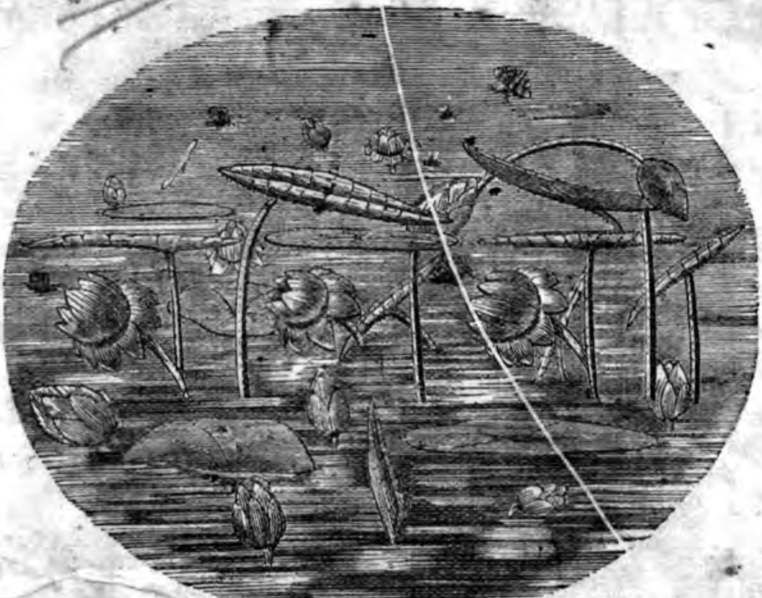
আর্য্যদর্শন।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অষ্টম খণ্ড, ১২৮৯ সাল।

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাভূষণ এম, এ,
কর্ত্তৃক সম্পাদিত
ও
নং বরানসী ঘোষের ষ্ট্রীট সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
জি, পি, বসু কোম্পানি কর্ত্তৃক ৩০ নং বেচু চাটুয্যের ষ্ট্রীট
বসু প্রেসে মুদ্রিত।



মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।

প্রথম পল্লব।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ বসু কর্ত্তৃক
সম্পাদিত।

১২৮৭।

কলিকাতা।

১৬৭ নং, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—কর প্রেসে
শ্রীঅধর নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ২ টাকা।

সূচিপত্র

আত্মোৎসর্গ।

জর্জ্জ ওয়াসিংটন।

(পূর্ব্ববারের পর।)

পাঠক ! এখন ইউরোপ ছাড়িয়া একবার আমেরিকায় চল। ঐ দেখ ! দুই জন মহাপুরুষ—ওয়াসিংটন ও পার্কার—মার্কিন ভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। প্রথমে যে মহাত্মার নাম উল্লেখ করিলাম, ইনিই আমেরিকার দাসত্ব-বিমোচন করেন। ইহাঁর জীবনী পাঠ করিলে, হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। আমরা ইহাঁরই জীবনী আলোচনা করিয়া আপাততঃ নিবৃত্ত হইব।

যে সকল ইংরাজ-পরিবার ব্রিটিশ সিংহের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া স্বদেশের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পাশ্চাত্য উপকূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, ওয়াসিংটনের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহাদিগের অন্যতম। ওয়াসিংটন-বংশ ১৬৫৭ খৃঃ ভার্জিনীয়ায় আসিয়া বসতি করেন। ওয়াসিংটনের পিতা মেরিল্যাণ্ডে যথেষ্ট বিষয়াদি করিয়াছিলেন। এবং মৃত্যুকালে সেই সমস্ত বিষয় তাঁহার ছয় পুত্রকে বিভাগ করিয়া দেন।

ওয়াসিংটন্ তাঁহার তৃতীয় পুত্র। ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি মেরিল্যাণ্ডের কোন সামান্য বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তথাপি তিনি ত্রিকোণমিতি ও জরিপ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় ছাড়িয়া তিনি একান্তমনে কেবল গণিত বিজ্ঞানের আলোচনায় নিযুক্ত হইলেন। তিনি লরেন্স নামক ভ্রাতার ভার্ণন্ গিরিস্থিত আবাসে শীতকাল যাপন করিতেছিলেন, এমন সময়ে লর্ড ফেয়ারফাক্‌সের চিত্ত আকৃষ্ট করিলেন। লর্ড ফেয়ারফাক্‌স গণিতবিজ্ঞানে ও জরিপ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ অভিজ্ঞতা দেখিয়া পটোমাক নদীতীরস্থিত সুবিশাল ভূমিখণ্ডের জরিপ কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি এই কার্য্য এরূপ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিলেন যে অচিরকাল-মধ্যে গবর্ণমেণ্টের সর্ভেয়ারের পদে নিযুক্ত হইলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তাঁহাকে ক্রমাগত তিন বৎসর আলিঘানি পর্ব্বতের নিবিড় অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। সেই সময়ে আমেরিকার প্রায় সকলেই রাজতান্ত্রিক ছিলেন। ওয়াসিং-

টনেরও রাজভক্তি এই সময় অচলা ছিল।

যখন ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রান্তসীমা আদিম অধিবাসিগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, এবং ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়, তখন ভার্জ্জিনীয়া ভাবী বিপদের আশঙ্কায় সামরিক প্রাদেশ সকলে বিভক্ত হয়। এই সময়ে ওয়াসিং-টন্ মেজরের পদে অভিষিক্ত হইয়া একটী প্রাদেশিক সেনায় অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভার্জ্জিনীয় মিলিসীয়ার দ্বিতীয় অধিনায়কত্ব প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই গ্রীষ্মের প্রারম্ভে ফ্রান্সের সহিত যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময়ে ফরাসি সেনাপতি কর্ণেল জুমোন্ভিলের অধীনস্থ ফরাশি সেনার সহিত তাঁহার প্রথম সম্মুখ-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফরাশি সেনা পরাজিত হয় ও ফরাশি সেনাপতি হত হয়েন। এই বিজয়ের জন্য তিনি ভার্জ্জিনীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হন ও ভার্জ্জিনীয় মিলিসীয়ার প্রধান নেতৃত্ব পদে অভিষিক্ত হন। তিনি সেনাপত্তি পদে বৃত হইয়া এরূপ কৌশল ও দক্ষতার সহিত পশ্চাৎপাদ হইয়া মহতী ফরাশি সেনার করাল গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন যে, ব্যবস্থাপক সমাজ তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন সেনাপতি ব্রাড্ডকের সহযোগী হইয়া যুদ্ধে গমন করেন। এই যুদ্ধে তাহাদিগের পরাজয় ও মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনার পরে তিনি ভার্ণন্স্থ পৈতৃক আবাসে প্রত্যাগত হন। তাঁহার ভ্রাতা লরেন্সের মৃত্যুতে ভার্ণন্গিরিস্থিত তাঁহার যাবদীয় বিষয় উত্তরাধিকারসূত্রে ওয়াসিংটনের হস্তগত হয়। এই সম্পত্তি হস্তে পাইয়া তিনি বিস্তৃত আকারে আতিথ্য ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। আমেরিকার আদি ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা অতিথি সৎকার্য্যে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ওয়াসিংটন পূর্ব্বপুরুষগণের সেই কীর্ত্তি বজায় করিলেন। এই সময়ে ১৭৫৯ খৃঃ তিনি কষ্টিস্ নামক কোন ব্যক্তির বিধবা রমণীকে বিবাহ করেন।

এই সময়ে তিনি বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বর ও সবিশেষ মান্য গণ্য হইয়া উঠিলেন। এইরূপে সুখে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহার বহুদিন অতীত হইল। যে সকল অমানুষ গুণে তিনি পরে জগতে উজ্জ্বল ও অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করেন, এখনও সে সকলের তাদৃশ কোন আভাস পাওয়া যায় নাই। যে জাতীয় স্বাধীনতা সমর উপলক্ষে তাঁহার সেই সকল গুণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়, যে সকল কারণে সেই সমরের উৎপত্তি, আমরা এক্ষণে তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিব।

আদিম অধিবাসী ও ফরাশিদিগের সহিত সমরে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সমূহ ক্ষতি হয়। বিখ্যাতনামা সেনা-

পতি উলফ এই সময়ে, হত হন। পীড়ায় ও শত্রুর অস্ত্রাঘাতে প্রায় তিন সহস্র জাতীয় সৈন্যের প্রাণ বিনষ্ট হয়। জাতীয় ঋণ চল্লিশ কোটী টাকায় পরিণত হয়। এই সমরের আংশিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ইংলণ্ডকেও চতুর্দ্দশ কোটী টাকা ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এবং বিজয়লব্ধ রাজ্য সকল সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য উপনিবেশে স্থায়ী সেনা রাখিতে হইয়াছিল।

যখন সমরের কোলাহল তিরোহিত হইল, যখন শেষ কামানের শব্দ শূন্যে মিশাইয়া গেল, যখন সমরে হত বীরবৃন্দ আপন আপন সমাধি-শয্যায় শয়ান হইয়া চির নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইলেন, যখন আহত সৈন্য সকল আপন আপন গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গকে আনন্দাশ্রুতে ভাসাইল, যখন মহাতেজা পার্ব্বতীয় সেনা [illegible] অধিবাসিগণের নিভৃত স্থান সকলের আলোড়নে বিরত হইয়া আপন আপন সৈন্যাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল, সংক্ষেপতঃ যখন সমস্ত আমেরিকায় শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভাবিবার সময় পাইয়া বিগত যুদ্ধের ক্ষতি লাভ গণনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, যদিও বিজয়লক্ষ্মী তাঁহাদিগের করতলস্থ হইয়াছে, যদিও তাঁহাদিগের বিজয়-গৌরব-রব ঘোষিত হইতেছে, তথাপি তাঁহারা আত্মপ্রসন্ন হইতে পারেন নাই। প্রভূত পরিমাণে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয়িত হওয়ায় তাঁহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। এ দিকে ইংলণ্ড এই সুযোগে জাতীয় ঋণ পরিশোধকল্পে আমেরিকার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

এ দিকে বিগত সমরে আমেরিকাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এরূপ প্রার্থনায় তত সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন যে, জাতীয় রুধিরে ও জাতীয় অর্থে তাঁহারাই এই বিজয় লাভ করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড [illegible] এই ব্যয়ভার বহন [illegible] এই সমরের পূর্ণ ফলভোগী হইয়াছেন, তথাপি তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। তিনি আমেরিকার উপরে কর ধার্য্য করিয়া সেই আংশিক ক্ষতি পূরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমেরিকা এত দিন আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া জানিতেন, সুতরাং ইংলণ্ডের সমস্ত অত্যাচার মুখ বুজিয়া সহিয়াছিলেন। কিন্তু আজ আমেরিকা আপনার বল জানিতে পারিয়াছেন। সুতরাং ইংলণ্ডের অত্যাচার এখন তাঁহার দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইল। বিগত সমরে ঔপনিবেশিকেরা বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন যে, বন্দুক চালনে ও কামান চালনে ইংলণ্ডীয় সেনা অপেক্ষা তাঁহারা কিছুতেই ন্যূন নহেন। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন এরূপ অক্লান্ত হইয়া

পড়িয়াছিলেন যে, সমর নিবৃত্ত থাকা যেন তাঁহাদিগের পক্ষে কিছু ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছিল। আজ রণক্ষেত্র আমেরিকাবাসিগণের নিকটে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণস্বরূপ অনুমিত হইতেছে। এই আভ্যন্তরীণ বল বুঝিতে পারিয়াই আজ আমেরিকা ইংলণ্ডের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতায় আপত্তি করিলেন।

ঔপনিবেশিকেরা দেখিলেন—ইংলণ্ড আমেরিকাকে সামরিক বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন। সীমান্তপ্রদেশের রাজ্য সকলের সহিত অকারণে যুদ্ধ বাধাইয়া আমেরিকার ব্যয়ে ও আমেরিকার রক্তে কতকগুলি ইংরাজসৈন্য ও কতিপয় ইংরাজ সেনাপতিকে রণদীক্ষিত করিয়া লইতেছেন। আজ আমেরিকা আপনার বল বুঝিতে পারিয়াছেন, তাই ইহা তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

ইংলণ্ডের মনে অভিমান ছিল, আমেরিক ঔপনিবেশিকেরা তাঁহার সন্ততি, তাঁহার যত্নে প্রতিষ্ঠাপিত, তাঁহার আদরে পরিবর্দ্ধিত, এবং তাঁহার বাহুবলে পরিরক্ষিত। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সের কোষাধ্যক্ষ এই চিরলালিত অভিমানের প্রত্যুত্তরে লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ড তুমি বলিয়া থাক যে, আমরা তোমার যত্নে আমেরিকায় স্থাপিত! না, একথা সত্য নহে—বরং তোমারই দৌরাত্ম্যে আমরা আমেরিকায় অধিবাসিত। তুমি বল, আমরা তোমার স্নেহে লালিত। না, বরং তোমারই অবহেলায় পরিপুষ্ট। তুমি শ্লাঘা করিয়া থাক—আমরা তোমারই বাহুবলে পরিরক্ষিত। না ইংলণ্ড। বরং তোমারই গৌরব রক্ষা করিতে আমাদিগকে জাতীয় রুধির ও জাতীয় অর্থ ব্যয় করিতে হয়।"

এইরূপ ভাব এক সময় আমেরিকাবাসী সাধারণের অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। আমেরিকার আদিম ঔপনিবেশিকগণ সকলেই সাধারণতান্ত্রিক ছিলেন। রাজা দেবানুগৃহীত, তিনি মানব নিয়মের অধীন নহেন—ইত্যাদি রাজতান্ত্রিক মত সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহারা সংখ্যায় দুর্ব্বল বলিয়াই অগত্যা ইংলণ্ডের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সন্ততিগণ এখন আত্মবল বুঝিয়া সে অধীনতাশৃঙ্খল ভেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

এদিকে ইংলণ্ডের লোকে ভাবিতে লাগিলেন, আমেরিকা ইংলণ্ডের উপনিবেশমাত্র; সকল বিষয়েই মাতৃরাজ্যের মুখাপেক্ষী, তবে তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া পালন না করিবে কেন? এই ভাবিয়া তাঁহারা আইনের উপর আইন জারি করিয়া আমেরিকাকে অষ্টপৃষ্ঠে বাঁধিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একটী আইন জারি হইল যে, কেহ ইংলণ্ডীয় জাহাজ ব্যতীত অন্য জাহাজে করিয়া উপনিবেশ হইতে ইংলণ্ডে মাল আমদানি করিতে অথবা ইংলণ্ড হইতে উপনিবেশে সমূহে মাল রপ্তানি করিতে

পারিবে না। ইহাতে ইংলণ্ডীয় বাণিজ্য-পোতের অধ্যক্ষগণ অতিশয় ধনবান্ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কতকগুলি দুর্নীতিকর নিষেধক আইন জারি হইল যে, যে সকল গাছের তক্তায় জাহাজ নির্ম্মিত হয়, আপন আপন সীমার বহির্ভূত এমন গাছ কেহ কাটিতে পারিবে না। কেহ লোহার কারখানা করিতে পারিবে না; কেহ ইস্পাত প্রস্তুত করিতে পারিবে না; যে দেশ বীবরে পরিপূর্ণ, সেখানে কেহ বীবরের টুপি তৈয়ার করিতে পারিবে না; কোন কারবারী এক সময়ে দুই জনের অধিক শিক্ষানবিশ রাখিতে পাইবে না ইত্যাদি। এদিকে বিলাতী মদ ও চিনি প্রভৃতির আমদানী বাড়াইবার জন্য দেশীয় চিনি, গুড় ও মদ প্রভৃতির উপরে বেজায় শুল্ক নির্দ্দিষ্ট করা হইল। এই সকল আইন অকেজো হইয়া পড়িয়া না থাকে, এই জন্য সন্দিগ্ধ ব্যক্তি মাত্রের ঘরে থানা তল্লাসী আরম্ভ হইল। এই সকল দুর্ব্বিষহ অত্যাচারে লোকে জর্জ্জরীভূত,—এমন সময় ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাম্প আইন প্রস্তাবিত হইল। পূর্ব্বে দলিল পত্র ও আদালতের দরখাস্তাদি সাদা কাগজে লিখিলে হইত; কিন্তু এই আইন অনুসারে সকলকেই সাদা কাগজের পরিবর্ত্তে ষ্ট্যাম্পযুক্ত কাগজ ব্যবহার করিতে হইবে। সংবাদ পত্র, সাময়িক পত্রিকা, পঞ্জিকা প্রভৃতিরও উপরে শুল্ক নির্দ্ধারিত হইল। এই আইনের পাণ্ডুলিপি ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে অবতারিত হইয়া আমেরিকাবাসিগণের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল। আমেরিকা এক্ষণে একবাক্যে ও মুক্ত-কণ্ঠে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের এ অধিকার অস্বীকার করিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর জর্জ্জ কিছুতেই বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। তাঁহার প্রভাবে ষ্ট্যাম্প আইন হাউস অব্ কমন্‌স ও হাউস্ অব লর্ডস্ উভয়ত্রই অবিসংবাদিতভাবে পাশ হইল। ভবিষ্য অভ্যুত্থানের সম্ভাবনায় ইহার সঙ্গে সঙ্গে একটী বিদ্রোহ-আইনও পাশ হইয়া গেল। যদি আমেরিকার কোন অংশে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণ করিবার জন্য ইংলণ্ড তথায় যত সৈন্য প্রেরণ করিবেন, এই আইনের বিধানানুসারে তথাকার অধিবাসিগণকে তাহাদিগের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান, সুকোমল শয্যা, সুমধুর পানীয়, শুষ্ক কাষ্ঠ, সুগন্ধি সাবান ও সুনির্ম্মল বাতি প্রদান করিতে হইবে।

এই কঠোর আইন জারি হওয়ায় বেন্-জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ প্রভৃতি মনীষীরও হৃদয় বিকম্পিত হইল। তিনি কোন প্রিয়বন্ধুর নিকটে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমেরিকার স্বাধীনতাসূর্য্য অনন্ত-কালের জন্য অস্তমিত হইল! এক্ষণে আমাদিগকে শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতার বাতি জ্বালিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করা ভিন্ন আমাদের আর কোন আশা নাই!" সাহসিকতর প্রিয়বন্ধু প্রত্যুত্তর লিখিয়া পাঠান—"ভাই! এক্ষণে আমাদিগকে

অন্য প্রকার বাতি জ্বালিতে হইবে।” প্রত্যুত এই ঘটনার পরেই আমেরিকার সর্ব্বত্র বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিল।

এই সময়ে কাড ওয়ালার কোলডেন নামক এক জন অশীতিবর্ষবয়স্ক ইংরেজ নিউইয়র্কের গবর্নর ছিলেন। অতি পবিত্রচরিত্র ও উদারপ্রাকৃতিক বলিয়া ইহাঁকে সকলেই শ্রদ্ধা করিত। ইহার মন্ত্রিসভার সভ্যগণও অতি উচ্চমনাঃ ছিলেন। এরূপ মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াও এবং এরূপ মহদাশয় হইয়াও এই প্রবীণ শাসনকর্ত্তাকে রাজশাসনের অনুরোধে লোকসাধারণের অভ্যুত্থানের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। ইতিহাসে এই জন্য তাঁহার নাম স্বাধীনতার শত্রু বলিয়া কলঙ্কিত হইয়াছে। তিনি স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন বটে, কিন্তু সে গতিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত হইয়া পড়িল। স্বাধীনতার সম্প্রদায় চতুর্দ্দিকে দলবদ্ধ হইতে লাগিলেন। সংবাদপত্র সকল নির্ম্মোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অকুতোভয়ে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ডের সহিত বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এই কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন। ১লা নবেম্বর ষ্ট্যাম্প আইন প্রচারের দিন স্থির ছিল। সেই দিন যত নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই আমেরিকার অধিবাসিগণ অধীর হইয়া উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে সভা বসিতে লাগিল, পথ ঘাট লোকে পরিপূর্ণ। আবাল বৃদ্ধ বনিতা দেশের জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। ধন্য স্বজাতিপ্রেম, ধন্য স্বদেশানুরাগ!

৩১এ অক্টোবর একটী মহতী জাতীয় সভার অধিবেশন হইল। এই সভায় ষ্ট্যাম্প আইনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের নিকটে এক খান আবেদন পত্র পাঠান স্থির হইল। দেশের সমস্ত বড় লোক ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। জেমস্ ইভান্স নামক এক ব্যক্তি ষ্ট্যাম্প বিলি করিবার ভার প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে অগত্যা কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশে ফিরিয়া যাইতে হইল।

নিউইয়র্কের দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ। ২৩এ অকটোবর ইংলণ্ড হইতে নূতন ষ্ট্যাম্প সকল আসিয়া এই দুর্গে সংরক্ষিত হইলে, এই দুর্গের উপর আক্রমণ সম্ভাবনা করিয়া ইংরাজেরা ইহার রীতিমত জীর্ণসংস্কার করিলেন এবং ইহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সুসংরক্ষিত করিয়া লইলেন, দুর্গের কামানগুলির মুখ নগরাভিমুখে সংস্থাপিত হইল এবং ইংলণ্ডীয় রণতরি সকল রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া নগরের বন্দরে আসিয়া লাগিল। নিউইয়র্ক অবরুদ্ধ নগরীর আকার ধারণ করিল। কিন্তু আমেরিকাবাসীরা ইহাতে ভীত না হইয়া দলে দলে নগরে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। যে—যে অস্ত্র পাইলেন, লইয়া নগরাভিমুখে

ধাবিত হইলেন। ব্রিটিশ কামানরাজি যেন মন্ত্রৌষধিরুদ্ধবীর্য্য সর্পের ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিল। কেন না শত্রু হইলেও জনরাজসেনাপতির এত লোকের উপরে গোলাচালন করিতে প্রবৃত্ত ব্যথিত হইল। ক্রমে জনতা এত বাড়িয়া উঠিল যে, ইংরাজেরা বিদ্রোহিদিগের হস্তে সমস্ত ষ্ট্যাম্প অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ইংলিস পার্লেমেণ্টকে ষ্ট্যাম্প আইন অগত্যা রহিত করিতে হইল। কিন্তু [illegible] আর একটী আইন জারি হইল; তাহা তুল্যরূপ দূষিত ও তুল্যরূপ আপত্তিজনক। এই আইন [illegible] প্রধানতঃ 'চা'র উপরে কর ধার্য্য করিয়া দিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে অনুমতি দেওয়া হইল—ইংলণ্ডের যে চা তাঁহারা আমেরিকায় পাঠাইবেন, আমেরিকাবাসিদিগকে সেই চা'র উপরে প্রতি পাউণ্ডে তিন পেনস করিয়া শুল্ক দিতে হইবে। কিন্তু আমেরিকাবাসীরাও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ঐ চা কখনই আমেরিকায় নামাইতে দিবেন না।

ফিলাডেলফিয়া প্রদেশের অধিবাসীরাই সর্ব্বপ্রথমে এই চার আমদানীর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইল। একদিন নগরের মধ্যে ঘোষণা হইল—'যে যে চা কিনিয়াছেন, তাঁহারা বাজারে আসিবেন; আজ রাত্রি দশটার সময়ে সেখানে এক অদ্ভুত আমোদের উৎসব হইবে।' অধিবাসীরা সকলে [illegible] পরিয়া সকলে যথা-সময়ে যথাস্থানে আসিয়া চা সমর্পণ করিল। রাত্রি দশটার সময়ে চা-স্তূপে অগ্নিপ্রদান করা হইল। বিশালস্তূপ প্রচণ্ড শিখায় দশ দিক আলোকিত হইল। লোকে সঙ্কল্প করিল, কিছুতেই বাজারে চা আনিতে দিবে না। যদি কোন ইংরাজ বণিক সশস্ত্র-পুরুষ-পরিরক্ষিত অবস্থায় চা আনিয়া বাজারের গুদামে রাখিত, অমনি রাত্রিতে গুদামে আগুন লাগিত। ফিলাডেলফিয়া নগরে চার জাহাজগুলি নদীমুখেও প্রবেশ করিতে সাহস করিল না। যেমন অবস্থায় আসিয়াছিল, সেই অবস্থায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেল। নিউইয়র্কে সেনার সাহায্যে চা নামান হইল বটে, কিন্তু চা কেহ কিনিল না। কারণ, ঘোষণা হইয়াছিল, যে চা কিনিবে, তাহার মস্তক যাইবে। চার্লস টাউনেও ঐ রূপে চা নামান হইল, কিন্তু ক্রেতা না জুটায়, চা গুদামে পড়িয়া পচিতে লাগিল, এবং অবশেষে অগ্নিদগ্ধ হইল। বোষ্টনেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গোলযোগ উপস্থিত হয়। এখানে গবর্ণর ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্দেশে চা পাঠান হয়। সুতরাং উহা নামাইবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইবে ভাবিয়া, লোকে বিশেষ প্রতিবিধানের চেষ্টা করে। এক সুবিমল প্রদোষে রজনীতে 'চা'র জাহাজগুলি বোষ্টনের বন্দরে আসিয়া লাগিল। যেমন লাগিল, অমনি তিন শত বোষ্টনবাসী ছদ্মবেশে সেই সকল জাহাজের উপরে গিয়া পড়িয়া চার

বাক্স গুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া সব ঝুপ্ঝাপ করিয়া জলে ফেলিয়া দিল। রক্ষকেরা-প্রথমে বাধা দিয়াছিল, কিন্তু সে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ গুলির নিকট পরাস্ত হইয়া শেষে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে তিন শত বত্রিশটী বাক্স ভগ্ন ও জলে প্রক্ষিপ্ত হইল।

এই বার ইংলণ্ড গর্জ্জিয়া উঠিল। এই সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র স্থির হইল—যে কোন রকমে হউক, উপনিবেশ-গুলিতে ইংরাজ-প্রভুতা ও আইনের মর্য্যাদা পুনঃস্থাপিত করিতেই হইবে। বোষ্টনের ধ্বংস স্থিরীকৃত হইল। বোষ্টনের উপরে হুকুম জারি করা হইল যে, যত চা নষ্ট করা হইয়াছে, সমস্তের মূল্য দিতে হইবে। বোষ্টনের সহিত সর্ব্ববিধ বাণিজ্য নিষিদ্ধ হইল। কষ্টম হাউস্ প্রভৃতি সালেমে লইয়া যাওয়া হইল। কিন্তু সে বাণিজ্যে সালেমের লোকে বোষ্টনের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে চাহিল না। সমস্ত আমেরিকা বোষ্টনের সহিত সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে লোক সকল এ নগর হইতে ও নগরে যাইতে লাগিল। সর্ব্বত্র বিশ্বব্যাপী অসন্তোষ ও বিরাগের ভাব পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। বহুদিন-সংরুদ্ধ ক্রোধ, স্বজাতিপ্রেম, স্বাধীনতা-স্পৃহা যুগপৎ উদ্দীপিত হইয়া সমস্ত জাতিকে যেন একশরীরী করিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত করিল।

বোষ্টনে আর একটী ঘটনায় প্রজ্বলিত বিদ্রোহানল আরও প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এক দিন ইংরাজ সৈনিকগণের সহিত নগরবাসিদিগের হাতাহাতি বাধিল; তাহাতে জাতীয় রক্ত পতিত হইল। শীতল ধবল বরফের উপরে সেই লোহিত রক্ত পতিত হইয়া যেন ইংলণ্ডের ধবলযশে কলঙ্কারোপ করিল। এই ঘটনায় সমস্ত আমেরিকা অগ্নিময় হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডের ন্যায়পরতা, জাতীয় গৌরব, মনুষ্যত্ব সমস্ত যেন আটলাণ্টিক গর্ভে নিমজ্জিত হইল। সমস্ত আমেরিকা সমস্বরে এই ঘটনার প্রতিবাদ করিলেন। সে স্বর আটলাণ্টিক বক্ষ বিদারিয়া ইংলণ্ডে গমন করিল। কিন্তু ইংলণ্ডের হৃদয় গলিত হইল না। ইংলণ্ড আমেরিকার স্বাধীনতার ধ্বংস সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। উত্তরপার্লেমেণ্টেই ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জকে বুঝাইলেন যে, আমেরিকা অনেক দিন হইতে স্বাধীনতার জন্য স্থির সঙ্কল্প হইয়াছিল; কেবল সামর্থ্য ও সুবিধার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে সেই রাক্ষসী স্বাধীনতা স্পৃহাকে সূতিকাগারেই বিনাশ করা প্রত্যেক ইংরাজেরই অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সুতরাং যে কোন মূল্যে ও যে কোন বিপদে হউক ইহা প্রত্যেক ইংরাজেরই সাধনীয়।

এদিকে আমেরিকাবাসীরাও আত্ম-রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। প্রাচ্যগগনে ভীষণ মেঘ উঠিয়াছে, দেখিয়াই তাঁহারা স্থির করিলেন যে

পশ্চিমাভিমুখে প্রবল ঝটিকা বহিবে। নানা স্থানে জাতীয় সভার অধিবেশন হইতে লাগিল। সকলেই মুক্তহস্তে চাঁদা দিতে লাগিলেন। দলে দলে সৈন্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। কর্ম্মচারিগণ মনোনীত হইতে লাগিলেন। আমাদের প্রবন্ধের অধিনায়ক জর্জ্জ ওয়াসিংটন সেনাপতির পদে অভিষিক্ত হইলেন। আমেরিকা এতদিন অনেক কোমল উপায় অবলম্বন করিয়া ব্যর্থ হইয়া এক্ষণে শাণিত অসি দ্বারা অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন।

ফিলাডেলফিয়া নগরে একটী জাতীয় মহতী সভার অধিবেশন হইল। আমেরিকাবাসীরা এখনও প্রকাশ্য রূপে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহারা জাতীয় দায়িত্বে ঋণ সংগ্রহ ও অতি ত্বরা সহকারে যুদ্ধের আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তখন ব্রিটিশ সেনাপতি গেজ বোষ্টন্ নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পাছে তিনি সসেনা আমেরিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, এই ভয়ে আমেরিকাবাসীরা তাঁহাকে বোষ্টন নগরে অবরুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। জর্জ্জ ওয়াসিংটনের হস্তেই এই গুরু ভার পড়িল। আমেরিকানেরা বোষ্টন অবরুদ্ধ করিবে, এই সংবাদ যখন বোষ্টনে উপস্থিত হইল, তখন ইংরাজেরা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ভাবিলেন যখন তাঁহাদিগের পুঞ্জীকৃত খাদ্যসামগ্রী রহিয়াছে, নগর দুর্গ সংরক্ষিত রহিয়াছে, তখন বিদ্রোহিদিগের নিকট হইতে তাঁহাদিগের কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। আর ব্রিটিশ সেনাপতি হাউএরও এই বিশ্বাস ছিল। সুতরাং নিকাশপ্রদীপ দীপাশিখার ন্যায় তাহাদের প্রেমানুরাগ এই মুমূর্ষু কালে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই সময় একটী রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইল; বলের (Balls) ধূম পড়িয়া গেল! প্রহসন, নাটক, মাসকুয়েরেড্ প্রভৃতির জন্য ধড়াধড় চাঁদা উঠিতে লাগিল। উক্ত রঙ্গালয়ে এক রজনীতে 'বোষ্টন-অবরুদ্ধ' নামক একখানি প্রহসন প্রণীত ও অভিনীত হইতেছিল। তাহাতে একটী দৃশ্যে সেনাপতি ওয়াসিংটনকে বিকটাঙ্গ অবস্থায় একটী প্রকাণ্ড পরচুলা মাথায় দিয়া একখানি মরচেধরা তরবার হস্তে একজন মাত্র পুরাতন বন্দুকধারী ভৃত্য সমভিব্যাহারে রঙ্গমঞ্চে অবতারিত করা হইয়াছিল। এই অংশটুকুর অভিনয় হইতেছে, এমন সময় একজন সার্জ্জন সহসা রঙ্গস্থলে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে জানাইল যে, আমেরিকানেরা আসিতেছে। দর্শকমণ্ডলী প্রথমে ইহা অভিনয়ের অংশ মনে করিয়া অসম্ভব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাদিগের সে ভ্রম দূরীকৃত হইল। সেনাপতি হাউ মুহূর্ত্ত মধ্যে আসিয়া সুদৃঢ় ও গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন "কর্ম্মচারিগণ!

অবিলম্বে সশস্ত্র আপন আপন স্থানে গমন কর।" সেই হর্ষ, সেই প্রমোদ, সহসা বিষাদে পরিণত হইল (Jest became earnest)। যথার্থই বোষ্টন অবরুদ্ধ হইয়াছিল, যথার্থই ওয়াসিংটন সসৈন্য ব্রিটনদিগকে আসিয়া ঘিরিয়াছিলেন। বোষ্টনের অবরোধ কয়েক মাস ধরিয়া রহিল। বঙ্কর্স পাহাড়ে ইংরাজদিগের সহিত আমেরিকানদিগের একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে বিজয়-লক্ষ্মী আমেরিকান-দিগের অঙ্কশায়িনী হন। ইংরাজেরা ওয়াসিংটনের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে, যদি তাঁহাদিগকে অক্ষত শরীরে নগর ছাড়িয়া যাইতে দেন, তাহা হইলে তাঁহারা নগরের কোন ক্ষতি না করিয়া নগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত আছেন। ওয়াসিংটন এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনুসারে ইংরাজেরা ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ ই মার্চ নগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক হ্যালিফ্যাক্স যাত্রা করিলেন।

এই স্বাধীনতাসমরে ওয়াসিংটন যে অদ্ভুত অবদান পরম্পরা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বীরত্বের ও আত্মত্যাগের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সকল রাখিয়া গিয়াছেন, সে সকল আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভব নহে। আমরা কেবল প্রধান প্রধান দুই চারিটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই জীবনী সমাপ্ত করিব।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে নিউইয়র্ক একটী প্রধান নগর। ইংরাজেরা তাহার উপর আক্রমণ করিবেন শুনিয়া তাহার রক্ষার্থ ওয়াসিংটন তথায় গমন করিলেন। তাঁহার সহিত ১৭০০০ মাত্র সৈন্য ছিল। ২২এ আগষ্ট ইংরাজ সৈন্য নিউইয়র্কের অনতিদূরবর্ত্তী লঙ্ আইলাণ্ড নামক দ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে নামিয়াই আমেরিক শিবিরাভিমুখে অভিযান করিল। ইংরাজসৈন্য আসিতেছে দেখিয়া আমেরিকানেরা ক্রুক্‌ক্রম শিবির পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহাদিগের দিকে অগ্রসর হইল। এই সময় সেনাপতি কিণ্টন অন্যদিক্ হইতে আর এক দল ইংরাজসৈন্য লইয়া আমেরিকানদিগকে আক্রমণ করিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পলায়নের আশা পর্য্যন্ত রহিল না। দুই সেনার মধ্যে পড়িয়া সেই আমেরিক সৈন্য ভস্মীভূত হইয়া গেল। সহস্র সৈন্য রণবন্দী হইল। অল্পসংখ্যক মাত্র রক্ষা পাইয়া পরাজয়বার্ত্তা গৃহে লইয়া গেল।

আমেরিক সৈন্য যুদ্ধে পরাস্ত হইল বটে, কিন্তু নিউইয়র্ক এখনও ওয়াসিংটনের হস্তে রহিল। ইংরাজেরা এই নগর অধিকার করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ওয়াসিংটন উপকূলে সৈন্য রাখিলেন—উদ্দেশ্য ইংরাজ সৈন্যকে জাহাজ হইতে নামিতে দিবেন না। তিনি স্বয়ং ও দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য লইয়া দূর হইতে ঘটনা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। ইংরাজসৈন্য আবির্ভূত হইবামাত্র আমেরিকানেরা ভয়ে পলায়ন

করিল—একটী মাত্র বন্দুকে আওয়াজ হইল না। বন্দুকের গুলি বন্দুকেই রহিয়া গেল। ওয়াসিংটন অল্প মাত্র আনুযাত্রিক সহ রণস্থলে পড়িয়া রহিলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণের কাপুরুষতায় এত দূর বিরক্ত,দুঃখিত ও হতাশ হইয়াছিলেন যে, কাতরস্বরে বলিয়াছিলেন যে, এই সকল লোক দ্বারা কেমন করিয়া আমেরিকা রক্ষা হইবে? যে সময় তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আসীন হইয়া এই কথা ভাবিতেছিলেন, সে সময় তিনি শত্রুসৈন্য হইতে অশীতি পদ পরিমিত দূরে অবস্থিত ছিলেন। ওয়াসিংটনের রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যেন কষ্ট হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার আনুযাত্রিকেরা বিপদের আশঙ্কা করিয়া তাঁহার অশ্বের মুখ ফিরাইয়া দিল, এবং অশ্বের বল্গা ধরিয়া টানিয়া তাঁহাকে সবেগে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। পরদিন ইংরাজদিগের সহিত একটী সামান্য যুদ্ধ হয়, তাহাতে আমেরিকানেরা জয়লাভ করেন। ইহাতে তাঁহাদিগের বিলুপ্ত গৌরব কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধৃত হয়। পরাজিত হইয়াও ইংরাজসৈন্য সংখ্যার আধিক্যবশতঃ আমেরিক সৈন্য ভেদ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। নিউইয়র্কের রাজতান্ত্রিক দল মহোল্লাসে ইংরাজসৈন্যগণকে গ্রহণ করিলেন। কয় রাত্রির মধ্যে নগরে অগ্নি লাগিয়া নগরের তৃতীয়াংশ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

ওয়াসিংটন নিউইয়র্ক পরিত্যাগ করিয়া হার্লেম নগরে সৈন্যের সন্নিবেশিত করিলেন। তাঁহার সৈন্যমধ্যে গভীর হতাশতার ভাব দেদীপ্যমান হইল। ইংরাজসৈন্য তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল। তাঁহারা পদে পদে পরাজিত হইয়া অবশেষে নর্থ কাসল পাহাড়ের শিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বিজয়লক্ষ্মী এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজদিগের করতলস্থ হইল। ইংরাজেরা ঘোষণা করিলেন যে, যে সকল বিদ্রোহী ৬০ দিনের মধ্যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিবে, তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করা যাইবে।

এই হতাশতার সময় ওয়াসিংটন আমেরিকার একমাত্র আশা ছিলেন। আমেরিকান মহাসভা তাঁহাকে ডিক্টেটর পদে অভিষিক্ত করিলেন, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন। কিন্তু সে অবস্থায় কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন এরূপ সাহস তিনি ভিন্ন আর কেহ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

ওয়াসিংটনের সৈন্যের দুরবস্থার ইয়ত্তা ছিল না। তাহাদিগের পায় জুতা ছিল না, গায় ভাল বস্ত্র ছিল না; সুতরাং নগ্ন পাদে, নগ্ন দেহে তাহাদিগকে হিমানীসমাচ্ছাদিত গিরিপথে ও গিরিশৃঙ্গে পলাইয়া বেড়াইতে হইয়াছে। অনাহারে ও অনিদ্রায় তাহাদিগকে কত দিন যাপন করিতে হইয়াছে। স্বয়ং সেনাপতি অভুক্ত ও নিনিদ্র থাকিতেন বলিয়া তাহারা সে ক্লেশ সহিতে পারিত।

ভাল শিক্ষা ছিল না, ভাল অস্ত্র শস্ত্র ছিল না বলিয়া ওয়াসিংটন নিজ সেনাকে সমতল ক্ষেত্রে শত্রুগণের সম্মুখীন করিতেন না। দিবসে পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত থাকিয়া রজনীতে অতর্কিতভাবে ইংরাজ-শিবিরে পড়িয়া তাহাদিগকে মারিয়া তাহাদের খাদ্য সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি লইয়া পলায়ন করিতেন। মহাসভা তাঁহাকে অস্ত্রশস্ত্র, অর্থ বা খাদ্য সামগ্রী দিয়া সহায়তা করিতে পারিতেন না। সুতরাং এ সমস্ত তাঁহাকে নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইতে হইত। কোন দেশের কোন সেনাপতিকে এরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার অতিমানুষ শক্তি বলে তিনি ক্রমে ক্রমে এ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উঠিলেন। তাঁহার সৈন্যেরা ক্রমেই রণদীক্ষিত হইয়া উঠিল, হতশত্রুর অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদে ক্রমেই তাহারা সুসজ্জিত হইয়া উঠিল। বীরত্বে ও স্বজাতিপ্রেমের ভাবে তাহারা ক্রমেই রণোন্মত্ত হইয়া উঠিল। এতদিনের কষ্ট যন্ত্রণায় ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ স্বদেশের মঙ্গলার্থ আত্মবলি দিতে প্রস্তুত হইল।

দীর্ঘ সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ওয়াসিংটনের সৈন্যগণ এখন শত্রুসৈন্যের সম্মুখীন হইল। জলে স্থলে একেবারে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

চল পাঠক, একবার কল্পনা-বলে ব্যোমযানে উঠিয়া সেই সময়ের ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অবস্থা দেখি। ঐ দেখ সমস্ত আমেরিকা জলে স্থলে যেন একটী প্রকাণ্ড যুদ্ধক্ষেত্র বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দেখ ইংরাজরণতরি বক্ষঃস্ফীত করিয়া পতাকা উড্ডীন করিয়া আমেরিকানদিগের বিরুদ্ধে ধাবিত হইয়াছে, আর আমেরিকানেরা ভীষণ তোপধ্বনি করিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঐ দেখ! আর একখানি ইংরাজ জাহাজ শ্বেতপালরাজি বিস্তার করিয়া নিউইয়র্কের বন্দর হইতে ভার্জিনিয়াভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। ঐ দেখ! ইহার সৈনিকেরা উপকূল-বিভাগ বিধ্বস্ত করিয়া লুণ্ঠনার্থ দেশমধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ শুন। পীড়িত ও মুমূর্ষ ইংরাজ সেনাগণের আর্ত্তনাদে গগন বিদীর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ! জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ইংরাজ-সৈন্য দলে দলে মরিতেছে, তথাপি লুণ্ঠন হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না।

আবার দেখ! আমেরিকানেরা কোথা হইতে হঠাৎ আসিয়া ব্রিটিশ শিবিরে পড়িয়া তাহাদের কামান, বন্দুক, তরবারি ও দ্রব্য-সামগ্রী কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। ঐ দেখ! আর এক দল আমেরিকান্ তিম-বোটে ও ছোট ছোট ষ্টীমারে করিয়া আসিয়া ইংরাজাধিকৃত উপকূল বিভাগে পড়িয়া ইংরাজেরও দ্রব্য সামগ্রী লুট করিয়া লইয়া যাইতেছে। যে সেণ্টজর্জ্জ দুর্গের লোহিত ক্রসের নিকট একদিন প্রত্যেক আমেরিকান্

নতশির হইতেন, আজ সে সেণ্টজর্জ্জের দিকে কেহ ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। ঐ যে সহস্র-বজ্র-নাদী কর্ণভেদী শব্দ শুনিলে, উহা একটী দুর্গ উড়িয়া যাইবার শব্দ। আমেরিকানেরা সুড়ঙ্গ কাটিয়া ইংরাজ-দুর্গের নিম্নে গিয়া বারুদে গর্ত্ত পূরিত করিয়া তাহাতে অগ্নিপ্রদান করায় ঐ দুর্গ উড়িয়া গেল। ঐ দেখ! আমেরিকানেরা আর একটী ইংরাজাধিকৃত নগরের উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে। আবার আর এক দিকে দেখ! ঐ একটী শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে রক্তক্ষেত্রে পরিণত হইল। ঐ দেখ! দুই সেনা কি সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে পরস্পরের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে; এবং ভীষণ লম্ফে পরস্পরের উপর পড়িয়া পরস্পরকে ছিন্ন ভিন্ন করিবার জন্য কি একাগ্রতার সহিত অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে। উভয়ের রণবিশারদী প্রতিভার পরীক্ষা দিবার এই একটী প্রকাণ্ড রঙ্গস্থল। ঐ শুন! একেবারে শত শত কামান গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে; সহস্র সহস্র বন্দুক পরক্ষণেই তীব্র শব্দে তাহার উত্তর দিতেছে। চতুর্দ্দিকে ঘন মেঘ উঠিতেছে। ধূমপুঞ্জে দৃষ্টি আবরিত হইতেছে, তথাপি উভয় সৈন্যের পরস্পর-সংহারী গুলিগোলার শব্দে কাণ ফাটিয়া যাইতেছে। ঐ দেখ! ইংরাজসৈন্য পরাস্ত হইয়া পশ্চাদ্গামী হইল। 'ওয়াসিংটনের জয়, জয় আমেরিকার জয়' শব্দে গগন বিদীর্ণ হইল। এতদিনে স্বাধীনতা রাজশত্রুকে পরাস্ত করিল। এতদিনে জাতীয় দুর্গে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইল। এই স্বাধীনতা-সমরের প্রধান নেতা ও প্রাণভূত ওয়াসিংটনের যশঃ আজ সমস্ত আমেরিকায় উদ্‌ঘোষিত হইতে লাগিল। এখন স্বাধীন আমেরিকা, বিজয়ী আমেরিকা, নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন জানাইবার জন্য ইংলণ্ডে কতিপয় ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে পাঠাইলেন। যে আমেরিকা ইংলণ্ডের রাশি রাশি ষ্ট্যাম্প ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছে, ইংলণ্ডের জাহাজ জাহাজ চা সাগরগর্ভে প্রক্ষেপ করিয়াছে, ইংরাজের ভয়-প্রদর্শনে পরিহাস করিয়াছে, ইংরাজের অভয়প্রদান তুচ্ছ করিয়াছে; যে আমেরিকা ইংরাজ-সেনাকে পদদলিত ও ইংরাজ-পতাকাকে অবমানিত করিয়াছে, এবং ইংরাজ-প্রভুতাকে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিয়াছে, আজ ইংলণ্ডের সেই আমেরিকজাতিকে একটী স্বাধীনজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহার সহিত সমানক্ষেত্রে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, এবং সন্ধিপত্রে স্বাধীন নাগরিকগণের স্বাক্ষর যেন রাজস্বাক্ষর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—সম্মতির এ প্রস্তাবে জননী ব্রিটানিয়াকে সম্মত হইতে হইল।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি হইয়া গেল। আজ ওয়াসিংটনের জীবনের কর্ত্তব্য এখনও শেষ হয় নাই। তিনি আজ পদ-

দলিত আমেরিকাকে স্বাধীনজাতিতে পরিণত করিয়া,রণপাণ্ডিত্যে জগৎকে মুগ্ধ করিয়া জগতের শিক্ষার জন্য আত্ম-ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে চলিলেন। তাঁহার যে সেনা অজেয় ইংরাজসেনাকে রণে পরাস্ত করিয়াছে, সেই সেনার বলে আজ তিনি আমেরিকার সম্রাট হইতে পারিতেন। কিন্তু সেই যোগীর অন্তরে সে নীচভাব লব্ধ-প্রবেশ হইল না। তাঁহার উদার অন্তরে বরং ইহার ঠিক বিপরীত ভাবের উদয় হইল। জাতীয় স্বাধীনতার জন্য তিনি অনিয়-ন্ত্রিত জাতীয় সৈনাপত্য স্বীকার করিয়া-ছিলেন; কিন্তু আজ তাহা সম্পন্ন হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে সে সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু সে পদ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একবার সসৈন্য নিউইয়র্ক নগরে প্রবেশ করিবেন, স্থির করিলেন।

নিউইয়র্কের আজ মহাদিন। নিউ-ইয়র্ক ইংরাজসৈন্যের সেনানিবাস ছিল। আজ সে ইংরাজসৈন্য স্থলে স্থল না পাইয়া জলনিধির আশ্রয় গ্রহণ করি-য়াছে। ঐ দেখ, অদূরে ইংরাজ-রণতরি তাহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহি য়াছে। আজ সে দিকে কেহ দৃক্‌পাতও করিতেছে না। ওয়াসিংটন্—বিজয়ী ওয়াসিংটন, আমেরিকার প্রাণের প্রাণ ওয়াসিংটন আজ সসৈন্য নগরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, তাই আজ আমেরিকা-বাসীরা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নগরাভিমুখে ছুটিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাজ-পথ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল—যেন রাজ-পথে জীবন-প্রবাহ প্রবাহিত হইল—যেন শির সমুদ্রে সমস্ত নগর প্লাবিত হইল—যেন তরঙ্গের উপর তরঙ্গ পড়িতে লাগিল—নবেম্বরের মৃদু মধুর সূর্য্যরশ্মি তাহাতে পতিত হওয়া জল-তরঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা বিধান করিল। এমত সময় সহসা ‘জয় ওয়াসিংটনের জয়, জয় আমেরিকার জয়’ ধ্বনি উত্থিত হইল। ধ্বনির উপর ধ্বনি, তাহার উপর ধ্বনিতে আকাশ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সেই জয়ধ্বনি সঙ্গে করিয়া অশ্ব-সেনা পরিবেষ্টিত সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন রণজিৎ লোকপ্রাণ ওয়াসিংটন নগরে প্রবেশ করিলেন। জয়ধ্বনি ও মঙ্গলধ্বনিতে নগর পরিপূরিত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাসাদাবলীর গবাক্ষমালা হইতে অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। এতদিন আমেরিকার জাতীয় জীবন ছিলনা, সুতরাং জাতীয় পতাকাও ছিল-না। কিন্তু আজ আমেরিকা বিশাল ও প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী অনন্ত বলশালী প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য। সুতরাং আজ আমেরিকার নব সৌভাগ্যদ্যোতক পতাকা চাই। যে স্তম্ভের উপর ব্রিটনপতাকা উড্ডীন হইত, ব্রিটনেরা নগর পরিত্যাগ কালে তাহা ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গিয়াছে। ঐ দেখ! ঐ আমেরিক বীরনাগরিকেরা

অমিত বলে ও মহোৎসাহে আজ জাতীয় পতাকার স্তম্ভ গাঁথিতেছে। ঐ দেখ! তাহাদিগের ক্ষিপ্রহস্ততায় নিমেষমধ্যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হইল। ঐ দেখ! আজ আমেরিক জাতীয়পতাকা সগর্ব্বে ও সহর্ষে গগনে নৃত্য করিতেছে—যেন নৃত্যস্থলে সমর-বিজয়ী ওয়াসিংটনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ঐ দেখ! বীর-চূড়ামণি ওয়াসিংটন শিরস্ত্রাণ খুলিয়া নগ্ন শিরে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, ও অবনত মস্তকে স্বজাতীয়গণকে নমস্কার করিতেছেন। অনেকে আজও তাঁহাকে দেখে নাই, অথবা দেখিয়াও তত আকৃষ্টচিত্ত হয় নাই। অনেকে আজও ওয়াসিংটনের নামও শুনে নাই। কোন্ দেবতা ছদ্মবেশে তাঁহাদিগের মধ্যে এতদিন বাস করিতেছিলেন দেখিবার নিমিত্ত আজ সমস্ত আমেরিকা প্রায় সেখানে উপস্থিত। আমেরিকাবাসিগণের সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন আজ নয়নে সংক্রামিত হইয়াছে। তাহারা আজ প্রাণ ভরিয়া উপচিত শক্তিতে তাহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তাকে দেখিতে লাগিল। আজ ওয়াসিংটন্ প্রত্যেক আমেরিকাবাসীর হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আজ তিনি প্রত্যেক আমেরিকা-বাসীর নয়নের অঞ্জন। তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিয়া, ও অনবরত দেখিয়াও আজ তাহাদিগের তৃপ্তি হইতেছে না। ধন্য ওয়াসিংটন্! ধন্য তোমার জীবন! অনাহারে অনিদ্রায় তুমি যে এতদিন ঘোর শবসাধনা করিয়াছিলে, আজ তাহার সিদ্ধি দেখিয়া না জানি তোমার মনে কি সুখসাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। তুমি আমেরিকায় যে কাজ করিলে, যতকাল আমেরিকা থাকিবে কখনই সে উপকার ভুলিতে পারিবে না। আমেরিকার জাতীয় জীবন কখনই ছিলনা, সুতরাং তুমি আজ একটী নূতন জাতি সৃষ্টি করিলে। তোমার তপোবলে ও চরিত্র-মাহাত্ম্যে সেই জাতি একদিন জগতের তীর্থস্থল হইবে। ধন্য তোমার বীরত্ব! তুমি বিনা শঙ্কায়, বিনা অস্ত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াও একটী বিশ্ববিজয়ী জাতিকে পরাস্ত করিলে। সাধনার অসাধ্য কিছুই নাই।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ আমেরিকার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অতিমানুষ বীরত্বে আমেরিকার চরণ হইতে ব্রিটিশ শৃঙ্খল স্খলিত হইল। তাঁহার যত্নে আমেরিকাবাসিগণ পৃথিবীর একটী জাতিমধ্যে পরিগণিত হইল। তাঁহার জীবন ব্রতের পূর্ণ উদযাপনা হইলে তিনি ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে জাতীয় সৈনাপত্যের পদ পরিত্যাগ করিয়া আপন গ্রাম্য আবাসে গমন করিয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিক দিন তিনি বিশ্রাম-সুখভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরকাল মধ্যেই আমেরিকা আবার তাঁহাকে

শরণাপন্ন হইল। তিনি যে শুদ্ধ বীরত্বে অদ্বিতীয় ছিলেন এরূপ নহে। তিনি অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন ও প্রগাঢ়-রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। বিশেষতঃ নিষ্কাম দেশহিতৈষণার জন্য তিনি আমেরিকা-বাসী মাত্রেরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। যখন প্রেসিডেন্টের পদ সৃষ্ট হয়, তখন সকলে একবাক্যে তাঁহাকেই ঐ পদে বরণ করিল। তাঁহাকে গ্রাম্য আবাস পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা ঐ জাতীয় অধিনায়কত্ব পদ গ্রহণ করিতে হইল। পাঁচ বৎসরের অধিক এই পদে থাকার কাহারও অধিকার নাই। কিন্তু ওয়াসিংটন্ তিনবার এইপদে মনোনীত হন। অবশেষে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। জাতীয় মহাসভার সভ্যেরা ও দেশের সমস্ত লোক এই শোচনীয় ঘটনার একমাস কাল শোক চিহ্ন ধারণ করেন।

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে জাতীয় হৃদয়ে শোক উদ্দীপন করিবার জন্য কোন জাতীয় বিধি-ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় নাই। যে মহাপুরুষের প্রাণোৎসর্গের ফলে আজ আমেরিকা অনন্ত সৌভাগ্যশালিনী ও অনন্ত সুখবতী, যাঁহার বীরত্বে ও ধর্ম্মবলে একদিন আমেরিকা অগণ্য বিপদপরম্পরা হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল, যাঁহাকে আমেরিকাবাসীরা এতদিন পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়া আসিতেছিল, সেই পবিত্র-হৃদয় মহাপুরুষ আজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আজ আমেরিকা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শোকে অভিভূত। সে গভীর শোক ব্যক্ত করা অসম্ভব। তথাপি যাহার যেরূপ সাধ্য আমেরিকা-বাসি-মাত্রেই সেইরূপে তাহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বাগ্মী সভাগৃহে বক্তৃতা করিয়া, যাজক ভজনালয়ে সমর্মন দিয়া, সম্পাদক সম্বাদপত্রের স্তম্ভে লিখিয়া, জাতিসাধারণ নীরবে অশ্রুজল ফেলিয়া—এই মহাপুরুষের মৃত্যু জনিত শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

ওয়াসিংটন্ যে আমেরিকাবাসিগণের বাস্তব পিতা ছিলেন তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিপদের দিনে যখন আমেরিকাবাসিগণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাদিগের একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র সহায় ছিলেন। অস্ত্র শস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, ধন নাই, অতীত জাতীয় গৌরবের উদ্দীপনা নাই—এরূপ অবস্থায় জাতীয় গৌরবের ভাবে সৈন্যগণকে উদ্দীপিত করা অসাধ্য সাধন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ওয়াসিংটন্ সেই নিরস্ত্র, বিবস্ত্র অশিক্ষিত সেনাকে আপনার প্রাণোৎসর্গের মোহিনী মন্ত্রবলে অচিরকাল মধ্যে অজেয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। এ স্বাধীনতাসমরে জাতিসাধারণ তাঁহাকে অনিয়ন্ত্রিত প্রভুতা দিয়াছিল মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে আর কোন প্রকারে সহায়তা করে নাই। তিনি স্বজাতির ধন লুণ্ঠন করিয়া আপনার ও

সেনার উদর-পূরণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। এই জন্য তিনি ও তাঁহার সেনা পার্ব্বতীয় বৃক্ষ-লতাদির ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া এই শব-সাধনা করিয়াছিলেন। সেই যোগবলেই এরূপ মহতী সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আমেরিকাকে পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠাপিত করেন নাই, কারণ আমেরিকার পূর্ব্ব গৌরব ছিল না। তিনি আমেরিক জাতির সৃষ্টিকর্ত্তা, আমেরিকার জাতীয় গৌরবের ও জাতীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা, এবং আমেরিকার জাতীয় জীবন ও জাতীয় ইতিহাসের প্রবর্ত্তয়িতা। এরূপ মহাপুরুষের জন্য শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া ও এরূপ মহাপুরুষের নামে তাঁহাদিগের রাজধানীর নামকরণ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এই মহাপুরুষের মৃত্যুতে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডও শোক চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল। ৯ই ফেব্রুয়ারি এই সংবাদ প্রথমে ফ্রান্সে উপস্থিত হয়। তখন সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সাধারণতন্ত্রী ফ্রান্সের প্রথম কন্‌সলের পদে অভিষিক্ত ছিলেন। তিনি নিজ সৈন্যগণের প্রতি এই আদেশ প্রচার করেন:—

"সৈন্যগণ!" ওয়াসিংটনের মৃত্যু হইয়াছে! এই মহাপুরুষ যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ফরাশি জাতি ও পৃথিবীর স্বাধীন জাতি মাত্রেরই নিকট তাঁহার স্মৃতি অতি প্রিয়। বিশেষতঃ ফরাশি সৈন্যগণের নিকট ইহা প্রিয়তর; কারণ, ফরাশি সৈন্য তাঁহার ন্যায় ও তাঁহার সৈন্যগণের ন্যায় স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল! অতএব তোমরা সকলেই তাঁহার জন্য শোক-চিহ্ন ধারণ করিবে।" তিনি আরও আদেশ করিলেন যে, ফরাশি সাধারণ-তন্ত্রে সমস্ত পতাকায় ও পতাকা-স্তম্ভে দশ দিন কাল কৃষ্ণ ক্রেপ সংলগ্ন রাখিতে হইবে। পারিস নগরীর এক হোটেলে (Hotel des Invalides) ওয়াসিংটনের স্মৃতি-সম্মানার্থ একটী আন্ত্যেষ্টিক বক্তৃতা করা হইল। সেই বক্তৃতা স্থলে নেপোলিয়ন ও সমস্ত সিবিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্স কোন বৈদেশিকের জন্য আর কখন এরূপ শোক প্রকাশ করেন নাই।

যখন ইংলণ্ডের রণতরী সকল টোর্বে বন্দরে নোঙ্গর করিয়াছিল, সেই সময় পোতাধ্যক্ষ লর্ড ব্রিড্‌পোর্টের নিকট এই সংবাদ আসিল। এই শোচনীয় সংবাদে শত্রুর মন বিগলিত হইল। তাঁহার আদেশে তদীয় পোতের পতাকা অর্দ্ধ-নমিত করা হইল। অবশিষ্ট উন-ষাইট্‌ খানি রণতরী মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তন করিল। ধন্য ওয়া-সিংটন! তুমি চরিত্র-গৌরবে আজ শত্রুর হৃদয়ও বিগলিত করিয়া তাহার নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিলে।

তোমার নিষ্কাম স্বদেশহিতৈষণা তোমাকে অনন্তকাল এইরূপে শত্রু মিত্র উভয়েরই পূজার্হ করিয়া রাখিবে। দেব! আমার হৃদয়-আসনে একবার আবির্ভূত হইয়া আমাকে এইরূপ নিষ্কাম ধর্ম্ম শিক্ষা দাও। একবার আবির্ভূত হইয়া ভারতে দারিদ্র্য-ব্রতের ও নিষ্কাম আত্ম-ত্যাগের মহিমা প্রচার কর। দেব! একবার দেখা দিয়া পতিত জাতিকে স্বজাতিপ্রেম ও স্বদেশানুরাগ শিখাও! আমরা এই প্রবন্ধে শঙ্কর, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, ওয়ালেস্ টেল, হ্যাম্‌ডেন্ হাউয়ার্ড, উইল্‌বারফোর্স, রমিলি, ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়াসিংটন্, প্রভৃতি যে সকল প্রাতঃস্মরণীয়-চরিত মহাপুরুষগণের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলাম, তাঁহারা প্রত্যেকেই আত্মোৎসর্গের এক একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই জন্যই এ প্রবন্ধের নাম আত্মোৎসর্গ বা প্রাতঃস্মরণীয় চরিতমালা রাখিলাম। ইঁহারা প্রত্যেকেই এক একটী গুরুতর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই সেই সেই ব্রতের উদ্‌যাপনায় নিজ নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সম্পত্তিতে জলাঞ্জলি দিয়া দারিদ্র্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ধনস্পৃহা আত্মত্যাগের প্রতিকূল। যিনি পরদুঃখকাতর, তিনি পরদুঃখ দেখিয়া কখন ধন পুঞ্জীকৃত করিয়া রাখিতে পারেন না। ধর্ম্ম-জীবনের প্রথম কার্য্য—ধনোৎসর্গ, দ্বিতীয় কার্য্য—প্রাণোৎসর্গ। খ্রীষ্টের জীবনে এই দুইটীই ঘটিয়াছিল বলিয়া তিনি আজও সুশিক্ষিত ইউরোপ ও মার্কেন ভূমিকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কার্ সাধ্য সেখানে বলে যে খ্রীষ্ট মানব ছিলেন, দেবতা নহেন? আমেরিকায় একবার পার্কার এই কথা প্রচার করিতে গিয়া প্রায় প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বুদ্ধ ধনোৎসর্গের প্রধান বীর। তিনি রাজপুত্র হইয়াও ভাবী রাজসিংহাসনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া মানব-হিতব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই জন্য আজও পৃথিবীর তৃতীয়াংশ বৌদ্ধ শাক্যসিংহের উপাসক। হিন্দু যবন মিশাইতে গিয়া গুরুগোবিন্দ ও ঘাতক হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ওয়ালেস্ স্বজাতির উদ্ধার সাধন করিতে গিয়া ইংরাজ-ঘাতকের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল সতীর অঙ্গের ন্যায় স্থানে স্থানে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। হ্যাম্‌ডেন্ও জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছিলেন। ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডী দিন দিন একটু একটু করিয়া শরীর গলাইয়া স্বজাতি-উদ্ধারানলে আহুতি দিয়াছিলেন। ওয়াসিংটন্ ও টেল্ জীবনের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশের উদ্ধারানলে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

হাউয়ার্ড, উইল্‌বারফোর্স, রমিলী ইহাঁরা মানবপ্রেমে উন্মাদিত হইয়া মানবজাতির দুঃখমোচনে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই যোগিবৃন্দের প্রত্যেকের জীবনেই ধনোৎসর্গ ও প্রাণোৎসর্গের বহুল দৃষ্টান্ত উপলক্ষিত হয়। কেহ পূর্ণ যোগী, কেহবা অর্দ্ধসংসারী ও অর্দ্ধযোগী এইমাত্র ভেদ। সকলেরই জীবনের একই লক্ষ্য—মানবদুঃখ-নিবৃত্তি ও মানবসুখবৃদ্ধি। দারিদ্র্য এই শব সাধনের প্রধান উপকরণ সামগ্রী বলিয়া ইহাঁরা সকলেই দারিদ্র্যকে মিত্রভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। শ্মশানে শিব, প্রেরার মরুভূমিতে গ্যারিবল্ডী, মর্সেলিসের ভূমধ্যগহ্বরে ম্যাট্‌সিনি, স্কট্‌লণ্ডের পর্ব্বতগুহায় ওয়ালেস্‌, কারাগারের অন্ধকারে কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের চিকিৎসালয়ে হাউয়ার্ড, দাসদিগের কুটীরে উইল্‌বারফোর্স, আলিঘানী পর্ব্বতের নীহারিণী অধিত্যকায় ওয়াসিংটন্‌, সুইজর্লণ্ডের পাষাণে টেল্‌, তপোবনের পর্ণকুটীরে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, রোগীর রুগ্নশয্যায় বা মৃত্যুশয্যায় বুদ্ধ, পাপী তাপীর যন্ত্রণাময় আগারে খ্রীষ্ট, বৈরাগীর গুণ্ডিল আসনে চৈতন্য, কারাগারের তমোময় গর্ত্তে হ্যাম্‌ডেন্‌, ও অপরাধীর রুধির-কর্দ্দমিত বধ্যভূমিতে রমিলী এবং পিতৃশবোপরি গুরুগোবিন্দ শবসাধন করিয়াছিলেন। রাজপ্রাসাদ শবসাধনার উপযোগী স্থল নহে। ঐশ্বর্য্য শবসাধনার অনুকূল সাধন সামগ্রী নহে। পর্ণকুটীর, গৈরিক বসন, কমণ্ডলু উঞ্ছবৃত্তি প্রভৃতিই শবসাধনার অনুকূল স্থান ও সাধন-সামগ্রী। আবার ভারতে এই সকলের আবশ্যকতা হইয়াছে। কিন্তু এবার আমাদের শবসাধনার লক্ষ্য পরকাল নহে,—ইহকাল। এবার আমরা পরের দুঃখে উদাসীন হইয়া সংসার ছাড়িয়া নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া কেবল নিজের পারলৌকিক হিতের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিব না। এবার আমরা সে স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের মঙ্গলার্থ শবসাধনা করিব। এবার আমরা নিজের স্বর্গ নরক লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব না। আমি নরকে যাই তাহাতেও দুঃখ নাই, কিন্তু আমার দেশ যেন আমার শবসাধনার বলে নরক হইতে উত্থিত হয়। আমি স্বর্গে যাইতে না পারি তাহাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু আমি যেন অন্ততঃ মৃত্যুকালেও দেখিয়া যাই যে, আমার দেশ অপূর্ব্ব স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, আমার জাতি দেবোচিত সৌভাগ্য ভোগ করিতেছে। না জানি সে সৌভাগ্যের দিন কতদিনে আসিবে! কে বলিতে পারে কত দিনে আসিবে? আমি শয়নে স্বপনে দেখি যেন মা আমার আবার অনন্ত বলশালিনী হইয়াছেন, যেন দশদিক আলোকিত হইয়াছে, যেন আবার মা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া নগরে নগরে দীপমালা পরিধান করিয়াছেন। এবার মা বিচ্ছিন্নাঙ্গ নহেন, এবার মা একচ্ছত্রী। আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মায়ের

চরণে অঞ্জলি দিবার জন্য, পুনর্জ্জীবিতা জননীর আরাধনা করিবার জন্য সমস্ত সন্তান আজ একত্র মিলিত হইয়াছে। ভাই! ঐ শুন স্বর্গে দেবতারা দুন্দুভি বাজাইতেছেন। ঐ দেখ! মায়ের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে। আজ স্বর্গে মর্ত্তে মহোৎসব! আজ দেব, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর একতানে মিলিয়া মায়ের অভিষেক-গান গাইতেছেন! আইস ভাই! আমরা সন্তানগণ সেই সুরে সুর মিলাইয়া প্রাণ, ভরিয়া মায়ের আগমনী গাই। একি প্রত্যক্ষ, না মায়া, না স্বপ্ন, না উন্মাদ বিজৃম্ভন! আমি কি বলিব? ভবিষ্যৎ ইহার উত্তর দিবে।

নাস্তিকতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

"তৎসাধক প্রমাণাভাবাৎ। নত্বীশ্বরে সাধক প্রমাণেব নাস্তি।"

কুসুমাঞ্জলি। পঞ্চম স্তবক।

কার্য্যকারণ-অনুমান।

ঈশ্বর নাই—এই কথার প্রমাণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি। এ কথার প্রমাণার্থ আমরা দেখাইয়াছি যে, যদি ঈশ্বররূপ কোন স্বতন্ত্র অলৌকিক পদার্থ বিদ্যমান থাকিত, তবে তাহা অবশ্য মনুষ্যের প্রত্যক্ষীভূত হইত। যে সকল পদার্থ বাস্তবিক আছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি। যাঁহারা বলিবেন, তোমরা পদার্থ প্রত্যক্ষ কর না, পদার্থের গুণ সকল উপলব্ধি কর। গুণ ব্যতীত মনুষ্যের পদার্থ উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা নাই। গুণসকল যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহাই যদি পদার্থ হয়, তবে সেই গুণ সকলের উপলব্ধিকেই পদার্থ-উপলব্ধি বলিব। তবে সার কথা এই, যদি গুণ সকল বিভিন্ন প্রকার হয়, তবে তদাশ্রয়-ভূমি পদার্থও বিভিন্ন প্রকার হইবে। এই নিয়মানুসারে আমরা জড়, শরীর, ও মনঃ পদার্থের বিভিন্নতা সাধন করিয়াছি। শরীর, জড়ের পরিণাম, এবং মন শরীরের পরিণাম বটে, কিন্তু ইহাদিগের গুণের বিভিন্নতা থাকাতে, আমরা পদার্থের বিভিন্নতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। মনের সহিত ঈশ্বরের গুণের ঐক্য থাকাতে আমরা ঈশ্বর-পদার্থকে আর স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে পারি নাই। যে সৃষ্টিশক্তি এই ঈশ্বর পদার্থে আরোপ করা হইয়াছে, তাহা সে পদার্থে কোনরূপে

সম্ভাবিত নহে, এই রূপই সপ্রমাণ করা হইয়াছে। যদি ঈশ্বর পদার্থে সৃষ্টিশক্তি সম্ভাবিত না হয়, তবে তাহা আর মনঃ-পদার্থ হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। সুতরাং তাহা আর স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। যখন তাহা মনঃপদার্থ হইতে স্বতন্ত্র নহে, তখন তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই অবশ্য বলিতে হইবে। যদি বল,যাঁহার সৃষ্টিশক্তি আছে তিনিই ঈশ্বর,তাহা হইলে তোমার ঈশ্বর-সংজ্ঞা শুদ্ধ সৃষ্টিশক্তি-বিশিষ্ট স্রষ্টাকে বর্ত্তাইল। তার পর বিচার্য্য এই, সেই স্রষ্টা লোকাতীত পুরুষ কি না? যদি তিনি প্রকৃতি-অতীত স্বতন্ত্র পুরুষ হন, তবে তাঁহার বিদ্যমানতার প্রমাণ চাই। যদি না হন, তবে চাই না; কারণ, প্রকৃতির বিদ্যমানতা কেহ অস্বীকার করেন না। যাঁহারা এই স্রষ্টাকে প্রকৃতি-অতীত এক স্বতন্ত্র পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাঁহার বিদ্যমানতা সপ্রমাণ করিবার জন্য কতকগুলি আনুমানিক প্রমাণ প্রয়োগ করেন। যদি এই আনুমানিক প্রমাণ সকল অসিদ্ধ হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তার সদ্ভাব পক্ষে প্রমাণাভাব। যে সকল প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা যদি বাস্তবিক প্রমাণ না হয়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার সদ্ভাব-পক্ষে প্রমাণ নাই, এই কথাই বলিতে হয়। ঈশ্বর-অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি প্রধান অনুমান-যুক্তি এই রূপে ব্যক্ত হইতে পারে :—

১। প্রতি কার্য্যের কারণ আছে।

২। জগৎরূপ সৃষ্টিব্যাপার একটি বৃহৎ কার্য্য।

৩। এই কার্য্যেরও অবশ্য কারণ আছে।

৪। সেই কারণই ঈশ্বর।

আমরা স্বীকার করি, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে। কিন্তু একথাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহা কার্য্য নহে তাহার কারণ নাই। আস্তিক-দিগের মতানুসারে স্বীকার করিয়া লইলাম যে,এই সৃষ্টিব্যাপার একটি কার্য্য। এই কার্য্য হইতে ঈশ্বর-নির্ণয় কিরূপ হইতে পারে, এক্ষণে তাহার বিচার করা কর্ত্তব্য।

ক। ন্যায় মতে কার্য্য হইতে কারণ-নির্ণয় সকল সময় ঠিক হয় না। কারণ হইতে কার্য্যের স্থিরতা হয়, কিন্তু কার্য্য হইতে কারণের স্থিরতা হয় না। ইহার যুক্তি এই, একটি কার্য্যের নানাবিধ কারণ হইতে পারে; সুতরাং কোন্‌টী ঠিক কারণ তাহার স্থিরতা নাই। মনে কর, তোমার জ্বর হইল। এই জ্বরের কারণ নানাবিধ হইতে পারে। সুতরাং জ্বরের কারণ স্থির করিতে হইলে সকল সময় তুমি শৈত্যকেই জ্বরের কারণ ধরিয়া তদুপযুক্ত ঔষধ দিলে জ্বরের উপশম হইবে না। কিন্তু অত্যন্ত শৈত্য হইলে যে জ্বর হইবে তাহা নিশ্চয়। অতএব যেখানে অত্যন্ত শৈত্য আছে সেখানে তুমি জ্বরের অনুমান করিতে পার, কিন্তু যেখানে জ্বর আছে, সেখানে

সকল সময় তুমি শৈত্যের অনুমান করিতে পার না।

কার্য্য থাকিলে কারণ থাকিবে, তাহা নিশ্চয়; কিন্তু কোন্‌টী সেই কার্য্যের প্রকৃত কারণ তাহার নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং সৃষ্টিব্যাপার যদি কার্য্য হয়, তাহার কারণ যে একজন অলৌকিক পুরুষ হইতেই হইবে, কার্য্যকারণ-সম্বন্ধে এরূপ সপ্রমাণ হয় না। অন্য কারণের সদ্ভাব অসম্ভব, এরূপ প্রমাণ করিতে না পারিলে, তোমার ঈশ্বরই যে একমাত্র কারণ, ইহা প্রকৃত অনুমানসিদ্ধ নহে।

খ। যদি বল, সৃষ্টিব্যাপারের কারণ যাহাই হউক না কেন, সেই কারণই ঈশ্বর। একথা বলিলে তোমার কার্য্য-কারণ সূত্র ঠিক এই স্থানে শেষ হয় না। তুমি এই বিশ্ব-ব্যাপারের নানাবিধ ঘটনার পরস্পর-সম্বন্ধ দেখিয়া বিবেচনা করিতেছ যে, ইহারা সকলেই পরস্পর কার্য্যকারণ সূত্রে সম্বদ্ধ। এই বিশ্ব-ব্যাপারে তুমি দেখিতে পাও, যাহা কার্য্য তাহা আবার অন্য কার্য্যের কারণ এবং যাহা একের কারণ তাহা আবার অন্য-তরের কার্য্য। এইরূপ একটী বৃহৎ কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলায় বিশ্বব্যাপারের সমুদায় ঘটনাই সম্বদ্ধ। এই দেখিয়া তুমি অনুমান করিলে যে, যে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত এই সমুদায় ঘটনাবলি, সেই প্রকৃতি নিজেই একটী ঘটনা ও কার্য্য। সেই কার্য্যের একটী কারণ অবশ্য আছে।

এই প্রকৃতি যদি কার্য্য হয়, তাহার কারণ অবশ্য আছে। কিন্তু যে কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়া তুমি প্রকৃতিকে কার্য্য-রূপে অনুমান করিলে, সেই অনুমান অনুসারে এই প্রকৃতিরূপ কার্য্যের কারণও কেন নিজে একটী কার্য্য বলিয়া নিরূপিত না হয়? যদি তুমি প্রকৃতিকে সাদি বলিলে, তবে কেন প্রকৃতির কারণকে অনাদি বল? প্রকৃতি যদি কার্য্য হয়, সেই প্রকৃতির কারণ ঈশ্বরও কার্য্য নহে কেন? তবে তোমার কার্য্য-কারণ সূত্রের শেষ কোথায়? যদি তুমি এক স্থলে থামিয়া বল, এই কারণটী কার্য্য নহে, ইহা অনাদি ও স্বয়ং-সম্ভূত, সে স্থলে তোমার সিদ্ধান্ত পূর্ব্ব অনুমান অনুসারে সিদ্ধ হয় নাই। সে কল্পনা তোমার একটী সৃষ্ট কল্পনা মাত্র। কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলানুসারে সে সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব প্রতিপন্ন হইল, শুদ্ধ কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলা ধরিয়া কোন আদি কারণে উত্থিত হওয়া যায় না। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহা তুমি না জানিতে পার; কিন্তু তোমার না জানা এক কথা, আর তাহা কার্য্য-কারণ-সূত্রে সমুদ্ভূত হই-য়াছে এইরূপ সংস্কার থাকা আর এক কথা। তুমি যদি বল সৃষ্টি-ব্যাপারের উৎপত্তি কি তাহা আমি জানি না, তবে তোমার যাহা বলা উচিত তাহাই বলিয়াছ; কিন্তু যখন তুমি বলিলে যে, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এই প্রকারে সমুদ্ভূত

হইয়াছে, তখন তুমি এক বিচার-সাপেক্ষ কথা উত্থাপন করিলে। তুমি হয়তো সৃষ্টি-ব্যাপারের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী কল্পনা করিলে, কিন্তু তোমার কল্পনা বুদ্ধির বিচারে দাঁড়ায় কি না, তাহা দেখিতে হইবে। যখন তুমি এই রূপ একটী কল্পনা করিয়া বলিলে যে, সৃষ্টি-ব্যাপার কার্য্য-কারণ-সূত্রে অনুস্যূত হইয়াছে, তখন দেখিতে হইবে সেই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ সৃষ্টি-ব্যাপারে খাটে কি না। আমরা দেখাইলাম, এই কার্য্য-কারণ-যুক্তি সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রযুক্ত হওয়া দূরে থাক, বরং এই যুক্তি ঈশ্বর-রূপ কোন আদি কারণ অনুমানের সম্পূর্ণ বিরোধী। কার্য্য কারণ যুক্তি অনুসারে তুমি কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার শেষ সীমায় আসিতে পার না, সে যুক্তি তোমাকে কেবল অনন্ত-পারম্পর্য্য-অনুমানে লইয়া যায়; কোন সিদ্ধান্তে লইয়া যায় না।

গ। আবার দেখ, যদি এই সৃষ্টি-ব্যাপার-রূপ কার্য্যের আদি কারণ ঈশ্বর হইলেন, তবে বিচার কর, তিনি কি প্রকার কারণ? পূর্ব্বে, কার্য্য হইতে কি রূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; এক্ষণে কারণ হইতে কিরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহার বিচার করা যাইতেছে।

অ। ন্যায়-শাস্ত্রে কারণ-তত্ত্ব বিবিধ। যে কারণকে তুমি দেখিতেছ যে তাহা বাস্তবিক কার্য্যের উৎপত্তি করে, অথবা যে কারণকে তুমি জান যে তাহা বাস্তবিক বিদ্যমান আছে, তাহাই এক-বিধ কারণ। ইহার নাম জ্ঞাত কারণ। তুমি অগ্নি হইতে ধূমের উৎপত্তি দেখিয়াছ, এজন্য অগ্নি ধূমোৎপত্তির জ্ঞাত কারণ। এই জ্ঞাত কারণে আমরা দেখিতে পাই, তাহা কার্য্যের সহিত নিত্য সম্বন্ধে গ্রথিত। এজন্য নৈয়ায়িকেরা বলেন, অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্য পদার্থের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতাই কারণ। যেখানে নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তিতা প্রমাণিত হয় না, সেখানে কারণের স্থিরতা হয় না। ধূমের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী তাপ অথবা অগ্নি; এজন্য তাপ ধূমের অন্যতর কারণ। এই জ্ঞাত কারণ সমবায়ি, অসমবায়ি, এবং নিমিত্ত ভেদে আবার তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। "যাহা সমবেত হইলে কোন পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাই তাহার সমবায়ি কারণ; তাহাতে আসন্ন যাহা, তাহা অসমবায়ি কারণ; এবং এ উভয় হইতে যাহা পৃথক তাহাই নিমিত্ত কারণ।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী দেশেলায়ের শিখা গ্রহণ কর। এস্থলে কাটী, কাটীর বারিহীনতা, বায়বীয় অক্সিজিন বাষ্প, এবং ফস্‌ফরস্ প্রভৃতি দ্রব্যই সমবায়ি কারণ। অসমবায়ি কারণ ঘর্ষণোৎপাদিত তাপ। নিমিত্ত কারণ, মনুষ্য। এই কতিপয় কারণ যোগ হইলে তবে দেশেলায়ের শিখা জন্মিল। এ সমস্তই জ্ঞাত কারণ। এই কার্য্য-কারণে নিয়ত-পূর্ব্ববর্ত্তিতা-সম্বন্ধ চিরকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে। এখন কথা

এই যে এই বিশ্বব্যাপার যদি কার্য্য হয়, তবে তাহার জ্ঞাত নিমিত্ত কারণ আছে কি না? যখন ঈশ্বরকে কেহ এ কার্য্যের কারণ রূপে প্রত্যক্ষ করে নাই, তখন ইহার জ্ঞাত নিমিত্ত কারণ সম্ভবে না। যখন সেই কারণের সহিত কার্য্যের নিয়ত পূর্ব্বাবর্ত্তিতা সপ্রমাণ করা যায় না, যখন কোন পৃথক কারণের সহিত জগৎ-রূপ কার্য্যের নিত্য সম্বন্ধ স্থির করা যায় না, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, ঈশ্বর জগৎ ব্যাপারের জ্ঞাত নিমিত্ত কারণ নহেন।

যদি বল, পরমাণুপুঞ্জ হইতে জগৎ উৎপন্ন হইবার নিমিত্ত কারণ, ঈশ্বর। তাহা হইলে তিনি আর আদি কারণ হইলেন না। যেহেতু সেই নিমিত্ত কারণের পূর্ব্বে অথবা তৎসমকালে প্রাকৃতিক পরমাণুপুঞ্জ-রূপ পদার্থ এবং জগদুৎপত্তির সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। আরও দেখ, পরমাণুপুঞ্জরূপ উপাদানে ঈশ্বর যে জগতের সৃষ্টিব্যাপার সম্পন্ন করিয়া তাহার নিমিত্ত কারণ হইয়াছিলেন, অথবা অন্য কোথাও, কি অন্য কোন সময়ে এই প্রকার অন্য সৃষ্টি সম্পন্ন হইয়াছে ইহা কেহ কখন প্রত্যক্ষীভূত করে নাই। যদি আমরা কোন প্রকার সৃষ্টি ব্যাপার কোন কালে প্রত্যক্ষ করিতাম, তবে বলিতে পারিতাম সৃষ্টিকাণ্ডের নিয়ম এইরূপ। কিন্তু তাহা যখন ঘটে নাই, তখন কিরূপে বলিতে পারি, সৃষ্টি-ব্যাপার সম্পন্ন হইতে গেলে একটী নিমিত্ত কারণ অবশ্য থাকিবে এবং সেই নিমিত্ত কারণ আবার সৃষ্টি হইতে পৃথক হইবে। ঈশ্বর যে জগৎ-উৎপত্তির সমবায়ি অথবা অসমবায়ি কারণ নহেন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যাঁহারা না করিবেন, তাঁহারা ঈশ্বর হইতে প্রকৃতির বিভিন্নতা স্বীকার করিলেন না। কিন্তু এই বিভিন্নতাই আস্তিকতার মূল বিশ্বাস। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সমবায়ি, অসমবায়ি, এবং নিমিত্ত এই তিন প্রকার জ্ঞাত কারণের কোন প্রকার কারণই ঈশ্বর নহেন।

যদি বল, আমরা যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ প্রদর্শন করিয়াছি, এ সমস্তই নৈসর্গিক ব্যাপার হইতে সিদ্ধ হইয়াছে। যাহা নৈসর্গিক ব্যাপারের সম্বন্ধ, তাহা সৃষ্টি-ব্যাপারে আরোপিত হইতে পারে না। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব, সৃষ্টি-ব্যাপার কি নৈসর্গিক নিয়মে সম্পন্ন হয় নাই? যদি তাহা নৈসর্গিক নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তবে তাহাতে নৈসর্গিক কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ অবশ্য বর্ত্তিতে পারিবে। আর যদি তাহা নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত হয়, তবে তাহাকে কার্য্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা অন্যায়? তোমরা যে কার্য্য-কারণের সম্বন্ধ এবং তার নৈসর্গিক ব্যাপার হইতে গ্রহণ করিয়াছ, সৃষ্টিব্যাপার অলৌকিক

তত্ত্বে সেই কার্য্য-কারণ-ভাব মূলেই বর্ত্তিতে পারে না। সুতরাং এই সৃষ্টি আর কার্য্যরূপে প্রথিত হইতে পারে না। যদি ইহা কার্য্য না হইল, তবে ইহার কারণ নাই, অবশ্য বলিতে হইবে

আমরা দেখিলাম ঈশ্বর জ্ঞাত কারণ হইতে পারেন না। এক্ষণে দেখা যাউক, তিনি অন্যবিধ কারণ হইতে পারেন কি না? আমরা সদৃশ কারণকে অন্য-বিধ কারণ বলিলাম। সেই সদৃশ কারণ কিরূপ, বলিতেছি।

(আ)। আস্তিকেরা বলিতে পারেন যে, এই জগৎব্যাপারের নিমিত্ত কারণ কখন কাহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই বলিয়াই যে, ইহার নিমিত্ত কারণ নাই এমত সম্ভবে না। একথা বলিলে তুমি এই সৃষ্টি ব্যাপারকে একটি নৈসর্গিক কার্য্যস্বরূপ করিলে, এবং যেমন নৈসর্গিক কার্য্যের কারণ থাকে, তদ্রূপ এই সৃষ্টি-ব্যাপারেরও এক সদৃশ নিমিত্ত কারণ আছে এইরূপই অনুমান করিলে। এস্থলে তুমি এই সৃষ্টিব্যাপারকে একটা মানুষ ব্যাপারের সহিত সমান করিয়া লইলে। মনুষ্য যেমন ঘট পটাদির কারণ, ঈশ্বরও জগৎসম্বন্ধে তৎসদৃশ। যদিও তুমি ঈশ্বরকে জ্ঞাত কারণরূপে অবগত নহ, যদিও তুমি কখন দেখ নাই যে, ঈশ্বররূপ কোন অলৌকিক পুরুষ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তথাপি তুমি মনুষ্য-কার্য্যের সহিত জগৎ সৃষ্টির সাদৃশ্য ঘটাইয়া, ঈশ্বররূপ পুরুষকে মনুষ্যসদৃশ নিমিত্ত-কারণ অনুমান করিলে। তোমার অনুমান এইরূপ :—

(১) যেমন ঘট, পট, গৃহাদি মনুষ্য-নির্ম্মিত কার্য্য, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎব্যাপারও একটি কার্য্য।

(২) যেমন ঘট, পট ও গৃহাদির নিমিত্ত-কারণ মনুষ্য, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎব্যাপারের কর্ত্তা ঈশ্বর।

এখন বিচার কর, এই দুইটি উপমান ন্যায়-সঙ্গত কি না? আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কারণ দ্বিবিধ। একবিধ জ্ঞাত কারণ; অন্যবিধ সদৃশ কারণ। মনুষ্য, ঘট পটাদির যেরূপ জ্ঞাত কারণ, ঈশ্বর জগৎ-সম্বন্ধে সেরূপ কারণ নহেন তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহাকে তুমি সদৃশ কারণরূপে অনুমান করিয়াছ। যেমন একবিধ কার্য্যের একরূপ কারণ থাকে, ঈশ্বরকে তুমি তদ্রূপ কারণ বলিয়া অনু-মান করিয়া লইয়াছ। এক্ষণে দেখা যাউক, তুমি যে সাদৃশ্য ঘটাইয়াছ, বাস্তবিক সে সাদৃশ্য ঘটে কি না।

(১—খণ্ডন)। তোমার প্রথম সাদৃশ্য এই যে, জগৎ ও সৃষ্টিব্যাপার গৃহাদির ন্যায় কার্য্য। একথা বলিলে আমরা বলিব, তুমি নির্ম্মাণ ও সৃষ্টি এই দুই শব্দের অর্থ একই করিয়াছ। তুমি কাহাকে নির্ম্মাণ বলে ও কাহাকে সৃষ্টি বলে তাহার প্রভেদ জান না। মনুষ্য যাহা যাহা করিতেছে, তৎসমস্তই নির্ম্মাণ করিতেছে। পূর্ব্বে পদার্থ সকল বিদ্যমান ছিল, পদার্থের শক্তি সকলও

বিদ্যমান ছিল, মনুষ্য কেবল পদার্থের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা তাহার এক প্রকার পরিণাম দর্শাইতেছেন। তিনি কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। কিন্তু এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিদান-ভূত পরমাণু-পুঞ্জ এরূপে উৎপন্ন হয় নাই। যখন তুমি তাহাদিগকে কার্য্য স্বরূপ অনুমান করিয়াছ, তখন অবশ্য তোমাকে বলিতে হইয়াছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না, পরমাণুপুঞ্জ ও তৎপরিণাম জগৎ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, আর যাহা কিছু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ;—এই দুই বিষয় ও তত্ত্ব কি সদৃশ? যাহা কিছু হইতে উৎপন্ন হয় নাই, তুমি তাহাকে সৃষ্টি বলিতেছ ; আর যাহা কিছু হইতে উৎপন্ন হইতেছে তাহাকে তুমি নির্ম্মাণ কার্য্য বলিতেছ। নির্ম্মাণ কার্য্যের ফল পুরাতন দ্রব্যের পরিণাম মাত্র, আর তুমি যাহাকে সৃষ্টি বলিতেছ, সে সৃষ্টির অর্থ নূতন দ্রব্যের উৎপত্তি। তবে বিবেচনা কর, এই সৃষ্টি ও নির্ম্মাণ কার্য্য কি সদৃশ ব্যাপার? কখনই নহে। যদি সদৃশ ব্যাপার না হয়, তবে সৃষ্টিব্যাপারকে কখন কার্য্য রূপে অনুমান করিতে পার না। কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ জগৎ পরিণামী ঘটনা-পুঞ্জের নিয়ম। জগৎসৃষ্টির পরবর্ত্তীকালে সেই জগতের পরিণামী ঘটনায় যে নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, সেই সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কালে সেই নিয়মানুসারে যে একটী নূতন সৃষ্টি ঘটিবে এ তত্ত্ব তুমি কোথা হইতে জানিলে? যাহা সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালের নিয়ম, তাহা কি সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী কালের নিয়ম? সৃষ্টিব্যাপারের সহিত যেমন বিশ্ব-ব্যাপারের ঘটনাবলির সাদৃশ্য নাই, তদ্রূপ এই সমস্ত ঘটনাবলি যে কার্য্য নামে অভিহিত, সৃষ্টিকাণ্ড সেই কার্য্য নামে অভিহিত হইতে পারে না। বাস্তবিক কার্য্যের সহিত সৃষ্টির সাদৃশ্য কিছুই নাই। বলিতে গেলে, সৃষ্টির সাদৃশ্য কোথাও নাই, কিছুতেই নাই। তখন তুমি সৃষ্টি-ব্যাপারকে কার্য্য-স্বরূপ অনুমান করিতে পার না। অতএব তোমার প্রথম (১) অনুমান যুক্তি-সঙ্গত নহে। তোমার (১) অনুমানের খণ্ডন এইরূপ ন্যায়বাক্যে অনুস্যূত হইতে পারে :—

(প) যে নিয়মে নির্ম্মাণ-কার্য্য ও জগতীয় ঘটনাবলি সম্পন্ন হয়, সৃষ্টিকাণ্ড সে নিয়মে সম্পন্ন হয় নাই।

(ফ) অতএব, নির্ম্মাণ-কার্য্য ও জগতীয় ঘটনাবলির সহিত সৃষ্টিব্যাপারের কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই।

(ব) নির্ম্মাণ-কার্য্য ও ঘটনাবলি যদি কার্য্য নামে অভিহিত হয়, সৃষ্টি-ব্যাপার তবে কার্য্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

এক্ষণে তোমার (২) অনুমানের বিচার করা যাউক। তোমার (২) অনুমান এই :—

যেমন ঘট, পট, ও গৃহাদির নিমিত্ত কারণ মনুষ্য, তদ্রূপ এই ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎব্যাপারের কর্ত্তা ঈশ্বর।

(২—খণ্ডন)। যখন তোমার প্রথম অনুমান ঠিক হয় নাই, তখন তাহার সিদ্ধান্ত-স্বরূপ দ্বিতীয় অনুমান কখন ঠিক হইতে পারে না। যাহা কার্য্য সদৃশ নহে, তাহার সদৃশ কারণ থাকিতে পারে না। আবার দেখ, তুমি মনুষ্যকে বলিলে—নিমিত্ত কারণ; কিন্তু ঈশ্বরকে বলিতে হইল—কর্ত্তা। ঈশ্বরকে তুমি নিমিত্ত-কারণ রূপ পদে অভিষিক্ত করিতে পারিলে না। তাঁহাকে নিমিত্ত কারণ বলিলে, সৃষ্টির সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণও আছে এরূপ স্বীকার করিতে হয়। এরূপ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, ঈশ্বর সৃষ্টির একমাত্র কারণ নহেন। তাহার সমবায়ি কারণই প্রধান কারণ। সেই সমবায়ি কারণ-স্বরূপ পরমাণুপুঞ্জই যদি প্রধান কারণ হইল, তবে ঈশ্বর আর আদি কারণ হইলেন না। কিন্তু তোমার অনুমান এই যে, ঈশ্বর আদি কারণ। এই রূপ অনুমান করিয়াছ বলিয়াই তুমি ঈশ্বরকে নিমিত্ত কারণ না বলিয়া, কর্ত্তা বলিয়াছ। কিন্তু যখনই তুমি ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়াছ তখনই তুমি বলিলে, ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ নহেন, ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ রূপ শব্দে অভিহিত হইতে পারেন না। যখন তোমার কর্ত্তা ও নিমিত্ত-কারণ এই দুই পদ এক অর্থবোধক নহে, তখন তুমি প্রকারান্তরে বলিলে, এই দুইবিধ কারণ-তত্ত্বের সাদৃশ্য নাই; অথবা তুমি বলিলে মনুষ্য যেরূপ গৃহাদির কারণ,ঈশ্বর সেরূপ জগতের কারণ নহেন। যখন এই দুই কারণ-তত্ত্বের সাদৃশ্য নাই, তখন তোমার দ্বিতীয় (২) অনুমানও যুক্তি-সঙ্গত নহে। অতএব অবশ্য বলিতে হইবে:—

১। জগৎ ও সৃষ্টিব্যাপার কার্য্য নামে অভিহিত হইতে পারে না।

২। ঈশ্বর জগতের জ্ঞাত কারণ নহেন।

৩। তিনি জগতের সদৃশ কারণও নহেন।

অথবা, সার কথা এই যে:—

৪। কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ জগৎ ও ঈশ্বরে আরোপিত হইতে পারে না।

এক্ষণে দেখুন, আমরা গোড়ায় আস্তিকদিগের যে অনুমান-তর্ক লইয়াছিলাম, তাহা হইতে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম। আমরা দেখাইলাম যে:—

প্রথমতঃ। যদি সৃষ্টি-ব্যাপারকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ঈশ্বরই তাহার একমাত্র ও আদি কারণ নহেন।

দ্বিতীয়তঃ। সৃষ্টি-ব্যাপারে কার্য্য শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ। যদি সৃষ্টি-ব্যাপার কার্য্য নহে, তবে তাহাকে কার্য্যরূপ কল্পনা করিয়া তাহার একটি কাল্পনিক কারণ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

উদয়ন যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আনিয়া ঈশ্বর স্থাপন করিতে গিয়াছেন, তাহার খণ্ডন আমরা এইরূপ করিলাম। তিনি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ পরিষ্কার করিয়া

বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য হইতে পারে নাই। যাঁহারা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ এইরূপ পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে না পারেন, তাঁহারা উদয়নের মতই ভ্রমে পতিত হয়েন, এবং উদয়নকে শিরোধার্য্য করিয়া ঈশ্বর-অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

সুবিখ্যাত সন্দেহবাদী হিউম এই কার্য্য-কারণ-তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া ইহা সৃষ্টি ব্যাপারে আরোপিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, সৃষ্টিব্যাপার কার্য্যপদে বাচ্য নহে। তবে তিনি বলিয়াছিলেন যদি ইহাকে কার্য্য বল, তবে ইহাকে এক অদ্বিতীয় কার্য্য বলিতে হইবে। অদ্বিতীয় কার্য্য বলাতে তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, সামান্যতঃ যাহাকে কার্য্য বলা যায়, এই সৃষ্টিব্যাপার তাহা নহে। কিন্তু তাঁহার ঐ কথার ছল ধরিয়া ডাক্তার চামার্স উত্তর দিয়াছেন যে, হিউম যদি সৃষ্টিব্যাপারকে অদ্বিতীয় কার্য্য বলিলেন, তবে তাঁহারই মতানুসারে বলিব, এই কার্য্যও যেমন অদ্বিতীয়, ইহার কারণও তেমনি অদ্বিতীয়। ডাক্তার চামার্সের উত্তর শুদ্ধ কথার ছল মাত্র। তিনি হিউম-বাক্যের প্রকৃত অর্থ ধরিয়া উত্তর দেন নাই। যাহা হউক, এ সকল জল্পনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আস্তিকদিগের একটি প্রধান অনুমান এই যে, ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের আদি কারণ। এই অনুমান যে ন্যায়-সঙ্গত নহে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। নৈয়ায়িক আচার্য্য মিল এই অনুমানের কিরূপ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা আমরা পরবারে ব্যক্ত করিব।

কপিঞ্জল।

সুখ।

কেন আমি তুলিলাম কুসুম সুন্দর।
এই তার পাতাগুলি শুকাইয়া যায়,
এতক্ষণ ফুটেছিল গাছের উপর,
উজ্জ্বলিয়া সেই দিক সুচারু শোভায়।

এই ফুল এই আছে এত মনোহর,
একে একে এখনি সে পড়িবে ঝরিয়া;
হায় যদি রাখিতাম গাছের উপর।
হাসিত সে কতক্ষণ গন্ধে আমোদিয়া।

হায় রে, কুসুম তোরে বড় ভালবাসি,
তাই তোরে তুলিলাম হঠাৎ ভুলিয়া,
আয় তোরে কিছুক্ষণ করি হৃদিবাসী,
হাসি হাসি পড় ঢলি হৃদয় শোভিয়া।

এমনি রে সুখের উদ্যানে ভ্রমিবারে,
ছিঁড়ি আমি কত ফুল ভ্রমে না জানিয়া,
তুলিয়া সে ফুল ভাসি নয়ন-আসারে,
ভাবি হায় কেন চিত্ত গেল বিমোহিয়া!

কুসুম, তোমারি মত ক্ষণস্থায়ী সুখ,
তবু যবে ফুটে আশা-দেশ সুশোভিয়া,
মনে হয় পাছে আমি হই বা বিমুখ,
তাড়াতাড়ি তাই তারে আনিগে তুলিয়া।

হায় সুখ, তোরে আমি বড় ভালবাসি!
এ জীবন দেশে তুই কুসুম সুন্দর,
আশার উজ্জ্বল দিকে ফুট হাসি হাসি,
আয় সুখ, রাখি তোরে শোভিয়া অন্তর।

শ্রীপূ—

আমার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত।

কানপুর।

বিগত পূজোপলক্ষে ছুটী পাইয়া আমি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়াছিলাম। প্রথমে আমি কানপুরে নাবি। কানপুর এখন পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান ব্যবসা-স্থান হইয়া পড়িয়াছে। তাহার কারণ এই, এই স্থানে তিনটি রেলওয়ে লাইন মিলিত হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন কানপুর দিয়া গিয়াছে এবং আউদ ও রোহিলখণ্ড লাইন কানপুর হইতে ছাড়িয়াছে। সর্ব্ব দেশীয় দ্রব্য-জাত সেই জন্য কানপুরে আসিয়া চারিদিকে বিলি হইয়া যাইবার অত্যন্ত সুবিধা হওয়াতে কানপুরের ব্যবসায়ে ধূমধাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে। কানপুর

এখন একটি সমৃদ্ধ নগর। কানপুর এখন উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বাজার। ইহার ব্যবসার ধূম-ধাম ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে চলিল। ইষ্টইণ্ডিয়া রেলওয়ে লাইন হইতে নামিবা মাত্র ষ্টেসনে একেবারে ঠিকা গাড়ীওয়ালার গাড়ওয়ানেরা আমাকে ছাঁকিয়া ধরিল। এখানে তিন প্রকার গাড়ী উপস্থিত দেখিলাম। (১) পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রসিদ্ধ একা (২) ক্যারাকেল—ইহা প্রায়ই একারই মত, প্রভেদ এই, ইহাতে একটি ছাদ আছে এবং বসিবার স্থান প্রশস্ত ও রেল দিয়া ঘেরা। ইহাতে চারিজন লোকের বিলক্ষণ সমাবেশ হয়, কিন্তু তাহার পশ্চাদ্ভাগ কিছু নাবিয়া পড়িয়াছে। এই ক্যারেকেলে যাইতে হইলে একার মত ধাক্কায় ধাক্কায় গা গতর ব্যথা হইয়া পড়ে। (৩) কলিকাতার মত পাল্কীগাড়ীও তথায় অনেক পাওয়া যায়। আমি এই তৃতীয় প্রকার ২ শ্রেণীর পাল্কীগাড়ী চড়িয়া কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গেলাম। যাইবার সময় সহর দেখিতে দেখিতে গেলাম। কানপুর অত্যন্ত বৃহৎ সহর। ইহার অনেক গুলি চক আছে। চক সকল কলিকাতার বড়বাজারের মত। কলিকাতায় একটী বড়বাজার, কিন্তু কানপুরে অনেকগুলি বড়বাজার। এই চকের ইমারত সকল দোতালা তেতালা। গৃহাদি অনেক ইষ্টক-নির্ম্মিত। গৃহাদি অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দোকান সকল সজ্জিত। দেশীয় দ্রব্যজাত ও বিলাতী কাপড় এবং অন্যান্য পণ্য দ্রব্যে অনেক দোকান পরিপূর্ণ। কানপুরে তুলার কারবার বিস্তর। কানপুরের তুলাপটী অত্যন্ত প্রশস্ত। সেখানে কেবল গাড়ী গাড়ী কার্পাস তুলার আমদানি হইতেছে এবং এক এক জায়গায় কাঁড়ি কাঁড়ি বোঝাই হইতেছে। খরিদারও বিস্তর। আনওয়ারগঞ্জ দিয়া কানপুর প্রবেশ করিলে এই সমস্ত দেখা যায়। যাইবার সময় কানপুর দিয়া যে গঙ্গার খাল গিয়াছে তাহাও দেখিতে পাইলাম।

ষ্টেসনের বাহিরে যে পূর্ব্বকার মিত্রালয় ছিল, তাহা এক জন এতদ্দেশীয় লোকে ভাড়া লইয়াছে। এই সরাইটি ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং ইহার মধ্যে একটি অন্তঃপুর ও একটী বহির্বিভাগ আছে। অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক লইয়া থাকিবার বেশ সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত তাহার নিকটে নিকটে দুই চারিটী মেটে বাড়ীর সরাইও আছে। এ সকল সরাই সহরের বাহিরে ও ষ্টেসনের সন্নিকট। সহরের মধ্যেও অনেক সরাই পাওয়া যায়। প্রায়ই সকল সরাই মেটে এবং তাহাতে বাস করা অত্যন্ত কষ্টকর। ষ্টেসনের নিকট মিত্রালয়টী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সরাই। ইহাই ভদ্রলোকের বাসোপযোগী। সরাই-ওয়ালা সর্ব্বদা সকলের প্রতি যত্ন করিতেছেন। এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকের প্রতি তিনি অধিকতর যত্ন করিয়া থাকেন। আদেশ করিলে অন্ন

ব্যঞ্জনাদিও প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। বাস্তবিক এই সরায়ের বন্দোবস্ত অতি সুন্দর এবং আগন্তুক মাত্রেরই সন্তোষকর।

কলিকাতা অপেক্ষা কানপুরে ভাড়াটিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত উত্তম। প্রতি বৎসরে এই গাড়ী সকলের লাইসেন্স করা হয়; কিন্তু প্রতি ইংরাজী মাসের ১ তারিখে সকল গাড়ী ঘোড়া পরীক্ষার্থ লাইসেন্স আফিসে হাজির করিতে হয়। কাহার কিরূপ অবস্থা আছে তাহার পরীক্ষা হইয়া গেলে, বেলা ২টার মধ্যে সকলের ছুটী হয়। মাসে মাসে এইরূপ পরীক্ষা হয় বলিয়া সকল ভাড়াটিয়া গাড়ী ঘোড়ার অবস্থা সর্ব্ব সময়েই অতি উত্তম থাকে। কলিকাতায় এইরূপ একটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিতে না পারিলে এখানকার ভাড়াটিয়া গাড়ী ঘোড়ার অবস্থা এখন যেমন কদর্য্য রহিয়াছে চিরকাল তেমনিই থাকিবে। যদি বল, এখানকার গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, তাহা হইলে সহরের এক এক দিক এক এক দিনে পরীক্ষা করিলেই এ আপত্তি চুকিয়া যাইতে পারে। আমাদের লাইসেন্স আফিস বৎসরের মধ্যে একবার লাইসেন্স বাহির করিয়া সমস্ত বৎসর বসিয়া কি করেন, মিউনিসিপাল আফিসকে আমরা তাহার তদারক করিতে অনুরোধ করি।

কানপুরে দেখিবার জিনিষ তিনটি— কানপুর সহর, গঙ্গার বাঁধান খাল, এবং হত্যাকাণ্ডের বাগান। আমি কানপুর সহর ও চক দেখিয়া গঙ্গার খাল দেখিতে গেলাম। খাল নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে, কলকাতার চিতপুরের খালের মত। কিন্তু ইহার দু ধার ইষ্টক দিয়া বাঁধান ও সোপান-শোভিত। খালে উঠা নামা কোন রকমে কষ্টকর নহে। অনেক দেশীয় লোককে তাহাতে স্নান-আহ্নিক করিতে দেখিলাম। এই খালের ঢালু ক্রমনিম্ন হইয়া যায় নাই। পশ্চিমাঞ্চলের জমির ঢালু এত অধিক যে এই খালের ঢাল ক্রম-নিম্নরূপে রক্ষিত হইতে পারে না। এজন্য এই বৃহৎ শত যোজন প্রবাহিণীর (গঙ্গার খাল) ঢালদেশ কিয়দ্দূর অন্তর বিভক্ত করা হইয়াছে। উপরের ভাগ নিম্নতর ভাগ অপেক্ষা প্রায় আট দশ হাত উচ্চ। উচ্চ ভাগের জল নিম্ন ভাগে হঠাৎ পতিত হয়। যেখানে উচ্চ ঢালুভাগ শেষ হইয়াছে সেই খানে প্রায় ১০ হাত নীচে নিম্ন ঢালুভাগ আরম্ভ হইয়াছে। এক ভাগের জল যেখানে অন্য ভাগে পতিত হইতেছে সেই সন্ধি-স্থল সকল দেখিতে অতি সুন্দর। জল উচ্চ হইতে নিম্নে পতিত হইলে সেস্থল গভীর হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এই ভয়ে উচ্চভাগের জলরাশিকে কৌশল পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে নামান হইয়াছে। জলরাশি প্রস্তরময় অথবা ধাতুময় গোল খিলান শ্রেণীর উপর পড়িতেছে। এই খিলানশ্রেণী সোপান-

রূপে স্থাপিত। জলরাশি এক সোপান হইতে অন্য সোপানে গড়াইয়া পড়িতেছে। সোপান হইতে সোপানান্তরে যেরূপে জল গড়াইয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর।

খালের এই সন্ধিস্থল সকলের নিকটে মহাজনেরা এক একটি ময়দার কল করিয়াছে। শুদ্ধ জলের স্রোতে এই কল চালিত হয়। মহাজনেরা এই জল, প্রণালী কাটিয়া আনিয়াছে। এই প্রণালী দ্বারা খালের উচ্চ ঢালের জল তাহার নিম্ন ঢালের কোন স্থানে মিলাইয়া দিয়াছে। এই পয়ঃপ্রণালী সকল ক্রম-নিম্ন হইয়া যাওয়াতে তৎপ্রবাহিত জলস্রোত অত্যন্ত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে কলের চাকা সকল অবস্থিত, সেখানকার ঢাল অধিক করিয়া দেওয়াতে জল অত্যন্ত জোরে গিয়া চাকার উপর পতিত হয়, এবং এই স্রোতের জোরে চাকা ক্রমাগত ঘুরিতেছে। সেই চাকার গতিতে কল চলিতেছে। কলের বাহিরে এই স্রোতের জল, প্রণালী দিয়া খালের নিম্নস্তরে গিয়া মিশিয়াছে।

কানপুরে যে স্থানে বিদ্রোহী সিপাহিরা হত্যাকাণ্ড করিয়াছিল সেই স্থানটি স্মরণার্থ ইংরাজেরা তথায় একটি সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। উদ্যানের মধ্যে স্থানে স্থানে স্মরণার্থ স্তম্ভ সকল নির্ম্মিত হইয়াছে। এই উদ্যানটি এত সুন্দর ও সুরুচির সহিত সজ্জিত যে দেখিলে আর মনে হয় না যে এই স্থানে পূর্ব্বে কোন হত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। অনুমতি-পত্র অথবা পাস ভিন্ন এই উদ্যান দেখিবার যো নাই। কিন্তু ইংরাজেরা বিনা পাসে দেখিতে পান।

হামিরপুর।

কানপুর বেড়াইয়া আমি একবার কোন কার্য্যোপলক্ষে হামিরপুর গিয়াছিলাম। কানপুর হইতে ঠিক ৪০ মাইল দক্ষিণে হামিরপুর। গঙ্গা যমুনার সঙ্গম দেশে যেমন প্রয়াগ অবস্থিত, হামিরপুরও তেমনি সঙ্গম দেশে অবস্থিত। ইহার একদিকে সূর্য্যতনয়া যমুনা, অন্য দিকে বেত্রবতী নাম্নী মালয়-নদী প্রবাহিত হইতেছে। যমুনার ধারে হামিরপুরের গৈরিক মৃত্তিকাময় পাড় সকল অত্যন্ত উচ্চ দেখায়। এই যমুনা পার হইয়া তবে হামিরপুরে উত্তীর্ণ হইতে হয়। বর্ষাকালে এই যমুনায় খেয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তখন পূর্ণগর্ভা যমুনা তর তর বেগে প্রবাহিত হয়। শীতকালে এই যমুনা এরূপ শীর্ণকায় হয় যে, তখন তাহাকে একটী ক্ষুদ্র নদী বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে; কিন্তু তাহার সেই বিশাল দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। তীরদেশ বালুতে ধূ ধূ করিতেছে। এই যমুনা অতিক্রম করিয়া আমরা হামিরপুরে গেলাম। হামিরপুর সহর পূর্ব্বকাল

বণ্ডেলখণ্ডের অংশ মাত্র। যমুনার পারে কানপুরের দিকে আমরা অনেক আম্রকানন এবং বৃক্ষ দেখিয়াছিলাম; কিন্তু হামিরপুরে আসিয়া একেবারে সে দৃশ্য হারাইলাম। হামিরপুরে কেবল নিম্ববৃক্ষই প্রচুর; এখানে আম্র বৃক্ষ একেবারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয়না। শুনিলাম, তথায় আম্র বৃক্ষ ভাল জন্মায় না। তথায় নিম গাছের বাড় অত্যন্ত অধিক। লোকে বলে সে দেশে নিম-গাছ না থাকিলে সকলেই কুষ্ঠ রোগ-গ্রস্ত হইত। বোধ হয় হামিরপুর অত্যন্ত গরম দেশ। নিজ হামিরপুর সহর বড় প্রশস্ত নহে। এখানে অনেক দীন দুঃখী লোকের বাস। হামিরপুর জেলার অন্তঃপাতী মহাবা নামক স্থানই প্রসিদ্ধ। এখানে রজপুত বংশীয়গণ অনেকে বাস করেন। হামিরপুর জেলা মধ্যে রাট এবং ওরাই নামক স্থানও প্রসিদ্ধ। কিন্তু সহরহামিরপুর হইতে দেড় দিনের পথ দূরে বান্দীই প্রধান সহর। যাহা হউক এই জেলা মধ্যে যে রজপুতেরা বাস করেন, আজও তাঁহাদের মধ্যে কন্যা জন্মিলে তাহার রক্ষা হওয়া বিষম দায়। তাহারা অযত্নে এবং নিরাহারে কন্যাকে মারিয়া ফেলিতে অনেক চেষ্টা পায়। হামিরপুর হাঁসপাতালে তুমি দুই একটি রজপুত শিশু-কন্যা রুগ্ন, শীর্ণকায় ও রোগগ্রস্ত প্রায়ই দেখিতে পাইবে। পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া এই কন্যাগুলিকে হাঁস-পাতালের রক্ষণাবেক্ষণে রাখিয়া দিয়াছে। এই জাতি মধ্যে শিশু-কন্যারা পীড়িত হইলেই পুলিষ অনুসন্ধান করিয়া তাহা-দিগকে হাঁসপাতালে আনিয়া দেয়। নহিলে গৃহে থাকিলে তাহাদিগের নিশ্চয় জীবন-সংসয়। একটী শিশু-কন্যা দুই তিনবার হাঁসপাতালে আইসে; তৎপরে হয় ত তত্ত্ব লইলে শুনা যায়, সেটী আর একবার পীড়িত হইয়া মারা পড়িয়াছে। হামিরপুর জেলার লোকেরা অত্যন্ত মূর্খ ও গোঁয়ার; কথায় কথায় মারামারি ও লাঠালাঠী করে। মারপিটের মকদ্দমা ও হত্যাকাণ্ড এখানকার প্রায়ই দৈনিক ব্যাপার। হাঁসপাতালে প্রায়ই মৃতদেহ চালান হইয়া থাকে। এই মৃতদেহ হয় কোন রজপুত শিশু-কন্যার, নয়, কোন হত্যা-ব্যাপারের চালান। রজপুত শিশু-কন্যা মরিলেই তাহার মৃতদেহ পরীক্ষা করাইতে হয়। এই মৃতদেহ সম্পর্কীয় মকদ্দমাই এখানে বিস্তর।

হামিরপুরের শিক্ষা-বিভাগের উন্নতি অতি অল্পই দেখা গেল—সে থানে যে জেলাস্কুল আছে, তাহার ছাত্র-সংখ্যা তিন শতও নহে। কলিকাতায় মাইনর স্কলার্সিপে যতদূর ইংরাজী শিক্ষা হয়, হামিরপুরস্থ জেলাস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে প্রায় ততদূর ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষা বিষয়ে লোকের যত্ন এবং উৎসাহও অতি সামান্য মাত্র।

হামিরপুরে দেখিবার কিছুই নাই। ইংরাজগণের গোরস্থানের বাগানটি দেখিতে একটু সুন্দর। তাহা বেশ

পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন আছে। খাস গবর্ণমেন্টের যে একটি বাগান আছে, তাহাতে অনেক গাছ-পালা আছে বটে, কিন্তু তাহা এত জঙ্গলপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে যে,তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হয়। বিশেষতঃ হামিরপুরে সর্পের ভয় অত্যন্ত অধিক। এই বাগানটী দেখিলে অনুমান হয়, হামিরপুরে মিউনিসিপ্যাল শাসন কিছুই নাই।

যমুনা এবং বেত্রবতীর খেয়াঘাটে দাঁড়াইলে দেখা যায়, দক্ষিণ হইতে যে সকল পণ্য দ্রব্য কানপুরে চালান হয়, তাহা সমুদায় হামিরপুর দিয়া যাতায়াত করে। কানপুরের একটি ব্যবসার রাস্তা হামিরপুর। সারাদিন গাড়ী গাড়ী মাল যমুনা পার হইয়া বেত্রবতীর দিকে যাইতেছে এবং বেত্রবতী পার হইয়া যমুনার দিকে আসিতেছে। কানপুরের ব্যবসার ধুমধাম হামিরপুরকেও কিয়ৎপরিমাণে জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। রাস্তার ধারে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষশ্রেণীর শীতল ছায়ায় দাঁড়াইলে—সারাদিন গাড়ী ঘোড়ার মৃদু মৃদু ঘণ্টা-রব, একার ঝম্ ঝম্ করতাল-শব্দ, এবং পথিকদিগের মৃদু মধুর তানলয়যুক্ত সঙ্গীত-ধ্বনি শুনিলে একটু মোহিত হইতে হয়।

আগ্রা।

হামিরপুর দেখা হইলে আমি আগ্রা দেখিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। যে আগ্রাধাম এককালে মোগল সম্রাটগণের দর্পে কম্পিত হইত, যে স্থানে তটস্থ থাকিয়া যমুনার তরঙ্গ অষ্ট দিকে বাদসা ও ওমরাহ গণের গর্ব্বিত আদেশ নিয়ত বহন করিয়া বেগে ধাবিত হইত; যাহার অজেয় দুর্গ মধ্যে আসীন হইয়া বাদসাগণ পৃথ্বীকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন, যেখানে যমুনার তীর তাজমহলের অদ্বিতীয় শোভায় শোভিত হইয়া আছে, যেখানে আকবরের পবিত্র নাম ধ্বনিত হইত, যেখানে বীরর লব ন্যায় মহাজনগণ রাজসভা শোভিত করিয়া বসিয়াছিলেন, যেখানে সাজিহানের বিপুল ধনসম্পত্তি ব্যয়িত হইয়া নগরের শোভা সম্পাদন করিয়াছে, আমি সেই আগ্রাধাম দেখিবার জন্য,—সেই স্থানে সেই সেই কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য, একান্ত ব্যগ্র ও উল্লাসিত হইয়া উঠিলাম। টুণ্ডালায় নামিয়া আগ্রার গাড়ীর জন্য যতক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইতেছিল, ততক্ষণও আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, গাড়ীতে চড়িয়া আগ্রায় উপনীত না হইতে হইতেই দূর হইতে যমুনার তীর দেখা দিল। যমুনার তীর না দেখা দিতে দিতে দেখিতে পাইলাম, তাহার তীরদেশে শ্বেত প্রস্তরময় তাজমহলের সুন্দর মন্দির শোভিত রহিয়াছে; এবং গাড়ীর ঠিক সম্মুখ দেশে আগ্রাদুর্গের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ক্রমে যমুনার তীরে পৌঁছিয়া দেখিলাম, কালিন্দীর আর সে পূর্ণস্রোত বেগবতী মূর্ত্তি নাই; এখন তিনি ক্ষীণবতী হইয়া রহিয়াছেন।

তাহার গর্ভদেশ শুকাইয়া আসিতেছে; একটি ক্ষীণ স্রোত ধীরে ধীরে যাইতেছে এবং চারিপাশে চড়া পড়িয়াছে। যমুনার সেতু দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল; সেতুর পারেই দুর্গের মূলদেশে আগ্রা ষ্টেসনে আসিলাম। আগ্রা ষ্টেসনটি প্রস্তর-নির্ম্মিত; সেই জন্য তত শ্রীমান্ নহে। যাহাহউক, ষ্টেসন হইতে নামিয়া আমি সহরে গেলাম। আগ্রা অত্যন্ত বৃহৎ সহর। দীর্ঘে প্রায় তিন ক্রোশ হইবে। আগ্রা অট্টালিকাময়। রাস্তা ঘাট নিতান্ত অপ্রশস্ত নহে। একটি প্রমাণ রাস্তা দেখিলাম বড় বড় প্রস্তর-ফলক দিয়া বাঁধান। বাড়ীর উঠান যেমন প্রস্তর-ফলক দিয়া বাঁধান থাকে, এই রাস্তাটি তদ্রূপ। সেই প্রস্তর-ফলকময় রাস্তা-দিয়া গাড়ী ঘোড়া লোক জন সকলেই চলিতেছে; দুই পার্শ্বে দোকান সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে। আমি আগ্রায় টমাসন কলেজ নামক চিকিৎসা-বিদ্যা-লয়ে গিয়াছিলাম। এই বিদ্যালয়-সংযুক্ত একটি হাঁসপাতাল ও একটি সংগ্রহ-মন্দির আছে। সংগ্রহ-মন্দির মধ্যে একটি অতি অদ্ভুত মৃতদেহ রক্ষিত দেখিলাম। আমি যোড়ামনুষ্যের মৃত দেহে দেখিয়াছি, তাহাদের দুই স্বতন্ত্র অঙ্গ ও দুই স্বতন্ত্র মস্তক এক শরীর হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আগ্রায় দেখিলাম শিশির ভিতর একটি মৃতদেহ রহিয়াছে, তাহার এক অঙ্গে দুই মাথা। এক অঙ্গে দুই মাথায় দৃষ্টান্ত আমি এই প্রথম দেখিলাম। এই চিকিৎসা-বিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষায় মোটামুটি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এখানকার মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা-ক্লাসের মত আগ্রা চিকিৎসা-বিদ্যালয়। পশ্চিমাঞ্চলে অস্ত্র-চিকিৎসারই সমধিক সমাদর। আগ্রার হাঁসপাতালেও দেখিলাম, অস্ত্র চিকিৎসার (ওয়ার্ড) বিভাগই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিভাগ। এ অঞ্চলে ব্যারাম পীড়া খুব কম, সুতরাং অস্ত্র-চিকিৎসারই আদর বাড়িয়াছে।

যমুনার ধারে আগ্রার বৃহৎ দুর্গ। গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে প্রয়াগের দুর্গ যেমন কলিকাতার দুর্গের মত মাটীর ভিতর-দেশে নির্ম্মিত, আগ্রার দুর্গ তদ্রূপ নহে। আগ্রার দুর্গ লোহিত প্রস্তরময় বৃহৎ প্রাচীর-বেষ্টিত। এই প্রাচীর সকল অত্যন্ত প্রশস্ত। দেখিলাম, তাহাতে কত গোলা গুলির দাগ রহিয়াছে, কোন খানে কিছুতেই ভেদ করিতে পারে নাই। এই দুর্গ মধ্যে বাদসাহেরা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সে ত দুর্গ নয়, একটি ক্ষুদ্র সহর বলিলেই হয়। তন্মধ্যে বিস্তর মহল আছে। এখন সে সকল মহল ইংরাজেরা ব্যবহার করিতেছেন। যে চতুর্ভুজ মহলে বাদসাহেরা থাকিতেন, এখন সেখানে ইংরাজ কয়েদীরা থাকে; সে মহল এখন ইংরাজগণের জেল হইয়াছে। ব্রিগেড মেজরের অনুমতিপত্র আনাইয়া আমি দুর্গ মধ্যে প্রবেশ

করিলাম। বরাবর যাইতেছি, সকল স্থানেই ইংরাজ সৈন্যের সমাবেশ দেখিলাম। দুর্গাভ্যন্তরে আর একটি ফটক পার হইয়া সির্সা মহলাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। ক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরময় বাড়ীতে উঠিলাম। সেই বাড়ীর ফটকে উপস্থিত হইলে একটা লোক মতিমসজিদ দেখাইতে লইয়া গেল। ফটক পার হইয়াই দেখিলাম—মতিমসজিদ। দেখিবামাত্র চমৎকৃত হইলাম। সম্মুখে দেখিলাম, সমুদায় শ্বেত প্রস্তরময় বৃহৎ মসজিদ ধপ্ ধপ্ করিতেছে। আজি প্রায় আড়াইশ বৎসর হইল, সাজিহান এই মসজিদ অতুল ধনরাশি ব্যয় করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। শুনিলাম, এই মসজিদের শুদ্ধ মজুরিতে প্রায় তিন লক্ষ টাকা পড়িয়াছিল। সাত বৎসরে ইহা নির্ম্মিত হয়। এই মসজিদে প্রবেশ করিবার তিনটি দ্বার আছে। যে দ্বার দিয়া আমি প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের জন্য অন্যতম দ্বার? ইহার একটি দ্বার বাদসাহের জন্য ছিল, এবং আর একটি দ্বার স্ত্রীলোকদিগের জন্য ছিল। যেমন তিনটি দ্বার আছে, তেমনি এই মসজিদের তিনটি বিভাগও আছে। সর্ব্বসাধারণ বিভাগটি মধ্যস্থলে এবং সর্ব্ব বৃহৎ, ইহার কুট্টিমদেশ ৫৫০ খানি বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত প্রস্তর-ফলক দিয়া আচ্ছাদিত। এক এক খানি প্রস্তর-ফলক এক একটি লোকের বসিবার আসন। এই বিভাগে ৫৫০ জন লোক একত্রে নেমাজ পড়িতে পারিত। এই বিভাগের এক পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের বিভাগ, অপর পার্শ্বে বাদসা ও তাঁহার ওমরাগণের বিভাগ। বাদসা-বিভাগের ভূতল-দেশ ৪৫ খানি শ্বেত প্রস্তর-ফলকে আচ্ছাদিত; তদ্রূপ স্ত্রীলোকদিগেরও বিভাগ। মসজিদের সম্মুখে যে প্রস্তরময় উঠান আছে, তাহার মধ্য-দেশে পূর্ব্বে একটা সূর্য্যঘড়ী ছিল। এই শ্বেত প্রস্তরময় মতিমসজিদ দেখিতে এত সুন্দর যে তাহাকে বাস্তবিকই মতিময়ই বলিতে হয়।

এই মতিমসজিদ দেখা হইলে দুর্গের অপর একটি ফটকে আমার সঙ্গী আমাকে লইয়া গেল। সেই গেট পার হইয়াই আর একটি শ্বেত প্রস্তরময় অপূর্ব্ব ভবন দেখিলাম। ইহার নাম আমখাস,—ইহা দরবার-আকারে গঠিত। চারিদিকেই শ্বেত প্রস্তরের থাম। থামের শিরায় শিরায় স্বর্ণরেখা সকল স্তম্ভের শোভা দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত করিয়াছে। শুনিলাম, এই দরবার-ভবন আকবর প্রস্তুত করান। আকবরের রাজসভা এই থানে বসিত। বাদসাহের জন্য একটি স্বতন্ত্র উচ্চাসন আছে। আকবর সেই আসনে বসিয়াছিলেন; উজীর বীরবল নিম্নদেশে একটি স্বতন্ত্র আসনে বসিতেন। একদা এই সময় শুনিয়া আকবরের প্রতি ভক্তিকে, প্রভুগত

হইয়া আমার সেই সময়ে একবার সেই বাদসা বসিবার স্থানকে প্রণাম করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। যেখানে আকবর বসিতেন, আমি সেই স্থানে উঠিয়া একবার দাঁড়াইয়া চারিদিক দেখিলাম। এখন সকলই শূন্য,কোথায় কেহই নাই। তখন আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম— সেই মোগল-সম্রাটেরা কোথায়? প্রতিধ্বনি যেন উত্তর দিল, সেই মোগল সম্রাটেরা কোথায়! হায় গৌরব কি ক্ষণ-স্থায়ী! পৃথিবীর দম্ভ কি অনিত্য!

এই বাদসা বসিবার স্থানটি নানাবর্ণের প্রস্তরে খচিত, দেখিতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময়। ইংরাজগণের বিগত আগ্রার দরবার এই আমখাসে হইয়াছিল। যাহাদিগের নামে পৃথিবী কম্পিত হইত, সেই অতুল প্রতাপশালী ইন্দ্রসমঐশ্বর্য্যশীল সম্রাটগণের দরবারে দীন ইংরাজগণ অনায়াসে বসিয়া গিয়াছেন। বসিয়া কি পূর্ব্বকার গৌরব এবং স্থান-মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া তাহাদিগের হৃদয় কম্পিত হয় নাই। কই আমি ত সে স্থলে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না, শরীর লোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। মোগল-প্রতাপ স্মরণ করিয়া শরীর কাঁপিয়া উঠিল। আমি সেখানে স্থির থাকিতে পারিলাম না; ভাবিলাম, কি কীটাণুকীট, আমি আকবরের সিংহাসনে গিয়া দাঁড়াইয়াছি; কি জানি, আমার মনে অচিন্ত্য কেমন অজ্ঞাতসারে ভয়ের সঞ্চার হইল। সেই স্থানের গৌরবে, মহিমায়, এবং গাম্ভীর্য্যে আমি পরিপূর্ণ হইলাম এবং শিহরিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া আসিলাম।

এই স্থান হইতে সরিয়া গিয়াই আমি আমখাসের ঠিক পশ্চাদ্দেশে যে প্রস্তরময় প্রশস্ত বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলাম তাহা একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠের নাম মৎসীভামন (মৎস্য-ভবন) শুনিলাম, যে স্থানের চারিধারে এই বারাণ্ডা, তাহা পূর্ব্বে একটি বৃহৎ জলাশয় ছিল, এই জলাশয় মৎস্যপূর্ণ থাকিত। সম্রাটগণ এই জলাশয়ে মাচ ধরিতেন। যে স্থানে বসিয়া মাচ ধরিতেন, সে স্থানটি স্বতন্ত্র আসন-নির্ম্মিত। সে স্থানের চিহ্ন আজিও আছে। আমার সঙ্গী সেই স্থান দেখাইয়া দিল। এখন আর সে জলাশয় নাই। শুনিলাম, ভরতপুর-রাজ তাঁহার অধিকার সময়ে তাহা বুঝাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং চিহ্ন স্বরূপ তাহার মধ্যদেশে যে একটি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, আজি সে বৃক্ষটি প্রবৃদ্ধ এবং সুবিস্তৃত হইয়া ভরতপুর-রাজের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

আমি এই বারেণ্ডা বেড়িয়া যে দিকে যমুনার দৃশ্য দেখা যায়, সেই স্থানে গেলাম। এই স্থানে উঠিয়া যেখানে আসিলাম, সে স্থানের নাম,—দেওয়ানখাস। এই দেওয়ানখাস বহির্দ্দেশীয় দুর্গপ্রাচীর হইতেও উচ্চ, এবং যমুনার দিকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। সেই স্থানটি দেখিলে বোধ হয়, তাহা একটি [illegible]

থাইবার স্থান। কিন্তু আমার সঙ্গী বলিল, সে স্থানটি বাদসাগণের মফঃস্বল দরবার ছিল। এখানে দুই খানি বৃহৎ প্রস্তরময় আসন আছে। যে খানি যমুনার দিকে রহিয়াছে তাহা এক খানি বৃহৎ কৃষ্ণ প্রস্তরাসন, নিজে বাদসা সেই আসনে বসিতেন। এই আসনের সম্মুখে মৎসীভামনের দিকে উজিরের আসন স্থাপিত আছে। এই স্থানে বাদসা ও উজির বসিয়া কথোপকথন করিতেন।

এই দেওয়ানখাসের পার্শ্বেই অনেক বেগম-মহল রহিয়াছে। এই বেগম মহল সকল যমুনার দিকে নির্ম্মিত। এই মহল সকল চারিদিকে ঘেরা এবং দেখিতে অতি সুন্দর। দেওয়ান খাসের নিকটেই যে বেগম মহল, তথা হইতে বেগমেরা যমুনার দৃশ্য দেখিতেন। বহির্দ্দেশীয় প্রাচীর এবং দেওয়ান খাসের মধ্যে একটি প্রশস্ত চত্বর আছে, সেই চত্বরে ব্যাঘ্রাদির সংগ্রাম হইত। যে স্থলে বেগমেরা বসিয়া এই সংগ্রাম দেখিতেন, সে স্থান আজি ও নির্দ্দিষ্ট আছে।

বেগম মহল সকল পার হইয়া গেলে, তবে বাদসাগণের খাসভবন চারিতলার উপর যমুনার ধারে অতি উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত রহিয়াছে। এ সকল ভবনে এখন যাইবার যো নাই। এখানে এখন ইংরাজ কর্ম্মচারীরা বসিয়া বসিয়া যমুনার লহরী-লীলা অবলোকন করেন। বেগম মহলের দিকে একটি সুন্দর মসজিদ আছে, বেগমেরা এই স্থানে নেমাজ পড়িতে আসিতেন। এই মসজিদটি মৎসীভামনের এক পার্শ্বে। মৎসীভামনের অপর পার্শ্বেও আর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। ইহার নাম নগিনা মসজিদ; সাজিহান ইহা প্রস্তুত করান। এই নগিনা মসজিদও স্ত্রীলোকদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই নগিনা মসজিদ অনেকটা মতিমসজিদের মত নির্ম্মিত হইয়াছে; দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু মতিমসজিদ দেখিয়া, আর এ সকল মসজিদ চক্ষে লাগে না। বাস্তবিক আমখাস ও মতিমসজিদ দেখিয়া আর কিছুই চক্ষে লাগে না; যদি লাগে, তাহা তাজ, তাহা আগ্রার গর্ব্ব, ভারতের গর্ব্ব, মোগল সম্রাটগণের গর্ব্ব, ভারতে মুসলমান-রাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি, তাহা অমূল্য, অতুল্য তাজ। আমি জানি না, এ তাজ আমি কিরূপে বর্ণনা করিব। আমি জানি না, এ তাজ বিলাতের ক্রিষ্টাল পেলেস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না। অথবা প্রত্যেকেই নিজ নিজ সৌন্দর্য্যে অতুল্য ও গরীয়ান্।

আগ্রা দুর্গের পাশ দিয়া, যমুনার ধারের রাস্তা দিয়া, আমি তাজ দেখিতে গেলাম। দূর হইতে বরাবরই তাজ দেখিতে পাইতেছিলাম, এজন্য সেই তাজ কতক্ষণে দেখিব বলিয়া যে ঔৎসুক্য হইতেছিল, তজ্জন্য যমুনার দিকে আর নজর পড়ে নাই। আমি সে দুর্গের

পার্শ্ব দিয়া, বাদসার নজরের সম্মুখ দিয়া, দুর্গপার্শ্বস্থ যমুনার ধার দিয়া, গাড়ী চড়িয়া, মনের উল্লাসে তাজ দেখিতে যাইতেছিলাম, তাহা একবারও মনে করি নাই। এখন তাহা মনে হইতেছে; আজি বাদসার আমল হইলে আমার মাথা-কাটা নিশ্চয় যাইত।

আমি দুর্গ হইতে তাজ দেখিয়াছিলাম, তাজ যমুনার ধারে সুন্দর শোভায় চিত্ত হরণ করিয়াছিল। আমি আগ্রার পথে অন্য প্রস্তর-নির্ম্মিত কত নকল তাজ দেখিয়াছিলাম, তাহাই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। আমি দুর্গের সিংহ-দ্বার সম্মুখে জুম্মা-মসজিদ দেখিয়াছিলাম, তাহাতে যে তাজের প্রতিরূপ পড়িয়াছিল, তাহাই আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। সেই জন্য আমার মনে হইতেছিল, আসল তাজ দেখিলে আমি কতই না মোহিত হইব! সকলেতই আমার আশা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, এবং আমার প্রত্যাশাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ যখন আমি মতি মসজিদ এবং আমখাস দেখিয়াছিলাম, তখনই আমি সেই মতি প্রতিম শ্বেত প্রস্তরে মনে মনে তাজকে কল্পনা করিয়াছিলাম, সেই কল্পনা আমার যেরূপ চিত্ত হরণ করিয়াছিল, তাজ দেখিতে যাইবার সময় ভাবিলাম, সেই কল্পনা কি পূর্ণ হইবে, সেই মনোময় তাজের অনুরূপ প্রতিকৃতি কি দেখিতে পাইব। তীর্থে যাইয়া শ্রী-লোকে দেবমূর্ত্তী দেখিবার জন্য যত উৎসুক হয়, আমি তাজ দেখিবার জন্য ততই উৎসুক হইয়াছিলাম।

অবশেষে বহির্দ্বারে পৌঁছিলাম। বহির্দ্বারে লেখা আছে "রাম রাম" আমি মনে মনে বলিলাম "বাম বাম,,। সেই বহির্দ্বারই আমাকে অভ্যর্থনা করিল। তৎপরে আমি তাজের সম্মুখস্থ প্রধান সিংহদ্বারে উপস্থিত হইলাম। বহির্দেশ হইতে এই সিংহদ্বারের দৃশ্য অতি মনোহর, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, এবং মহান্। ইহা লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত। সিংহদ্বার মধ্যে প্রবেশ করিলাম; তন্মধ্যে সম্মুখেই পাথরে লেখা আছে, আগন্তুক! যদি তুমি তাজ দেখিতে চাও একবার এই সিংহদ্বারের উপর-দেশ হইতে তাজের প্রতি দেখ"। আমি সেই আদেশানুসারে ত্বরিত গতিতে সেই সিংহদ্বারের উপরে উঠিলাম। উঠিয়া কি দেখিলাম! শিল্পের এক অপূর্ব্ব রমণীয় সৃষ্টি আমার সমক্ষে সমুদিত! যাহা কখন দেখি নাই, তাহা দেখিলাম যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই, তাহা দেখিলাম! আমার সেই পূর্ব্বকালের কল্পনাকেও তখন অতি দীন বলিয়া প্রতীত হইল; আমার মনোময় তাজ লজ্জায় মনে মনে বিলীন হইল! এমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুরুচির সৌন্দর্য্য কুত্রাপি দেখি নাই! তখন বলিলাম, প্রকৃতি তুমি গম্ভীর, মহান্ এবং সুন্দর বটে; কিন্তু তোমার সৌন্দর্য্য পরিচ্ছন্ন নহে, তাহাতে কেমন এক অমসৃণ বিশৃঙ্খল বন্যভাব আছে।

তোমার কুসুম সকল পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বটে, কিন্তু সে কুসুম সকল এত ক্ষুদ্র যে, তাহাদের ক্ষুদ্রতায় সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া পড়ে। আজি শিল্পের একটি প্রকাণ্ড কুসুম, সৌন্দর্য্যে বোধ হয় তোমার পরাজয় করিল।

এই সিংহদ্বারের দূরদেশ হইতে তুমি তাজের সৌন্দর্য্য যেমন অনুভব করিবে, নিকটে গিয়া তত পারিবে না। নিকটে গিয়া তুমি তাহার গাত্রের সৌন্দর্য্য এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সকল তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিয়া নয়ন সার্থক করিতে পারিবে; কিন্তু এই সিংহদ্বার হইতে সেই তাজের সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য যেমন অতুল্যরূপে তোমার দৃষ্টি-সমক্ষে প্রতীয়মান হইবে, সেই তাজের সম্মুখস্থ উদ্যান শোভা, সেই তাজের চারিপার্শ্বস্থ চত্বর-শোভা, সেই তাজের পার্শ্বদেশীয় দুই সিংহদ্বারের শোভা, সেই তাজের চত্বর দেশের চারিকোণের চারি স্তম্ভের শোভা, আর সেই তাজের অপর দিকে যমুনার শূন্যময় দেশের শূন্যদৃশ্য, এবং সেই তাজের পার্শ্বস্থ সর্ব্বদেশীয় শোভা,—সেই দূর দেশ হইতে যেমন মোহনবেশে একত্রে তোমার দৃষ্টি-সমক্ষে উদয় হইবে, এমন আর কোন স্থান হইতে দেখিতে পাইবে না। সে দৃশ্য যদি তোমার মনকে মুগ্ধ না করে, জানি না, কোন্ দৃশ্য তোমার মনোমুগ্ধকর!

আমি এই মনোমুগ্ধকর সুন্দর শোভা কিয়ৎকাল নয়ন তৃপ্ত করিয়া দেখিলাম। চিত্রকর নহি, যে তাহার চিত্র লইব। কিন্তু যে চিত্রকর হয়, সেই দৃশ্যের চিত্র না লইয়া সে থাকিতে পারে না। আমি, সেই অপূর্ব্ব দৃশ্যের চিত্র মনে মনে লইলাম। এবং সেই চিত্র আজিও আমার মনে মনে অতি সুমোহন বেশে শোভিত রহিয়াছে। জানি না, আমি তাহা কখন ভুলিতে পারিব কি না! আমার মত কেহ যদি মোহিত হইয়া থাকে, তবে আমি বলিব যে ব্যক্তি সেই সিংহদ্বারে লিখিয়া রাখিয়াছে, আগন্তুক তুমি উপরে উঠিয়া একবার তাজের শোভা দেখ,—বোধ হয় সেই ব্যক্তিই আমার ন্যায় মোহিত হইয়াছিল। আর আমি এই সুন্দর শোভায় যে কবিত্ব অনুভব করিলাম, তিনিও অবশ্য সেই সুন্দর দৃশ্যে সেই কবিত্ব অনুভব করিয়াছিলেন। এই সুন্দর শোভা দেখিয়া আমি মনে মনে ভাবিলাম, এত দিনে আমার সমুদায় ভ্রমণ-শ্রম সার্থক হইল।

তৎপরে আমরা সেই সিংহদ্বারের ছাদের উপর চারি দিক বেড়াইলাম, এবং তাহার চারিদিক হইতে বার বার সেই দৃশ্যের প্রতি দেখিতে লাগিলাম। এক এক স্থানে যেন সেই শোভা নূতন ভাবে উদিত হইল। তার পর নীচে নামিয়া সিংহদ্বারের পার্শ্বস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেই গৃহমধ্যে নানা দেশীয় পুরাতন দ্রব্যের সংগ্রহ আছে। অধিকাংশ বৌদ্ধ এবং জৈন-কীর্ত্তি, এবং

দেব-দেবতার মূর্ত্তি। যমুনায় একটি সুন্দর কৃষ্ণ-মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিলাম। যোধ বাইয়ের ন লক্ষ টাকার হারের গড়ন কিরূপ ছিল, তাহার আদর্শ একটি প্রস্তরে খোদিত আছে দেখিলাম। এইরূপ নানা দ্রব্যে দুইটি পার্শ্বস্থ গৃহ পরিপূর্ণ। সেই সমুদায় দেখিয়া সিংহদ্বার হইতে বাহিরে গিয়া দেখি, তাহার বহির্দ্দেশে এক পার্শ্বে একটি লোক নানাবিধ চিত্র সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। সে সমুদায় বিক্রয়ার্থ আছে। তন্মধ্যে অনেক মোগল বাদসার চিত্র, সেই তাজের চিত্র, অনেক ভারতীয় রাজার চিত্র, অনেক স্থানের চিত্র, অনেক বাইয়ের চিত্র, দর্শন করিলাম। তাজের যে কয়েক খানি চিত্র ছিল, তাহাতে মন তৃপ্ত হইল না বলিয়া এক খানিও গ্রহণ করিলাম না।

সম্মুখেই বাগান। সোপান হইতে নামিবা মাত্র সম্মুখে একটি কৃত্রিম প্রস্তর-নির্ম্মিত বাঁধান-ঝিলে সুবর্ণ মৎস্য সকল ঝিকমিক্ করিয়া শৈবাল মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। দুই পার্শ্বে নানা কুসুম ও সুগন্ধি গাছের কেয়ারি। মধ্যে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বসিবার স্থান; আর দুই দিকে তাজের সম্মুখে সেই লম্বা ঝিলের জলে শৈবালাবলি এবং সুবর্ণ মৎস্য দেখিতে অতি সুন্দর। কিন্তু ঝিলের বামপার্শ্বে ঘন বৃক্ষের ছায়া ও দৃশ্য তদপেক্ষা সুন্দরতর। এই খানে কতক-গুলি বালককে দেখিতে পাইবে, তাহারা দর্শকগণকে বাগান দেখাইয়া বেড়ায়। তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে কতকগুলি সুগন্ধি গাছের পাতা এবং তৎসঙ্গে এলাচ ও লবঙ্গ গাছের পাতা আ[illegible] উপহার দিল। তৎপরে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া নানাবিধ গাছ দেখাইতে লইয়া যাইতে চাহিল। তাহার প্রিয় সম্ভাষণে তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রতিদান করিয়া তাজ দেখিতে গেলাম। তাজের বহিশ্চত্বরে উঠিলেই একটি বালক বসিয়া আছে, সে সেই স্থানে পাদুকা রাখিয়া যাইতে বলে। তাহার কৌশল এই যে, পাদুকা ফিরিয়া লইবার সময় তাহাকে কিছু না দিলে পাদুকা ফিরাইয়া দেয় না। আমরা বলিলাম পাদুকা রাখিয়া যাইবার সরকারি হুকুম দেখাও, তবে পাদুকা রাখিয়া যাইব। সে হুকুম দেখাইতে পারিল না; সুতরাং আমরা পাদুকা সমেত চলিয়া গেলাম। কিন্তু পাদুকা সমেত সেই তাজের অভ্যন্তরস্থ সুন্দর নানা বর্ণের উজ্জ্বল প্রস্তরের উপর চলিয়া যাইতে ভয় হইতে লাগিল, পাছে আমাদের পদাঘাতে সেই প্রস্তর সকল বিশ্রী অথবা বিবর্ণ হইয়া যায়। তাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমরা কি অগ্রে দেখিব সহসা স্থির করিতে পারিলাম না। তাহার অভ্যন্তরের মধ্যস্থলে তাজবিবি ও সাজিহানের কবর প্রস্তরময় সুন্দর রেল দিয়া ঘেরা এবং সেই কবর একটি স্বতন্ত্র গৃহমধ্যে স্থিত। এই গৃহের চারিপার্শ্বে প্রস্তরময় ফুলকাটা

পাতলা প্রাচীর দেওয়া আছে। সেই প্রাচীর পার্শ্বে কবর-গৃহের চারিদিক বেড়িয়া একটি পার্শ্ব-গৃহ আছে। আমরা প্রথমে সেই পার্শ্বগৃহে প্রবেশ করিলাম। তাহার কাজ দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। সেই শ্বেত প্রস্তর গাত্রে কুঁদিয়া তোলা এমন সুন্দর সুন্দর গোলাপ প্রস্তরের ফুল সকল রহিয়াছে যে, তাহা দেখিলে সকলকেই প্রশংসা করিতে হয়। প্রাচীরের ধারে ধারে নানা বর্ণের বহুমূল্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর-খচিত সারি সকল শোভনীয় দেখাইতেছিল। যে যে স্থানে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বর্ণাভ প্রস্তর সকল ভ্রষ্ট অথবা অপহৃত হইয়াছে, সেই সেই স্থানে এক একটি বিশ্রী তালি পড়িয়াছে। যাহা হউক, এই পার্শ্বগৃহের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাজ সকল ক্ষণিক স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া আমরা মধ্যস্থ কবর-স্থানে আসিলাম। সেই দুই কবর যে কি সুন্দর কুসুমময় প্রস্তরে আচ্ছাদিত, তাহা বর্ণনাতীত। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া একবার তাজবিবি* ও তৎপার্শ্বস্থ বাদসার কবরের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম নুর-জিহান তুমি কতই না সুন্দরী ছিলে। বাদসা তোমাকে কতই না ভাল-বাসিতেন! কতই না ভালবাসিয়া তেমন সুন্দর দেহকে এমন সুন্দর কবর মধ্যে রক্ষিত করিয়া গিয়াছেন! ধন্য নুরজিহান, তোমার রূপ, ধন্য তোমার লাবণ্য, ধন্য তোমার প্রাণেশ্বর সম্রাট! নুরজিহান, তুমি যখন জীবিত ছিলে, তোমাকে কি এত লোকে দেখিতে আসিত, না দেখিতে পাইত? আমার বোধ হয়, তুমি এই সুন্দর কবরস্থ হইয়া এখনও সমান রূপ-যৌবনে জীবিত সুন্দরী হইয়া আছ। তোমার প্রাণেশ্বর তোমাকে এই স্থলে অমরত্ব দিয়া গিয়াছেন এবং তৎ-সঙ্গে সঙ্গে আপনিও অমর হইয়াছেন। তোমার রূপ-যৌবন বয়স্ কবে হরণ করিয়াছিল, কিন্তু এই সুন্দর কবর সেই রূপ-যৌবন তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছে। তুমি সেই রূপযৌবনে যেন ভূষিতা হইয়া আবার চিরজীবনে জীবিত হইয়া রহিয়াছ।

চিরকালের জন্য তোমার কবরে অসংখ্য প্রস্তরময় গোলাপ ও নানা বিধ কুসুম ফুটিয়া রহিয়াছে। তোমার প্রাণেশ্বর তোমাকে এখন যেমন কুসুমাভরণে শোভিত করিয়া রাখিয়াছেন, আমার অনুমান হয়, তুমি যখন কোমল কুসুম কোরকের ন্যায় জীবনোদ্যানে এক দিন ফুটিয়াছিলে, তখনও তোমার প্রাণেশ্বর এইরূপ নানাবিধ মণি মুক্তা এবং হীরক-কুসুমে তোমাকে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি কুসুমের মত তোমাকে পাইয়া জীবিতকালে কুসুমশোভিত করিয়া রাখিয়াছিলেন,

* আমি সেই তাজমহলস্থ লোক-মুখে শুনিলাম, এই তাজবিবির অন্যতর ডাকনাম নুরজিহান ছিল। এ নুরজিহান জাহাঙ্গিরের সুবিখ্যাত নুরজিহান নহেন।

এবং চিরদিনের জন্যও তোমাকে কুসুম-বিকীর্ণ করিয়াই গিয়াছেন। ধন্য কামিনী-কুসুম, রূপের জন্য, তোমার পদমর্য্যাদার জন্য, আজি পর্য্যন্ত কোন সুন্দরীই তোমার মত এরূপ অতুল্য ও অমূল্য উপহার এ জগতে লাভ করিতে পারেন নাই। হে জগৎ-ললামময়ী সম্রাড়ীশ্বরি! তোমার পদমর্য্যাদার জন্য, তোমার রূপের জন্য তোমার সমাধি-দেশে আজি আমি নমস্কার করি। তুমি সমাধিস্থ থাকিয়া চিরদিন জগতের নমস্যা হইয়া থাক, চিরদিন শান্তি সম্ভোগ কর।

তাজের উপরস্থ সমাধিদেশ দেখিয়া আমি তাহার নিম্ন তলস্থ সমাধি-দেশ দেখিতে গেলাম। উপরে সমাধিদেশ যেরূপ সজ্জিত দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ঠিক তাহার নিম্ন তলে সেই প্রকার আর একটি সমাধিস্থল তুল্যরূপে বিচিত্র বোধ হইল। যখন এই সমাধিস্থল নিম্নতলে রহিয়াছে, তখন আমার অনুমান হইল, এই নিম্নতলস্থ সমাধি-মণ্ডলই প্রকৃত সমাধি-স্থান। উপরিস্থ তলে যে সমাধিমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা নিম্নতলস্থ সমাধিমণ্ডলেরই নকল মাত্র। নিম্নতলস্থ সমাধিমণ্ডল অপেক্ষাকৃত অন্ধকারময় বলিয়া, বোধ হয়, উপরিস্থ সমাধিমণ্ডল নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই দ্বিতল সমাধিদেশ দেখিয়া আমি তাজের উপরে উঠিলাম। উপরে, তাহার নির্ম্মাণ-কৌশল সুন্দর প্রতীত হইল। যিনি তাজের এমন সুন্দর সর্ব্বাঙ্গ-মিলন, এমন মিল-বিশুদ্ধ গঠন-কৌশল মনে মনে অনুমান করিয়া বহির্দ্দেশে তাহার প্রতিরূপ দিয়াছেন, তিনি যথার্থ সৌন্দর্য্যসৃষ্টিকারী, তাহার কল্পনা যথার্থ সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী, তাহার কৌশল-অনুভবের প্রশংসা এক মুখে শেষ করা যায় না।

তৎপরে নামিয়া আসিয়া তাজের বহির্দ্দেশীয় অঙ্গসৌষ্টব দেখিতে লাগিলাম। তাহার অঙ্গে এক এক খানি বৃহৎ শ্বেত প্রস্তর-ফলক সুন্দর পুষ্প-শোভিত হইয়া রহিয়াছে। যে খানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে অন্য একখানি আর প্রদত্ত হয় নাই। তাজ, তাহার পুরাতন ও ভগ্ন বেশে যেমন সুন্দর ও মহান্ দেখাইল, আহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সংস্কৃত হইলে, বোধ হয় তত মহান্ ও সুন্দর দেখাইত না। আমি কোন পুরাতন, ও এত দিনের অট্টালিকাকে এত সুন্দর বেশে দেখি নাই। পুরাতন তাজ আজিও সমান সুন্দর রহিয়াছে। তবে যিনি তাহার সৌন্দর্য্যের হানি করিয়া তাহার অঙ্গ হইতে মহামূল্য রত্ন সকল হরণ করিয়াছেন, আমি জানি না, সেই দস্যু কি শাস্তির উপযুক্ত,—তাহার হস্ত সকল কুকার্য্যেই বিস্তৃত হইতে পারে,—সেই পাষণ্ড জগতের অভিশাপের যোগ্য পাত্র।

তাজ দেখিয়া আমি তাহার এক কোণের একটি স্তম্ভের শিরোদেশে

উঠিতে গেলাম। কলিকাতায় অকটারলনী মনুমেণ্ট ইষ্টক-নির্ম্মিত ; কিন্তু তাজের এই চারিকোণস্থ চারিটি স্তম্ভ প্রস্তর-নির্ম্মিত। উচ্চে বোধ হয় কিছু ছোট হইতে পারে। এই স্তম্ভের মধ্য দিয়া প্রস্তরময় সোপানাবলি অবলম্বন করিয়া তাহার প্রথম বারেণ্ডায় একবার দাঁড়াইলাম। যমুনার ধারে সেই বারেণ্ডায় দাঁড়াইলে সকলেরই গা কাঁপিতে থাকে ;-শিরোদেশ যেন টলিতে থাকে। এজন্য আমি সেই স্থান হইতে সরিয়া গিয়া তাহার উপরের বারেণ্ডায় উঠিলাম। এই স্তম্ভের শিরোদেশে বেশ বসিবার জায়গা আছে, এবং সেইস্থান হইতে আগ্রা সহরের সুন্দর দৃশ্য বেশ দৃষ্টি-গোচর হয়। কত দূরে গির্জার চূড়া সকল আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে দেখিতে পাইলাম। থাকে থাকে অট্টালিকা সকল শোভমান রহিয়াছে, দেখিলাম। আগ্রা যে কত বড় সহর তাহা এইস্থল হইতে বেশ প্রতীত হইতে থাকে ; এবং আগ্রাসহর যে কেমন স[illegible] অট্টালিকাময় তাহাও দৃষ্টি-গোচর হইতে থাকে।

অন্যদিকে দেখ, তোমার দৃষ্টি অবাধে চলিয়া যায়,—সকলই শূন্যময় ও ধূমময় বোধ হয়। সহরের অন্য পার্শ্ব দিয়া দেখ,—সেই সুদূরস্থ মথুরা নগরীর কোন কোন উচ্চ মন্দিরের শিরোদেশ যেন ঈষৎ, অস্পষ্ট, দৃষ্টিপথে আইসে। শুনিলাম, এই স্থল হইতে বাদসা কোন দূরস্থ মন্দিরের আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, তাহা হিন্দুদিগের কোন দেব-মন্দিরের আলোক। অমনি হুকুক দিলেন, যেন তৎক্ষণাৎ সেই দেব-মন্দির ভূমিসাৎ করা হয়। মথুরার সে দেবমন্দির ভূমিসাৎ হইয়াছে। কিন্তু আজও দুই একটি মন্দিরের চূড়াদেশ দেখা যায়। বোধ হয়, এসমস্ত চূড়াদেশ বলিয়াই বাদসার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই।

এই স্তম্ভের দুই পার্শ্বে দেখ, যমুনার শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। আজি যমুনার বক্ষে এক খানিও তরি বাহিয়া যায় না। আজি যমুনার তীরে মোগল-সাম্রাজ্যের রাজধানীর কিছু মাত্র গণ্ডগোল নাই ;—যমুনার তরঙ্গরোলে সে গণ্ডগোলের প্রতিধ্বনিও নাই। আজি আগ্রা নীরব,—যমুনাও নীরব! যমুনা পুলিনে কেবল দুই একটি ক্ষুদ্র পক্ষী রাজ্য গৌরবের অসারতা প্রচার করিয়া শাখা হইতে শাখান্তরে গান গাইতে গাইতে উড়িয়া বেড়াইতেছে ;— কখন বা যমুনার উপর লম্ফ ঝম্প দিয়া, এক বার দুর্গের শিরোদেশে আসিয়া, একবার বা তাজের চূড়ায় বসিয়া, মনের উল্লাসে, আপনাদের প্রভুত্বের গুণগান করিতেছে। নীচে যমুনার স্রোত দুর্গের মূলদেশ স্পর্শ করিয়া, এবং তাজের পবিত্র-শ্বেত পাদদেশ বিধৌত করিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে।

স্তম্ভের সেই শিরোগৃহে ক্ষণিক বসিয়া

গতক্রম হইলে তথাহইতে অবরোহণ করিলাম। অবরোহণ করিয়া তাজের সম্মুখস্থ বাগানে বেড়াইতে গেলাম। পূর্ব্বে এইখানে গোলাপ-বাগ ছিল; কিন্তু এখন আর সে গোলাপ-বাগ নাই; এখন তৎস্থলে ইংরাজেরা একটি সুন্দরতর সুরুচিকর উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন। উদ্যান প্রস্তুত করা বিষয়ে ইংরাজ গণের সুরুচির প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। কোন খানে পুষ্প কানন, কোন খানে কুঞ্জ, কোন খানে লতা, কোন খানে শোভনীয় বৃক্ষাদিতে তাহারা উদ্যানকে অতি রমণীয় ও পরিচ্ছন্ন বেশে সাজাইতে জানেন। এ বাগানটিও সেইরূপ সজ্জিত হইয়াছে। পূর্ব্বকার পয়ঃ-প্রণালী দিয়া আজিও যমুনা হইতে বারি বাহিত হইয়া সমগ্র উদ্যান দেশে নীত হইতেছে। কেবল আঙ্গুর-কাননটি, বোধ হইল, অযত্নে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া রহিয়াছে।

বাগান বেড়াইয়া আমরা আর একবার তাজের সম্মুখে গেলাম। ক্ষণিক তাহার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে পুনরায় দেখিলাম। তাহার মোহন শোভা হৃদয়ে আবার অনুভব করিলাম, তাহার চারু মূর্ত্তি আবার মানস-পটে চিত্রিত করিলাম; পশ্চাৎ ফিরিলাম, আবার সিংহদ্বারে আসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। আবার সেই তাজের সম্মুখে;—তখন বার বার তাজকে দেখিয়া, সাজিহানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, এবং তাজবিবিকে আর একবার নমস্কার করিয়া বিদায় হইলাম।

তাজ দেখিবার পর আমার সেকেন্দ্রা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। সেকেন্দ্রা, আগ্রা সহর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেকেন্দ্রা আকবরের সমাধিস্থল। সকলেই বলিতে লাগিল, তাজ দেখিয়া আর সেকেন্দ্রা মনে লাগিবে না; সেকেন্দ্রা দেখিয়া তাজ দেখা উচিত ছিল। কিন্তু যখন সেরূপ ঘটে নাই, তখন আর সেকেন্দ্রা দেখিতে অভিরুচি হইল না। আমরা আগ্রা সহর কথঞ্চিৎ বেড়াইয়া, লক্ষ্মৌ দেখিবার জন্য ট্রেনে চড়িলাম। গাড়ীতে যাইতে যাইতে যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ আগ্রার দিকে, আগ্রার দুর্গের দিকে, এবং অবশেষে সেই সুন্দর তাজমহলের দিকে তাকাইয়াছিলাম। ক্রমে সকলই অদৃশ্য হইল। ট্রেণ হু হু শব্দে চলিয়া গেল।

শ্রীপূ——

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রলাপ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত; চীপ্ সাইড যন্ত্র, মূল্য ॥০ আনা।

প্রসিদ্ধ "উদ্ভ্রান্ত প্রেমের" অনুকরণে 'প্রলাপ' রচিত হইয়াছে। ইহাতে যে সমস্ত হৃদয়ভাব অকপট ও অনর্গল রূপে

পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা অতীব শোচনীয়। উপেন্দ্রনাথের ত্রয়োদশ বর্ষীয়া পত্নী গর্ব্ভিনী হন; যথাকালে তিনি একটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রটীও অচিরে মৃত হয়। ইত্যাদি পুস্তকের প্রতিপাদ্য। বিষয়টী করুণ রসোদ্দীপক। বাল্যোদ্বাহের বিষময় ফলে দেশের কি অনিষ্টই না হইতেছে! প্রলাপ লেখকের হৃদয়-ভাব অতি মহান্ ও স্বর্গীয় হইলেও তাহার শেষ রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের শেষ ভাগে দৃষ্ট হইল—উপেন্দ্র পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি, এ বিবাহের পরিণাম শুভ হইবে। অপরিণত-বয়স্ক বিপত্নীক যুবকের দ্বিতীয় পরিণয়ে আমাদের আপত্তি নাই—তবে যে অত্যুদার উচ্চগুণ সম্পন্ন মহচ্চিত্র, সাধারণ-সমক্ষে ধৃত হইয়াছিল, তাহার সৌন্দর্য্যের প্রায় সর্ব্বাংশেরই খর্ব্ব হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পুস্তকপাঠে প্রথম প্রথম আমাদিগকে কথঞ্চিৎ বিচলিত করিয়াছিল। 'প্রলাপের ভাষা সকল স্থানে ব্যাকরণশুদ্ধ হয় নাই—পুনরুক্তি দোষেরও অভাব নাই। এরূপ পুস্তকে পুনরুক্তির মার্জনা আছে, কিন্তু অপক্ক ভাষা মার্জনীয় হইতে পারে না।

১। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বাৎসরিক বিবরণ ১২৮৬-৮৮ সাল; ১৮ নং অক্রূর দত্তের গলি, বহুবাজার।

২। THE 1st, 2nd, & 3rd ANNUAL REPORTS OF THE বরাহ নগর আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা পুস্তকালয় (১৮৭৬) কলিকাতা প্রেস্।

৩। THE 8th ANNUAL REPORT OF THE চন্দননগর পুস্তকালয়১৮৮০—৮১ সাল।

৪। আড়বেলিয়া জ্ঞানবিকাশিনী সভার ৪র্থ বার্ষিক বিবরণ, সন১২৮৯ সাল।

৫। THE TENTH REPORT OF THE HINDU FAMILY ANNUITY FUND for 1880-81.

১২৮৮র আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যক আর্য্যদর্শনে যোড়াসাঁকো লাইব্রেরীর বার্ষিক বিজ্ঞাপনীর সমালোচনে সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলা হইয়াছে। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিশেষ গুণ এই যে ইহা গ্রন্থকার গণের অনুগ্রহের উপরে নির্ভর করে না। তিন বৎসরের মধ্যে ৫২২ খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া অপরিসীম হৃষ্ট হইয়াছি। "সাবিত্রী লাইব্রেরী"—এই সঙ্কর নামের আমরা পক্ষপাতী হইতে পারিলাম না। লাইব্রেরী শব্দের পরিবর্ত্তে 'পুস্তকাগার' ব্যবহার করিলে ভাল হইত। সাধ্বী সাবিত্রীকে ইংরাজির সহিত সম্মিলিত করা ভাল হয় নাই। 'সাবিত্রী লাই-

রবী' শুনিলে শকুন্তলা-হোটেল স্মরণ হয়।

হিন্দু ফ্যামিলি এনিউটি ফণ্ড দ্বারা বাঙ্গালা দেশের হিন্দু বিধবা গণের অন্ন সংস্থান হইয়াছে। আমরা ইহার কার্য্যপ্রণালীর প্রতি বরাবর সমান আগ্রহবান্।

চন্দননগর পুস্তকালয় নিয়মিত রূপে ইংরাজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফ্রেঞ্চ পুস্তক ও সংবাদ এবং সাময়িক পত্রিকা ক্রয় করিয়া থাকেন। পুস্তকাগারের আয়-ব্যয়ের প্রদত্ত তালিকা দ্বারা জানা যায়, সেভিংস্ ব্যাঙ্কে ৩০০৲ টাকা জমা আছে। প্রকাশ্য পুস্তকালয়ের ভাণ্ডারে এইরূপ টাকা জমা না থাকিলে, তাহার উন্নতি প্রত্যাশা করা যায় না। এপর্য্যন্ত পুস্তকালয়ে সংস্কৃত ৮০, বাঙ্গালা ২৮, ইংরাজী ১৩৮৮ এবং ফ্রেঞ্চ ১৫৩ খানি পুস্তক ও পত্রিকা সংগৃহীত হইয়াছে।

আড়বেলিয়ার পুস্তকালয়ের সংসৃষ্ট স্ত্রীশিক্ষা, দরিদ্র বালকগণের শিক্ষা ও সাধারণ দরিদ্রদিগের অর্থ সাহায্য, বঙ্গবিদ্যালয় এবং সভা আছে। এই পুস্তকালয়ের অভিপ্রায় উচ্চ। এক কালীন দান, চাঁদা, ১২৮৬ সাল অবধি বারইয়ারি দরুণ সংগৃহীত অর্থ সভার আয়-ভুক্ত হইয়াছে।—ইহা অবশ্যই একটী সুসমাচার বলিতে হইবে।

১। THE CALCUTTA MAGAZINE. January, 1882.

২। **প্রবাহ** (মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন) ১—৬সংখ্যা। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

৩। **গোপাল ভাঁড়** (রহস্যজনক মাসিক পত্রিকা) শ্রীকিষণ লাল বস্মণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। গ্রেট ইডেন প্রেস্।

৪। **সাহিত্যদর্শন** (ঐ) চট্টগ্রাম।

৫। **উষা** (মাসিক পত্র) ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

'প্রবাহে' সত্যব্রত সামশ্রমি-লিখিত বৈদিক প্রবন্ধটী সারবান্। এই বর্ষের বৈশাখের "ভারতীতে" লিখিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'যমের কুকুর' প্রবন্ধ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইতেছে। কিন্তু ভাষাটী এবং বর্ণন-প্রণালী আশানুরূপ হয় নাই; কেবল বিষয়াংশেই উহার গুরুত্ব। আর্য্যদর্শনের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় সুকবি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের লিখিত "আর্য্যদর্শন" নামে একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবাহেও 'প্রবাহ' শীর্ষক একটী পদ্যময়ী রচনা দেখিতেছি। ইহার মনোবিজ্ঞান, আর্য্যসভ্যতার ইতিহাস, জয়চাঁদের চিঠি, নাটক ও অভিনয় প্রভৃতি ক্রমশঃ প্রকাশ্য প্রস্তাবগুলি ভাল হইতেছে। আর্য্যসভ্যতার ইতিহাসে ইংরাজি প্রমাণের সঙ্গে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার করিলে, সন্দর্ভটী অধিকতর প্রীতিদায়ক ও প্রয়োজনীয় হইবে। জয়চাঁদের চিঠির স্থানে স্থান অনাবশ্যক বিষয় সত্ত্বেও উহা আমোদজনক এবং

কিছু কিছু ভৌগলিক ও ঐতিবৃত্তিক ঘটনায় পূর্ণ; সুতরাং সাধারণের উপকারী। ৬ষ্ঠ সংখ্যক প্রবাহে নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্নকে মৃতের তালিকা-মধ্যে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, ইহা সম্পাদকের পক্ষে ভয়ানক অসাবধানতা। সে যাহা হউক, প্রবাহের উদ্দেশ্যের সহিত আমাদের বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে।

কলিকাতা ম্যাগাজিনের বিষয়গুলি উত্তম হইতেছে।—সম্পাদকের মতের সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই।

হাস্যপ্রধান পত্রিকার মধ্যে "পঞ্চানন্দ" প্রথম ও প্রধান। পঞ্চানন্দের পর 'সদানন্দ' 'রসিকরাজ' 'হরবোলাভাঁড়' 'বিদ্রূপ' ইত্যাদি অনেক পত্রই বাহির হইয়াছে। হাস্যকর প্রস্তাবের অবতারণায় পঞ্চানন্দ সম্পাদক উপযুক্ত ব্যক্তি। আর এক কথা—হাস্যরস-ভূয়িষ্ঠ পত্রিকার বহুল প্রচার বঙ্গদেশের পক্ষে অহিতকর। লঘু বিষয় লইয়া বঙ্গদেশ বিস্তর মাতামাতি করিয়াছে এবং করিতেছে। তাহার সাহায্যার্থে অনুকূল বিষয়ের প্রাচুর্য্য যাঁহারা দিতে যান, আমাদের মতে তাঁহারা ভাল করিতেছেন না। তজ্জন্যই "গোপাল ভাঁড়ের" আবির্ভাব আমাদের তত আনন্দের বিষয় নহে। একেই প্রকৃত "গোপাল ভাঁড়ের" গল্পের জ্বালায় আমরা অস্থির; তাহার উপর আবার নকল "গোপাল ভাঁড়" কেন?

সাহিত্য দর্শন বিষয়ে যাহা বলা যাইতে পারে, তৎ সমস্তই ঊষা-সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "সাহিত্য-দর্শনের" লেখা নিতান্ত অপরিপক্ক। ইহার উপকারিতা কিছুমাত্র দেখিতেছি না। ইহার অনেক লেখা বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীস্থ বালকগণ কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া বোধ হয়।

আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ।

এক সময় আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ এই ভারতে এতদূর উন্নত হইয়াছিল, যে অধুনা সভ্যাদর্শ পাশ্চাত্য জাতিগণ বহুকাল পর্য্যন্ত অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম, অর্থ ব্যয় ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও, অদ্যাপি সকল বিষয়ে তাহার সমকক্ষতা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু আর্য্য সন্তানগণের দুরদৃষ্ট বশতঃ কালচক্রের সংঘর্ষণে সেই উন্নতশীর্ষ আয়ুর্ব্বেদ আজ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সংপ্রতি ভারতবন্ধু হৃদয়বান মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকেই আর্য্যগণের অন্যান্য বিষয়ক অবনতির নিমিত্ত শোক করিয়া, অবসর পাইলে আয়ুর্ব্বেদের জন্যও দুই এক বিন্দু অশ্রুপাত করিয়া থাকেন। এটী আয়ুর্ব্বেদের পক্ষে শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। ইহাঁরা আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার প্রতিকার পূর্ব্বক যাহাতে আয়ুর্ব্বেদ পুনর্ব্বার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য মনোযোগী হইতে ভারতহিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য ইহাও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারা আয়ুর্ব্বেদের অবনতির যে সকল কারণ উল্লেখ করেন তাহার সহিত অনেক সময় আমাদের মতের বিরোধ উপস্থিত হয়, এই জন্য আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ধারণা আছে, তাহা সাধারণের গোচরার্থ এই পত্রিকায় লিখিলাম।

কেহ বলেন, 'আধুনিক বৈদ্যগণ আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাঁহাদের চিকিৎসায় কোন ফল দৃষ্ট না হওয়ায়, এবং ইংরেজী চিকিৎসায় বিশেষ সুফল পাওয়ায় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় সাধারণের বিশ্বাস নাই। যে ব্যবসায়ে সাধারণের বিশ্বাস না থাকে তাহাতে উপযুক্ত অর্থাগমের প্রত্যাশাও থাকে না। অর্থাগমের প্রত্যাশা না থাকিলে ভদ্রব্যবসায়ীগণেরও তৎপ্রতি সমাদরের লঘুতা জন্মে। অন্য কেহ সেই দিকে প্রবেশ করে না, এই জন্য ক্রমেই তাহার লোপ পাইয়া আইসে, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ।' আমরা এ মতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতে পারি না। কারণ যে পরিমাণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের প্রয়োজন, যদিও তত না থাকুক এখনও উত্তম উত্তম আয়ুর্ব্বেদবিৎ সুচিকিৎসক বহুসংখ্যক পাওয়া যায়। এবং তাঁহাদের চিকিৎসায় অসংখ্য

উৎকট রোগের প্রতিকার হইয়া থাকে। বোধ হয় অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যে সকল প্রাচীন রোগ দীর্ঘকাল ডাক্তারি চিকিৎসায় ফলপ্রাপ্ত হয় নাই; তাহাও উপযুক্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে অনতিবিলম্বে নিরাময় হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এবম্বিধ দৃষ্টফল সত্ত্বেও প্রত্যক্ষের অপলাপ পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রকে অজ্ঞ বলিয়া আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করা, বোধ হয় সদ্‌যুক্তি-প্রণোদিত কার্য্য নয়।

অনেকে বলেন, আয়ুর্ব্বেদে এমন কিছুই ছিল না ও নাই যে, অধুনাতন ইংরেজী চিকিৎসার সহিত প্রতিযোগিতা পূর্ব্বক নিজ গৌরব রক্ষা করিতে পারে। পূর্ব্বে অন্য কোন প্রকার চিকিৎসা প্রণালী ছিলনা, সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ-বিহিত চিকিৎসাই সর্ব্বত্র সমাদৃত ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সংপ্রতি উৎকৃষ্টতর ইংরেজী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি এবং বহুল প্রচার হওয়ায়, আয়ুর্ব্বেদ ক্রমে হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই কাল্পনিক যুক্তিদ্বারা আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা আয়ুর্ব্বেদ তত্ত্বে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিব। সভ্যতার আদর্শ, কবিত্বের জন্মভূমি, চিকিৎসাশাস্ত্রের আকর এই ভারতে এককালে আয়ুর্ব্বেদ কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, তবে প্রতিকূলবাদীদিগের মত খণ্ডনার্থ আমরা সংক্ষেপে ইহাই বলিতেছি যে, জগতের চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিবেন আজ পৃথিবীতে যত প্রকার চিকিৎসা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সর্ব্বপ্রাচীন এবং তজ্জন্য বোধ হয় সকলেই সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সম্বন্ধে সেই আর্য্যঋষিগণ-প্রণীত আয়ুর্ব্বেদের নিকট ঋণী। যে শস্ত্র চিকিৎসা প্রভাবে পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী আজ দিগন্তব্যাপিনী, সেই শস্ত্র চিকিৎসা আমাদেরই আর্য্য পিতামহগণের চিন্তা-প্রসূত। যিনি আয়ুর্ব্বেদের পারদ প্রয়োগ-প্রণালী অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি জানেন, অধুনা বিকলাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ অতীত কালে রসায়নশাস্ত্রের কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিল। অদ্যকার অঙ্গহীন আয়ুর্ব্বেদে অনুসন্ধান করিলে এখনও এমন বিস্তর সারবান্ বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার প্রয়োগ দেখিলে বর্ত্তমান উন্নতশীর্ষ পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালী-প্রবেত্তাগণ যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। এমন অবস্থায় আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না যে, আয়ুর্ব্বেদে এমন কিছুই ছিল না ও নাই যে অধুনাতন ইংরেজী চিকিৎসার সহিত প্রতিযোগিতা পূর্ব্বক নিজ গৌরব রক্ষা করিতে পারে; এবং ইহাই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ মাত্র। আমরা এক্ষণে আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির

কয়েকটী প্রকৃত কারণ দর্শাইয়া অদ্যকার প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

আমরা আয়ুর্ব্বেদের অবনতির চারিটী কারণ দেখিতে পাই। প্রথম সংস্কৃত ভাষার পতন। দ্বিতীয় বৈদেশিক রাজশাসন। তৃতীয় আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষেপসাধন। চতুর্থ ভ্রান্তি-পূর্ণ অনুবাদ প্রচলন।

(১) সংস্কৃত ভাষার পতন আয়ুর্ব্বেদের অবনতির প্রথম কারণ। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরাজগণের নিকট ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপকগণের অসাধারণ সম্মান ও যথোচিত বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। কি রাজা কি সাধারণ লোক,পিতা মাতার পারলৌকিক ক্রিয়া, কি পুত্রাদির উৎসব,কি বার্ষিক দেবার্চ্চনাদি, যে কোন প্রকার কার্য্য হউক অধ্যাপকগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দান করিতেন। হিন্দু সমাজে বিদ্যাদানের মূল্যগ্রহণ এবং বিদ্যার্থী ছাত্রকে বিদ্যাদান না করা অত্যন্ত পাপকার্য্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ছাত্র উপস্থিত হইলেই, অধ্যাপক তাহাকে ভোজন ও বাসস্থান প্রদান পূর্ব্বক অভিলষিত শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন। ছাত্র পুত্র তুল্য ও অধ্যাপক পিতৃসম—এই ধর্ম্মভাব সাধারণের মনে নিহিত ছিল। তৎকালে বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত সাধারণের কোন প্রকার পৃথক্ সাহায্য করিতে হইত না। এক মাত্র ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য ধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া, যে কর্ম্ম করিত তাহাতেই শিক্ষাকার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইত।

কাল সহকারে দুরাত্মা যবনগণ হিন্দু রাজগণকে পরাভূত করিয়া হিন্দুদিগের অমূল্যরত্ন স্বরূপ গ্রন্থরাশি ও তদ্ব্যবসায়ীগণের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হয়, এবং নানাবিধ অত্যাচার দ্বারা হিন্দুগণকে নিজ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে যত্ন করে। পূর্ব্বতন রাজগণের নিকট অধ্যাপকগণ অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। যবন রাজগণের নিকট সম্মানের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের অত্যন্ত বিদ্বেষ-ভাজন হইয়া জাতি ও প্রাণের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিতভাবে কালযাপন করিতে হইত। এই সময় কি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি আয়ুর্ব্বেদ সমুদায় শাস্ত্রের আলোচনার নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে। যবনগণ হিন্দুদিগের শাস্ত্রালোচনা রহিত করিয়াই যে নিশ্চিন্ত রহিল এমন নয়, তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। অমূল্য রত্ন-স্বরূপ হিন্দুশাস্ত্র-লিখিত পুস্তক সকল ধ্বংস করিতে লাগিল এবং যাহাতে দেবভাষা সংস্কৃতের বিলোপসাধন হইয়া সর্ব্বতোভাবে তাহাদের জাতীয় আরবী পারসী ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত ও আদৃত হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হইতে লাগিল। এই প্রকারে দুর্বৃত্ত যবনগণের অত্যাচারে হিন্দু রাজগণের অবনতির সহিত সংস্কৃত চর্চ্চারও প্রায় বিলোপ-সাধন হইয়া উঠিল।

ইংরাজের আমলে রাজবিদ্যা ইংরেজী; ইংরাজগণ সর্ব্বদা ইংরেজী বিদ্যার উন্নতি

সাধনে কৃত-সঙ্কল্প। সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য ইহাঁদিগের যে যত্ন তাহা নাম মাত্র। ইংরাজী শিক্ষা ভিন্ন কোন প্রকারে রাজ প্রসাদ লাভের প্রত্যাশা না থাকায় সাধারণও কোন প্রকারে সংস্কৃত শাস্ত্রের উন্নতিবিধানে যত্নবান নহেন। আজ কাল আমরা সংস্কৃত-চর্চ্চার যে কথঞ্চিৎ প্রাবল্য দেখিতে পাই, তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় সমুচিত নহে। ইহাতে পূর্ব্বরীতি অনুযায়ী সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাওয়াতে সংস্কৃত চর্চ্চার অল্পতা হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ব্যাকরণে সম্যক ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে আয়ুর্ব্বেদ পাঠে অধিকার জন্মে না। বৈদ্যগণ প্রায়ই ব্রাহ্মণ উপাধ্যায়ের নিকট টোলে ব্যাকরণ, সাহিত্য ও ন্যায়াদি প্রভৃতি বিনা ব্যয়ে অধ্যয়ন করিয়া, সংস্কৃতে উত্তম ব্যুৎপন্ন হইয়া বৈদ্য অধ্যাপকের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যবন হস্তে আয়ুর্ব্বেদের অনেকগুলি গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে; অবশিষ্ট যে দুই চারিখানি সংহিতা ও সংগ্রহ আছে, সংস্কৃত-চর্চ্চার অল্পতা হওয়ায়, তাহার অধ্যয়নও অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে। এইটি আয়ুর্ব্বেদের অবনতির প্রথম কারণ।

(২)। আয়ুর্ব্বেদের অবনতির দ্বিতীয় কারণ, ভারতে বৈদেশিক রাজশাসন। সংসারের নিয়মই এই যে, দেশের উন্নত ব্যক্তিগণ যে বিষয়ে যত্ন প্রদর্শন করেন, সে বিষয় সদোষ হইলেও সাধারণের মন সেই দিকে আকৃষ্ট হয়। যখন ভারতে হিন্দু রাজগণের প্রবল প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল, তখন তাঁহারা যাহা করিতেন সাধারণ ভারতবাসীর পক্ষে তাহাই অনুকরণীয় ছিল। কালসহকারে রাজলক্ষ্মী তাঁহাদের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দুরাত্মা যবনগণের আশ্রিত হইলেন। যবনগণ ভারতের রাজা ও সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিল; সুতরাং তখন আবার তাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের ভাষা, তাহাদের চিকিৎসা, ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় হউক, সাধারণের আদরের হইয়া উঠিল। আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবেই বলিয়াছি, অনুদার যবনগণের ধর্ম্ম বিগর্হিত আচরণে আর্য্যগণের অপার চিন্তা লব্ধ পরিশ্রমের ধন বহুমূল্য গ্রন্থ রাশি বিলুপ্ত হয়। এই সময় হইতেই আয়ুর্ব্বেদের অবনতির সূত্রপাত হইল। যবনগণ আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তারের সহিত জাতীয় ভাষা ও ধর্ম্মের বহুল প্রচলনে যত্নবান হইল; পরিবর্ত্ত স্বভাব কালের প্রসাদাৎ তাহাদের অভীষ্টও অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হইল। সংপ্রতি ইংরেজ আমাদের রাজা, অতএব ইংরেজী চিকিৎসার স্বভাবতই আমাদের সাধারণের অধিক ভক্তি হওয়ার সম্ভব। বিশেষতঃ ইংরেজী চিকিৎসা-প্রণালী ক্রমে সংস্কৃত হইয়া এখন যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাংশে না হইলেও বিষয় বিশেষে তাহার উপর ভক্তি হওয়ার অনেক কারণ আছে।

ইংরেজী চিকিৎসার সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া, প্রাধান্য রক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজী চিকিৎসা রাজবলে বলীয়সী, ইংরেজী চিকিৎসা শিক্ষার জন্য রাজপুরুষগণ প্রতিবৎসর অকাতরে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়, পারদর্শী ছাত্রগণকে উৎসাহার্থ বৃত্তি, পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে স্থূল বেতনে রাজ সংসারে চাকরি-প্রদান—ইত্যাদি বহু প্রকারে ইংরেজী চিকিৎসার উন্নতি-বিধান করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। আর বাঙ্গালা চিকিৎসা দেশীয় কয়েকজন দরিদ্রের হস্তে ন্যস্ত। ইহাদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় কাহার জয়লাভের সম্ভাবনা, বিচারক পাঠক অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। ইংরেজী চিকিৎসা লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ও বৎসরসাধ্য ঔষধ সংগ্রহে কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তিত নহে। শতমুদ্রা ব্যয়ের প্রয়োজন হইলে দরিদ্র আয়ুর্ব্বেদকে দশদিক্ শূন্য দেখিতে হয়। পূর্ব্বে দেশের ধনীগণের বাটীতে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী চিকিৎসকগণ বেতন পাইতেন এবং ঐ সকল ব্যক্তির প্রয়োজন বশতঃ তাহাদের ব্যয়ে, বহুব্যয়-সাধ্য ঔষধ প্রস্তুত হইত। অনেক সময় এক এক জন সম্পন্ন ব্যক্তির নিমিত্ত ও ঔষধ পরিবর্ত্তনের অনুরোধে প্রধান প্রধান পাঁচ সাতটি ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইত। তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনোপযোগী ঔষধ ভিন্ন সমুদায়ই বৈদ্যগণ ইচ্ছানুরূপ দান ও বিক্রয় করিতে পারিতেন। এইরূপ অর্থব্যয়ে অর্থপ্রদাতা ধনীগণ কিঞ্চিন্মাত্র বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া, নিজ উদ্দেশ্যে প্রস্তুত ঔষধ দ্বারা অপরের রোগ প্রতিকার হইল তজ্জন্য পুণ্যের অংশী হইবেন বোধে, বিশেষ সন্তোষ লাভ করিতেন। ইহাতে বৈদ্যগণের ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুবিধা ও যথোচিত অর্থাগম হইত। কিন্তু এক্ষণে আর এ রীতি প্রচলিত নাই।

ইংরেজ শাসনে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসায়কুশল ইংরেজ চিকিৎসকগণ রাজ-সাহায্যে অধিকতর উৎসাহী হইয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন; তাঁহারা অনেকেই স্বয়ং ধনী এবং স্বজাতি ও রাজসহায়ে বিলক্ষণ সম্পন্ন। বৈদ্যগণের ন্যায় রোগীর প্রতি ঔষধ প্রস্তুতের ব্যয়-ভার অর্পণ না করিয়া, তাহার নিজ ব্যবহারোপযোগী ঔষধের মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ সংগৃহীত ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হইত, এ প্রণালীতে তাহা হইতে অনেক অল্পব্যয় হইতে লাগিল। ব্যয়ের সংক্ষেপ ও ঔষধ প্রস্তুত করণের কাল অপেক্ষা না করিয়া যথাকালে ঔষধ প্রাপ্তিতে সহসাই লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া, ক্রমে পূর্ব্ব প্রণালীর প্রতি আগ্রহ কমিয়া আসিল। বৈদ্যগণও ঔষধ প্রস্তুত সম্বন্ধে ধনীগণের নিকট যে সাহায্য পাইতেন, ইংরাজী

চিকিৎসার প্রাদুর্ভাবে ক্রমে তাহাও রহিত হইয়া আসিল।

অধুনাতন কালে ইংরাজী চিকিৎসাই রাজচিকিৎসা। কোন রাজকর্ম্মচারী রোগাক্রান্ত হইলে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় তাহার সম্পূর্ণ ভক্তি থাকিলেও তিনি যে রোগ হওয়া গতিকে কার্য্যে অনুপস্থিত, উপরিতন কর্ম্মচারীকে ইহা জ্ঞাপন হেতু অগত্যা তাঁহাকে রাজনিয়ম অনুসারে ইংরাজী চিকিৎসকের সার্টিফিকিট জন্য তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এক প্রয়োজন-সাধনের দুইটী উপায় থাকিলে উভয়ের উপর সমান শ্রদ্ধা থাকা অসম্ভব, সুতরাং যাহাদ্বারা সর্ব্বদা উদ্দেশ্য সমগ্র সাধিত হয়, তৎপ্রতি ভক্তির আধিক্য স্বাভাবিক। উল্লিখিত কারণে অনেকের ডাক্তারি চিকিৎসার প্রতি অধিক আগ্রহ হইয়াছে এবং দেশীয় চিকিৎসার প্রতি আদরের লঘুতা জন্মিয়াছে। যে ব্যবসায়ের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা না থাকে তাহার অবনতি অবশ্যম্ভাবী।

আজ যদি ভারতের রাজমুকুট হিন্দু রাজগণের শিরে সুশোভিত থাকিত, সার্দ্ধ পঞ্চশত বৎসর পর্য্যন্ত স্বেচ্ছাচারী যবনগণ কর্ত্তৃক ভারত বিমর্দ্দিত না হইত, এবং সার্দ্ধশত বৎসর পর্য্যন্ত ভারত যদি শ্বেতদ্বীপবাসী মহাপুরুষ গণের আজ্ঞাপেক্ষী হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে কখনই ভারতের এবং ভারতের অতুলনীয় ধন—আয়ুর্ব্বেদের আজ এ দুর্দ্দশা হইত না। প্রথমে মুসলমান রাজগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদিগের অন্যান্য শাস্ত্রের সহিত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের প্রতি উৎপীড়ন, তৎপরে ইংরেজ রাজশাসনে তাহাদের জাতীয় চিকিৎসারই উন্নতি সাধন—এই উভয় বংশীয় রাজগণের ভারত-শাসনই ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের অবনতির দ্বিতীয় কারণ।

(৩) আয়ুর্ব্বেদের অবনতির তৃতীয় কারণ নানা প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষেপ-সাধন। প্রথমতঃ মুসলমানদিগের উৎপাতে আয়ুর্ব্বেদীয় বহু গ্রন্থ বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বাপর বলিয়া আসিতেছি। তদ্ব্যতীত যাহা ছিল তাহাও আমাদিগের সংগ্রহকারদিগের দোষে অনেক বিলুপ্ত হইয়াছে। তাঁহারা আমাদিগের আয়ুঃ, স্মৃতি ও সহিষ্ণুতার খর্ব্বতার সহিত মহাসমুদ্র সদৃশ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেরও খর্ব্বতা করিয়া অধুনা রেখা মাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। আমরা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম, কোন এক মহাত্মা ডিমাই দুই কি তিন ফরমা আকারে অতি ক্ষুদ্রতম পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহার নাম রাখিয়াছেন—চিকিৎসার্ণব। নামটী কেমন জাঁকাল! আরও দুঃখের বিষয় চিকিৎসার্ণব খানি এককালে ভ্রমার্ণব।

আয়ুর্ব্বেদে কথিত আছে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রজা-সৃষ্টির পূর্ব্বে লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদ রচনা করেন। অধুনা সহস্র শ্লোক-পূর্ণ কোন আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্

ধন্বন্তরী পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া, প্রধানতঃ ঔপধেনব, বৈতরণ, ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, গোপুর রক্ষিত, করবীর্য্য সুশ্রুত, নেমীকাঙ্কায়ণ, গার্গ, গালব, এই একাদশ জনকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। অধ্যাপনান্তে ইঁহারা প্রত্যেকে এক এক খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন; এবং মহামুনি পুনর্ব্বসু, অগ্নিবেশ, ভেল জতুকর্ণ, পরাশর হারীত ও ক্ষারপাণী—এই ছয়জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দেন। ইঁহারাও ছয় জনে কৃতবিদ্য হইয়া ছয় খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্ম-খণ্ডে আরও ষোল খানি চিকিৎসা গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আমরা প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে আর সে সকলের নামোল্লেখ করিলাম না। এই ত্রয়োত্রিংশৎ খানী গ্রন্থের মধ্যে আমরা কেবল সুশ্রুত-কৃত সুশ্রুত ও অগ্নিবেশ কৃত চরক এই দুই খানি মাত্র সংহিতা দেখিতে পাই। তাৎকালিক অন্যান্য সকল গ্রন্থই হিন্দুদিগের দুরাদৃষ্টের সহিত অদৃশ্য হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা দুই খানি মাত্র সংহিতা দেখিতে পাই। কয়েক খানি সেই সংহিতা হইতে সংগৃহীত। আর কতক গুলি সেই সংগ্রহের উপসংগ্রহ মাত্র। সংহিতা গুলি একে ত দুর্ব্বোধ সংস্কৃত ভাষায় রচিত, তাহাতে আবার দীর্ঘায়তন এবং উপযুক্ত আচার্য্যের উপদেশ সাপেক্ষ। সুতরাং মূল সংহিতা-অধ্যয়ন অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কেহ দুই এক খানি সংগ্রহ; অনেকেই দুই তিন খানি উপসংগ্রহ মাত্র অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ মহাসাগরের পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং এবম্বিধ অল্পাধ্যায়ী চিকিৎসক গণের হাতে পড়িয়া আয়ুর্ব্বেদ যে বিকলাঙ্গ ও অঙ্গহীন হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

বর্ত্তমান সময়ে যে সকল আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে অম্বষ্ঠকুল-সম্ভূত ভিষগ্বর মাধবকর-সংগৃহীত রোগ-বিনিশ্চয় (অধুনা যাহা নিদান নামে খ্যাত) নামক গ্রন্থই অধিকাংশ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের প্রধান অবলম্বন। এই পুস্তক মূল আয়ুর্ব্বেদের উপসংগ্রহ মাত্র। উপসংগ্রহকার গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছেন যে, তিনি 'সদ্বৈদ্যদিগের আদেশানুসারে নানা মুনির বচন সকল সংক্ষেপে এই রোগবিনিশ্চয় গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন'; এবং 'এই গ্রন্থ নানা শাস্ত্র বিহীন অল্প মেধাবান্ চিকিৎসকদিগের রোগজ্ঞানের পক্ষে সুখকর হইবে।' চিকিৎসা পুস্তকের সংক্ষেপ-সাধনই অবনতির এক প্রধান হেতু। উপসংগ্রহকার যে কয়েকটী রোগের নিদান ও লক্ষণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে মূল পুস্তক হইতে অনেক লক্ষণাদি পরিত্যাগ করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ জ্বররোগ মাত্র গ্রহণ করিলাম। সুশ্রুতে জ্বর রোগের কারণ

অনেক লিখিত আছে। মাধব কর কেবল মাত্র মিথ্যা আহার বিহারকেই জ্বর রোগের হেতু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সন্নিপাত জ্বরের ত্রয়োদশ প্রকার নাম ও লক্ষণ চরকে বর্ণিত আছে। মাধব কর সাধারণ এক প্রকার লক্ষণ মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই প্রকার তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকে মূল হইতে অনেক কারণ ও লক্ষণাদি পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা এই মাধবকৃত নিদান অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা জানেন না যে, আয়ুর্ব্বেদে কোন্ পীড়ার কারণ ও লক্ষণাদি কতদূর ব্যক্ত আছে। আয়ুর্ব্বেদ তাঁহাদের নিকট অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া জ্ঞান থাকে। তাঁহারাও লোকের নিকট আপন জ্ঞান পরিমিত পরিচয় দেন। এবম্প্রকারে আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তির লঘুতা জন্মিয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বহু কাল পর্য্যন্ত শস্ত্র চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়াছেন। অস্ত্রচিকিৎসায় বিশেষ সাবধানতার আবশ্যক। অনবধানতা কিম্বা দৈবাৎ অথবা অক্ষমতা, যে কোন কারণে হউক, স্থান বিশেষে অস্ত্র পাতের বিসদৃশ হইলে রোগীর প্রাণবিনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুতরাং অস্ত্রচিকিৎসা করিতে গেলে প্রাণী-হত্যার আশঙ্কা আছে, এবং অত্যন্ত গুরুতর পাপজনক কার্য্য, স্ত্রীহত্যা, ব্রহ্মহত্যাও হইতে পারে। এই পাপ ভয়ই অস্ত্রপরিত্যাগের কারণ বলিয়া প্রচারিত। ইহা ভিন্ন অস্ত্র পরিত্যাগের অন্য কারণ আছে কি না তাহা আমরা জানি না। যাহাই হউক, অস্ত্র-পরিত্যাগই যে আয়ুর্ব্বেদের মান হানির একটী প্রধান কারণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। মনে করুন, কোন ব্যক্তির আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি আছে, বৈদ্যগণকে যথোচিত সম্মান করেন, ডাক্তারদিগের প্রতি বিদ্বেষ আছে, কিন্তু শস্ত্রসাধ্য কোন রোগ হইলেও তাহাকে ইংরাজী চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে একদিকে আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসার প্রতি তাহার ভক্তির লঘুতা জন্মে, এবং অপর দিকে ইংরাজী চিকিৎসার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

আজ কাল অনেকগুলি বৈদ্যসন্তান অন্যদিকে থাকিয়া কোন প্রকার কিছু সুবিধা না হইলে, অগত্যা পৈতৃক চিকিৎসা পুস্তক খুলিয়া বসেন। মূলগ্রন্থে হস্তক্ষেপ অসাধ্য, সুতরাং তাহার উপর, কি পার্শ্বে যে দুই চারি খানি জায় পাওয়া যায়, তদনুসারে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ পূর্ব্বক পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বনাশ করিতে বসেন। ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও অপরাপর নিম্ন শ্রেণীর অনন্যোপায় ব্যক্তিগণ কোন স্থান হইতে দুই সপ্তাহের লক্ষ্মীবিলাস কোন স্থান হইতে দুই সপ্তাহের মৃত্যুঞ্জয়, কোথা হইতে পাঁচ খানি জায় সংগ্রহ করিয়া

চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বসেন, ও আয়ুর্ব্বেদের শেষ আহুতি প্রদান করিতে থাকেন। একদিকে উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অল্প, অপর দিকে অজ্ঞলোকেরা সর্ব্বদা 'আমাদের আয়ুর্ব্বেদে এ রোগের কোন ঔষধ নাই' ইত্যাদি নিজ অক্ষমতা গোপন পূর্ব্বক আয়ুর্ব্বেদের উপর সমস্ত দোষ অর্পণ করিতে লাগিল। এমন অবস্থায় এখনও যে কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে, ইহাই তৎপ্রকাশক পূর্ব্ব আর্য্যগণের পুণ্যফল বলিতে হইবে।

(৪)। আয়ুর্ব্বেদের অবনতির চতুর্থ বা শেষ কারণ ভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ-প্রচলন। আজ কাল আয়ুর্ব্বেদের যে প্রকার অনুবাদ হইতেছে, ইহাও যে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির একটী অসামান্য কারণ,তাহার আর সন্দেহ নাই। এই অনুবাদ করিতে আয়ুর্ব্বেদ-অধ্যয়ন করার প্রয়োজন নাই; সংস্কৃত শাস্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র ব্যুৎপত্তি থাকিলে, ও মুদ্রাঙ্কিত করার ব্যয় সংগ্রহ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ আজ কাল অস্বামিক মহার্ঘ রত্ন। রত্নজীবী ভিন্ন কাচ বিক্রেতার হস্তে রত্নের যে প্রকার দুর্দ্দশা হয়, অশিক্ষিত অব্যবসায়ীর হাতে পড়িয়া আজ আয়ুর্ব্বেদের সেই দুর্দ্দশা হইয়াছে। বিলুপ্ত হইয়াও আয়ুর্ব্বেদের যাহা আছে তাহা অবিকৃত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনুবাদকগণের হাতে পড়িয়া তাহা আবার বিকৃতাঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে। অনুবাদকগণ অনেক স্থানে রামকে শ্যাম করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদের মনের বিশ্বাস এই যে, তাঁহারা দেশের হিতসাধন করিতেছেন; কিন্তু তাঁহাদের একবার ভাবিয়া দেখা উচিত,যে কোন বিষয়ই হউক না কেন অন্যথা প্রকাশিত হওয়া অপেক্ষা অপ্রকাশিত হওয়াও ভাল। অপ্রকাশিত থাকায় তদ্দ্বারা কোন উপকার পাওয়া যায় না—এইমাত্র অনিষ্ট: কিন্তু অন্যরূপ প্রকাশিত হইলে উপকারের প্রত্যাশা দূরে থাকুক, বরং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনা। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদের বিষয় কোন প্রকার অন্যথা হইলে লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা।

একটী ঔষধে দশটী দ্রব্য উক্ত আছে, ইহার মধ্যে কোনটীর অর্থ অন্যথা অনুবাদিত হইলে ঐ ঔষধে কোন উপকার দর্শেনা, সময় বিশেষে প্রাণহানির সম্ভব হইতে পারে। ঔষধ ভিন্ন অন্যবিধ অনুবাদ স্থানেও অনুবাদকর্ত্তা গ্রন্থের মর্ম্মাববোধে অসমর্থ হইয়া ভ্রমপূর্ণ অনুবাদ করিলে, আয়ুর্ব্বেদের উপর সাধারণের যে কিঞ্চিৎ ভক্তি আছে ঐ ভ্রমদর্শনে তাহারও অল্পতা হইতে পারে।

এযাবৎ যতগুলি অনুবাদিত আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, আক্ষেপের বিষয়, আমরা ইহার একখানিও প্রমাদশূন্য দেখিতে পাইলাম না। অনেকগুলির আর প্রতিবাদ না করিয়া একখানি নূতন অনুবাদ প্রকাশ করিলে প্রকৃত হয়। আমরা অধিক দৃষ্টান্ত দ্বারা পাঠকগণকে বিরক্ত করিতে চাই না,

একটী মাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম, দেখিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যেমন চমৎকার অনুবাদ হইয়াছে।

সিবিল সার্জ্জন বাবু উদয়চাঁদ দত্ত মহাশয় পূর্ব্বোক্ত রোগ-বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। উক্ত গ্রন্থে উদর রোগের অরিষ্ট লক্ষণের একস্থানে লিখিত আছে :—

বিরিক্তাঞ্চাপ্যুদরিণাং পূর্য্যমানংবিবর্দ্ধয়েৎ

ইহার অনুবাদ এই প্রকার হওয়া উচিতঃ—বিরেক প্রাপ্ত হইয়াও অর্থাৎ যাহাকে (যে উদর-রোগীকে) দাস্ত দিলেও অবিলম্বে উদর পুনঃ-পূর্ণ হয় তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন অর্থাৎ তাহার রোগ অসাধ্য। উদয় বাবু এস্থানে অনুবাদ করিয়াছেন 'সেই রোগীকে (অর্থাৎ সেই উদররোগীকে) সম্বিবেচক ও পূজামান হইলেও বৈদ্য ত্যাগ করিবেন'। পাঠক দেখুন এস্থানে উদয় বাবু রামকে শ্যাম করিয়া তুলিয়াছেন কি না? আমরা অনুবাদককে জিজ্ঞাসা করি, তিনি কোন্ কোন্ শব্দের অর্থ সম্বিবেচক ও পূজামান অনুবাদ করিয়াছেন? অধুনা একেত আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের অনাস্থা, তাহাতে আবার এবম্বিধ ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থ বিস্তর প্রকাশ হইতেছে; ইহাও যে আয়ুর্ব্বেদ-অবনতির একটী কারণ তাহার আর সন্দেহ নাই।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

নাস্তিকতা।

কার্য্য-কারণ-অনুমান।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

মিল যে রূপে আদি কারণের অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন, আমাদিগের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে অদ্য তাহা গ্রহণ করিলাম। তিনি প্রথমে জড় জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, জড় অতীত কোন পৃথক্ শক্তি যে তাহার আদি কারণ হইবে এরূপ সম্ভব হয় না; তৎপরে মনোজগতের বিচারে দেখিলেন, সেই মন হইতেও ঐশ্বরিক মনকে তাহার স্রষ্টা রূপে অনুমান করা যাইতে পারে না। অতএব, সিদ্ধান্ত হইল কোন প্রকার যুক্তি অবলম্বনে জগদতীত কোন অলৌকিক শক্তি জগতের আদি কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হয় না। প্রথমে জড় জগৎ দেখ।

১। কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, একথা স্থির; কিন্তু কার্য্য কাহাকে বলে? আমরা মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলি

এবং বৃষ্টিকে মেঘের কার্য্য বলি। আমরা জানি মেঘ বাষ্পময়, এই বাষ্প শীতল হইয়া ক্রমে ঘনীভূত হইয়া আইসে; তৎপরে যখন বিদ্যুৎ-বলে সেই বাষ্পের সহিত বায়বীয় অক্সিজিনের রাসায়নিক মিলন সংঘটিত হয়, তখন তাহা বৃষ্টির আকার ধারণ করে, এবং সেই বৃষ্টি পার্থিব আকর্ষণে ভূতলে পতিত হয়। এই ঘটনাকে আমরা কার্য্য বলি। সূক্ষ্ম রূপে বিচার করিতে গেলে প্রতীত হয়, যতক্ষণ এই ব্যাপার ঘটিতেছে, ততক্ষণ তাহা একটি কার্য্য, এবং সেই কার্য্যের কারণ হাইড্রোজিন, অক্সিজিন, বিদ্যুৎ এবং আকর্ষণ-শক্তি। ঘটনাই যখন কার্য্য হইল, তখন দেখ, ঘটনা আর কিছুই নহে, তাহা পরিবর্ত্ত ও পদার্থের অবস্থান্তর মাত্র। অতএব ঘটনাও যাহা, পরিবর্ত্তও তাহা। কার্য্য তবে আর কিছুই নহে, তাহা পরিণাম মাত্র। কারণ-পদার্থের পরিণামই যদি কার্য্য হইল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে কারণ-পদার্থে দুই প্রকার উপকরণ আছে। এক প্রকার উপকরণ নিত্য ও অপরিণামী, অন্যবিধ উপকরণ অনিত্য ও পরিণামী। দেখ, বৃষ্টি-বারিকে তুমি কার্য্য রূপে পাইয়াছ। তুমি জান, সেই বারি অক্সিজিন ও হাইড্রোজিন সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই বারিকে যখন তুমি পুনরায় বিশ্লেষণ করিবে, তখন তুমি সেই অক্সিজিন ও হাইড্রোজিনকে আবার স্বতন্ত্র রূপে প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সেই অক্সিজিন ও হাইড্রোজিনে এমত একটি নিত্য সাধর্ম্ম্য আছে যাহা সংযোগে ও বিয়োগে বিনষ্ট হয় না; সেই জন্য অক্সিজিন এবং হাইড্রোজিন চিরকাল একই পদার্থ রহিয়াছে। ইহাই নিত্য বস্তু। যে গুণে অক্সিজিন এবং হাইড্রোজিন একত্রে সংযুক্ত হইয়া জল রূপে পরিণত হইল, তাহাই তাহাদিগের পরিণামী ভাব। এই পরিণামী ভাবের জন্য বস্তুর অবস্থান্তর বা পরিবর্ত্ত ঘটে, কিন্তু যে বস্তুর এই প্রকার অবস্থান্তর ঘটে তন্মধ্যস্থ নিত্যবস্তু অব্যাহত থাকে।

সাংখ্য-দর্শনেও বস্তুর এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহা নিত্য ধর্ম্ম তাহা 'অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম' নামে অভিহিত হইয়াছে। যাহা আইসে না,—যায়ও না—যাহা চিরকালই থাকে—তাহার নাম অনাগমাপায়ী ধর্ম্ম। ইহার অন্য নাম 'স্বভাব'। যে ধর্ম্ম থাকাতে বস্তু সকল পরিণামপ্রাপ্ত হয় তাহাকে দর্শনশাস্ত্রে 'বিকরণ-যোগ্যতা' কহে। এই দ্বিবিধ ধর্ম্ম থাকাতে বস্তু সকল নিজ নিজ স্বভাব রক্ষা করিতেছে অথচ নানা রূপে পরিণত হইয়া জগতের বিচিত্রতা এবং অসংখ্য পরিণাম ঘটাইতেছে। এই পরিণামের বিয়োগ অথবা বিশ্লেষণ ঘটিলে আবার সেই নিত্যবস্তু স্বতন্ত্র হইয়া স্বকীয় স্বভাবে আইসে। অতএব, জড়পদার্থ মাত্রেই নিত্য এবং পরিণামী উভয় উপকরণই বিদ্যমান আছে। যখন কোন কার্য্যোৎপন্ন হয়, তখন এই পরিণামী

ধর্ম্ম হেতু পদার্থের অবস্থান্তর হয় মাত্র। এক্ষণে দুইটি বিষয় পরিষ্কার হইয়া আসিল।

(ক) জড় কারণ পদার্থে পরিণামী এবং নিত্য উপকরণ বিদ্যমান আছে।

(খ) কার্য্য মাত্রই উৎপন্ন এবং সাদি। এখন বিচার্য্য এই, জড়পদার্থে যে সমস্ত নিত্য উপকরণ আছে, তাহা সাদি কি অনাদি? এই নিত্য উপকরণকে সাদি বলা আমাদের জ্ঞানাতীত। আমাদের জ্ঞানে যাহা সাদি রূপে প্রতীত হয় না, তাহাকে আমরা কখন সাদি বলিতে পারি না; যাহাকে সাদি বলিতে পারি না, তাহাকে কার্য্য নামেও অভিহিত করিতে পারি না। তাহাকে অবশ্য কারণ-বিরহিত অথবা (Uncaused) অহেতুক বলিতে হইবে। অতএব, নশ্বর পরিণামী এবং অনিত্য ভাব হইতে যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ সংঘটিত হয়, তাহা পদার্থের অপরিণামী এবং নিত্য স্বভাবে আরোপ করা অন্যায়। কি অনুমান, কি উপমান, কোন ন্যায় যুক্তিতে ইহা সিদ্ধ নহে।

২। এখন সিদ্ধান্ত হইল যে, কার্য্য-কারণ অনুমান সমগ্র জড়জগতে আরোপ করা যায় না। এই অনুমান কেবল তাহার পরিণামী ঘটনা পুঞ্জে বর্ত্তিতে পারে। এই সমস্ত ঘটনা পরিবর্ত্ত মাত্র এবং কার্য্য-কারণ-সূত্রে সংগ্রথিত। আমরা দেখিতে পাই, একটী পরিবর্ত্তের কারণ-রূপে যাহা নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহারও নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য একটী পরিবর্ত্তন। বৃষ্টির কারণরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী যেমন মেঘ, মেঘেরও কারণরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্য তাপোৎপাদিত সামুদ্রিক বাষ্প। বৃষ্টি মেঘের কার্য্য বটে, কিন্তু মেঘও আবার অন্য কারণের কার্য্য। এইরূপে জড়জগতে পরিবর্ত্তের পর পরিবর্ত্ত ঘটিয়া আসিতেছে। যে হেতু, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ যদি নূতন ঘটনা না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কার্য্য কখন নূতন হইতে পারে না। পূর্ব্বে কোন পরিবর্ত্ত না ঘটিলে, পরে কোন পরিবর্ত্ত ঘটিতে পারে না। নূতন পরি-বর্ত্তের কারণকে অবশ্য নূতন পরিবর্ত্ত হইতেই হইবে। যে হেতু, কারণস্বরূপ নব পরিবর্ত্ত না হইলে কার্য্য-স্বরূপ নব পরিবর্ত্ত কেন ঘটিবে? অতএব, যদি কারণ-রূপ পরিবর্ত্ত অনন্তকাল ব্যাপিয়া থাকে, তবে কার্য্যরূপ পরিবর্ত্তও অনন্তকাল আছে; এবং কার্য্যরূপ পরিবর্ত্ত-স্রোত যদি চিরকাল হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে কারণরূপ পরিবর্ত্তস্রোতও চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। তবে এ স্রোতের আদি কোথায়, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই কার্য্য-কারণ-সূত্র এইরূপ অনুমানে আসিয়া পড়ে:—

(ক) সকল কার্য্যতত্ত্ব যেমন সাদি;

(খ) সকল কারণতত্ত্বও তেমনি সাদি।

কিন্তু তোমরা আদিকারণ কাহাকে বল? যদি আদিকারণের অর্থ এরূপ হয় যে, তাহার আর অন্য কারণ নাই সুতরাং সে কারণ আর সাদি নহে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, আমরা যাহাকে কার্য্য-

কারণ সম্বন্ধ বলি, সে সম্বন্ধ কখন আদি-কারণ-অনুমানের সহিত সঙ্গত হইতে পারে না। যে হেতু, আমাদের জ্ঞানে প্রতীত হইয়াছে যে, সকল কারণ-তত্ত্বই সাদি।

৩। যদি আদি কারণ কিছু থাকে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, জড়ের মধ্যে যাহা নিত্য ও অপরিণামী তাহাকে এক দিন আদি কারণ বলিয়া অভিহিত করিলে অন্যায় হয় না। যে হেতু, যদিও এই উপাদান থাকিলেই যে কার্য্যোৎপন্ন হয় এমত নহে, তথাপি এই উপাদান না থাকিলে, অন্য কারণ ব্যর্থ হয়। যেমন, অক্সিজিন এবং হাইড্রোজিন না থাকিলে, বিদ্যুতীয় তাপ একাকী জলোৎপত্তি করিতে পারে না, এবং অক্সিজিন এবং হাইড্রোজিন থাকিলেও বিদ্যুতীয় তাপ ভিন্ন তাহাদের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়া জলোৎপত্তি হইতে পারে না; এই রূপ, যে কোন কার্য্য তুমি বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, অনেক গুলি শক্তি একত্র সংযুক্ত হইলে তবে কার্য্যের উৎপত্তি হয়। আরও প্রতীত হয় যে, এই শক্তি সকলের পরিমাণ বিভিন্ন হইলে এবং তাহারা বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে এবং বিভিন্ন বিভিন্ন বস্তুর সহিত সংযুক্ত হইলে কার্য্যেরও বিভিন্নতা ঘটে। উপাদান-কারণে এই সকল শক্তি চিরকাল নিহিত আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, এই কারণ-পদার্থের এই শক্তি সকল চিরকাল একই রহিয়াছে। তাহারা এক বই দুই নয়, এক বই দ্বিতীয় নয় এবং তাহাদের পরিমাণও নিরূপিত আছে। অতএব, যদি আদি কারণ রূপ পদ কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হয়, তবে এই শক্তিকে এক দিন আদি কারণ বলিলে হানি নাই। যে হেতু, সর্ব্ব কার্য্যাদির মূলে এই শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অথচ এই শক্তির মূল যে কি, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

কাপিল সাংখ্যেও বস্তুর এই আদি শক্তি মূল-প্রকৃতি রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই আদি শক্তিকেই মূল অথবা অব্যক্ত প্রকৃতি কহে। এই শক্তি জন্য যে সমস্ত পরিণাম ঘটে তাহাকে 'বিকৃতি' বলে। বিকৃতি আর কিছুই নহে, ইহা প্রকৃতিরই অবস্থান্তর মাত্র। এই অব্যক্ত অথবা মূল প্রকৃতির সাধর্ম্ম্য সাংখ্য দর্শনে এই রূপ বর্ণিত আছেঃ—

এতদবস্থায় প্রকৃতি অহেতুক (অকারণ) নিত্য (অবিনশ্বর), ব্যাপক (Universal) অনাশ্রিত (নিম্ন পরিণামের যে রূপ কারণ আছে, ইহার আর সেরূপ কারণ নাই) অলিঙ্গ (মূলান্তর থাকার অনুমাপক), নিরবয়ব, অর্থাৎ কারণ নাই বলিয়া কারণান্তরের অনধীন।

কিন্তু আস্তিকেরা বলেন, এই প্রাকৃতিক শক্তির মূল কি, তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন। প্রকৃতিতে যে শক্তির যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা কার্য্যোৎপন্ন হয়, সে-সমস্ত শক্তির কারণ মনঃ। এই

জগতেই প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, ঘট পট গৃহাদির কারণ যখন মনঃবিশিষ্ট মনুষ্য, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, মনই সেই ঘট পটাদির প্রাকৃতিক শক্তির মূল কারণ। আমরা এই জগতেই দেখিতে পাই, প্রাকৃতিক গতি শক্তি এক পদার্থ হইতে অন্য পদার্থে চালিত হইতে পারে, কিন্তু সেই শক্তির মূল কি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতিক শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে, তাহার আদি দেখিতে পাই না। কিন্তু মানসিক কার্য্য মাত্রই আদি বিশিষ্ট, যে হেতু, মনই যে মানসিক কার্য্যের আদি, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। এ তর্ক এই রূপে ব্যক্ত হইতে পারে;—

(ক) মানসিক ক্রিয়াই গতির মূল।

(খ) অন্য কোন কারণ গতি সমুৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে।

(গ) সুতরাং জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে যে গতি বিদ্যমান দেখা যায়, তাহার আদি ও মূল মানসিক কার্য্য।

(ঘ) এই মানসিক কার্য্য মনুষ্যের নহে, তদপেক্ষা অধিকতর শক্তিসম্পন্ন পুরুষের মানস-সম্ভূত। এই শেষোক্ত পুরুষের নাম ঈশ্বর।

এক্ষণে, বিচার করিতে হইবে, এই তর্ক কতদূর পরীক্ষা-সহ। বাস্তবিক, গতির মূল কি মানসিক কার্য্য? আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, কোন কার্য্যই এক মাত্র শক্তি হইতে সমুৎপন্ন নহে। বিজ্ঞানে প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, নানা শক্তির যৌগিক ক্রিয়া জন্য (Conservation of force) কার্য্য উৎপন্ন হয়। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের যাথার্থ্য মনোরাজ্যেও প্রতিপাদিত হয়। যে ইচ্ছা জন্য মানসিক ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সে ইচ্ছা কি নূতন কোন শক্তির সৃষ্টি করে? না, পূর্ব্বকার প্রাকৃতিক শক্তির উদ্রেক এবং পরিচালনা করে? যদি বলে, ইচ্ছা গতি উৎপাদিত করে, তাহা হইল আমরা বলিব, ইচ্ছাদ্বারা কোন মূল শক্তির সৃষ্টি হয় না, কিন্তু পূর্ব্বে যে মূল শক্তি অন্য আকারে বর্ত্তমান ছিল, ইচ্ছা তাহাকে গতিরূপে পরিণত করে মাত্র। আমাদের শরীর মধ্যে যে সকল শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, মন, সেই শক্তিকে উদ্রেক এবং পরিচালনা করে মাত্র। অতএব, মন যদি কখন কারণ হয় তবে অবশ্য বলিতে হইবে, যে শারীরিক শক্তির উদ্রেক এবং পরিচালনার কারণ মন। কিন্তু এতৎসঙ্গে সঙ্গে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইচ্ছার পূর্ব্বে শারীরিক শক্তি সকল বিদ্যমান ছিল। এই সকল শারীরিক শক্তি কিছু মনঃ-সম্ভূত নহে,—মন তাহাদিগকে প্রয়োগ করে মাত্র। সে সকল শক্তির মূল অথবা সৃষ্টির কারণ মন নহে। অতএব, যদি প্রকৃত পক্ষে বিচার করা যায়, তবে প্রতীত হইতে থাকে শক্তিই নিত্য ও আদি কারণ, এবং মন আদি কারণ নহে। এই খণ্ডন-তর্ক এই রূপ অবয়বে আইসে:—

(ক) শক্তির উদ্রেক এবং পরিনামই গতি।

(খ) মন অথবা মনের ইচ্ছা এই গতি উদ্রিক্ত করে মাত্র, সৃষ্টি করে না।

(গ) সুতরাং মন আদি কারণ নহে।

এখন যদি প্রতিপন্ন হয়, মন যেমন শক্তিকে সৃজন করে না, শক্তিও তেমনি মনকে সৃজন করে না। তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হয় যে,শক্তি ও মন উভয়েই সমভাবে নিত্য ও সমসাময়িক। আর, পূর্ব্বে যেমন প্রতিপাদিত হইয়াছে তদনুসারে যদি বল, সত্য, মন যদিও শক্তিকে সৃজন করে নাই, কিন্তু তাহাকে অন্য আকার হইতে গতি রূপে পরিণত করিতে সমর্থ; এবং মন ভিন্ন যদি অন্য কোন তত্ত্ব সে রূপ করিতে সমর্থ, এমত প্রতিপাদিত না হয়, তাহা হইলে ত অবশ্য বলিতে হইবে যে, মন যদিও সেই প্রকৃতিস্থ শক্তিপুঞ্জের সৃষ্টিকারণ নহে, তথাপি এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন শক্তিদ্বারা নিয়মিত ও চালিত, তখন সেই জগৎ-ব্যাপারের মূলে অবশ্য মানসিক ক্রিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রতিবাদীর এই তর্ক গুলি ন্যায়-অবয়বে রাখিলাম;—

(ক) ইচ্ছা (মন), শক্তিকে সৃজন করে না।

(খ) শক্তিও ইচ্ছাকে সৃজন করে না।

(গ) তবে শক্তি ও ইচ্ছা উভয়ই শক্ত এবং নিত্য। আবার:—

(ক) শক্তির উদ্রেককর্ত্রী ইচ্ছা।

(খ) ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কর্ত্তৃত্বে গতি রূপে শক্তির উদ্রেক উৎপন্ন হয় না।

(গ) সুতরাং যে জগতে গতি রূপ শক্তির উদ্রেক রহিয়াছে, তাহার কর্ত্রী অবশ্য ইচ্ছা বলিতে হইবে।

এক্ষণে, এই তর্ক গুলি পরীক্ষা করিয়া দেখ। শক্তির উদ্রেক ইচ্ছা হইতে ঘটে বটে, কিন্তু ইচ্ছা ব্যতীত যে আর কিছুতে সে রূপ উদ্রেক ঘটে না, এমত কথা বলা যায় না। রাসায়নিক ক্রিয়া, বৈদ্যুতিক পদার্থ, তাপ, প্রভৃতি তত্ত্বও ইচ্ছার মত শক্তিপুঞ্জের উদ্রেক করিতে সমর্থ। বৃষ্টি, মেঘ, প্রভৃতি ভৌতিক কার্য্য মাত্রের পরীক্ষায় এই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়। অতএব, অবশ্য বলিতে হইবে, গতি সমুৎপাদনে ইচ্ছা একাকিনী সমর্থা নহে, সে ধর্ম্ম অন্য পদার্থেও বিদ্যমান আছে। যদি এ কথা বল, এই বিদ্যুৎ ও তাপ প্রভৃতি হইতে যে শক্তি বিকাশ পায়, তাহা অন্যত্রলব্ধ, তাহা হইলে ত ঠিক সেই কথা ইচ্ছা সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। যে হেতু আমরা জানি, বাহ্যবায়ু এবং ভক্ষ্যদ্রব্যের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি ইচ্ছাতে বিকাশ পায়। যে শক্তি-প্রভাবে জগতীয় ব্যাপার ও ঘটনাপুঞ্জ ঘটিতেছে, সে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপিয়া এক অনন্ত স্রোতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার আদি ও অন্তের কিছুই ঠিকানা নাই। সুতরাং, একথা ছাড়িয়া দাও। আমরা এখানে শুদ্ধ ইচ্ছা যেরূপে জড়জগতে কার্য্য করে, তাহারই বিষয়

বলিতেছি। নিজে ইচ্ছার কতদূর স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব আছে, নিজে ইচ্ছা স্বাধীন কি না— এখানে সে কথার বিচার হইতে পারে না। এখানে ইচ্ছার কার্য্যাদি ও ফলের বিষয়ই প্রতিপাদ্য। নিজে ইচ্ছা কিরূপে উৎপন্ন হয়, তাহা স্বতন্ত্র বিষয়। তবে এইমাত্র আমরা বলিতে চাহি যে ইচ্ছার ক্রিয়াহেতু যে সকল শক্তির বিকাশ হয়, তাপ প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বেরও ক্রিয়াহেতু সেই সমস্ত শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছার প্রাধান্য আর কই সপ্রমাণিত হয়? যাঁহারা ইচ্ছার স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব মানেন, তাঁহারা হয় বলিবেন, ইচ্ছা কারণ-বিরহিত, সেইজন্য ইহাকে আদিকারণ বলা উচিত। কিন্তু যাঁহারা আবার জড়বাদী, তাঁহারা বলিবেন, জড়পদার্থের শক্তিও কারণ-বিরহিত এবং সেইজন্য আদি-কারণ নামে অভিহিত হইতে পারে; বরং ইচ্ছা-বিশেষের সহিত তুলনায় প্রতীত হয় যে, ইচ্ছা-বিশেষ নিত্য নহে কিন্তু এই জড়পদার্থের শক্তি নিত্য। সুতরাং ইচ্ছা অপেক্ষা এক বিষয়ে শক্তির প্রাধান্য আছে, অবশ্য বলিতে হইবে।

উল্লিখিত খণ্ডন-তর্ক এরূপ ন্যায়-বাক্যে প্রকটিত হইতে পারে

(ক) ইচ্ছা ব্যতীত অন্যান্য কর্ত্তৃত্বেও গতিরূপ শক্তির উদ্রেক জন্মিতে পারে।

(খ) সুতরাং, জগতে যে গতি লক্ষিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ ইচ্ছা (মন) নহে।

আবার

(ক) যদি ঐ অন্যান্য কর্ত্তৃত্বকে সহে-তুক ও জন্য বল, ইচ্ছাকেও তবে সমান জন্য বলিতে হইবে।

(খ) ইচ্ছা যদি স্বাধীন ও অজন্য (অকারণ) হয়, তবে, প্রকৃতির আদ্য-শক্তিও স্বাধীন এবং অজন্য অথবা কারণ-বিরহিত।

বরং

(ক) ইচ্ছা-বিশেষ অনিত্য ও জন্য।

(খ) কিন্তু জড়ের শক্তি নিত্য এবং অজন্য।

উপরে যেসমস্ত খণ্ডন-তর্কের অল্পনা করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যদি আস্তিকতা সাব্যস্ত করিতে হইলে আদিকারণের প্রয়োজন হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে মানবজ্ঞান দ্বারা আস্তিকতা সমর্থিত হইতে পারে না। জড়জগতের আদিকারণ মন নহে, এইরূপ প্রতিপন্ন করিয়া মিল দেখাইয়াছেন যে, মনোজগতের আদিকারণও মন হইতে পারে না। যেহেতু:—

(১)। চেতন জগৎ এবং মনুষ্য যে মন-বিশিষ্ট, সেই চেতনার সদ্ভাব সম্ভা-বিত হইতে গেলে, যদি অন্য একটি অধিকতর শক্তিসম্পন্ন ও বৃহত্তর মনের সদ্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়, তাহা হইলে আর সৃষ্টির নিরাকরণ হইল কই? সোপানের একপদ অগ্রসর হওয়া মাত্র হইল। এই প্রথম মনের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি দ্বিতীয় মন হয়, তবে প্রশ্ন হইতে পারে,

এই দ্বিতীয় মনের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? তার পর দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়, তৃতীয়ের পর চতুর্থ, এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তার পর অনন্ত সৃষ্টিকর্ত্তা আসিয়া পড়ে। আর যদি দ্বিতীয় মনকে অসৃষ্ট ও অনাদি বল, তবে প্রথম মন কেন সেইরূপ না হয়? সুতরাং একবিধ মন অন্যতরের আদি কারণ হইতে পারে না।

(২) যদি বল, যে মন সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা অনন্ত ও নিত্য; কিন্তু মনুষ্যের মন অনিত্য এবং সীমাবদ্ধ। আমরা শুদ্ধ জড় অথবা তাহার শক্তিকে নিত্যরূপে জানিয়াছি; কখন নিত্য মনের জ্ঞান উপলব্ধ হয় নাই। কিন্তু মনে কর, আমরা এইরূপ একটি নিত্য মনের সত্ত্বা কল্পনা করিয়া লইলাম। তাহা হইলে অবশ্য বলিতে হইবে, তুমি শুদ্ধ সৃষ্টির রহস্য নিবারকরণ করিবার জন্য কল্পনা করিলে, আমাদিগের মনের সৃষ্টিকর্ত্তা একটি অনন্ত ও নিত্য মন। তার পর কথা এই, তুমি যে জন্য এই কল্পনা করিলে, সে উদ্দেশ্য কি সাধিত হইল? অনন্তই হউক, আর নিত্যই হউক, মন ব্যতীত আর ত অন্য পদার্থ মনের সৃষ্টিকর্ত্তা হইল না। কিন্তু এক মন যে অন্য মনের উৎপত্তি-কারণ হইতে পারে, এ কথাই তুমি জান না। সুতরাং তোমার রহস্য যেখানকার সেই স্থানেই রহিল। তুমি যে উদ্দেশ্যে কল্পনা করিয়াছিলে, তদ্দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না।

কিন্তু তুমি একটি কথা বলিতে পার, ভূতত্ত্ব-বিদ্যা-দ্বারা জানা যায় যে, এই বিশ্ব-সংসারে প্রাণী এবং মানব সৃষ্টির কাল অপেক্ষাকৃত অধিক নহে। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের সহিত তুলনায় প্রতীত হয় যে, মানব সেদিনকার জীব মাত্র। সুতরাং মানব উৎপত্তি ও প্রারম্ভ আছে। যাহার উৎপত্তি ও প্রারম্ভ আছে তাহা সাদি, এবং যাহা সাদি, তাহার কারণ আছে। কিন্তু ঈশ্বররূপ নিত্য মন-বিশিষ্ট-পুরুষ সম্বন্ধে একথা উক্ত হইতে পারে না।

এস্থলে তুমি এইমাত্র কল্পনা করিলে যে, ঈশ্বরের মন নিত্য এবং অনাদি। কিন্তু সেই মনের সহিত মানব-মনের যে সম্বন্ধ ঘটাইতে চাহ, তাহা তুমি কোন্ যুক্তিতে প্রাপ্ত হও? যদি বল যে, ঈশ্বরের মন নিত্য এবং সেই হেতু অনাদি, তাহা হইলে সেই মন যে অনিত্য এবং উৎপন্ন মনের স্রষ্টা, তাহা তুমি কিরূপ জানিতে পারিলে? মনঃ-দ্বারা মনের সৃষ্টি হইতে পারে, এই তত্ত্ব তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে। যাহা প্রমাণ করিতে হইবে তাহা তুমি ধরিয়া লইতে পার না। মন যে জড়কে সৃষ্টি করিতে পারে, তৎপক্ষে যেমন প্রমাণাভাব, মন আবার অন্য মনকে সৃষ্টি করিবে, তৎপক্ষেও সমান প্রমাণাভাব। তবে বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে এই মাত্র প্রতীত হয় যে, জড় জগৎ প্রথমে বিদ্যমান ছিল এবং চেতন ও মনোজগৎ ক্রমশঃ উৎপন্ন হইয়াছে। এখন যদি বল, চেতন জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? তাহার উত্তর

এই মাত্র হইতে পারে যে, জড় জগৎ যে আদি শক্তির পারিণাম, চেতন জগৎও সেই শক্তির উচ্চতর পরিণাম। যে হেতু, সৃষ্টি-পর্য্যায়ে প্রতীত হয় যে, এই জগতে ক্রমশঃ নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টের পরিণাম ঘটিয়াছে। আমরা নিকৃষ্ট জড়-মৃত্তিকা হইতে উৎকৃষ্ট চেতন-শীল উদ্ভিদ্ জগৎ উৎপন্ন হইতেছে দেখিতে পাই। এই চেতন জগৎ, অচেতন এবং প্রাণী মণ্ডলের মধ্য-স্থিত। প্রাণী জগৎ ক্রমশঃ মানবীয় মনে পরিণত হইয়াছে। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, নিকৃষ্ট এবং নিকৃষ্টতর হইতে ক্রমে ক্রমে উৎকৃষ্ট এবং উৎকৃষ্টতরের উৎপত্তি হইতেছে। বিস্তর প্রমাণে এই সিদ্ধান্ত নিরাকৃত হইয়াছে। আমরা অচেতন অথবা জড় হইতে চেতনের উদ্ভব দেখিতে পাই; কিন্তু চেতন হইতে যে জড়ের উদ্ভব হয় এরূপ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

এই স্থলে মিলের তর্কবাদ শেষ হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন, আদি-কারণের তর্ক ধরিয়া আস্তিকতা প্রতিপন্ন হয় না। তাঁহার প্রধান তর্ক এই যে, যে জড় ও শক্তির আদি নাই তাহার কারণও নাই। এজগতের শুদ্ধ সত্ত্বা দেখিয়া তদতীত ঈশ্বর-সত্ত্বার অনুমান করা যায় না।

কপিলও প্রকৃতির এই রূপ ভাব বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ণয় করিয়াছিলেন। মিল যাহাকে শুদ্ধ শক্তি বলিয়াছেন, কপিল তাঁহাকে মূল, অথবা অব্যক্তপ্রকৃতি বলিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতির এই শক্তি যেমন সমগ্র জগতে বিদ্যমান আছে তেমনি সেই জড় জগতের ক্ষুদ্রতম পরমাণুতেও বিদ্যমান আছে। এই শক্তিপুঞ্জ অব্যক্ত অবস্থায় আছে এবং ব্যক্ত হইয়া জগৎ রূপে প্রতীয়মান হইয়াছে মাত্র। আমরা যাহাকে গতি বিরহিত জড় বলিয়াছি, তাহা আর কিছুই নহে, এই শক্তিরই সমসংস্থান (Equilibrium) মাত্র। এই জগতেরই কারণ আছে; যে হেতু, তাহা শক্তির যৌগিক ক্রিয়ার পরিণাম মাত্র এবং চিরকালই পরিণামী অবস্থায় অবস্থিত। প্রকৃতির শক্তি সেই এক মাত্র কারণ। মিল বলিয়াছেন, যদি আদি কারণ কিছু থাকে, তবে এই শক্তিই, এই নিত্য শক্তিই সেই আদি কারণ এবং যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ব্যক্ত প্রকৃতির ভাব ও গুণ, তাহা অব্যক্ত প্রকৃতির ভাব ও গুণ নহে। যে হেতু ব্যক্ত প্রকৃতি হইতে অব্যক্ত প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কপিলও ঠিক এই কথা বলিয়াছেন।

মিলের সহিত কপিলের প্রভেদ এই যে, কপিল প্রকৃতি রূপে এই জড়শক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা কল্পনা করিয়াছেন, মিল সে রূপ করেন নাই। এই জগৎ কখন মূল প্রকৃতি রূপে ছিল কি না, এবং থাকিতে পারে কি না, তাহা এক স্বতন্ত্র কথা। শক্তির স্বভাব এবং ধর্ম্ম কি তাহা আমরা পরীক্ষায় জানিতে পারি; কিন্তু যে শক্তির বিকাশ এই জগৎ, সেই জগৎ-অনাশ্রিত হইয়া স্বতন্ত্র ভাবে শক্তি কখন

থাকিতে পারে কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা কল্পনায় শক্তির সাধর্ম্ম্য অনুমান করিতে পারি মাত্র। কপিল চিন্তা প্রভাবে যাহা পৃথক্ ভাবে কল্পনা করিতে পারিয়াছেন, তাহার পৃথক সত্ত্বাও অনুমান করিয়া ফেলিয়াছেন। মিল তাহা করেন নাই, তিনি পরীক্ষা জন্য শক্তিকে পৃথক্ ভাবে চিন্তা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু জগৎ ব্যতীত তাহার পৃথক্ সত্ত্বাও আছে একথা বলেন নাই। মিল কোন কল্পনা করেন নাই, তিনি যেমন দেখিয়াছেন, তেমনই ভাবিয়াছেন। কপিলের মূল প্রকৃতির কল্পনার সহিত ইয়োরোপীয় কেয়সের (Chaos) কল্পনার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু উভয়ই কল্পনা মাত্র। আমাদের দর্শনকারগণের মধ্যে কেবল জৈমিনি বলিয়া গিয়াছেন, জগৎ চিরকালই এইরূপ চলিয়া আসিতেছে। তিনিই কেবল জগতের কোনরূপ পূর্ব্বাবস্থা কল্পনা করেন নাই।

এই জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া একজন বহুকালের প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিত (মহর্ষি কপিল) যেস্থানে উপনীত হইয়াছেন, আশ্চর্য্য এই, আজ ইয়োরোপীয় বিজ্ঞানতত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক পণ্ডিত মিলও সেইস্থানে উপনীত হইয়াছেন। কপিল বলিয়াছেন, আমরা এই বিশ্লেষণে পরমাণুপুঞ্জ পর্য্যন্ত যাইতে পারি, তদতীত যাইতে পারি না, কিন্তু এই পরমাণুপুঞ্জ মূল-প্রকৃতি-শক্তিরই পরিণামমাত্র। মিলও দেখাইয়াছেন, আমরা প্রকৃতি বিশ্লেষণে প্রকৃতির শক্তিকেই আদিরূপে দেখিতে পাই, তদতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না। এই শক্তিই আমাদের জ্ঞানের সীমা। এই শক্তি কি, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই শক্তি কত অসংখ্যরূপে প্রকটিত এবং পরিণত হইতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিতেছি। আস্তিকেরাও প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়া এই পর্য্যন্ত জানিতে পারেন। তবে আস্তিকদিগের সহিত নাস্তিকদিগের প্রভেদ এই, নাস্তিকরা বলেন, যখন আমরা এই প্রকৃতির আদি শক্তি কিপ্রকার তাহা জানি না, এবং তাহার শেষ কি তাহাও জানি না, তখন আমরা সেই শক্তির পারে কিরূপে যাইব; এবং তদতীত অন্য একটী বিভিন্ন পুরুষের সত্ত্বা কিরূপে অনুমান করিব? আস্তিকেরা নাস্তিকদিগের এই অজ্ঞানতা ভেদকরিয়া যাইতে চাহিলেন, এবং সেই জন্য এক প্রকৃতি অতীত পুরুষের কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এখন কথা এই, এই কল্পনাদ্বারা কি বাস্তবিক আমাদের অজ্ঞানতার কিছু নিরসন হইয়াছে, না, সৃষ্টিসম্বন্ধে আমরা এই কল্পনার পূর্ব্বে যেমন অনভিজ্ঞ ছিলাম ইহার পরেও তদ্রূপ আছি? এই কল্পনা দ্বারা যদি আমাদের অজ্ঞানতার নিরসন না হইয়া থাকে, তবে সেরূপ কল্পনার আবশ্যকতা কি? যদি আমরা এই সৃষ্টি-রহস্য, ঈশ্বর-কল্পনা দ্বারা বুঝিতে না পারিলাম, তবে আমাদের জ্ঞান যে পর্য্যন্ত যায়, সেই পর্য্যন্ত গিয়াই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কপিঞ্জল।

সন্তাপিনী।

আসিওনা, সহচরি, নিকটে আমার,
ফেলি আমি অশ্রুবারি বসিয়া নির্জ্জনে।
অন্তর হয়েছে পূর্ণ আজি শোক-ভার,
একদিন কাঁদি আমি মরম-বেদনে।

জীবনেতে এক দিন এইরূপ হয়,
যেদিনে সন্তাপ শুধু ভাল লাগে মনে।
যতক্ষণ নাহি হয় আশার উদয়,
ততক্ষণ মন পোড়ে অন্তর-দহনে।

দেখনি কি, প্রিয় সখি, বরিষার কালে,
পর্ব্বত হইতে উৎস ধায় জলভারে?
হিমান্তেতে সেই উৎস পর্ব্বতের ভালে,
পয়োহীন হয়ে শোভে তরঙ্গের হারে।

তেমতি এ জীবনের ঋতু-বরষায়,
হৃদয়-আকাশ পূর্ণ মেঘ আড়ম্বরে।
মন ঘনতর হয় স্মরণ-বিভায়,
বরিষণ বিনা মুক্তি নাহি সে অন্তরে।

আবার হে সহচরি, এ জীবন দেশে,
ফুটিবে বাসন্তী সুখ সুন্দর শোভায়।
হাসিব আবার আমি সহচরী বেশে,
বিদাইয়া শোক, তাপ, চিন্তা, ভাবনায়।

আজ কিন্তু, সহচরি, নিকটে আমার,
আসিওনা, বসি আমি, হেথায় নির্জ্জনে।
বসিয়া হৃদয় করি পূর্ণ শোক-ভার,
মন-দুঃখে কাঁদি আমি একাকী গোপনে।

শ্রী পূ

রাজ-তন্ত্র।

জর্ম্মনী দেশের সুবিখ্যাত চাণক্যোপম মন্ত্রীবর প্রিন্স বিস্মার্ক বলিয়াছেন "বদান্যতা ভাব-বিশিষ্ট যুক্তি মার্গানুসারী স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শাসন-প্রণালী।"*

এক ব্যক্তির হস্তে সমস্ত রাজ্যশাসনের ক্ষমতা থাকিলে এই একটী বিশেষ উপকার লাভ হয় যে, একমাত্র মত এবং ইচ্ছার অনুসারে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। অনেক ব্যক্তি পরামর্শ করিতে গেলেই মত-দ্বৈধ ঘটিবার প্রচুর সম্ভাবনা। এক রাজ্যের মধ্যে বিভিন্ন বিভিন্ন মতের প্রচালনা হইলে ঘোরতর আত্মবিচ্ছেদ ও কলহ উপস্থিত হইতে পারে। একমাত্র প্রভু হইলে অধীনস্থ সকল প্রকার কর্ম্মচারীদিগেরই স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অনেক সুবিধা হয়। এই নিমিত্ত একমাত্র রাজা থাকিলে পূর্ব্ব প্রকটিত শাসন প্রণালীর সম্পাদক বিভাগ অত্যন্ত বলশালী ও কার্য্য-কুশল হয়।

* Vide Preface to Matthew Arnold's Mixed Essays, page 7.

অনিয়ম-তন্ত্র সাম্রাজ্যের পক্ষপাতীগণ আরও বলিতে পারেন যে, যদি এক ব্যক্তির হস্তে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ভার অর্পিত থাকে, তাহা হইলে শাসন-প্রণালীর যাবতীয় ব্যাপার ধর্ম্মানুশাসনের অনুসারে বিচক্ষণতার সহিত সমীচীন রূপে সম্পাদিত হইতে পারে। মন্দ আইনগুলি পরিবর্ত্তিত হইয়া উত্তম উত্তম আইন প্রকটিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিগণ উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইবে, এবং বিচার-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। জন সাধারণ অত্যল্প পরিমাণে রাজ-কর প্রদান পূর্ব্বক সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে।

পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, দীন দরিদ্র ব্যক্তিদের অপেক্ষা ভূপতিগণ এক দিবসে ২৪ ঘণ্টা হইতে এক সেকেণ্ডও অধিক সময় পাইতে পারেন না। এই নিয়মিত অল্প সময়ের মধ্যে শাসন-প্রণালীর সমস্ত বিভাগ রাজার স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে; প্রত্যেক নগর ও পল্লীর সমস্ত বিষয় তাঁহার সর্ব্বসময়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানা আবশ্যক। স্বয়ং অপারগ হইলে প্রজাপুঞ্জের মধ্য হইতে তাঁহার বহুসংখ্যক ন্যায়-পরায়ণ ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক নির্ব্বাচন করিতে হইবে। যাঁহারা শাসন-প্রণালীর নানা রূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, এবং এরূপ পরম ধার্ম্মিক ও গুণশালী ব্যক্তিনিচয়ের উপর উল্লিখিত কর্ম্মচারীগণের পর্য্যবেক্ষণের ভার অর্পণ করিতে হইবে যাঁহারা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের পাত্র। কিন্তু এই সমস্ত গুরুতর এবং বিভিন্ন প্রকারের কার্য্যকলাপ সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করিতে এত অদ্ভুত ও মনুষ্যাতীত ক্ষমতা এবং বলের প্রয়োজন যে, সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান্ না হইতে পারিলে একমাত্র সৎস্বভাববিশিষ্ট সমস্ত সদ্গুণালঙ্কৃত শাসন-কর্ত্তারও এবম্বিধ সমস্ত কার্য্য একাকী নিষ্পাদন করা সম্পূর্ণ রূপে অসাধ্য।

কিন্তু যদিও তর্কচ্ছলে স্বীকার করা যায় যে, রাজামাত্রেই প্রাগুক্তরূপ অলৌকিক গুণসম্পন্ন ও কার্য্যকুশল, এবং এক মাত্র রাজা থাকিলে তিনি যে সমুদায় আদেশ প্রচার করেন তাহা সুচারুরূপে কার্য্যে পরিণত হওয়ার সমধিক সম্ভাবনা, তথাপি ঈদৃশ রাজ-তন্ত্র প্রার্থনীয় কি না ইহা বিচার সাপেক্ষ। উক্তরূপ অবস্থাতে দেশমধ্যে কেবল এক জন ব্যক্তি অসাধারণ জ্ঞান ও তেজঃ-সম্পন্ন। অপরাপর সকলেই নিস্তেজ ও জড়পদার্থবৎ নতুবা এক ব্যক্তির সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকিবে কেন? এবম্বিধ প্রজাপুঞ্জের স্বকীয় ভাবী শুভাশুভের প্রতি কোনরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষমতা নাই। এক ব্যক্তির ইচ্ছা বলবৎ ভাবে তাহাদের সমস্ত বিষয় মীমাংসা করিয়া দেয়, এবং সেই মীমাংসার অবাধ্য হইলে তাহারা ঘোরতর অপরাধে অপরাধী হয়। যদি চ কোন কোন ব্যক্তি ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া জ্ঞানের উন্নতি সাধন

করে, তথাচ সেই জ্ঞানোন্নতি দ্বারা শাসন-প্রণালীর কোন কার্য্যকারিতা হয় না। সুতরাং এবম্প্রকার সমাজস্থ ব্যক্তিবৃন্দের মন নিতান্ত সংকীর্ণ ও নীচাশয় হইয়া আইসে। তাহারা কেবল ইতর পশুর ন্যায় আহার বিহার এবং পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি বর্দ্ধনের নিমিত্ত যত্নবান হয়; এবং জন-সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনতা ধারণ করে। সুতরাং তাহাদের নৈতিক উন্নতিও নিতান্ত সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। কেন না, সাধারণের হিতকামনা জনিত মনের উদারতা একেবারে লয় প্রাপ্ত হয়। যদিচ স্বভাবতঃ এই রূপ বিশ্বজনীন প্রেম কোন ব্যক্তির হৃদয় মধ্যে বিকশিত হয়, তথাপি কার্য্যতঃ প্রযুক্ত না হওয়াতে আতপ-দগ্ধ ছিন্ন-প্রসূনের ন্যায় শুষ্কত্ব প্রাপ্ত হয়। কার্য্যে-পরিণত না হইলে কোন মানসিক ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে না। এক পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যেও পরস্পরের প্রতি নৈসর্গিক প্রেম-নিবন্ধন অযাচিত-ভাবে পরস্পরের সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত নানা প্রকার প্রয়াস হইয়া থাকে; তদভাবে পারিবারিক প্রেমও ক্রমশঃ হ্রাস হয়। সুতরাং যদি দেশের নিমিত্ত কোন কাজ করিতে না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতই সেই দেশের প্রতি ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপ উদাসীনতা জন্মে। গ্রীসদেশে প্রাচীন কালাবধি প্রথিত আছে যে; স্বেচ্ছাচারী রাজ-তন্ত্রে কেবল এক জন দেশহিতৈষী ব্যক্তি থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা স্বয়ং। অপরাপর সকলে হীনবীর্য্য এবং স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন বিহীন হইয়া পড়ে। লোকে যেরূপ কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত বৃষ্টি হওয়ার জন্য ভগবানের উপর নির্ভর করে তদ্রূপ এই অবস্থায় সমাজস্থ ব্যক্তি বৃন্দ সকল প্রকার হিতা-হিতের নিমিত্ত কেবল রাজার দিকে চাহিয়া থাকে। তিনি ভাল করিলে ভাল, মন্দ করিলে উপায় নাই বলিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহা বহন করিতে হয়। কিন্তু যে দেশের এরূপ দুর্গতি, সেখানকার লোক বালকদিগের মত আপনাদিগকে অবধানের সহিত রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে অক্ষম। তথায় সমাজের কোন প্রকার উন্নতির আশা নাই। হয় ত প্রবলতর অপর এক জন স্বেচ্ছা-চারী রাজা,অথবা নিকটস্থ কোন বিক্রম-শালী অসভ্যজাতি আসিয়া ঐ দেশের রাজাকে পরাস্ত করিয়া সমস্ত অধিবাসীকে ক্রীত দাসের ন্যায় ব্যবহার করিতে পারে।

ফলতঃ যে দেশে জনসাধারণের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে কোন ক্ষমতা নাই, তদ্বিষয়ে কোনরূপে মতামত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই, এবং যেখানকার প্রত্যেক অধিবাসী শাসন-কার্য্যের কোন না কোন অংশ স্বয়ং সম্পাদন না করে, একমাত্র স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে বাস করে, তথাকার লোকের সুখশান্তির ভরসা নাই। মনুষ্যমাত্রই স্বার্থপর;

নিজের সুখবর্দ্ধনের নিমিত্ত যেরূপ লালায়িত, স্বার্থশূন্য হইয়া অপরের সুখস্বচ্ছন্দতা বিধানের নিমিত্ত তত মনোযোগী নহে। অনেকে এরূপ স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব স্বীকার না করিতে পারেন, কিন্তু যেদিন এইরূপ স্বার্থপরতা পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে, মনুষ্যমাত্রেই অপরাপর সকলের নিমিত্ত আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সেইদিন ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের অধিষ্ঠান হইবে। বর্ত্তমান সময়ে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিজের শুভাশুভ যে স্থলে নির্ভর করে, সেখানে সে প্রাগুক্ত স্বতঃ নিজের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। অতএব স্থূলতঃ প্রতীয়মান হইতেছে যে, রাজা যেসমস্ত অনুসাশন করেন, তাহা তাঁহারই নিজের সুবিধার জন্য *।

সুতরাং প্রধানতঃ এই বিবেচ্য হয়, রাজা প্রজার জন্য কি প্রজা রাজার জন্য? আমাদের ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, রাজার নিমিত্তই প্রজা। রাজারা দেবসন্তান। ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবতা হইতেই নৃপতিগণের উদ্ভব হইয়াছে. জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস ছিল। সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ ইহার উদাহরণ স্থল।

মনু বলিয়াছেন:—

ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রানির্হৃত্য
শাশ্বতীঃ॥ ৪

যস্মাদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো-
নির্ম্মিতোনৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা। ৫
(মনুসংহিতা, ৭ম অধ্যায়)।

অর্থাৎ ইন্দ্র বায়ু যম সূর্য্য অগ্নি বরুন চন্দ্র কুবের, এই অষ্টদিকপালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। যেহেতু, এই সকল প্রতাপান্বিত দিকপালের অংশে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন। এজন্য শৌর্য্যবীর্য্যের আতিশয্য দ্বারা সকল প্রাণীকে অভিভব করিতে পারেন।

প্রকৃতিবর্গের কর্ত্তব্য এই যে সর্ব্বদা নরেন্দ্রগণের সেবাশুশ্রূষাতে কালযাপন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন। নরপালগণের ইন্দ্রিয় সুখ কিসে চরিতার্থ হয়, মৃগয়া প্রভৃতি উপায়দ্বারা কিসে তাঁহার বলবীর্য্যের বৃদ্ধি হয়, অপরাপর মনুষ্যগণ ভারতবর্ষের পূর্ব্বতন কালে কেবল তাহাতেই অনুরক্ত থাকিত।

অন্যান্য দেশেও এইপ্রকার ভাবের অনেক চিহ্ন দেখা যায়। ইংলণ্ডের প্রাচীন অধিবাসী সেক্সনদিগের মধ্যে এইরূপ

* "The subordination of a nation to a man, is not a wholesome but a vicious state of things. * * * Autocracy presupposes inferiority of nature on the part of both ruler and subject: on the one side a cold, unsympathetic sacrificing of others' wills to self-will; on the other side a mean, cowardly abandonment of the claims of manhood."

Herber Spencer's Scientific and Speculative Essays, Vol. II. page 194.

সংস্কার ছিল যে, তাহাদের রাজা "উডেন" স্বয়ং দেবাবতার। তিনি স্বচ্ছন্দে ভূলোক দ্যুলোক এবং নিরয়লোকে পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। গ্রীসের প্রাথমিক বীর ও নৃপতিগণ দেবসম্ভূত। রোম-নগরীর নির্ম্মাতা "রমিউলস্" "মার্স" অর্থাৎ অস্ত্রদেবতার সন্তান। সকল স্থানেই ভূমিপদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জন্মাইবার নিমিত্ত ধর্ম্মযাজকগণ প্রকৃতি বর্গকে এইরূপ ভ্রমপ্রমাদে নিপাতিত করিতে যত্নবান হইত। কারণ, এইরূপ কুসংস্কারাভিভূত না হইলে কদাচ তাহারা তাহাদের ন্যায় একমুণ্ড ও দ্বিবাহুধারীদিগের দাসত্বে কালাতিপাত করিত না। কোন কোন স্থানে ধর্ম্মযাজকগণ আত্মপ্রতারিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্যক্তিবিশেষকে দেবসম্ভূত ও দেবানুগৃহীত বলিয়া গললগ্নীকৃতবাস হইয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি সাধন করিত, এবং জনসাধারণকেও সেই রূপ প্রবৃত্তি দিত। মন্বাদি গ্রন্থে রাজাদিগের নিমিত্ত যে সমস্ত সারগর্ভ উপদেশ-বাক্য লিখিত আছে তৎ সমুদয় আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণের গভীর চিন্তা ও সূক্ষ্ম-দর্শিতার চিহ্ন স্বরূপ। কিন্তু সে সমুদয় অমূল্য উপদেশ গ্রন্থাদিতেই পর্য্যবসিত থাকিত। অত্যল্প মাত্র সময়ে তদ্দ্বারা সুফল ফলিত। বাস্তবিক কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনে স্থান দিতে পারেন যে, বৃদ্ধ পিতা মাতা বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য বনে গমন করিলে* উষ্ণ-শোণিত অপরিণামদর্শী যুবক সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া আমোদ প্রমোদ ও ইন্দ্রিয় সুখে কালাতিপাত না করিয়া গম্ভীর ভাবে ব্রাহ্মণগণের উপদেশ বাক্যের প্রতি কর্ণপাত করিবে? অবশ্য আমরা রামায়ণাদি গ্রন্থে পাঠ করি যে, রামচন্দ্র অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন, এমন কি প্রজানুরঞ্জন অনুরোধে প্রিয়তমা ভার্য্যা জানকীকেও বনবাস দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈদৃশ ব্যবহার এত দূর অমানুষিক যে, রামচন্দ্র স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার স্বরূপ পরিগণিত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ কি প্রাচীন কি অধুনাতন সকল সময়ের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে, নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে রামচন্দ্র যুধিষ্ঠির প্রভৃতির ন্যায় নিঃস্বার্থ এবং প্রজাপরায়ণ রাজার সংখ্যা অতি অল্প এবং নিরো ও সিরাজদ্দৌলার ন্যায় নৃশংস এবং বিলাসী রাজার সংখ্যাই সমধিক পরিমাণে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা মধ্যবিত প্রকারের রাজা ছিলেন কেবল তাঁহাদের যত্নেও পৃথিবীর বিশেষ উপকার হয় নাই।

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনিয়ম-তন্ত্রের সম্রাট নিয়ম-তন্ত্রের বাধাবাধকতার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারেন, তবু ত তিনি মুদ্রাযন্ত্রের এবং

* মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায়, দ্বিতীয় শ্লোক।

শাসন-কার্য্যের সমুদায় বিষয় আলোচনা করিবার স্বাধীনতা বিধান করিয়া জন-সাধারণকে স্বাধীনভাবে সামাজিক-বিষয়-সম্বন্ধে আপনাপন মত ব্যক্ত করিতে দিতে পারেন। হয় ত তিনি নিজে হস্ত-ক্ষেপ না করিয়া স্থানবিশেষে স্বায়ত্ত শাসনদ্বারা তথাকার বিশেষ বিশেষ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দিতে পারেন। হয় ত তিনি ব্যবস্থাপক এবং সম্পাদক-বিভাগের প্রধান প্রধান ক্ষমতা গুলি স্বহস্তে রাখিয়া সমাজের সমস্ত বা কিয়দংশ লোক দ্বারা স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত সভা-দ্বারা শাসন-কার্য্যের সাহায্য লইতে পারেন। কিন্তু এতাদৃশ স্বাধীনতা অমূলক স্তোক মাত্র। কেন না, রাজা ইচ্ছা করিলেই, যে কোন মুহূর্ত্তে তাহা কাড়িয়া লইতে পারেন এবং লোকের চক্ষুতে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া দর্শাইতে পারেন্ যে, যদিও তাহাদের প্রভু জ্ঞানবান্ এবং দয়ালু, তথাপি তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে সেই প্রভুর সম্পূর্ণ দাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেক সময়ে পূর্ব্বতন নৃপতিগণ অমাত্য বর্গের পরামর্শ লইয়া চলিতেন। অনেক ভূপতি প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ সর্ব্বদাই প্রতিপালন করিতেন। প্রাচীন ভারত-বর্ষে মুনি ঋষিগণের বাক্য সম্রাটগণ অবহেলা করিতেন না। বশিষ্ঠ, চাণক্য প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গের কথা রাজারা শিরো-ধার্য্য করিতেন। ফ্রান্স দেশে রিস্লু, টারগট, মাজেরিন্ প্রভৃতি অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ মন্ত্রিত্ব-পদে নিযুক্ত হইয়া প্রভূত পরিমাণে দেশ-হিত-কর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেন। ইংলণ্ডদেশে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার প্রভুত্ব হওয়ার পূর্ব্বেও উদ্ধত-প্রকৃতি যথেচ্ছাচারী অষ্টম হেনরী কিছু কালের জন্য উলজি এবং তদীয় গৌরবান্বিতা কন্যা রাজ্ঞী এলিজাবেথ, বর্লে প্রভৃতি বিচক্ষণ সদস্যের পরামর্শ লওয়াতে, শাসনপ্রণালীর কার্য্যকলাপ সুচারুরূপে সংসাধিত হইত। যথেচ্ছাচারী রাজ-গণ এই রূপ আচরণ করিলে, অনেক পরিমাণে অনিয়মতন্ত্র-ঘটিত অশুভ-নিচয়ের অপনোদন হয়, সন্দেহ নাই।

কিন্তু ঘোরতর পরিতাপের বিষয় এই যে, পৃথিবীতে বিগত চারি সহস্র বৎসরের মধ্যে জনসমাজের ভাগ্যে অত্যল্পসংখ্যক এরূপ উত্তম শাসনকর্ত্তা জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহারা যথেচ্ছ আচরণ করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও নিঃস্বার্থ ভাবে সাধারণের হিতানুষ্ঠান করিয়াছেন। এ কাল পর্য্যন্ত ধারাবাহিকরূপে রাজার পুত্র হইলেই যাঁহারা রাজা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়শই মন্দচরিত্রের সংখ্যা বহুলপরিমাণে স্মৃতিগোচর হয়। কায়মনোবাক্যে প্রজার হিতকামনা কদাচিৎ কেহ করিয়াছেন। উৎকৃষ্ট মন্ত্রী থাকিলেও, তাহাদের সদুপ-দেশ কদাচিৎ রাজন্যবর্গের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। কালক্রমে রাজাদিগের দৌরাত্ম্য এবং অবিচার অপনয়ন করিবার

অভিপ্রায়ে ইউরোপ-খণ্ডের অন্তঃপাতী স্পেন, ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে "কোর্টেস" "পার্লিয়মেণ্ট" "ন্যাসনেল এসেমব্লি" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম ধারণপূর্ব্বক জনসাধারণ একত্রীভূত হইল। ক্রমেই এই সাধারণ সভাগুলির আধিপত্য বর্দ্ধমান হইল। অবশেষে আমেরিকায় ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ এবং ফ্রান্সদেশের লোক বৃথা ব্যয়-সাধ্য এবং সমাজের অপকারী রাজতন্ত্র একেবারে উঠ-ইয়া দিয়াছেন। ফলতঃ সর্ব্বস্থানের ইতিহাস পাঠ করিলেই প্রতীয়মান হয় যে, জনসমাজের যে পরিমাণে বুদ্ধি ও নীতিসম্বন্ধে উৎকর্ষ জন্মে, সেই পরিমাণে ব্যক্তি-বিশেষের পদানত হইয়া থাকিবার ইচ্ছারও হ্রাস হয়। প্রাচীন রোম নগরে প্রজাতন্ত্র সিনৃসি-নেটস্, এথেন্স নগরে সোলন এবং মিটালিনি দেশে পিটাকস প্রভৃতি ব্যক্তিকে কিয়ৎকালের নিমিত্ত যথেচ্ছা-চারিত্বে বরণ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ব্যাধিত ব্যক্তির ঔষধ সেবনের ন্যায় ক্ষণকালব্যাপী; এবং সেই অল্পকালের মধ্যে উক্ত মহাত্মাগণ ঐ দেশবাসীদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিবার বাধা বিপত্তি গুলি নিরাকরণ করিতে সম্পূর্ণ-রূপ যত্নশীল হইয়াছিলেন, আপনাদের ক্ষমতা ও গৌরববৃদ্ধির জন্য নহে। যে দেশ কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়াছে, তথায়ও স্বেচ্ছাচারী রাজত্বের আবির্ভাব হইলে, প্রথম রাজা শান্তস্বভাব হইলেও পরিণামে অধিকতর পরিমাণে অনিষ্টপাত হয়। রোম নগরের প্রজাতন্ত্র উচ্ছেদের পর আগষ্টস সিজার প্রথম সম্রাট্ হইলেন। কিন্তু যদিও তিনি শান্তশীল ছিলেন, তথাপি সেই শান্তশীলতায় রোমনগরে অধিকতর অপকার হইয়াছিল। কেন না যদি ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার দাসত্বে থাকিয়া তাঁহার উদারতা এবং ন্যায়পরতা গুণে বশীভূত হইয়া রোম বাসীদের ক্রমে ঐরূপ দাসত্ব সহ্য হইয়া না আসিত, তাহা হইলে কদাচ তাহারা তাঁহার অব্যবহিত পরে টাইবিরিয়স সিজরের ভয়ানক অত্যাচার ও দৌরাত্ম্য নিশ্চেষ্টভাবে সহ্য করিতে সমর্থ হইত না। পৃথিবীর আদিম অবস্থাতে হয় ত অপর সাধারণের এক ব্যক্তির আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলা উচিত। যখন মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিলে, অপরের সুবিধার নিমিত্ত আপনার স্বার্থ ও স্বাধীনতা অনেক পরি-মাণে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত না হয়, যত দিন তাহারা আইনের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অপারগ হয়, তত দিন তাহাদের এক জন রাজাকে দেবতা-জ্ঞানে ভক্তি ও শ্রদ্ধা না করিলে, সেই সমাজ রক্ষা পাইতে পারে না। এতাদৃশ সমাজের লোকগুলি যেমন অসভ্য এবং কলহপ্রিয়, সেই জন্য এমন এক জন শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন, যিনি আপন বাহু বা চাতুর্য্যবলে সকলকে দমন করিয়া রাখিতে পারেন। কিন্তু মনুষ্য-সমাজ যখন সভ্যতার উচ্চ পদবীতে আরোহণ

করিল, যখন মনুষ্যহৃদয় কোমল ভাব ধারণ করিল, যখন মনুষ্য ক্রমে শিষ্ট ও শান্ত হইয়া আসিল এবং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে শিখিল, তখন আর অসভ্য-কালোচিত শাসন প্রণালীর আবশ্যকতা রহিল না। সেই সঙ্গে সঙ্গে শাসনকর্ত্তার প্রতি আস্থা ও আদরের ও হ্রাস হইল। প্রথমে রাজাকে লোকে দেবতা মনে করিত। ক্রমে তাহাকে দেবসন্তান বা দেবানুগৃহীত বিবেচনা করিত। অবশেষ তাহাকে সামান্য নর বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিল, তাহার কার্য্যকলাপের সমালোচনা করিতে শিখিল, তাহাকে নিন্দা ও ব্যঙ্গ করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। এমন কি, যখন রাজার দৌরাত্ম্যে নিতান্ত প্রপীড়িত হইল, তখন রাজার শিরশ্ছেদন পর্য্যন্ত বিধান করিল। ইহার দৃষ্টান্ত ইংলণ্ড দেশের প্রথম চার্লস ও ফ্রান্স দেশের ষোড়শ লুই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, প্রিন্স বিস্মার্ক প্রভৃতি স্বেচ্ছাচারী সাম্রাজ্যের পক্ষপাতিগণের মত নিতান্ত অমূলক এবং ভ্রান্তিসঙ্কুল। তদ্দ্বারা জনসমাজের দ্বিতীয় প্রস্তাবোক্ত বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিক অবস্থা এবং কর্ম্মিষ্ঠতা গুণ ক্রমে শিথিল হয় ও পরিশেষে এক বারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

শ্রীচন্দ্রমোহন মজুমদার।

রুসীয় নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়।

যে রুসিয়া দূর হইতে অন্তরীক্ষবাসী শশিকলার ন্যায়, অসীম জলধি-জল-সম ইংরেজদিগকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার আভ্যন্তরিক কার্য্যকলাপ, রীতি-নীতি, ন্যায়-বিচার ও সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করা উচিত। রুসীয়ার সম্রাট্ যথেচ্ছাচারী; সুতরাং প্রজার মতামত অপেক্ষা না করিয়াই, রাজ্য শাসিত হইয়া থাকে। এই জন্য অনেক স্থলে, সম্রাট স্বীয় অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া, সাধারণের বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়েন। তথাকার সংবাদ-পত্রগুলি স্বাধীন নহে। তাহারাও সম্রাটের পরিচর্য্যা করিয়া থাকে; সুতরাং প্রজারা হৃদয়োদ্ঘাটন করিয়া যে, মনোদুঃখ প্রকাশ করিবে, তাহার ক্ষমতা নাই। এই জন্য দিন দিন সাধারণে বীতরাগ হইয়া, দেশীয় শাসনের বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই প্রকারে নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় সমুদ্ভূত হইয়া, প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলিকে বিপর্য্যস্ত করিবার মানস করিয়াছে।

টর জেনিফ তাঁহার 'বার জিন্ সএল' নামা পুস্তকেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাহারা তখনও

দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রমশালী ছিল। কিন্তু কাল সহকারে তাহারা মিলিত হইয়া সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছে, এবং দিন দিন তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাহারা সকলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়শালী; স্বকীয় প্রাণ উৎসর্গ করিয়াও প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন প্রচলিত নিয়ম ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচার করাই তাহাদের ব্রত। ক্রমাগত রাজকীয় কার্য্যকারকের প্রাণ হরণ করা তাহাদের উদ্দেশ্য। দুই বার সম্রাটের জীবনাপহরণের মানসে অগ্ন্যস্ত্র ব্যবহার করিয়া শেষ ১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ্চ রুসকর্ম সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারকে জ্বলন্ত বম নিক্ষেপে বিনাশ করিয়াছে। কি গ্রাম, কি নগর, কি বিদ্যালয়, কি ধর্ম্মমন্দির সকল স্থানেই এই সম্প্রদায়। কিয়দ্দিন ভূত পূর্ব্ব সম্রাট্ এত ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি শত্রু ও মিত্র ভেদ করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবার ও ভৃত্য-বর্গ-মধ্যেও এই নিয়মাবলম্বী দৃষ্ট হইয়াছিল।

সম্রাট নিহিলিষ্ট বংশ ধ্বংস করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। অণুমাত্র সন্দেহে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি দেশ-নির্ব্বাসিত হইয়া সাইবিরিয়ায় প্রেরিত হইতেছে। তথাপি এই নূতন স্রোত প্রবল হইয়া উঠিতেছে। স্ত্রী ও পুরুষ মিলিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। এক জন ধৃত ব্যক্তিকে দশ জন সমর্থন করিতেছে। এইরূপে এই কালাগ্নি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া, দেশের শান্তি ভঙ্গ করিয়া সম্রাটের আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিয়াছে।

যে দিন "ভেরা জেসুলিচ" নাম্নী এক রমণী সেণ্টপিটার্সবর্গের প্রধান পুলিষ কার্য্যকারক জেনারল্ ট্রিপফ্‌কে অগ্ন্যস্ত্র দ্বারা হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াও, 'জুরির' বিচারে নির্ব্বিঘ্নে অব্যাহতি পাইয়াছে, সেই দিন হইতে নিহিলিষ্টগণ দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে। ভেরা জেসুলিচের জীবনী পাঠ করিলে, তাহার দৃঢ় অধ্যবসায় ও রুসীয়ার বিচার-পদ্ধতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সে সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কোন এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করিত। সেই স্থানে নেট্‌চেফ নাম্নী এক রমণীর সহিত তাহার সাতিশয় প্রণয় জন্মে। সেই রমণীর ভ্রাতা রাজবিদ্রোহী হইয়া ধৃত হইলে পর, নেট্‌চেফ্, তাহার ভগিনী ও ভেরা—নেটচেফের সুহৃদ, এই জন্য অপরাধিনী হইয়া ধৃত ও দুই বৎসরের জন্য কারাবাসে প্রেরিত হয়। দুই বর্ষ অতীত হইলে, ভেরা বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। এক দিন সে তাহার মাতার নিকটে উপবেশন করিয়া আছে, এমন সময়ে এক জন পুলীষ-কার্য্যকারক রাজাজ্ঞানুসারে তাহাকে ধৃত ও সাত বৎসরের জন্য সাইবিরিয়ায় নির্ব্বাসিত করিল। তখন তাহার দুঃখের সীমা ছিল না। দারুণ শীতে

ও অনাহারে তাহাকে ভয়ঙ্কর ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপে নিরপরাধিনী হইয়াও গ্রহবৈগুণ্যে নিতান্ত দীনার ন্যায় তথায় যৌবন যাপন করিয়া, দেশীয় শাসনপ্রণালীর উপরে তাহার বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হইল। এক দিন সংবাদ পত্র পাঠে সে অবগত হইল যে, প্রধান কার্য্যকারক ট্রেমফ্‌ এক জন কারাবাসীকে অতিশয় প্রহার করিয়াছেন। এই সংবাদ পাঠে ভেরার হৃদয়ে, স্ত্রীসুলভ কারুণ্যরসের আবির্ভাব হইল। ক্রোধে তাহার হৃদয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তখনই "রিবলার" সংগ্রহ করিয়া ট্রেমফ্‌কে হত্যা করিবার জন্য, তাহার গৃহে আগমন করিল, এবং সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। আত্মদোষ স্বীকার করিলেও, সে জুরির বিচারে নির্দ্দোষণী বলিয়া সপ্রমাণ হয়। এই ঘটনাটী ১৮৭৮ সালের ২৪ সে জানুয়ারিতে ঘটিয়াছিল।

যেমন ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিণী গিরিশৃঙ্গ হইতে, মৃদু-মধুর কল কল ধ্বনি করিতে করিতে নিম্নগামিনী হয় ও ক্রমে ক্রমে অন্যান্য নির্ঝরিণীর সহিত মিলিতা হইয়া, বর্দ্ধিতকলেবরা ও ভয়ঙ্করা হয়; সেইরূপ নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় ভেরার কৃতকার্য্যতা দর্শনে সাতিশয় উন্মত্ত হইয়া অল্পকালের মধ্যে, তাহাদের ভীম পরাক্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কে স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ প্রভেদ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ওডেসা প্রভৃতি স্থানে শত শত ব্যক্তি সন্দিহান হইয়া রুদ্ধ ও বন্দুকাঘাতে নিহত হইতেছে। বিচার যাহাই হউক, রুসীয়ায় আর একটী ভয়ঙ্কর নিয়ম প্রচলিত আছে। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যের আবশ্যকতা হইলে, রাজার ইচ্ছানুসারে সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। অমত করিলে, তখনই ধৃত ও কারাবাসে নীত হইবে। এই জন্য যৌবন সময়ে সকল প্রজাকেই সমর-কৌশল শিক্ষা করিতে হয়।

রুসীয়ার অভ্যন্তরে অগ্নি জ্বলিয়াছে। অদূরদর্শী সম্রাট প্রজারঞ্জনের চেষ্টা না পাইয়া, স্বকীয় বলবীর্য্য দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা পাইতেছেন। জল-সেচনে কোন কোন স্থানের অনল নির্ব্বাণ হইতে পারে। অনলের কারণানুসন্ধান পূর্ব্বক মূলোৎপাটন না করিয়া শুষ্ক বলদর্পে সিদ্ধমনস্কাম হওয়া যায় না। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত কে কোথায় জল-সেচনে নির্ব্বাণ করিতে পারে?

রুসীয়া তুরস্কের সহিত যুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত হতবীর্য্য হইয়াছে। তাহার রাজকোষ পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণ নহে। সৈন্য-সংখ্যার অনেক হ্রাস হইয়াছে। অনেক যুদ্ধবিশারদ রাজপুরুষ বৈবস্বত-ভবনে প্রবেশ করিয়াছে। এমন সময়ে বহু-বিস্তৃত রাজ্যে সুনিয়ম স্থাপন পূর্ব্বক প্রজাপালন না করিয়া ইংলণ্ড, বোখারা, চীন প্রভৃতি স্বাধীন রাজন্যগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়া, কেবল অপরি-

হার্য্য দম্ভের পরিচয় প্রদান করা মাত্র। এখন অগ্র নির্ব্বাণ না করিলে, পরিশেষে তাহা দাবানলের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র রাজ্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

রুসীয়ার রাজ্য-বিস্তৃতির ইচ্ছা যে কত প্রবল, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

১। সুইডেনের অধিকাংশ, যথা কুরলাণ্ড, লিথনিয়া, ইস্থেনিয়া, ফিন্‌লাণ্ড, লাপলাণ্ড এবং বোথনিয়া উপসাগরস্থ দ্বীপসমূহ।

২। পোলাণ্ড হইতে ভিষ্টুলা ও নিপার নদীর মধ্যস্থিত সমুদায় প্রদেশ।

৩। তুরস্ক হইতে ক্রিমিয়া, বেসারেবিয়া, থারসন, আজফ প্রভৃতি ৩,৯৮,০০০ বর্গ মাইল।

৪। প্রুসিয়া হইতে বিয়ালিষ্টক।

৫। অষ্ট্রিয়া হইতে চারণাপোল।

৬। সমুদায় সার্কেশিয়া।

৭। পারস্য হইতে জর্জ্জিয়া ও কাস্পীয় হ্রদস্থ প্রদেশ।

৮। প্রায় সমুদায় তাতার।

৯। চীন হইতে আমুর প্রদেশ।

১০। জাপান হইতে সাগেলিয়ান দ্বীপ।

এই সমুদায় প্রদেশ রুসীয়া গত একশত বৎসরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল স্থান অধিকার করিয়া, রুসীয়া অতি কুৎসিতরূপে শাসন করিতেছেন। পোল ও কোসাকদিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টীয়ান্ করিতেছেন। বিদ্যাশিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই। রাজ্য-বিস্তৃতির সহিত শাসন-শৈথিল্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

রুসীয়ার স্ত্রীলোকদিগকে কায়িক দণ্ড প্রদান করা হয়, এবং সম্রাট কোন প্রকার বিচার না করিয়াই, কোন ব্যক্তিকে যথেচ্ছ দণ্ড দিতে সমর্থ হন। এখানে ফাঁসী নাই। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, বধ্য ব্যক্তিকে মধ্যস্থানে আবদ্ধ করে, পরে কতিপয় ব্যক্তি অর্দ্ধমণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া,এক সময়ে বন্দুক দ্বারা তাহাকে বিনাশ করে। রুসীয়া সভ্যতার অভিমান করেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মনীতি তথায় কত অল্প, তাহা তত্রত্য পুলীষ-মন্ত্রীর কার্য্য দেখিলে, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। কোন সম্ভ্রান্ত রসিকা মহিলার তীব্র বচনপরম্পরায় বিরক্ত হইয়া, পুলীষ মন্ত্রী তাহার অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে স্বাবাসে আনয়ন পূর্ব্বক ধর্ম্মহরণ করে। এইরূপ ঘটনা প্রায় হইয়া থাকে।

রুসীয়া কখন সত্য কথা বা সরল আলাপ করিতে শিক্ষা করেন নাই। শঠতা ও প্রতারণা ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ।

রুসীয়-রাজনৈতিক চাতুর্য্য অতি জঘন্য। প্রত্যেক রাজধানীতে রুসীয় সুন্দরী যুবতী মহিলা কর্ম্মব্যপদেশে বাস করে। তাহারা ধর্ম্ম-বিনিময় অথবা উৎকোচ প্রদান করিয়া, তদ্দেশের গুহ্য সংবাদ সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশে পাঠাইয়া দেয়।

এত অনুকূলক যুক্ত জাতীয় স্বত্ব-[illegible] উৎসাহ প্রদান করিয়া, [illegible] দ্বারা, অনেক [illegible] সংবাদ আনয়ন করিয়া ছিলেন।

[illegible] এই প্রকার [illegible] করিয়া, [illegible] তাঁহার [illegible] দেখিবার [illegible] হইয়াছেন। [illegible] জন্য [illegible] যুক্তে কেহই তাহার প্রতি [illegible] প্রদর্শন করেন নাই। নির্দিষ্ট সম্প্রদায় প্রবল হইলেই, [illegible] প্রণালী প্রবর্তিত হইতে পারে। [illegible] হইয়াছে [illegible] সম্ভাবনা। [illegible] হউক [illegible] অনেকে সন্তুষ্ট আছেন। [illegible]—

ওয়ালেস্‌।

(১২৮৮, পৌষ, ৩২৭ পৃষ্ঠার পর।)

নবম পরিচ্ছেদ।

ওয়ালেস যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল। ইংরাজদিগের বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্ন [illegible] সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল। এপ্রিল মাসের প্রথমেই এড্‌ওয়ার্ড আরগাইলে এক সভা আহ্বান করিলেন। এই সভার সমস্ত ইংরাজ [illegible] হন। [illegible] আমের [illegible] কোন ক্ষতি [illegible] হয়েন নাই। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুন আয়ার নগরের বাহিরে একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে—এই সভায় [illegible] হয়। [illegible] উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। আমাদের [illegible] অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি এই [illegible] বিশ্বাসঘাতকতার [illegible] করিবেন না, [illegible] সভায় যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। সুতরাং এড্‌ওয়ার্ড তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া [illegible] অভিষিক্ত করিলেন। [illegible] কোন [illegible] নিস্তার না পান, সেই [illegible] দেশে [illegible] একটী সভা আহূত হইল।

সভার কাজ আরম্ভ না হইতেই, [illegible] করিতেছেন [illegible] হইলেন।

[illegible] সভায় [illegible] অনুষ্ঠানের পূর্বে [illegible] জাতীয় দলের একটী সভা আহ্বান করিলেন। ওয়ালেস [illegible] স্থিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ওয়ালেস্‌-ঘটিত একটী [illegible] হইয়া [illegible] করিয়া [illegible] দেশের

পরে ওয়ালেস্ পথশ্রান্তিতে কাতর হইয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তিনি নিদ্রাবস্থায় একটী অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেন। তিনি দেখিলেন, যেন একটী পলিতকেশ বৃদ্ধ আসিয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, 'পুত্র! এই লও তোমার জন্য বিশাল অবিচ্ছিন্ন অসি আনিয়াছি—লও'। শাণিত খড়্গের উজ্জ্বল বিভায় দশ দিক আলোকিত হইল। বৃদ্ধ ওয়ালেস্কে একটী পর্ব্বতের উপত্যকা-ভূমিতে লইয়া গিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ওয়ালেসের নয়নদ্বয় অনেক দূর পর্য্যন্ত বৃদ্ধের অনুসরণ করিয়া প্রতিহত হইল। ওয়ালেস্ তাঁহার বিষয় সবিশেষ অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তিনি দেখিলেন, সম্মুখে অদূরে মেঘমালা হইতে একটী প্রকাণ্ড অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া রস্ হইতে সল্ওয়ে সাগর পর্য্যন্ত সমস্ত স্কট্লণ্ড পরিব্যাপ্ত হইল। সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে একটী হিরণ্ময়ী-দেবী-মূর্ত্তি আবির্ভূত হইল। দেবীর দেহকান্তিতে দশ দিক্ ঝলসিয়া উঠিল। ভগবান্ বিভাবসুও নিষ্প্রভ হইলেন। দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ওয়ালেসের দিকে অবতরণ করিতে লাগিলেন। ওয়ালেসের নিকটে আসিয়া বলিলেন 'বৎস! এই লোহিত-হরিত দণ্ড গ্রহণ কর; ঈশ্বর নিপীড়িত জাতির উদ্ধার সাধনের জন্য তোমায় অধিনায়ক মনোনীত করিয়াছেন। হৃদয়ে সাহস বাঁধিয়া তাঁহার এই গুরুতর কার্য্য সাধন কর। এ পৃথিবীতে তোমার পুরস্কারের আশা অল্প, কিন্তু বৈজয়ন্তী-ধামে তোমার জন্য সিংহাসন প্রস্তুত রহিয়াছে'। এই কথা বলিয়া দেবী ওয়ালেসের হস্তে একখানি পুস্তক অর্পণ করিয়া যে মেঘমালা ভেদ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সহসা শূন্যে উঠিয়া সেই মেঘমালার গর্ভে বিলীন হইলেন। স্বপ্নাবস্থায় ওয়ালেস্ পুস্তক খুলিয়া দেখিলেন, পুস্তকের প্রথম ভাগ কাংস্য অক্ষরে, দ্বিতীয় ভাগ স্বর্ণ অক্ষরে ও তৃতীয় ভাগ রজত অক্ষরে লিখিত। লেখা পড়িতে চেষ্টা করায় ওয়ালেসের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি সহসা কাষ্ঠাসন হইতে উঠিয়া গির্জ্জার বাহিরে গেলেন। পাদরীর নিকটে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিলেন। তিনি যথাসাধ্য ইহার রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন, "ঋষিপ্রবর, সেণ্ট আনড্রু তোমায় ঐ খড়্গ প্রদান করেন। যে পর্ব্বত-সমীপে তোমায় লইয়া যান, উহা স্তূপীকৃত অত্যাচার-রাশি। তোমাকে ঐ অত্যাচার-রাশির প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ অগ্নি—স্কটলণ্ডের অমঙ্গলের পরিসূচক। ঐ রমণী স্বয়ং কুমারী মেরী। ঐ দণ্ড দ্বারা তোমায় স্কট্লণ্ড শাসন ও শত্রুদমন করিতে হইবে। দণ্ডের লোহিত বর্ণে যুদ্ধ ও রক্তপাত ব্যঞ্জিত হইতেছে। হরিত বর্ণে সাহস পরিসূচিত হইতেছে। ঐ ত্রিধাবিভক্ত পুস্তক তোমার বিখণ্ডিত দেশ সূচনা করিয়া দিতেছে। দেবী এই পুস্তক তোমার হস্তে দিয়া এই ছিন্ন ভিন্ন দেশের একীকরণ ও

তাঁহাকে রেনাল্ড প্রভৃতির শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের কথা জ্ঞাপন করিলেন। সুতরাং তিনি সেই পান্থাবাসে গিয়া বইডের সহিত মিলিত হইয়া ল্যাঙলেন্ অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে ওয়ালেস্ কবস্বী হইতে সন্ধিপত্র লইয়া আয়ারের সৈন্যাবাসের অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন, পথিমধ্যে প্রাগুক্ত রমণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের বিষয় তাঁহাকে সবিশেষ অবগত করাইলেন এবং তাঁহাকে ইহার প্রতিশোধ লইতে অনুরোধ করিলেন। ওয়ালেস্ এই সংবাদে হতজ্ঞান ও শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তিনি এডাম্ ওয়ালেস্ ও উইলিয়ম্ ক্রফোর্ডের নিকটে এই সংবাদ পাঠাইবার জন্য উক্ত রমণীকে অনুরোধ করিয়া বইড্ ও ষ্টীফেনের সহিত মিলিত হইবার জন্য ল্যাঙলেন্-অরণ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এদিকে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক সভায় আনয়ন করিবার জন্য ষোল জন ইংরাজ-সৈনিক প্রেরিত হইল। পথিমধ্যে ওয়ালেসের সহিত তাহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। তাহারা ওয়ালেস্‌কে চিনিত না, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত বীরত্ব অচির-কাল-মধ্যেই তাঁহাকে তাহাদিগের নিকটে পরিচিত করিল। তিনি ও তাঁহার তিন সহচর মিমেষমধ্যে অনুসন্ধানকারী ইংরাজগণের দশ জনকে মারিয়া ফেলিলেন। অবশিষ্ট ছয় জন প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

আয়ারের নূতন গবর্ণর আরনূলফ্ উক্ত সভায় সমবেত সমস্ত ইংরাজের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ তাঁহাদিগের সকলকেই 'নাইট' উপাধি প্রদান করিলেন। উক্ত সভায় প্রায় চারি সহস্র ইংরাজ সমবেত হইয়াছিলেন। গবর্ণর মৃত স্কট্ ব্যারন-গণের সম্পত্তি তাঁহাদিগকে ভাগ করিয়া দিবেন, প্রতিশ্রুত হইলেন। সমবেত সভামণ্ডলীর সম্বর্দ্ধনার্থ প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন হইয়াছিল। ইংরাজেরা পান-ভোজনাদির আতিশয্যে বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পড়িলেন।

সেই বিশ্বাসিনী স্বজাতিপ্রেমিকা রমণী এই সংবাদ ল্যাঙলেন্ অরণ্যে ওয়ালেসের নিকটে লইয়া গেলেন। ওয়ালেসের নিকটে ইত্যবসরে অনেক লোক আসিয়া জুটিয়াছিল। তিনি আশু তাহাদিগকে আয়ারের ভীষণ হত্যা-কাণ্ডের প্রতিশোধ লইবার জন্য উদ্দীপিত করিলেন। যদিও তিনি পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডের অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছিলেন, তথাপি তখন সকলে উপস্থিত ছিলেন না বলিয়া, তিনি নব-নির্ব্বাচনের জন্য পাঁচ জন লোককে মনোনীত করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে ওয়ালেস্, বইড্, ক্রফোর্ড, এডাম্ ও অচিঙলেক্ এই পাঁচ জন নির্ব্বাচিত হইলেন। এই পাঁচ জন অক্ষ দ্বারা আপনাদিগের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে

কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিন বার পাশা পড়িল, তিন বারই ওয়ালেসের নাম উঠিল। তখন তিনি সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন এবং অসি নিষ্কোষিত করিয়া শপথ করিলেন যে, আয়ারের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ না লইয়া জলগ্রহণ করিবেন না।

তৎক্ষণাৎ ওয়ালেসের কার্য্য-প্রণালী স্থির হইয়া গেল। তিনি স্থির করিলেন, আয়ারের সৈন্যাবাসে ও আয়ার নগরের যে যে গৃহে সেই রাত্রিতে ইংরাজ অবস্থিতি করিতেছেন অগ্নি প্রদান করিবেন। তিনি সেই বিশ্বাসিনী রমণীকে ও আয়ারের কতিপয় অধিবাসীকে ইংরাজাধিষ্ঠিত গৃহ সকলের দ্বারে খড়ির দাগ দিবার জন্য আয়ার নগরে পাঠাইয়া দিলেন এবং আর বিশ জন লোককে সেই সকল দ্বারে দহ্যমান পদার্থ সংলগ্ন করিতে পাঠাইলেন। চতুর্দ্দিকে যখন আগুন লাগিবে, তখন নগররক্ষার জন্য দুর্গ হইতে সৈন্য বাহির হইতে না পারে, এই জন্য আর পঞ্চাশ জন লোক সহ রবার্ট বইডকে দুর্গদ্বার রক্ষার জন্য পাঠাইলেন। অবশিষ্ট লোক জন সহ তিনি স্বয়ং বারনস বা সৈন্যাবাস-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং চিহ্নিত গৃহমাত্রের দ্বারে এক এক দল লোক পাঠাইলেন। এক সময়েই বারনুসে ও চিহ্নিত গৃহমাত্রে অগ্নিপ্রদান করা হইল। দহ্যমান-পদার্থসংযোগে অগ্নিপ্রদান মাত্র চতুর্দ্দিকে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পানপ্রমত্ত ইংরাজ যেখানে ছিল পুড়িয়া মরিল।

সে রাত্রিতে দুর্গমধ্যে অতি অল্প সৈন্য ছিল, সকলেই প্রায় সভায় আসিয়াছিল। যাহারা দুর্গমধ্যে ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশই উত্তাল অগ্নিতরঙ্গ দেখিয়া দুর্গ হইতে বাহির হইতে চেষ্টা করিল। বইড তাহাদিগকে কোন বাধা দিলেন না। কিন্তু দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহারা দুর্গে ছিল, তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিয়া দুর্গ দখল করিলেন। তিনি দুর্গরক্ষার জন্য বিশ জন লোক রাখিয়া, নগরের শান্তিরক্ষা-বিষয়ে ওয়ালেসের সাহায্য করিবার জন্য অবশিষ্ট লোক সহ দুর্গ হইতে বহির্গত হইলেন। সেই রাত্রিতে আয়ারে সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চসহস্র ইংরাজ বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের ঘোরতর পাপের করাল গ্রাসে পতিত হন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

যখন সকলে আসিয়া মিলিত হইলেন, তখন ওয়ালেস্ অবিলম্বে গ্লাস্গো যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কারণ, সেখানেও এইরূপ একটী সভার অধিবেশন হইবার কথা আছে, এবং ওয়ালেসের মনে আশঙ্কা হইল, হয়ত তাঁহার বন্ধুবর্গ ও আত্মীয় স্বজনের সেখানে কোন বিপদ ঘটিয়াছে। তিনি এই সঙ্কল্প করিয়া আয়ারের প্রধান অধিবাসিগণকে ডাকাইলেন। তাঁহাদিগের

হস্তে তাহার প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত দুর্গ ও নগর-রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া তিন শত অশ্বারোহী সহ গ্লাসগো-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদিগের অশ্ব ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মৃত ইংরাজ-সৈনিক-পুরুষগণের অশ্ব সকল হইতে বাছিয়া তিন শত উৎকৃষ্ট অশ্ব লইলেন। একাধিক তিন শত অশ্বারোহী অতি প্রচণ্ডবেগে নিমেষ-মধ্যে গ্লাসগোর তোরণ-দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। ইংরাজেরা ভয়ে অধীর হইলেন। বিসপ্ বেকের হস্তে নগর ও দুর্গরক্ষার ভার অর্পিত ছিল, তিনি অবিলম্বে এক সহস্র সৈন্য সমবেত করিলেন। ওয়ালেস তাঁহার ক্ষুদ্র অশ্বসেনাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া এক ভাগ আচিণ্ডলেকের হস্তে সমর্পণ করিলেন, ও এক ভাগের অধিনায়কত্ব নিজের হস্তে রাখিলেন। দুই জনে দুই দিক হইতে নগর আক্রমণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ইংরাজেরা ওয়ালেসের সৈন্যের অল্পতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অচিরকাল-মধ্যেই উভয় দলে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। যদিও ইংরাজদিগের দিকে সৈন্য সংখ্যা প্রায় চারি গুণ ছিল, তথাপি ওয়ালেস্ ও তদীয় বীরবৃন্দ অদমিত-তেজে ইংরাজ-অশ্বারোহিগণকে পাতিত করিতে লাগিলেন। ওদিকে অচিণ্ড্লেকের সৈন্য উত্তর দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিল। ইংরাজ-বাহিনী অতঃপর দ্বিধা বিভক্ত হইল। অচিণ্ড্লেকের সৈন্য অমিত বেগে আসিয়া শত্রুসেনাকে ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। সেই অবসরে ওয়ালেস্ও অগ্রসর হইয়া প্রচণ্ড অসিপ্রহারে ইংরাজ-পতাকাধারীর মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পতাকাধারীর পতনে ইংরাজ সেনা একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল। চারি শত ইংরাজ বিসপ্ বেক্কে লইয়া দক্ষিণারণ্যের অভিমুখে পলায়ন করিল। ওয়ালেস সদলে তাহাদিগের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া অধিকাংশকেই ভূতলশায়ী করিলেন। সার্ আমের ডি ভালেন্সের সাহায্যে বেক্ কতিপয় মাত্র সহচর-সমভিব্যাহারে কেবল প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে পাইয়াছিলেন।

জাতীয় দলের এই সকল অবদান-পরম্পরায় আশ্বস্ত হইয়া স্কট্লণ্ডের অনেক জমিদার (লর্ডস) ক্রমে ক্রমে এড্ওয়ার্ডের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে লাগিলেন। বুকান্, অ্যাথোল্, মেন্টীথ্, লোবেন, সার নীল্ ক্যাম্বেল, ডঙ্কান্ প্রভৃতি প্রাচীন-বংশধরগণ সকলেই এড্ওয়ার্ডের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় দলের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ম্যাক্ফ ডিয়েন্ ও চারি জন মাত্র জমিদার এড্ওয়ার্ডের স্বাপক্ষ্যে রহিলেন। ইহাঁরা পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য লইয়া সার্ নীল্ ক্যাম্বেলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাম্বেলের নগরী পরিখাবেষ্টিত ছিল। সেই পরিখার

উপরি কেবল একটী মাত্র লম্বমান সেতু ছিল। ক্যাম্বেল্ সেই সেতু ফেলিয়া দিলেন। শত্রুসেনা পরিখা পার হইতে সাহস না করিয়া পরিখার অপর পারে অবস্থিতি করিতে লাগিল। এদিকে ক্যাম্বেল এই সংবাদ দিবার জন্য ওয়ালেসের নিকটে দূত পাঠাইলেন। ক্যাম্বেল্ ও ওয়ালেস্ ডণ্ডীর স্কুলে একত্র পড়িয়াছিলেন। স্বদেশানুরাগের গভীর ভাব উভয়েরই অন্তরে সেই সময়ে পরিপুষ্ট হয়। আবল্ ডঙ্কান্ এই দৌত্য কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে ডনডাফ দুর্গে ওয়ালেস্‌কে প্রাপ্ত হন। তিনি শুনিবামাত্র সার জন্ গ্রেহাম্‌কে লইয়া ক্যাম্বেলের সাহায্যার্থ বহির্গত হইলেন।

এই সময়ে এডওয়ার্ড-পক্ষপাতী আব্ল রোক্বী অসংখ্য সৈন্য সহ 'ষ্ট্রালিং কাসল্' নামক দুর্গে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই পথ দিয়া আসিবার সময়ে ঐ দুর্গ দখল করিবার বাঞ্ছা ওয়ালেসের মনে বলবতী হইল। যখন ওয়ালেস্ এই দুর্গ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আরল্ ম্যাল্কম সসৈন্য তাঁহার সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তিনি এই মিলিত সেনাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রধান ভাগ ম্যাল্কমের কাছে রাখিয়া এক শত দৃঢ়কায় ও রণকুশল সৈন্য লইয়া আপনি ও গ্রেহাম—দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রোক্বী এই অল্পসংখ্যক স্কটীশ সেনা উপেক্ষা করিয়া সাত কুড়ি তীরন্দাজ লইয়া তাহাদিগের সম্মুখীন হইলেন। উভয় সৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। গ্রেহাম্ যেমন বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন, অমনি ইংরাজ তীরন্দাজের তীরে তাঁহার অশ্ব বিদ্ধ হইল। গ্রেহাম লম্ফ দিয়া ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিলেন দেখিয়া, ওয়ালেস্‌ও নিজ অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারী হইলেন। উভয়ে পাদচারী হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ম্যাল্কম অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইংরাজ-সেনা চমকিত হইল। তাহারা পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পথ পাইল না। থড়্গাথড়্গি ও হস্তাহস্তি হইতে হইতে ওয়ালেস্ রোক্বীর সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন। অমনি তাঁহার অসি তাঁহার মস্তকে পড়িয়া তদীয় শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিল। ক্রমে স্কট্‌বীরদলের অব্যর্থ অস্ত্রে সমস্ত ইংরাজ-সৈন্য নিহত হইল। কেবল রোক্বীর দুই পুত্র ও বিংশতিমাত্র সৈন্য অবশিষ্ট রহিল। তাঁহারা আত্মসমর্পণ করায় 'ষ্টার্লিঙ কাসল' স্কটদিগের হস্তগত হইল। এই দুর্গ রক্ষার ভার ম্যাল্কমের হস্তে সমর্পণ করিয়া ওয়ালেস্ ক্যাম্বেলের সাহায্যার্থে ধাবিত হইলেন।

মরকত মণি।

উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ মণি-বিশেষের নাম "মরকত"। আধুনিক জহুরীরা ইহাকে "পান্না" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। অমরসিংহের অভিধান গ্রন্থে ইহার "গারুত্মত" "অশ্মগর্ভ" "হরিন্মণি" এই তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি অন্যান্য কোষ গ্রন্থে "মরকত" "রাজনীল" "গরুডাঙ্কিত" "রৌহিণেয়" "সৌপর্ণ" গরুড়োদ্গীর্ণ" "বুধরত্ন" "গরুড়" "পাচি" প্রভৃতি নাম আছে। বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, গরুড়পুরাণ, শুক্রনীতি, মানসোল্লাস, রাজনির্ঘণ্ট, যুক্তিকল্পতরু, অগস্তিমত ও মণিপরীক্ষা প্রভৃতি পুরাতন গ্রন্থে এই রত্নের বর্ণ, ছায়া, গুণ, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি নির্ণীত আছে।

বর্ণ ও লক্ষণ।

"শুকবংশপত্রকদলীশিরীষকুসুমপ্রভং
গুণোপেতম্।
সুরপিতৃকার্য্যে মরকতমতীব শুভদং
নৃণাং বিধৃতম্।"
[বৃহৎসংহিতা।

শুক পক্ষীর পক্ষ, বংশপত্র,(কচি পাতা নহে), কদলী ও শিরীষ পুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, প্রভাশালী ও গুণযুক্ত মরকত মণি ধারণ করিলে, অত্যন্ত শুভ হয়।

"ময়ূরচাষপত্রাভা পাচির্বুধহিতা হরিৎ।"
[শুক্রনীতি।

ময়ূর ও নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায় আভাযুক্ত, হরিদ্বর্ণের মরকত মণি বুধগ্রহের প্রীতিজনক।

"শুকপক্ষনিভঃ স্নিগ্ধঃ কান্তিমান্
বিমলস্তথা।
স্বর্ণচূর্ণনিভৈঃ সূক্ষ্মৈর্মরকতৈশ্চৈব বিন্দুভিঃ।
[অগ্নিপুরাণ।

মরকত অর্থাৎ মরকত মণির বর্ণ, শুক পক্ষীর পক্ষের সদৃশ, স্নিগ্ধ, লাবণ্যযুক্ত এবং সুনির্ম্মল। ইহার অভ্যন্তর যেন সূক্ষ্ম সুবর্ণচূর্ণ-বিন্দুরাশি-পরিপূরিত রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞান হয়। এ লক্ষণটী সকল পান্নায় থাকে না।

"ইন্দ্রায়ুধসগর্ভেন হরিতেন সমপ্রভম্।
কীরপক্ষসমাচ্ছায়ং গরুড়োরঃসমুদ্ভবম্।
শস্তং মরকতং কান্তং নলিকাগ্রদলপ্রভম্।"
[মানসোল্লাস।

ইন্দ্রধনুর গর্ভস্থ হরিদ্বর্ণের তুল্য বর্ণ, চাষ বা ময়ূর পক্ষীর পক্ষের ন্যায় ছায়াবিশিষ্ট, মনোহর ও কমনীয়কান্তি মরকত গরুড়ের বক্ষ হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা নলিকা নামক গন্ধদ্রব্যের অগ্রভাগের প্রভার ন্যায় প্রভাবিশিষ্টও হইয়া থাকে।

"স্বচ্ছঞ্চ গুরুসচ্ছায়ং স্নিগ্ধগাত্রঞ্চ মার্দব-
সমেতম্।
অব্যঙ্গং বহুরঙ্গং শৃঙ্গারীং মরকতং শুভং
বিভৃয়াৎ।"
[রাজনির্ঘণ্ট।

স্বচ্ছ অর্থাৎ সুনির্ম্মল, ওজনে ভারি, ছায়াযুক্ত, স্নিগ্ধগাত্র, অতীক্ষ্ণকান্তি অব্যঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গহীন নহে বা সুন্দর গঠন, শৃঙ্গারগুণবর্দ্ধক;—এরূপ শুভ মরকত ধারণ করাই কর্ত্তব্য।

"শর্করিলকলিলরুক্ষং মলিনং লঘু-
হীনকান্তিকল্মাষম্।
ত্রাসযুক্তং বিকৃতাঙ্গং মরকতমমরাঃ অপি
নোপভুঞ্জীত।"
[রাজনির্ঘণ্ট।

শর্করিল অর্থাৎ কাঁকরদার, কলিল অর্থাৎ আবিল, রুক্ষ অর্থাৎ অস্নিগ্ধ, মলিন, ওজনে হালকা, হীনকান্তি, কল্মাষ বর্ণ, ত্রাসদোষযুক্ত, বিকৃতাঙ্গ অর্থাৎ মন্দ গঠন, অমর হইলেও এরূপ মরকত উপভোগ করিবে না।

এতদ্ভিন্ন গরুড়পুরাণের ৭১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি, আকার, বর্ণ, ছায়া, দোষ, পরীক্ষা ও মূল্যাদি উত্তমরূপে নির্ণীত হইয়াছে। পাঠকগণের পরিতৃপ্তির জন্য তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

সূত উবাচ।

দানবাধিপতেঃ পিত্তমাদায় ভুজগাধিপঃ।
দ্বিধা কুর্ব্বন্নিব ব্যোম সত্বরং বাসুকির্যযৌ॥
স তদা স্বশিরোরত্নপ্রভাদীপ্তেনভোহম্বুধৌ
বরাজ স মহানেকঃ খণ্ডসেতুরিবাবভৌ॥
ততঃ পক্ষনিপাতেন সংহরন্নিব রোদসী।
গরুত্মান্ পন্নগেন্দ্রস্য প্রহর্ত্তুমুপচক্রমে॥
সহসৈব মুমোচ তৎ ফণীন্দ্রঃ
সুরসাহ্বাক্ততুরস্কপাদপায়ান্।
নলিকাবনগন্ধবাসিতায়াং
বরমাণিক্যগিরেরুপত্যকায়াম্॥

তস্য প্রপাত সমনন্তরকালমেব
তদ্বল্লালয়মণীন্দ্রবমাসমীপে।
স্থানং ক্ষিতেরুপপয়োনিধিতীরলেখম্।
তৎ প্রত্যয়াম্মরকতাকরতাং জগাম॥
তত্রৈব কিঞ্চিৎ পততস্তু পিত্তাৎ
উৎপত্য জগ্রাহ ততো গরুত্মান্।
মূর্চ্ছাপরীতঃ সহসৈব ঘোণা
রন্ধ্রদ্বয়েন প্রমুমোচ সর্ব্বম্॥
তত্রা কঠে বস্তুককণ্ঠ-শিরীষপুষ্প-
খদ্যোতপৃষ্ঠবরশাদ্বল শৈবালানাম্।
কহ্লর শষ্পকভুজঙ্গভুজাঞ্চ পত্র-
প্রাপ্তত্বিষা মরকতাঃ শুভদা ভবন্তি॥
"তদ্‌যত্র ভোগীন্দ্রভুজা বিমুক্তং
পপাত পিত্তং দিতিজাধিপস্য।
তস্যাকরস্যাতিতরাং সদেশো
দুঃখাপলভশ্চ গুণৈশ্চ যুক্তঃ॥
তস্মিন্ মরকতস্থানে যৎকিঞ্চিদুপজায়তে।
তৎ সর্ব্বং বিষরোগাণাং প্রশমায়
প্রকীর্ত্তিতে॥
সর্ব্বমন্ত্রৌষধিগণৈর্যন্ন শক্যং চিকিৎসিতুম্
মহাহিদন্দ্রষ্ট্রাপ্রভবং বিষং তৎ তেন
শাম্যতি॥
অন্যমপ্যাকরে তত্র যদ্দোষৈরুপবর্জ্জিতম্।
জায়তে তৎ পবিত্রাণামুত্তমং পরিকীর্ত্তিতম্॥
অত্যন্তহরিদ্বর্ণং কোমলমর্চ্চিবিচ্ছেদ-
জটিলঞ্চ।
কাঞ্চনচূর্ণস্যান্তঃ পূর্ণমিব লক্ষ্যতে যচ্চ॥
যুক্তং সংস্থানগুণৈঃ সমরাগং গৌরবেণ
হীনম্।
সবিতুঃ করসংস্পর্শাৎ ছুরয়তি সর্ব্বাশ্রমং
দীপ্ত্যা॥

হিত্বা চ হরিতং তং যস্যাস্তর্বিনিহিতা
ভাবেদ্ধাপ্তিঃ।
অচিরপ্রভা প্রভাহতনবশাদ্বলসন্নিভা
ভাতি ॥
যচ্চ মনসঃ প্রসাদং বিদধাতি
নিরীক্ষিতমতিমাত্রম্।
তন্মরকতং মহাগুণমিতি রত্নবিদাং
মনোবৃত্তিঃ ॥
যস্তু ভাস্করসংস্পর্শাৎ ভস্মনাম্লামচামণিঃ
রশ্ময়েদাত্মপাদৈস্তু মহামরকতং হি তৎ।
চতুর্ধা জাতিভেদস্তু মহামরকতে মণৌ।
ছায়াভেদেন বিজ্ঞেয়া চতুর্বর্ণা লক্ষণৈঃ ॥"

সূত ঋষিগণকে বলিতেছেন,—

ফণিপতি বাসুকি সেই দৈত্যপতির পিত্ত আচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া আকাশকে যেন দ্বিধাকরতঃ গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি তখন স্বীয় মস্তকস্থ মণির প্রভাসমূহে সমুজ্জ্বল আকাশ-সমুদ্রের মধ্যে যেন এক খণ্ড সেতুর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অনন্তর পক্ষীন্দ্র গরুড় যেন আকাশকে সংক্ষেপ করতঃ সর্পরাজ বাসুকিকে প্রহার বা গ্রাস করিবার উপক্রম করিলেন।

ফণিপতি বাসুকি তৎক্ষণাৎ সেই পিত্তরাশিকে সর্পগণের আদি মাতা সুরমা প্রভৃতির উক্তি ক্রমে তুরস্ক দেশের পাদপীঠস্বরূপ বা প্রত্যন্ত পর্ব্বতের নলিকাবন-গন্ধ-গন্ধীকৃত উপাত্যকা-প্রদেশে ফেলিয়া দিলেন। (নলিকা এক প্রকার প্রবলাকৃতি সুগন্ধ দ্রব্য। ইহা উত্তরাপথে পাঁঠারী নামে প্রসিদ্ধ)।

সেই পিত্তের পতনের পর, সেই পিত্তরূপ কারণ হইতে তৎসমীপস্থ পৃথিবীর সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সকল মরকত মণির আকর হইয়াছে। *

সেই পিত্তের পতনকালে গরুড় তাহার কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পুনশ্চ তাহা নাসারন্ধ্র দ্বারা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

তাহা হইতে অবকাশ, শুক পক্ষীর কণ্ঠ ছবি, এবং শিরীষ পুষ্প, খদ্যোত পৃষ্ঠ নবশষ্প, শৈবাল, কহ্লার (সুঁদী ফুল) পুষ্পের পাপড়ীর ন্যায় ও ময়ূরপুচ্ছের পার্শ্বভাগের ন্যায় আভাযুক্ত শুভদায়ক মরকত সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে।

গরুড় কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত দৈত্যপতির পিত্ত যে যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই মরকতাকর স্থান গুলি দুর্গম ও গুণযুক্ত।

সেই মরকত স্থানে যাহা কিছু উৎপন্ন

---

* পিত্তের বর্ণ সবুজ, পান্নার বর্ণও সবুজ। এই উপমা উপলক্ষ করিয়া রূপকপ্রিয় পৌরাণিকেরা অসুরের পিত্তে পান্নার জন্ম বর্ণনা করিলেন এবং তুরস্ক দেশের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত ও উপত্যকায় তাহার আকর আছে, ইহাও নির্ণয় করিলেন। এই মতের সহিত অগস্তি প্রোক্ত মণি-পরীক্ষার ঐক্য আছে। যথা—"প্রভ্রষ্টং তদা তৎ পিত্তং মুখস্থং ধরণীতলে। পতিতং দুর্গমে স্থানে বিষমে তুর্ধমেঽপি চ। তুরুষ্কবর্ষস্য স্থানে উদধেস্তীর-সন্নিধৌ। ধরণীন্দ্রগিরিস্তত্র ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ। তত্র জাতা-স্তরাঃ শ্রেষ্ঠা মরকতা মহামুনে!" ইতি।

হয়, সেই সমস্তই বিষ-রোগের নাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

সমুদায় ঔষধ ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল মহাসর্পের দংশোৎপন্ন বিষের চিকিৎসা করা যায় না—তাহা মরকত দ্বারা উপশান্ত হয়।

সেই আকরে অন্য যে কোন নির্দোষ মণি উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই উত্তম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

যাহা অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ, অতীক্ষ্ণ, কিরণাবলি-জড়িত, যাহার অভ্যন্তর কাঞ্চনচূর্ণ-পূর্ণের ন্যায় লক্ষ্য হয়, যাহার গঠন পরিপাটী উত্তম ও গুণশালী, যাহার সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ, ওজনে হাল্‌কা, সূর্য্য-কিরণের যোগ হইলে, যাহা সমস্ত গৃহকে প্রভা পরিপূরিত করে, যাহা হরিত ভাব ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ দীপ্তি অভ্যন্তরেই নিহিত রাখে, যাহার অভ্যন্তর নিতান্ত হরিদ্বর্ণ নহে, অথচ যেন দীপ্তিপরিপূর্ণ এবং যাহা বিদ্যুৎপ্রভা-প্রতিবিম্ব নূতন ঘাসের ন্যায় আভাযুক্ত, যাহা দেখিবামাত্র মনোমধ্যে অত্যন্ত হর্ষ উৎপাদন করে, রত্নবিৎ পণ্ডিতগণের মতে তাদৃশ মরকতই মহাগুণবিশিষ্ট।

যে মহামণি করতলে থাকিয়াও সূর্য্য-কিরণ-সংসর্গে আত্মরশ্মি দ্বারা নিকটস্থ বস্তুকে অনুরঞ্জিত করে, তাহা মহামরকত নামে অভিহিত হয়। মহামরকত মণির ছায়া বা বর্ণের ভিন্নতা অনুসারে চারি প্রকার জাতির কল্পনা করা হইয়া থাকে।

ছায়ার ভিন্নতা।

"ভবেদষ্টবিধা ছায়া মণের্ম্মরকতস্য চ।
বর্হিপুচ্ছসমাভাসা চাষপক্ষসমাপরা॥
হরিকাচনিভা চান্যা তথা শৈবালসন্নিভা
খদ্যোতপৃষ্ঠসংকাশা বালকীরসমা তথা॥
নবশাদ্বলসচ্ছায়া শিরীষকুসুমোপমা।
এবমষ্টৌ সমাখ্যাতাশ্ছায়া মরকতাশ্রয়াঃ
ছায়াভির্গুরুমেতাভিঃ
শ্রেষ্ঠং মরকতং ভবেৎ॥
পদ্মরাগগতঃ স্বচ্ছো
জলবিন্দুর্যথা ভবেৎ।
তথা মরকতচ্ছায়া শ্যামলা হরিতামলা॥"

মরকত মণির আট প্রকার ছায়া হইয়া থাকে। ময়ূরপুচ্ছের ন্যায়, চাষ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ পক্ষীর পক্ষের ন্যায়, হরিদ্বর্ণ কাচের ন্যায়, শৈবালের ন্যায়, খদ্যোত (জোনাক পোকার) পৃষ্ঠের ন্যায়, শুকশাবকের ন্যায় নব-দূর্ব্বাদলের ন্যায় ও শিরীষ পুষ্পের ন্যায়। মরকতের এই প্রকার ছায়া বা বর্ণ বিখ্যাত। এই সকল বর্ণের মরকত শ্রেষ্ঠ। পদ্মরাগ-গত নির্ম্মল জলবিন্দু যেরূপ, মরকতের ছায়াও সেইরূপ নির্ম্মল, হরিৎ বা শ্যামল।

গুণ ও দোষ।

"স্বচ্ছতা গুরুতা কান্তিঃ স্নিগ্ধত্বং পিত্তকারণম্।
হরিদ্বিরঞ্জকঞ্চৈব সপ্ত মারকতে গুণাঃ॥

নির্ম্মলত্ব, গুরুত্ব (ভার), কান্তিযুক্তত্ব স্নিগ্ধত্ব, পিত্তকারণত্ব, হরিদ্বর্ণতা ও রঞ্জকতা,—এই সাত প্রকার গুণ মরকতের

লক্ষণ। মরকতের সাতটী দোষ ও পাঁচটী গুণের উল্লেখ আছে। যথা—

"দোষাঃ সপ্ত ভবন্ত্যস্য
গুণাঃ পঞ্চ [illegible]ঃ।"

সেই মরকত মণির ৭ প্রকার গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"অস্নিগ্ধং রুক্ষমিত্যুক্তং ব্যাধিস্তস্য ধৃতে ভবেৎ।
বিস্ফোটঃ স্যাৎ সপিড়কে তত্র শস্ত্রহতি-র্ভবেৎ॥
সপাষাণে ভবেদিষ্টনাশো মরকতে ধৃতে।
বিচ্ছায়ং মলিনং প্রাহুর্বার্য্যতে ন তু ধার্য্যতে
শর্করং কর্করাযুক্তং পুত্রশোকপ্রদং ধৃতম্।
জরঠং কান্তিহীনন্তু দংষ্ট্রিবহ্নিভয়াবহম্॥
কল্মাসবর্ণং ধবলং ততো মৃত্যুভয়ং ভবেৎ
ইতি দোষাঃ সমাখ্যাতা বর্ণ্যন্তেঽথ মহাগুণাঃ॥

রুক্ষ, বিস্ফোট, সপাষাণ, বিচ্ছায়, শর্কর, জরঠ ও ধবল—এই সাতটী মহাদোষ। রুক্ষ—অস্নিগ্ধ। রুক্ষ মরকত ধারণ করিলে, ব্যাধি জন্মে। বিস্ফোট—পিড়কাযুক্ত (ফুলকুঁড়ির ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুমালায় আচিত)। এই বিস্ফোট মরকত ধারণ করিলে, শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়। সপাষাণ—অন্য প্রস্তরখণ্ড-যুক্ত। সপাষাণ মরকত ধারণ করিলে, ইষ্টনাশ হয়। বিচ্ছায়—মলিন অথবা বিকৃতবর্ণ। এই বিচ্ছায় মরকত পরিত্যাগ করিতেই হয়, ধারণ করিতে হয় না। শর্কর—কাঁকরযুক্ত। শর্কর মরকত ধারণ করিলে, পুত্রশোক জন্মে। জরঠ—কান্তিহীন। এই জরঠ মরকত ধারণ করিলে, দন্তর (দন্তুর) ভয় ও বহ্নিভয় উৎপন্ন হয়। ধবল—কল্মাষ অর্থাৎ বিচিত্র বা বিরুদ্ধ বর্ণযুক্ত। ইহা ধারণ করিলে, মৃত্যুভয় জন্মে। এই সাত প্রকার মহাদোষ ব্যাখ্যাত হইল। এক্ষণে মহাগুণ সকলের বর্ণনা করিব।

"নির্ম্মলং কথিতং স্বচ্ছং গুরু স্যাৎ গুরুতা-যুতম।
স্নিগ্ধং রুক্ষবিনির্ম্মুক্তমরজস্করেণুকম্॥
সুরাগং রাগবহুলং মতাঃ পঞ্চগুণা মহাঃ।
এতৈর্যুক্তং মরকতং সর্ব্বপাপভয়াপহম্॥"

স্বচ্ছ, গুরু (ভারি) স্নিগ্ধ, অরজস্ক, সুরাগ,—এই পাঁচটী মহাগুণ। এতদ্গুণ-যুক্ত মরকত সমুদয় পাপভয় নাশ করে। স্বচ্ছ—নির্ম্মল। গুরু—ওজনে ভারি। অরজস্ক—রেণুবর্জ্জিত। সুরাগ—বর্ণাধিক্য বা সকল দিকে সমান রঙ্।

ফলশ্রুতি।

"গজবাজিরথম্ দত্বা বিপ্রেভ্যো বিস্তরাদ্ধি যে।
তৎফলং সমবাপ্নোতি শুদ্ধে মরকতে ধৃতে
ধনধান্যাদিকরণে তথা সৈন্যক্রিয়াবিধৌ।
বিষরোগোপশমনে কর্ম্মাথর্ব্বণেষু চ॥
শস্যতে মুনিভিরস্মাদয়ং মরকতো মণিঃ॥'

ব্রাহ্মণকে হস্তী, অশ্ব ও রথ দান করিলে যে ফল হয়, নির্দ্দোষ মরকত ধারণ করিলে, সেই ফল হইয়া থাকে। মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ধন-ধান্যাদি-ঘটিত কার্য্যে, সৈনিককার্য্যে, বিষচিকিৎ-

সায় ও অভিচারাদি কার্য্যে এই মণি অতি সুপ্রশস্ত।

"স্নানাচমনজাপ্যেষু রক্ষামন্ত্রক্রিয়াবিধৌ।
দদদ্ভির্গোহিরণ্যানি কুর্ব্বদ্ভিঃ সাধনানি চ॥
দৈবপিত্র্যাতিথেয়েষু গুরুসম্পূজনেষু চ।
বাধ্যমানেষু বিষমে দোষজাতৈর্বিষোদ্ভবৈঃ॥
দোষৈর্হীনং গুণৈর্যুক্তং কাঞ্চনপ্রতি-
যোজিতম্।
সংগ্রামে বিবিক্ষিশ্চ ধার্য্যং মরকতং বুধৈঃ॥"

স্নান, আচমন, জপ, রক্ষাকার্য্য, মন্ত্রপ্রয়োগ ও তদনুষ্ঠান-কালে এবং যাহারা গো হিরণ্য দান করিবেন, সাধনা করিবেন, তাঁহারা দেব, পিতৃ ও অতিথি-সৎকার-কালে ও গুরুপূজাকালে নির্দ্দোষ ও গুণযুক্ত মরকত সুবর্ণের সহিত যুক্ত করিয়া ধারণ করিবেন। যাঁহারা যুদ্ধে বিচরণ করেন, তাঁহারাও ধারণ করিবেন।

পরীক্ষা।

অন্যান্য মণির ন্যায় ইহাও কৃত্রিম, কি অকৃত্রিম, জাত, কি বিজাত, তাহা পরীক্ষা করিতে হয়।

"কৃত্রিমত্বং সজত্বং দৃশ্যতে সূরিভিঃ
ক্কচিৎ।
ঘর্ষয়েৎ প্রস্তরে বাল্মকাচত্তম্মাদ্বিপদাগে॥"

রত্নজ্ঞ পণ্ডিত রত্ন কৃত্রিম, কি স্বাভাবিক, তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। কখন কখন পরীক্ষাবলম্বন করিয়াও থাকেন। সন্দেহ হইলে, তাহাকে প্রস্তরে ঘর্ষণ করিবে। বাল্ম ও কাঁচ নামক বিজাত হইলে কৃত্রিম মাণিক্য ভাঙ্গিয়া যাইবে, অকৃত্রিম বা সাচ্চা পান্না ভাঙ্গিবে না।

"লেখয়েল্লৌহভৃঙ্গেন চূর্ণেনাথ বিলেপয়েৎ
সহজঃ কান্তিমাপ্নোতি কৃত্রিমো
মলিনায়তে॥"

তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকা দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গে চূর্ণ লেপন করিবে। ইহা করিলে, স্বাভাবিক মরকত উজ্জ্বল হইবে। আর কৃত্রিম হইলে, মলিন হইয়া যাইবে।

"বর্ণাঢ্যাতিবহুত্বাৎ যদ্যান্তঃ স্বচ্ছকিরণ-
পরিধানম্।
সান্দ্রস্নিগ্ধ বিশুদ্ধং কোমলবর্হপ্রভাদি-
সমবাপ্তি।
চলোজ্জ্বলয়া কান্ত্যা সান্দ্রাকারং
বিভাময়া ভাতি।
তদপি গুণবৎ সংজ্ঞামাপ্নোতি হি যাদৃশং
পূর্ব্বম্॥
সকলং কঠোরং মলিনং রুক্ষং পাষাণ-
কর্করোপেতম্।
নিষ্কৃষ্ট শিলাজতুনা মরকতমেবংবিধং
বিগুণম্॥"

অত্যন্ত রঙদার অথচ অভ্যন্তর নির্ম্মল, প্রভাপরিপূর্ণ, যাহা নিবিড়, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, কোমলকান্তিযুক্ত ও ময়ূরপুচ্ছপ্রভার ন্যায় কান্তিযুক্ত, যাহা অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি-ছটা দ্বারা নিবিড়ের ন্যায় দেখায়, তাহাও গুণবৎ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

অস্তভয়, কঠোর, মলিন, রুক্ষ,

পাষাণ ও কর্করযুক্ত, শিলাজতু-দগ্ধ মরকত নির্গুণ বলিয়া অগ্রাহ্য।

"সন্ধিশ্লেষিতং রত্নমনাস্ন্নবতান্তবেৎ।
শ্রেয়স্কামৈর্ন তৎ ধার্য্যং ক্রেতব্যং বা কথঞ্চন।,,

যে রত্ন মরকত হইতে ভেদপ্রাপ্ত ও বিশ্লিষ্ট সন্ধি হয়, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাহা ধারণ করিবেন না, ক্রয়ও করিবেন না।

"ভল্লাতঃ পুত্রিকাকাচস্তদ্বর্ণমনুযোগতঃ।
মণের্মরকতস্যোক্তে লক্ষণীয়া বিজাতয়ঃ।"

মরকত মণির ভল্লাত, পুত্রিকা ও কাচ—এই তিন প্রকার বৈজাত্য আছে। অর্থাৎ এই উক্ত তিন প্রকার ঝুটা পান্না হয়। পণ্ডিতেরা তাহা বর্ণ ও যোগ-ক্রমে অনুমান করিয়া থাকেন।

"ক্ষৌমেণ বাসসা ঘৃষ্টা দীপ্তিং ত্যজতী পুত্রিকা।
লাঘবেনৈব কাচস্য শক্যা কর্ত্তুং বিভাবনা।।
কস্যচিদনেকরূপৈর্মরকতসমনুগচ্ছতোঽপি গুণবর্ণৈঃ।
ভল্লাতস্য নিবেত্তুর্বৈশদ্যমুপৈতি বর্ণস্য।

ক্ষৌম বস্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, পুত্রিকা নামক বিজাত মরকতের দীপ্তি লোপ হইয়া যায়। লঘুত্ব অর্থাৎ ওজন দ্বারা কাচ নামক বিজাত মণি জানা যায়। অনেকবিধ গুণবর্ণ-বিশিষ্ট মরকতের সঙ্গে অনুগত করিয়া বর্ণের বৈশদ্য নির্ণয় করিয়া দেখিলে, ভল্লাত নামক বৈজাত্যও নির্ণয় করা যায়। এতদ্ভিন্ন ঊর্দ্ধগামিনী প্রভা দ্বারা অন্যান্য প্রকার বৈজাত্য জানা যায়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

মূল্য।

"তুলয়া পদ্মরাগস্য যন্মূল্যমুপজায়তে।
লভ্যতেঽভ্যধিকং তস্মাৎ গুণৈর্মরকতং শুভম্।।

রত্নশাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে, যে, একটী মরকত মণি যদি ওজনে সমান হয়, তাহা হইলে সেই পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকত মণিটীর মূল্য অধিক হইবে।

"তথাচ পদ্মরাগাণাং দোষৈর্মূল্যং প্রহীয়তে।
ততোঽস্মিন্নপি সা হানি দোষৈর্মরকতে ভবেৎ।।,,

এবং যে সকল দোষে পদ্মরাগ মণির মূল্যের অল্পতা হয়, মরকত মণিতেও সেই দোষে মূল্যহানির কল্পনা করা হয়।

"গুণপিণ্ডসমাযুক্তে হরিতশ্যামভাস্বরে
মূল্যং দ্বাদশকং প্রোক্তং জাতিভেদেন সূরিভিঃ।।
যবৈকেন শতং পঞ্চ সহস্রং দ্বিতয়ে যবে
ত্রিভিশ্চৈব সহস্রোদ্বে চতুর্ভিশ্চ চতুর্গুণম্

পণ্ডিতেরা সমূহ গুণশালী হরিত বা শ্যাম ভাস্বর মরকত মণির জাতি-ক্রমে মূল্যাবধারণ করিয়া থাকেন। ১ যবে ৫০০, ২যবে ১০০০, ৩ যবে ২০০০, ৪ যবে তাহার চতুর্গুণ।

ফল-কথা এই যে পদ্মরাগ অপেক্ষা মরকতের মূল্যাধিক্য আছে, কিন্তু কত আধিক্য, তাহার অনুগত নাই। পরন্তু রমণীয়তা ও দুর্লভতা অনুসারে মূল্যের আধিক্য ঘটনা হইয়া থাকে।

শ্রীরামদাস সেন।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

সাহিত্যবিবৃতি, শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন-প্রণীত, ১৷৹ টাকা।

বরদা বাবু সিটী কালেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক। শিক্ষকেরা ছাত্রদিগের অভাব উপলব্ধি করিবার অনেক সুযোগ পাইয়া থাকেন। সুতরাং শিক্ষক দ্বারা ছাত্রগণের অভাব-নিরাকরণোপযোগী বিষয় সুন্দর রূপে নির্ব্বাহিত হয়। বরদা বাবুর গ্রন্থও তদ্রূপ হইয়াছে। মোটের উপর বরদাবাবুর পুস্তক সাধারণতঃ বালকগণের উপকারী ও উপযোগী হইয়াছে।

বরদাবাবুর পুস্তকের সমালোচনের উপলক্ষে আমাদের আত্মকথা কিছু বিবৃত করিতে হইল। ৭ম খণ্ড আর্য্যদর্শনের ৯ম ও ১১শ সংখ্যায় শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশের সাহিত্যসংগ্রহের ব্যাখ্যার গুণভাগ উল্লেখ করিতে গিয়া, আমরা "অবরোধ" শব্দের ব্যুৎপত্তি ও "দীপ" শব্দের নূতন বিশুদ্ধ ব্যাখ্যানের প্রশংসা করিয়াছি। তজ্জন্য ২রা অগ্রহায়ণের এডুকেশন্ গেজেটে এক ব্যক্তি বেদান্তবাগীশের সঙ্গে আর্য্যদর্শনকেও আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে "সংখ্যাবাচক শব্দের একশেষ দ্বন্দ্ব হইবার কোন কথা নাই।"

এতৎ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যঃ—

১। সংখ্যাবাচক শব্দ লইয়া দ্বন্দ্ব সমাস করিবার নিষেধ দৃষ্ট হয় না।

২। সুপদ্মনামক ব্যাকরণের "সরূপাণামেকশেষো দ্বন্দ্বে" সূত্রের ব্যাখ্যাস্থলে টীকাকার বিষ্ণুমিশ্র বলিয়াছেন—দ্বন্দ্বারম্ভক বাক্যে সরূপাণাং সরূপয়োশ্চ পদয়োরেকপদং শিষ্যতে স্থাপ্যতে,অপরং নিবর্ত্ততে। ঘটাঃ ইত্যত্র প্রাক্ ঘটশ্চ ঘটশ্চ ঘটশ্চ। সরূপপর্য্যায়াভ্যাং দ্বন্দ্বঃ "প্রায়ো" নেষ্যতে। তেন একশ্চ একশ্চ, "দ্বৌ চ দ্বৌ চ" ইত্যত্র "প্রায়ো" নৈকশেষঃ।

বিষ্ণুমিশ্র যখন "দ্বৌ চ দ্বৌ চ" প্রায় একশেষ দ্বন্দ্ব হয় না, এবং সরূপপর্য্যায় লইয়া দ্বন্দ্ব "প্রায়" ঈপ্সিত নহে—এই "প্রায়" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং 'দ্বৌ চ দ্বৌ চ' বাক্যটী ধরিয়া গিয়াছেন, তখন তাঁহারই মতে গৌণকল্পে বিধি

পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে বুঝা যায়, তিনি কোথায় উহা দেখিয়া থাকিবেন।

৩। যে প্রসিদ্ধ ও দেশমান্য পণ্ডিত জগদীশ তর্কালঙ্কার এক জন উৎকৃষ্ট নৈয়ায়িক এবং ব্যাকরণের সূক্ষ্ম বিচারক, সেই তর্কালঙ্কার স্পষ্টাক্ষরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। যে শব্দশক্তি প্রকাশিকা আবার এই জগদীশের পাণ্ডিত্যের পরিচয় স্থল, (জগদীশস্য সর্ব্বস্বং শব্দশক্তিপ্রকাশিকা) সেই গ্রন্থের দ্বন্দ্ব সমাসের লক্ষবোধক কারিকার তৎকৃত বৃত্তিতে স্পষ্ট লেখা আছে—একশ্চ একা চ ইত্যত্র একৌ, দ্বৌ চ দ্বে চ দ্বৌ, * উভৌ চ উভে চ উভৌ. এয়শ্চ ত্রিশ্রশ্চ ইত্যত্র চ বিগ্রহে এয় ইত্যাদিরেকশেষ "ইষ্যত এব"।

এখন দেখুন, জগদীশ পণ্ডিত বলিতেছেন, দ্বৌ চ দ্বে চ সমাসে "দ্বৌচ্চ্ৌতই" জানিবে।

৪। শিবের ধ্যানে "পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং" পদ প্রযুক্ত আছে। এখন কি বুঝিতে হইবে, শিবের ৫ টী মুখ, আর ৩টী চক্ষু? পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন মত ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি ত্রীণি—ত্রীণি; ত্রীণি নেত্রাণি যস্য—এইরূপ সমাসবাক্য হইয়া একশেষ দ্বন্দ্ব হইবে। তাহা হইলেই মোটে ১৫টী চক্ষু দাঁড়াইল অর্থাৎ প্রতিমুখে ৩টী করিয়া চক্ষু হইল।

"সাহিত্য-সংগ্রহের অন্যান্য ব্যাখ্যা-পুস্তক অধঃকৃত করিয়াছি" কেন?—এডুকেশনের এ অংশ সম্বন্ধে বক্তব্য:—বরদা বাবুর পুস্তকে

(ক) ২ পৃষ্ঠ—(দ্বি + আপ্ + অ) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু (দ্বি + অপ্ + অ) হওয়া উচিত। কেন না, জলবোধক "আপ" শব্দ নাই।

(খ) ৫ পৃষ্ঠ—"জম্বুদ্বীপে" "ভারতবর্ষে" প্রতিবাক্য দেওয়া হইয়াছে। জম্বুদ্বীপ নয় বর্ষে বিভক্ত। ভারতবর্ষ সেই নব বর্ষের অন্যতম। 'সমুদ্রের' প্রতিবাক্য 'জলবিন্দু' বলিলে যেরূপ অশুদ্ধি হয়, তাহাই এখানে ঘটিয়াছে।

(গ) ২৪৯ পৃষ্ঠা—শতশঃ (শত + চশস্) শতসংখ্যকৈঃ বলিয়া সহস্রৈঃ সহস্রৈঃ বলা অন্যায়। শতসংখ্যকৈঃ বলিলেই ১০০ মাত্র বুঝায়। শতশঃ অর্থাৎ শতং শতং বলিয়া বহুশতৈঃ বা সহস্রৈঃ বলিলে শুদ্ধ হইত।—নবীন বাবুর কথা পরে বলিব।

* সাধারণ নিয়মানুসারে শেষ পদের লিঙ্গানুসারে এখানে লিঙ্গ-স্থিতি হয় নাই। উক্ত উদাহরণের সর্ব্বত্র পুংলিঙ্গের প্রাধান্য রহিয়াছে। সুপ্রাচীন ও সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ ভর্ত্তৃহরির ন্যায় প্রদর্শন পূর্ব্বক পাণিনীর মতাভ্যন্তরের তাৎপর্য্য বর্ণনাত্মক "বাক্যপদীয়" গ্রন্থে এই মত গৃহীত হইয়াছে। উক্ত উদাহরণে বিভিন্ন লিঙ্গ দিয়া সমাস প্রদর্শিত হইয়াছে। সমান লিঙ্গে যে হইবে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। এখানে "দ্বৌচ দ্বৌচ" সমাস-বাক্যস্থানে যে দ্বিবচন বচন থাকিবে, তাহাও নির্দিষ্ট আছে।

এডুকেশন-গেজেট-সম্পাদক অস্মৎ-প্রেরিত প্রতিবাদটী প্রকাশ না করায় অগত্যা আর্য্যদর্শনেই সেই প্রতিবাদ করিতে হইল। এই অবসরে আর একটী বলিয়া রাখি, বেদান্তবাগীশই বল, আর যেই বল—মানুষ মাত্রেই ভ্রান্ত। ভাল করিতে গিয়া যদি বেদান্তবাগীশ ভ্রান্ত হইতেন, তাহা হইলেও কি তাঁহার স্বাধীন ভাবে চলার চেষ্টা—সুধীমাত্রেরই নিকটে প্রশংসনীয় নহে?

১। মনুসংহিতা শ্রীহরিমোহন সেন রায়চৌধুরী জমিদার দ্বারা প্রকাশিত।

২। মনুসংহিতা. শ্রীপ্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

মনুসংহিতা সর্ব্বপ্রথমে গবর্ণমেণ্ট দ্বারা মুদ্রিত হয়। তদনন্তর কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি মূল সংস্কৃত, প্রসিদ্ধ ও প্রামাণিক টীকাকার কুল্লূকভট্টের টীকা ও নিজ-কৃত বঙ্গীয় ভাষান্তর সহ মুদ্রাঙ্কিত করেন। এই সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পরে শ্রীমথুরানাথ তর্করত্ন নামক এক ব্যক্তি উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। এই সংস্করণ—শিরোমণির সংস্করণের প্রায় অবিকল নকল। কেবল মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা প্রতিবাক্য পরিবর্ত্তন আছে। সেই সংস্করণই এক্ষণে বাজারে পাওয়া যায়। তৎপরে প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন নামে এক ব্যক্তি শুদ্ধ মনুস্মৃতির বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন। ইহাতে অনুবাদকের কোনও শ্রম দৃষ্ট হইল না; অনুবাদটীও প্রাঞ্জল বা পরিপাটী নহে। ইহার প্রচারের অব্যবহিত পরে বায়নার রাজেন্দ্রনাথ দত্ত নামে কোন ব্যক্তি মানবধর্ম্মশাস্ত্র নাম দিয়া এক খণ্ড পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাহারও প্রশংসা করিবার কিছু মাত্র নাই।

সর্ব্বকনিষ্ঠ হরিমোহন সেন বাবুর প্রকটিত মনু। ইহাতে মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। ইহা মথুরানাথের ন্যায় একখানি গ্রন্থমাত্র হইবে। তবে যাঁহাদের মনুপাঠে একান্ত অনুরাগ, অথচ একেবারে ৫, কি ৬, টাকা ব্যয় করিয়া পুস্তক কিনিতে পারেন না, ইহাতে তাঁহাদের উপকার আছে। আমরা এ কার্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারি না। সমাজের যে সকল অবশ্য করণীয় কার্য্য বাকী রহিয়াছে, তাহার সহিত তুলনায় ইহা যৎসামান্য। খগোল, জ্যোতিষ, বেদ, দর্শন, অলঙ্কার-বিদ্যা, উপনিষৎ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় সমুদ্রোপম ভূরি ভূরি শাস্ত্রের মূল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। টীকাটিপ্পনী, ভাষ্য, ব্যাখ্যান বা অনুবাদ ত বহুদূরের কথা। পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য বাল্মিকী রামায়ণের মূল, রামানুজটীকা ও বঙ্গানুবাদ যাই প্রকাশ করিলেন, অমনি প্রতাপচন্দ্র রায় কয়েক টাকা মাত্র "ডাক মাশুল" লইয়া "বিনা মূল্যেই" রামায়ণ বিতরণ আরম্ভ করিলেন! বরাট প্রেস্ প্রাঞ্জলতর রামায়ণ অনুবাদে মন দিলেন।

মহাভারত-সম্বন্ধেও ঐরূপ। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ ও বর্দ্ধমানরাজের অনুবাদের পরে প্রতাপচন্দ্রের ক্রমান্বয় ডাকমাশুল ৬।৶৹ লইয়া "বিনা মূল্যে" ৪র্থ বার বিতরণ হইল!

এক্ষণে পুরাণ, স্মৃতি এবং তন্ত্র লইয়াই বঙ্গসমাজ বিব্রত। উচ্চ কল্পের বিদ্যার দিকে উহার দৃষ্টি করিবার সামর্থ ও নাই ইচ্ছা নাই। কেবল নকলই চলিতেছে।

হিন্দুধর্ম্মের গতি এক্ষণে—উচ্চবিদ্যার আলোচনা বা গ্রন্থ প্রচারের অনমুকূলে। ন্যায়, বৈশেষিক মীমাংসা, প্রভৃতি আর্য্যদর্শনশাস্ত্র-গুলি বঙ্গে অচর্চ্চিত থাকিয়া যাইতেছে। গণিত, জ্যোতিষ, বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, বৈদিক অভিধান, গৃহ্য সূত্র;—কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, ব্যাস, উশনা: প্রভৃতির সংহিতা—মৃতকল্প। ইহাদের উদ্ধারে জড় বঙ্গের অপ্রবৃত্তি কেন?

হরবিলাপ, শ্রীরাধানাথ মিত্র, ।৹ আনা।

যে ক্রিয়ার অভিনয় পরিসমাপ্ত হইলে, শঙ্কর নিঃসঙ্গ-যোগতাপস হইয়াছিলেন, এবং তৎপরবর্ত্তী যে বিষয় লইয়া কালিদাসের "কুমারসম্ভব" কাব্যের জন্ম, 'হরবিলাপ' তাহারই প্রতিবিম্ব। ইহা উৎকৃষ্ট ধরণের না হউক, মধ্যম রকমের নাট্যগীতিকা। দোষাংশ অল্প পুস্তক খানির অঙ্গসৌষ্ঠব জন্য মন আকৃষ্ট হয়।

Annals and Antiquities of Rajsthan by Lieutenant Colonel James Tod. Popular Edition. Published By Brajendralal Das. vol I. no1—4. অদ্য পর্য্যন্ত রাজস্থানের ৪টী সংস্করণ হইল। ১ম—ভারতীয় সংস্করণ; ২য়—ইংলণ্ডীয় সংস্করণ; ৩য়—বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ এবং ৪র্থ এই সমালোচ্য গ্রন্থ। ইংলণ্ড-মুদ্রিত রাজস্থানে ১ম সংস্করণ অপেক্ষা কোন কোন ঘটনা অধিক দৃষ্ট হয়। হরিমোহন বাবুর সংস্করণ উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত হইয়াছিল। এক্ষণে ১০৲ টাকায় হরিমোহন বাবুর সংস্করণ বিক্রীত হইতেছে। কলিকাতার গ্রাহকগণ অগ্রিম ৫৲ টাকা দিলেই ব্রজেন্দ্র বাবুর প্রকাশিত রাজস্থান পাইবেন। মফঃস্বলে কেবল ৸৹ মাশুল মাত্র বেশি লাগিবে। সমালোচ্য রাজস্থানের মুদ্রাকার্য্যের বিচার জন্য আমরা ভুল পাওয়া যায় কি না পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াও কচিৎ এক আধটী মাত্র বর্ণাশুদ্ধি পাইয়াছি। এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র হইতে ইহার অধিক প্রত্যাশা করা যায় না। জনসাধারণ এই সুযোগ ছাড়িলে বুঝিব, বঙ্গের দশা উন্নত হইবার আশা এখনও সুদূরে অবস্থিতি করিতেছে।

নিহিলিস্‌ম্‌।

আর্কিমিডিস্ বলিয়াছিলেন,—যদি তিনি দণ্ডস্থাপনের জায়গা পান, তবে এই পৃথিবীকে উলটাইয়া দিতে পারেন আজি ইয়োরোপে সেই স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। মনুষ্য সমাজ—এই পৃথিবী এবং সেই স্থান—স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার ক্ষীণরব একবার প্রাচীন গ্রীশ ও রোমে উত্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তখনকার একাধিপত্যের ঘোর দুন্দুভি-ধ্বনিতে তাহা ক্রমশই দমিত এবং বিলুপ্ত হইয়াছিল। বিগত ফরাসি-বিদ্রোহ ব্যাপার সেই রব পুনর্ঘোষিত করিয়া ইউরোপময় তাহার প্রতিধ্বনি দিয়াছে। ইউরোপের জনসাধারণের হৃদয় তাহাতে একদা জাগরিত, উৎসাহিত এবং ঝঙ্কারিত হইয়াছে। এখন ইউরোপে দুইটী বলের সংগ্রাম লাগিয়াছে;—শ্রেণী অথবা ব্যক্তি-বিশেষের বল এক দিকে, অন্যদিকে জনসাধারণের বল। স্বাধীনতা এক বৃহৎ সমুদ্রের বল উত্থাপিত করিয়াছে—যে বলের পরাক্রমে প্রাচীন অভেদ্য-প্রায় লোক-শ্রেণীবিশেষের ক্ষমতারূপ পার্ব্বতীয় তীর ক্রমশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। এই জন-সাধারণের বলের বিপক্ষে রাজকীয় আধিপত্য, লোকসমাজের উচ্চশ্রেণীস্থ জনগণের বিক্রম, ধর্ম্ম-রাজ্যের ঘোর শাসন, স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে পুরুষ জাতির অবধা প্রভুত্ব, প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির ঘোর দৃঢ়তা এবং সামাজিক শাসন দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এতগুলি বলের বিপক্ষে জনসাধারণ এবং মানব-জাতির স্বাভাবিক অধিকার-রূপ বল একাকী যুঝিতেছে। জনসাধারণের বিপক্ষীয় বল বহুকাল হইতেই পৃথিবীতে চলিয়া আসিতেছে। কুসংস্কার, ভ্রান্তি, অজ্ঞানতা, অবিদ্যা প্রভৃতি তাহার অসংখ্য সহায়। এই সমস্ত সহায় যতই তিরোহিত হইতেছে, ততই সেই বলের বিক্রম কমিতেছে। এই দ্বিবিধ বলের ঘোর প্রতিঘাত ও ঘর্ষণে আজি ইউরোপীয় সকল দেশই ন্যূনাধিক রূপে আন্দোলিত। জনসাধারণের বীর্য্য বল যে এত দূর পরাক্রান্ত হইতে পারে, পূর্ব্বে কাহারও মনে এরূপ ধারণা ছিল না। আজি এই জনসাধারণের বীর্য্যকে দমিত করিয়া রাখা বিপক্ষগণের পক্ষে বিষম দায় হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে জনসাধারণও জানিত না যে, তাহাদের হস্তে এক অমোঘ অশনি-বল ন্যস্ত আছে। যদি তাহারা এই বল নিয়মিত রূপে প্রয়োগ করিতে পারে, তদ্বিরুদ্ধে সকল বলই পরাজিত হইতে পারে। এই বল যেমন জোর করিয়া উঠিতেছে, ইউরোপীয় সমাজ দেশ-বিশেষে কেবল তাহার শমতা বিধান করিতেছে মাত্র। এখন সে বলকে দমিত করা অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাকে শান্ত

করাই এখন সকল সমাজের চেষ্টা হইয়াছে। অল্পাধিক পরিমাণে সকল সমাজই তাহার শান্তিবিধান করিতে চেষ্টা করিতেছে।

ইউরোপের প্রায় সকল দেশের সাধারণ ইতিহাস এখন এই রূপ। প্রতি সমাজের অভ্যন্তরে এখন দুইটী বিপক্ষীয় বলের ঘোর সংগ্রাম লাগিয়াছে। প্রতি সমাজে জনসাধারণের বৃহৎ সমুদ্র তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণিক শান্তি-বিধান হয়, আবার যেন কোথা হইতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। স্বর্গরাজ্যের যে স্বাধীনতা-পবন এখন এই সমুদ্রোপরি বহমান হইতেছে, সেই সমীর-তরঙ্গ না থামিলে এ সমুদ্রের আন্দোলনও থামিবে না। এ আন্দোলনের মূল স্বাধীনতার ভাব। স্বাধীনতা এখন মানব-মনের চিন্তাকে প্রসারিত করিয়াছে, হৃদয়কে দ্বিগুণ বলে বলীয়ান্ করিয়াছে এবং শরীরকে সিংহের অদমনীয় বিক্রম দিয়াছে। এই স্বাধীন চিন্তার নিকষে আজি সকলই পরীক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি-নীতি, আচার পদ্ধতি, স্বত্ব ও অধিকার—সকলই আজি এই স্বাধীন চিন্তা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ঈশ্বর, দেব-দেবতা, রাজা, পুরোহিত, রাজকমণ্ডলী, দীক্ষাগুরু, পুরুষ জাতি, স্ত্রীজাতি, সম্রান্তগণ প্রভৃতি কেহই এ পরীক্ষায় মুক্তি পান নাই। স্বাধীনচিন্তা এখন তন্ন তন্ন করিয়া সকল অনুসন্ধান করিতেছে। কাহার মূল কি, কাহার বল কত দূর, কাহার ভিত্তি কোথায়, এ সমুদায়ই স্বাধীন চিন্তার বিষয় হইয়াছে। স্বাধীন চিন্তার বিস্তারিত ক্ষেত্রে আজি সকল বিষয়ই পরীক্ষাস্থল হইয়াছে। এ অনুসন্ধানের শেষ কি হইবে, কেহ বলিতে পারে না। ক্রমে দেখা যাইতেছে যে,এই পরীক্ষা-প্রভাবে অনেক প্রাচীন ব্যবস্থা ও আচার-পদ্ধতি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, এবং সমাজের অনেক পরিবর্ত্ত ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তের তরঙ্গে পূর্ব্ব-রীতি কোথায় ভাসিয়া যাইতেছে!

এই তান-ধ্বনি এবং বৈপ্লবিক পরি-বর্ত্ত ইউরোপীয় সমাজের এখন সাধা-রণ নিয়ম; অল্পাধিক পরিমাণে ইউ-রোপের সকল সমাজেই ইহা বর্ত্তমান। এত কাল রুসিয়া এই ভাবে আক্রান্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রান্তভাগস্থ রুসিয়াও ঘোর বিপ্লবে আন্দোলিত। ঐ পাশ্চাত্য তরঙ্গ আসিয়া এই প্রান্ত দেশে প্রতিঘাত করিয়া যে আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছে, তাহা সামান্য আন্দোলন নহে। জানি না সে আন্দো-লনের শেষ কি হইবে। সেই আন্দো-লন অতি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, এবং নিহিলিসম্ নামে ইউরোপীয় জগতের আশঙ্কাস্থল হইয়াছে। এই নিহিলিসমের কথঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইবে।

মাইকেল্ ব্যাকুনিন (Michael Bakunin) এই নিহিলিসমের স্থাপয়িতা।

তিনি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জেনিভা নগরীতে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ পাঠ করিলে নিহিলিস্‌মের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এই বক্তৃতা ইউরোপীয় সমাজে প্রদত্ত হয়। সেখানকার সমাজে এই বক্তৃতার যত দূর গভীর অর্থ,এই ভারতীয় সমাজে তত দূর উপলব্ধি হইতে পারে না। সেই সমাজে তাঁহার বক্তৃতার প্রতি কথার অর্থ যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, এই দাসত্বভূমিতে এই অধীন, নির্জ্জীব, অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন, প্রভুত্ব-সহিষ্ণু ভারতবর্ষে সেরূপ অর্থ কখনই গৃহীত হইতে পারে না। ভারতবাসিগণ সেই বক্তৃতার মর্ম্মবোধে ঠিক্ সক্ষম নহেন। তাঁহাদিগের নিকটে ইহার সকল কথাই নূতন বোধ হইবে। এই দেখুন, সেই বক্তৃতা কি মর্ম্মে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"ভ্রাতৃগণ, আমি আপনাদিগকে একটি নূতন কথা বলিতে উপস্থিত। এই কথার মর্ম্ম পৃথিবীর সীমা হইতে সীমান্ত পর্য্যন্ত ভেদ করিয়া যাইবে। অর্দ্ধ সংস্কার, কি অর্দ্ধপথ অগ্রসর হওয়া, আমার মন্ত্রের উপদেশ নহে। আমি প্রাচীন সমাজের ধ্বংস চাই। এবং তৎস্থলে এক নূতন সমাজ সৃষ্টি করিতে চাই। আমি অসত্যের স্থলে সত্যকে স্থাপন করিতে চাই।

"যাহা অমূলক ও মিথ্যা, তাহার ধ্বংস সাধন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আমরা একেবারে সকলের মূল হইতে কার্য্যারম্ভ করিব। এই পৃথিবীর যে দিকে যাও, সেই দিকেই দেখিতে পাইবে, তাহার সর্ব্বস্থলেই ঘোর দাসত্ব বিরাজমান। যে সমস্ত ভ্রান্তি হেতু পৃথিবীর এই ঘোর শোচনীয় দাসত্ব ঘটিয়াছে, সেই সমুদায় ভ্রান্তির মূল—ঈশ্বর। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম-পুরোহিতগণ, যাজক মণ্ডল, এবং নৃপতিনিচয় বরাবর মানবজাতির হৃদয়-মনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে যে, এই জগৎ ঈশ্বরেরই শাসনে রহিয়াছে। তাহারা আবার একটি পরকালের মত সৃষ্টি করিয়াছে এবং উপদেশ দিয়াছে যে, যাহারা এই পৃথিবীতে তাহাদের শাসন অবহেলা করিবে,—তাহাদের আদেশ লঙ্ঘন করিবে, পরকালে ঈশ্বর তাহাদিগকে অনন্ত যন্ত্রণায় শাস্তি প্রদান করিবেন। তাহাদিগের ঈশ্বরের ভাব পরীক্ষা করিলে প্রতীত হয় যে, তাহা ঘোর নৃশংসতার চূড়ান্ত কল্পনা মাত্র। জন-সমাজকে ভয় দেখাইবার জন্য সেই কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। তাহারা নিজে যে সমস্ত নিয়ম ও আদেশ প্রচার করিলেন, জনসমাজকে সেই নিয়ম ও আদেশের বশবর্ত্তী করিবার জন্য, নৃশংস ঈশ্বর-কল্পনার সৃষ্টি হইয়াছে। লোকমণ্ডলীর দশভাগকে অপর এক ভাগের দাসত্বে আনিবার জন্য এই কল্পনার সৃষ্টি। তাহাদিগের কল্পিত ঈশ্বর যদি বাস্তবিকই থাকিতেন, তবে ঈশ্বরের

হাতে যখন বজ্ররূপ অস্ত্র রহিয়াছে, সেই অস্ত্রাঘাতে ঈশ্বর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন জন্য প্রথমে কেন পৃথ্বীস্বামী নৃপবর্গকে ধ্বংস করেন না? যে সকল ধর্ম্মে সত্যের জ্যোতিঃ অসত্যের প্রভাবে মলিন হইয়াছে, সেই ধর্ম্মোপদেশকগণকে বজ্রাঘাতে কেন নিপাত করেন না? আপন প্রভুত্ব স্থাপন করিবার জন্য, এবং সত্যের জয়ের জন্য তিনি কেন বজ্রাঘাত করেন না? তোমাদের হৃদয় মন হইতে অগ্রে ঈশ্বর সত্তার বিশ্বাসকে বিদূরিত কর। কারণ, যত দিন সেই লজ্জাকর মূঢ়তার চিহ্নস্বরূপ ঘোর ভ্রান্তির তিলার্দ্ধ মাত্র বিশ্বাস তোমাদের মনে বিদ্যমান থাকিবে, তত দিন স্বাধীনতা যে কি মহাবস্তু, তাহা কখনই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না।" 'একবার এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, অন্যান্য ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হওয়া সহজ হইয়া আসিবে। প্রথম ভ্রান্তি ঈশ্বর, দ্বিতীয় ভ্রান্তি অধিকার (Right)। শৌর্য্য ও বীর্য্য (Might) এই অধিকারের দোহাই দিয়া, এই অধিকারের সহায়তায় আপন প্রভুত্ব ও গৌরব স্থাপন করিয়াছে। শৌর্য্য ও বীর্য্য নিজেই এই অধিকারকে মানেন না, কিন্তু মূর্খ শত্রুগণের বিপক্ষে ইহাকে স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করেন।

"জোরই সমাজের ভিত্তি-ভূমি। এই জোরে আইন, আদালত সকলই চলিতেছে। এই জোর, সমাজের দশ-ভাগের এক ভাগ লোকের হাতে অপর নয় ভাগকে এই এক ভাগের বশবর্ত্তী করিবার জন্য এই অধিকারকে প্রবল করিয়া রাখিয়াছে। এই অধিকারের সমক্ষে এখন সমাজের অধিকাংশই লোক প্রণত হয়। শিক্ষা, উপদেশ, ও জোর এই অধিকারের প্রভুত্ব বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু তোমারা যদি নিজের জোর বুঝিতে পারিতে—নিজের ক্ষমতা জানিতে পারিতে, তাহা হইলে কখনই অপরের অধিকারকে প্রবল হইতে দিতে না, এবং সেই অধিকারকে একান্ত গ্রহণীয় বলিয়া স্বীকার করিতে না।

"মনকে যদি ঈশ্বরভয়ের অনধীন করিতে পার, যদি অধিকারের অলঙ্ঘ্যতার বিশ্বাস হইতে মুক্ত হইতে পার, তাহা হইলে অপরাপর অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হওয়া সহজ হইয়া আসিবে। তাহা হইলে, বিদ্যোপদেশ, বর্ত্তমান সভ্যতা, সম্পত্তি-বিষয়ক ব্যবস্থা, প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, রীতি নীতি এবং আইন আদালতের ন্যায় অন্যায়ের বিচার-মধ্যে যে অধীনতার ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই অধীনতার শৃঙ্খল সকল একে একে আপনাপনি ভগ্ন ও শিথিল হইয়া পড়িবে।"

"আত্মসুখেরই অনুগামী হও। এই আত্মসুখ লাভ করিতে হইলে এক্ষণকার সমাজ ও শাসন-তন্ত্র বিচূর্ণ করিতে হইবে। এক্ষণকার সামাজিক ব্যবস্থা

এবং এক্ষণকার শাসন-তন্ত্র সাধারণ লোকের সুখের জন্য নহে, কিন্তু সমাজের অতি অল্পলোকের সুখের জন্য প্রস্তুত ও বলবৎ করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন সার কার্য্য এই—আপনারা এরূপে শিক্ষিত হও, আপন সন্তান-সন্ততি-গণকে এরূপ শিক্ষা দাও, যেন বড় লোকের মিথ্যা কথায় আর না ভ্রান্তি জন্মায়; যেন সকলেই ভবিষ্য নব সমাজ-সংগঠন-পক্ষে এরূপ উপযুক্ত হইতে পার যে, যখন সেই নব সমাজ ও নব-বিধানের কাল উপস্থিত হইবে, তখন যেন আর বড় লোকের কথায়, নৃপগণের কথায়, এবং ধর্ম্মযাজকগণের কথায় প্রতারিত না হইতে হয়।

"যে সমাজ এখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা ধ্বংস করা এক্ষণে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। ভাল, মন্দ বিচার না করিয়া এক্ষণকার সমাজ সমূলে নিপাত করা আবশ্যক। কারণ, এই সমাজের এক কণা মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, আমাদিগের নব-সমাজ সৃষ্ট হইবে না।

"ধর্ম্মযাজকেরা ধর্ম্মগ্রন্থে একটি গল্প লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর অতি প্রাচীন কালে এক বৃহৎ জলপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যায়; সেই জলপ্লাবনে ধর্ম্ম-যাজকদের দেবতারা একটি জাহাজে পূর্ব্বকার সকল প্রাণীর এক এক জন মাত্র রক্ষা করিয়াছিলেন। এই রক্ষিত বীজ হইতে পুনরায় পূর্ব্বকার সমাজের সকলই উৎপন্ন হইল। প্লাবনের পূর্ব্বে পৃথ্বীর যে দূষিত অবস্থা ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা হইল। সেই জলপ্লাবনের ফল কিছুই ফলিল না। তদ্রূপ, তোমরা যদি এই বর্ত্তমান সমাজের কিছু অংশ রক্ষা কর, নূতন সমাজ গঠিত হইলেও, এই রক্ষিত অংশ হইতে আবার পৃথিবীতে এক্ষণকার দূষিত সমাজের সর্ব্ববিধ অবস্থা উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে তোমাদের বিধ্বংস করিবার প্রয়োজন সিদ্ধ হইল কই? সাবধান, যেন এই দূষিত সমাজের কিয়দংশও রক্ষিত না হয়।"

বক্তৃতার যে অংশের মর্ম্ম আমরা প্রদান করিলাম, তাহাতে নিহিলিষ্ট-তন্ত্রের সার মত সকলই আছে। সে সম্প্রদায়ের অন্যান্য ব্যক্তির বক্তৃতায়ও ঠিক এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যাকুনিন্ শরীরপাত ও জীবন বিসর্জ্জন করিয়া নিজ মত ইউরোপময় প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন। যেখানে তাঁহার নিজ মত পরিপোষণোপযোগী অভ্যুত্থান হইয়াছে, সেই খানেই ব্যাকু-নিন্ আসিয়া উপস্থিত। যেখানে রাজকীয় ক্ষমতা এবং সামাজিক প্রভুত্ব বিনাশের জন্য বিদ্রোহ ঘটিয়াছে, সেই খানে ব্যাকুনিন্ আসিয়া সেই উদ্যোগে যোগ দিয়াছেন। কখন সুইজারলণ্ডে, কখন ফ্রান্সে, কখন বার্লিনে, কখন ড্রেস্‌ডেনে, কখন প্রেগে, কখন বার্ণ, জুরিক, এবং জেনিভায় ঘোর উৎসাহে সামাজিক অধীনতা এবং যাজকীয় ধর্ম্মের

দাসত্বের বিপক্ষে কায়মনোবাক্যে যুঝিতে-ছেন। ইহাতে তাঁহার একবার জীবন যাইতে যাইতে রক্ষা হইয়াছিল।

সার্নিসেভস্কি নামক আর এক জন নিহিলিষ্ট-সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত এক খানি উপন্যাস প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে স্বকীয় সাম্প্রদায়িক একটি সমাজের আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। রুসিয়াতে এই গ্রন্থের প্রচার বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বার্লিন এবং সুইজারলণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্যাকুনিনের বক্তৃতার সারাংশ পাঠে প্রতীত হইবে যে, বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ দাসত্বের মোচন করাই নিহিলিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এই দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে অপনয়ন করিতে এখন কত সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে। এই দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে অপনীত হইলে, সমাজ নূতন রকমে কিরূপে গঠিত হইতে পারে, সে বিষয় লইয়া নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় ব্যস্ত হয় নাই। কারণ, সহস্র বৎসর পরে সমাজের অবস্থার কল্পনা আজি নির্দ্ধারণ করা বাতুলতা মাত্র। আজি যাহা ভাবিব,তাহা কেবল কল্পনাবিজৃম্ভিত মাত্র হইবে। হয় ত সে কল্পনা, সকলের নিকটে সমান প্রিয় বোধ না হইতে পারে। সুতরাং সে বিষয় লইয়া এক্ষণে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা পণ্ডশ্রম মাত্র। ভবিষ্যতের সমাজ—ভবিষ্যতে উত্থিত হইবে। আমাদের কাজ আমরা করি;—নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, আমাদের কাজ—দোষ অপনয়ন করা। যখন এই দোষ অপনয়ন করিতে সহস্র বৎসর চলিয়া যাইবে, তখন আর অন্য কথা ও অন্য উদ্দেশ্যের প্রয়োজন কি? এক্ষণকার সমাজের যাহা দোষ, তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে সেই দোষের অপনয়ন করিতে চেষ্টা করাই যথেষ্ট কার্য্য। এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে, তখন অন্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু বর্ত্তমান দোষ যত দিন অপনীত না হইবে, তত দিন অন্য উদ্দেশ্য গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন মাত্র।

বর্ত্তমান দূষিত সমাজের ধ্বংস-সাধন করা নিহিলিষ্টদের এক মাত্র উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তাহাদের আন্তরিক যত্ন নিয়োজিত হইয়াছে। তাহাদের প্রধান প্রতিবাদের বিষয়—ধ্বংসসাধনের প্রধান বিষয়—দাসত্ব। এই দাসত্ব-স্থানে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্থাপন করা তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। দাসত্বের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধনেই স্বাধীনতার সম্পূর্ণ উদয় নির্ভর করে। এজন্য দাসত্বের সম্পূর্ণ ধ্বংস-সাধন এবং স্বাধীনতার সম্পূর্ণ গৌরব-পরিস্থাপন একই কার্য্য বলিয়া নিহিলিষ্টগণ গণ্য করিয়াছেন।

এই দাসত্ব সম্পূর্ণরূপে অপনীত করিতে হইলে, সমাজে ইহা যে কয়েক মূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে, দাসত্বের সেই সকল মূর্ত্তির উপরেই কুঠারাঘাত

করা উচিত। একপ্রকার দাসত্ব রাখিয়া অন্যপ্রকার দাসত্ব উঠাইয়া দেওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজে দৃষ্ট হইয়া থাকে, দ্বিবিধ দাসত্ব পরস্পর প্রবলরূপে গ্রথিত এবং বদ্ধমূল আছে। দুই প্রকার দাসত্বই পরস্পর সাহায্যাবলম্বনে সুরক্ষিত হইতেছে। দাসত্ববৃক্ষের মূলদেশ এই দ্বিবিধ অধীনতায় সৃষ্ট। সামাজিক আচার ব্যবহার এই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা-মাত্র। এই দ্বিবিধ দাসত্বে সমাজকে একেবারে নির্জ্জীব ও হীনবীর্য্য করিয়া রাখিয়াছে। একবিধ দাসত্ব,—যাজকগণের সৃষ্ট মতামতের অধীনতা; অন্যবিধ দাসত্ব,—রাজকীয় অথবা সামাজিক প্রভুবলের অধীনতা। ইউরোপীয় বর্ত্তমান সকল সমাজেই এই দ্বিবিধ দাসত্ব ন্যূনাধিকরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ধর্ম্মপ্রভুত্ব, এবং সামাজিক প্রভুবলের পরাক্রম পরস্পরকে রক্ষা করিতেছে। নিহিলিষ্টগণ এই দুই প্রকার প্রভুত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করিতে চান। নিহিলিষ্টেরা বলেন:—ন ধর্ম্মঃ, ন ব্যবস্থাঃ—নিহিল।

শ্রীপূ—

বিবাহ-প্রথা।

স্ত্রী পাইবার জন্য বিবাদ জীব জন্তুর মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। বন্য সমাজেও বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিবার রীতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। মনোমত নারীকে বিবাহ করিবার জন্য চিপোয়ানেরা প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে। কাহারও স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ জন্মিলে টুস্কিরা তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীকে কাড়িয়া আনে। বুশম্যানদের মধ্যে বলবানেরা দুর্ব্বলের স্ত্রী কাড়িয়া লয়। সিংহীর স্বামী পরাস্ত হইলে সে আপনিই বিজেতার গহ্বরে যায় শুনিয়াছি। অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্যদিগের মধ্যে কোন দল যুদ্ধে পরাভূত হইলে নারীগণ বিজেতৃদিগের নিকট আপনারাই উপস্থিত হয়। সামোয়ানেরা অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় তাহাদের স্ত্রীদিগকে ভাগ করিয়া লয়। কারিবেরা নরমাংসভুক। কিন্তু স্ত্রীলোকের মাংস ইহাদের মতে অখাদ্য। যুদ্ধে বালিকা পাইলে ইহারা সন্তানের জন্য গরু বা মুরগীর ন্যায় তাহাদিগকে পুষিয়া রাখে। অষ্ট্রেলিয়ায় কাহারও বিবাহ করিতে সে হইলে গোপনে গোপনে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন স্ত্রীলোককে একাকী পাইলে লাঠীর এক আঘাতে তাহাকে অজ্ঞান করিয়া চুলে ধরিয়া টানিয়া নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে লইয়া যায়। ক্রমে সে সংজ্ঞা লাভ করিলে তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনে। অভাগিনীর সর্ব্বত্র সমান

সুখ। সুতরাং সে অকারণে আর প্রহার লাভ করিতে চায় না। সিডনীর লোকেরাও এই রূপে বিবাহ করে। যখন হাত ধরিয়া প্রহারে সংজ্ঞাহীন অভাগিনীকে টানিয়া লইয়া যায়, পথে কাঁটা বা পাথর পড়িয়া থাকিলেও ভ্রূক্ষেপ করে না। একটা নিরাপদ স্থানে পৌছিতে পারিলেই হইল। অভাগিনীর আত্মীয় স্বজন পরে জানিতে পারিলে সে লোককে কোন তাড়না করে না, কেবল তাহার পরিবারের কাহাকে সেইরূপে কাড়িয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। বালি দ্বীপের লোকেরাও কাহাকে একাকিনী পাইলে ঐরূপে চুরি করিয়া লয়, আত্মীয় স্বজনকে কিছু পণ দিলে আর কোন গোলযোগ হয় না।

যে সকল জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে এখন কাড়িয়া লইয়া বিবাহ করিবার প্রথা না থাকিলেও বিবাহ করিতে হইলে কাড়িয়া লইবার অনুকরণ করিতে হয়। উড়িষ্যার খন্দজাতি বিবাহ করিয়া স্ত্রীকে পৃষ্ঠে লইয়া পলাইবার সময় শ্বশুরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিয়া প্রহার করিতে থাকে, বরপক্ষীয়েরা বরের পক্ষে লড়াই করে। কোন জাতির বিবাহ স্থির হইলে বর আসিবার সময় উভয় পক্ষে স্ত্রীপুরুষে কিছুক্ষণ আপোষে লড়াই হয়। তাহার পর সকলে একত্র আহারাদি করে। বাদাগা, হোস, ওরাঁও গোন্দ প্রভৃতি জাতির মধ্যেও কন্যাকে বর কাড়িয়া লইবার ভাণ করিয়া থাকে। শারো দিগের মধ্যে বর কন্যার মত হইলে তাহারা বনমধ্যে কয়েক দিন নির্জ্জনে বাস করিয়া গ্রামমধ্যে ফিরিয়া আসে। তখন বিবাহের কথা সকলকে বলা হয়। তাহার পর একটা লড়াই করিয়া বিবাহ কার্য্য সমাপ্ত হয়। মলয় উপদ্বীপে বিবাহ আসরে সকলে একত্র হইলে কন্যা ছুটিয়া পলায় বর যদি তাহাকে ধরিতে পারে তবেই তাহাদের বিবাহ হয়। কালমকদের মধ্যে বর নির্দ্ধারিত পণ দিবার পর কন্যা লইয়া কাড়াকড়ি হয়। কন্যা ঘোঁড়ায় চড়িয়া ছুটিয়া পালায়। বর তাহাকে ধরিবারজন্য দৌড়িতে থাকে। যদি ধরিতে পারে তবে কন্যাকে স্ত্রীরূপে আপন গৃহে লইয়া যায়। যদি কন্যার তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা না থাকে বর কোন রূপেই তাহাকে ধরিতে পারে না। তুঙ্গুজ ও কামাস্কাট্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে বর বলপূর্ব্বক কন্যাকে দখল করিতে না পারিলে বিবাহের কোন কথাই হয় না। বাড়ীর বাহিরে কোথাও একাকিনী পাইয়া কন্যাকে আক্রমণ করিতে হয়। নতুবা তাহার আত্মীয়েরা অপমান মনে করিয়া লড়াই করিতে আসে। সামোয়ার অধিবাসী দিগের মধ্যে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। মোগলদের বর বিবাহ করিতে উপস্থিত হইলে কন্যা কোন আত্মীয়ের নিকট গিয়া লুকাইয়া

থাকে। কন্যাকর্ত্তাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতে হয়। তিনি বলেন, যদি পার, খুঁজিয়া লইয়া যাও। তখন বর চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে থাকে; ধরিতে পারিলে, বল পূর্ব্বক লইয়া যায়। সাইবিরিয়ার সর্ব্বত্র বল পূর্ব্বক বিবাহ করিবার রীতি আছে। স্মিথ্ দ্বীপে এস্কুইমোদিগের মধ্যে অনেক পূর্ব্ব হইতে কাহার সঙ্গে কাহার বিবাহ হবে, স্থির করিয়া রাখে। তথাপি বর আসিলে, কন্যা তাহার সহিত চীৎকার করিয়া ঝগড়া বিবাদ করিতে থাকে, অনেক আঁচড় কামড়ের পরে এক বার বরের বাটীতে লইয়া উপস্থিত করিতে পারিলে, সে হাসি মুখে গৃহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। গ্রীণলণ্ডে কোন নারীকে বিবাহ করিতে হইলে, প্রথমে তাহার পিতামাতার সম্মতি লইয়া পরে বল পূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে হয়। আমেজন নদী-বাহে অসভ্যদিগের মধ্যে বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওয়া ভিন্ন বিবাহের আর কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। দক্ষিণ আমে-রিকায় ইণ্ডিয়ানেরা পিতামাতার সম্মতি লইয়া কন্যাকে সহসা আক্রমণ করিয়া লইয়া বনে পালায়। সেখানে কয়েক-দিন বাস করিয়া স্বামী স্ত্রী-রূপে ফিরিয়া আইসে। টেরাডেল্‌ফিউগোতে যখন কোন যুবক মাছ কি পাখী ধরিয়া পরিবার প্রতিপালনে সমর্থ হইল, তখনি এক খানি ডোঙ্গা প্রস্তুত বা চুরি করে; এবং সুবিধা বুঝিলে কন্যাকে লইয়া পালায়। কন্যার মত না থাকিলে সে বনের মধ্যে এমনি লুকায় যে, বর কোন রূপেই খুঁজিয়া পায় না। নবজিলণ্ডেও কাড়িয়া লইবার প্রথা আছে। কন্যার মত না থাকিলে, কখন কখন উভয়ে প্রাণান্ত যুদ্ধ করিয়া থাকে; কিন্তু এক বার লইয়া যাইতে পারিলে, তাহার স্ত্রী হইতে কন্যার অন্য কোন আপত্তি থাকে না। ফিলিপাইন্ দ্বীপের অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং নবগিনীতে বিবাহের দিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কন্যা বন-মধ্যে পালায়, এক ঘণ্টা কাল পরে বর পশ্চাৎ ধাবমান হয়। যদি সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে কন্যাকে ধরিয়া আনিতে পারে, তবেই তাহাদের মধ্যে বিবাহ হয়। কাফ্রিদিগের মধ্যে পণ দিয়া স্ত্রী-ক্রয় করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। কিন্তু পণ দিবার পরে বর ও কন্যা-পক্ষে লড়াই হয়। বর-পক্ষ পরাস্ত হইলে, কন্যাকে কোন স্থানে একাকিনী দেখিলে, বর তাহাকে চুরি করিয়া লয়। পশ্চিম আফ্রিকায় ধন দিয়া কন্যাপক্ষের মনস্তুষ্টি করিতে হয়। তথাপি কন্যাকে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া যাইবার সময়ে তাহারা তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা করে। পশ্চিম আফ্রিকার মাণ্ডিঙ্গো জাতির মধ্যে প্রথমে কন্যার মায়ের মত লইয়া কন্যাকে যখন বাঁধিতে বসে, তখন চারিটী বন্ধু সহ বর আসিয়া তাহাকে লইয়া পালায়। কন্যা আঁচড়াইতে কামড়াইতে ও পা ছুড়িতে থাকে। পার্শ্ববর্ত্তী স্ত্রীলোকেরা দাঁড়াইয়া হাসিতে থাকে। উত্তর আফ্রিকার কন্যা স্বামি-

গৃহের দ্বারে আসিয়া উষ্ট্র-পৃষ্ঠ হইতে নামিতে চাহে না। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া তাহাকে ভুলাইতে হয়। সাইনে পর্ব্বতে আরবদিগের মধ্যে বিবাহের পত্র হইলে, কন্যাকে পথে যাইবার সময়ে দুই চারিটী বন্ধুর সাহায্যে বল পূর্ব্বক লইয়া যাইতে হয়। কন্যা ইট ছুড়িয়া ও অন্যান্য প্রকারে আত্মরক্ষা করে। কখন কখন বরপক্ষীয়েরা গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। সার্কেসিয়ায় ভোজের সময়ে বর তরবারি-আঘাতে কন্যার অবগুণ্ঠন কাটিয়া দিয়া দুই তিনটী বন্ধুর সাহায্যে তাহাকে লইয়া পালায়। পূর্ব্বে গ্রীস দেশে ও স্পার্টা নগরে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা-মতেই হেলেনকে বিবাহ করাতে,পারিসের কোন নিন্দা হয় নাই। পোলাণ্ড, লিথোনিয়া, রসিয়া এবং প্রসিয়ার কোন কোন অংশে প্রথমে কন্যাকে কাড়িয়া লইয়া শেষে পিতামাতার অনুমতি লইবার রীতি ছিল। ওয়েলস্ দেশে বর—বিবাহ করিতে উপস্থিত হইলে, কন্যাকে লইয়া তাহার আত্মীয় স্বজনেরা পালাইত। অনেক ছুটাছুটির পরে বর কন্যাকে ধরিতে পাইত। তখন আমোদ প্রমোদ করিয়া বিবাহ সমাধা হইত।

ভারতবর্ষে হিন্দু বর বিবাহ করিতে উপস্থিত হইলে,অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমাণে প্রহার সহ্য করিতে হয়। কানেডা, চীন, আবিসিনিয়া ও প্রাচীন রোম দেশে কন্যাকে বল পূর্ব্বক দ্বার পার করিতে পারিলে, তবে বিবাহ হইত। আমাদের দেশে দ্বার যষ্টির বোধ হয়, এইরূপে জন্ম হইয়াছে। ইংলণ্ডে কন্যাকে লইয়া যাইবার সময়ে কন্যা-পক্ষীয়েরা বরকে চটী জুতা প্রভৃতি ছুড়িয়া মারে। হিন্দুদিগের বিবাহের পরে স্ত্রীকে লইয়া যাইবার প্রথা এবং সাহেবদের হনিমুনের নিয়ম বোধ হয়, এই রূপেই হইয়াছে। শ্বশুরপক্ষীয়ের নাম গ্রহণ করা এবং মুখ দেখা অনেক জাতির মধ্যে নিন্দনীয়। হিন্দুদের মধ্যেও সেই রূপ।

বন্যদিগের মধ্যে সচরাচর দাম্পত্য-প্রেমের লেশ-মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক অসভ্য জাতির ভাষায় ভালবাসা, প্রেম বা প্রণয় শব্দও নাই। হটেন্‌টট্ জাতির স্ত্রী-পুরুষের ব্যবহারে প্রণয়-রাগ কিছুই লক্ষিত হয় না। কুশাকাফিদিগের বিবাহে, প্রণয়ের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। টিনে ইণ্ডিয়ান্ ও আলগঙ্কিকিং জাতির ভাষায় প্রণয় বা প্রিয় শব্দই নাই। উত্তর আমেরিকায় ইণ্ডিয়ানেরা প্রণয় কাহাকে বলে, জানে না। আহা হুয়েলিন্‌দের মধ্যে একটী দম্পতী দেখা গিয়াছিল। তাহাদের তিন বৎসর বিবাহ হইয়াছিল, অথচ স্বামী স্ত্রী কেহ কাহারও একটী কথা বুঝিতে পারিত না, ইঙ্গিতে তাহাদের কথা, বার্ত্তা চলিত। আসামী বা চিরুকী জাতির মধ্যে প্রণয়-রসের একটীও কবিতা বা গান নাই। বুসার রাজা

রাজকার্য্য সারিয়া নিজেই গৃহকার্য্য তদারক করেন এবং নিজের পরিধেয় প্রস্তুত করিয়া লন। তাঁহার রাণীর চাকর-চাকরাণীর সম্পত্তি সকলই বিভিন্ন। গোল্ডকোষ্টে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কিছুমাত্র ভালবাসা দেখা যায় না। মঙ্গিলো জাতির মধ্যে বিবাহ এক রকম দাসী-ক্রয় মাত্র। স্বামী স্ত্রী কখন পরস্পরের সহিত হাস্য পরিহাস করে না। তাহাদের এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিল, স্ত্রীর সহিত হাসি তামাসা করিলে, সে আর কোন কাজ ভাল রূপ করিবে না। তাহাকে কাজ করিতে বলিলে, সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে। চট্টগ্রামের পার্ব্বতীয় জাতিরা বিবাহকে এক প্রকার পালব-সংযোগ মনে করে;—বিবাহ করিলে, রাঁধা ভাত পাইবার সুবিধা হয়। সামোয়া জাতিরা স্ত্রীর প্রতি একটুও ভালবাসা দেখায় না। পারা-গোয়ের গাইকুরু জাতির মধ্যে বিবাহ-বন্ধন এত শিথিল যে, যখন স্বামী ও স্ত্রীর মনান্তর উপস্থিত হয়, তাহারা অমনি ভিন্ন হইয়া পড়ে। স্ত্রীসুলভ লজ্জাশীলতা ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র নাই। অস্ট্রে-লিয়াতেও দাম্পত্যপ্রণয় কিছুমাত্র নাই। দাসী পাইবার জন্যই তাহারা বিবাহ করিয়া থাকে। ইহারা বলে—কাঠ, জল ও আহার-সঞ্চয়ের জন্য এবং কোথায় যাইতে হইলে, বোঝা বহিয়া লইবার জন্য স্ত্রীর প্রয়োজন। ইহারা অতি সামান্য কারণে স্ত্রীকে পশুবৎ প্রহার করিয়া থাকে। কেহ দেখিতে সুন্দর হইলে, তাহার ভাগ্যে অধিকতর যন্ত্রণা লাভ হয়। বাঙ্গালী হিন্দুদের বিবাহ করিতে যাইবার সময়ে মাতা জিজ্ঞাসা করেন, "বাছা! তুমি কোথায় যাইতেছ?" পুত্র বলে—"মা! তোমার দাসী আনিতে যাইতেছি।"

অনেক অসভ্যদিগের বিবাহে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। ভারত-বর্ষের কুড়ুম্ব জাতির মধ্যে বিবাহের কোন অনুষ্ঠান নাই। মধ্য-ভারতবর্ষের কড়েয়া জাতির মধ্যে বিবাহ শব্দই নাই। দশ জনকে জানাইয়া কাহার সহবাস করিলে, তাহাই বিবাহ করা হইল। কালিফর্ণিয়ার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিবাহ শব্দ কিম্বা বিবাহের কোন অনুষ্ঠানও নাই। পশুপক্ষীর ন্যায় ইচ্ছা হইলেই, জোট বাঁধিয়া থাকে। কুচিন ইণ্ডিয়ান্-দের বিবাহ কি জন্ম-সময়ে কোন অনু-ষ্ঠান হয় না। রেডেস্কিনদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর পরস্পর সম্মতি হইলেই যথেষ্ট; পুরোহিত ডাকিতেও হয় না, কাহাকে সাক্ষী রাখিতেও হয় না। ব্রাজিল দেশীয় সকল অসভ্যদিগের মধ্যে এবং অস্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানে বিবা-হের কোন অনুষ্ঠান হয় না। আবিসি-নিয়ায় বিবাহ নাই। পরস্পরের সম্মতি হইলেই তাহারা সহবাস করিয়া থাকে। কখন কখন কোন পক্ষের অমত হইলেই, বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়। ইচ্ছা হইলেই পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে। এক বার পরি-

ত্যক্ত হইলে, অন্যের ঔরসে সন্তান উৎপাদন করিলে, বা অন্য স্বামী আছে বলিয়া আবার বিবাহ করিতে কোন আপত্তি হয় না। কাস্কমের একটী রাণী একে একে সাতটী স্বামী গ্রহণ করিয়া ছিল। একে একে সকলেই পরিত্যক্ত হইয়া তাহার পারিষদের কার্য্য করিত। উগাণ্ডাদেশে বিবাহ প্রথাই নাই। বেডুইন্ আরাবদের মধ্যে কুমারী বিবাহে কিছু অনুষ্ঠান হয়; কিন্তু বিধবা-বিবাহ করিতে কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। আশান্টি ও মণ্ডিঙ্গো জাতি কোন অনুষ্ঠান করিয়া বিবাহবদ্ধ হয় না। কঙ্গো এবং অঙ্গোলায় বিবাহ করিতে জ্ঞাতি বন্ধুর অনুমতি লইতে বা কোন অনুষ্ঠান করিতে হয় না। বিপেরা, এস্কিমো, আলুট ও ব্যাধদিগের মধ্যে কোন অনুষ্ঠানই হয় নাই। কোন কোন জাতির মধ্যে এক প্রকার অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। টাহিটী দ্বীপে বিবাহ-সময়ে থৎ না করিতে ও উলকী পরিতে হয়। বনাযি দ্বীপে বিবাহকালে কন্যার পায়ে শ্বশুরবংশের মস্তকের দাগ দিয়া দেয়। ছোটনাগপুরের মুণ্ডারিদিগের বিবাহ-সময়ে কন্যা, মাথায় জলের কলসী লইয়া এক হাতে কলসী ধরিয়া নাচিতে থাকে, বর পিছন দিক হইতে সেই হাতের ফাঁক দিয়া একটী তীর ছোড়ে। যেখানে তীর পড়ে, কন্যা সেই অবধি গিয়া পায়ে করিয়া তীর তুলিয়া, হাতে করিয়া ভক্তিভাবে স্বামীকে দেয়। বীরাহার প্রভৃতি কতক গুলি জাতি বিবাহ-সময়ে বর কন্যা পরস্পরের রক্ত লইয়া পরস্পরের গায়ে দেয়। বোধ হয়, এই রূপ প্রথা হইতে হিন্দু-রমণীদিগের সিন্দুর ব্যবহার হইয়াছে কোন কোন হিন্দুজাতির মধ্যে কোন দেবতার কোন বৃক্ষের সহিত প্রথমে বিবাহিত হইয়া পরে বরকন্যার মধ্যে বিবাহ হয়। কুরমিদিগের বরের সহিত আম্র-বৃক্ষের এবং কন্যার সহিত মালতী বৃক্ষের বিবাহ হয়। ক্যানেডার ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সরদার যদি বলে, বিবাহ হইয়াছে, তাহা হইলেই বর স্ত্রীকে পৃষ্ঠে লইয়া আপন কুটীরে যায়। আবিসিনিয়াতেও এইরূপ নিয়ম দেখা গিয়াছে। সেখানে বর কন্যাকে কাঁধে লইয়া বাড়ী লইয়া যায়। বাড়ী অধিক দূর হইলে, সেইরূপ করিয়া কন্যার বাড়ী প্রদক্ষিণ করিলেই, বিবাহ করা হয়। কোন কোন জাতির মধ্যে আগুন জ্বালিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলেই, বিবাহ করা হইল। টোডাদের মধ্যে বরের সংসারের কোন কর্ম্ম করিয়া দিলেই, বিবাহ হয়। নবগিনিতে বরকে পান তামাক দিলেই হইল। নবজ জাতিরা একটা পাত্রে কিছু রাখিয়া দুই জনে খায়। প্রাচীন ক্যাম্বারানদের মধ্যে পিঠা তৈয়ার করিয়া বর-কন্যায় একত্র খাইত।

বিবাহ করিতেও যেমন বেশী আড়ম্বর আবশ্যক করে না, ইহাদের মধ্যে

বিবাহ ভঙ্গ করাও তেমনি সহজ। চিপেরা জাতির মধ্যে স্ত্রীকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিলেই বিবাহ ভঙ্গ হয়। পেরিকু জাতি যত ইচ্ছা বিবাহ করে, স্ত্রীদিগকে গোলামের মত খাটায়, এবং চটিয়া যাইলেই, তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। টুপিরা এমন হইলে কাহাকে বিলাইয়া দেয়, আবার যত ইচ্ছা বিবাহ করে। বারংবার স্ত্রী না বদলাইয়া মানুষ কেমন করিয়া বাঁচে, ট্যাস্মেনিয়ানেরা তাহা বুঝিতে পারে না। খসিয়া জাতি এত বার স্ত্রী পরিবর্ত্তন করে যে, কাহাকেও স্ত্রীরূপে গ্রহণ করাকে বিবাহ বলিতেই ইচ্ছা করে না। নবজিলণ্ডে স্ত্রীকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেই, বিবাহ ভঙ্গ হয়। টাহিটী দ্বীপে কোন পক্ষের ইচ্ছা হইলেই, বিবাহ ভঙ্গ করা হয়। মেক্সিকোর প্রাচীনদিগের মধ্যে এবং খসিয়া জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকেরা কখন স্বামীকে তাড়াইয়া দিয়া বিবাহ ভঙ্গ করে।

বিবাহ-সম্বন্ধের পবিত্রতা বা সতীত্বের আদর যে অসভ্য-সমাজে নাই, তাহা বিশেষ করিয়া আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। স্ত্রী উপভোগ পাত্রী—সম্পত্তি বিশেষ এবং দাসীমাত্র, তাহার অধিক আর কিছুই নহে। হাসানিয়া আরবদের মধ্যে স্বামীর গৃহে তিন দিন বাস করিলে, প্রত্যেক চতুর্থ দিনে স্ত্রীকে যথা ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে। সিংহলে প্রথমে পনর দিনের জন্য বিবাহ হয়। তাহার পরে ভাব গতিক বুঝিয়া বিবাহ পাকা করা হয় বা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। দক্ষিণাপথের রেডি জাতিদিগের বয়স্কা কুমারীর সহিত ছয় বৎসরের বালকের বিবাহ হয়। তাহার পরে নিজে পিতৃপক্ষীয় ভিন্ন সে যে কাহারও সহিত সহবাস করিতে পারে। মাতুল, মাতুলপক্ষীয় ভ্রাতা, শ্বশুর বা শ্বশুরপক্ষীয় কাহারও ঔরসে তাহার সন্তান হইলে সে সেই শিশু স্বামীর বলিয়া গণ্য হয়। হড্‌সন্ উপসাগরের নিকটবর্ত্তী ইণ্ডিয়াদিগের মধ্যে কোন দুর্ব্বল লোকের স্ত্রীর উপরে বলবানের দৃষ্টি পড়িলে, তাহাকে স্ত্রী ছাড়িয়া দিতে হয়। পরে ইণ্ডিয়ান্‌দের কেহ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাস্ত হইলে, বিজয়ী স্ত্রী ফিরিয়া পায়। গ্রীনলাণ্ডের এস্কুইমোদের মধ্যে বন্ধুকে স্ত্রী ছাড়িয়া দেওয়া মহানুভবতার লক্ষণ ও পার্থিয়ান্‌দের মধ্যে কাহারও গর্ভে দুই তিনটী সন্তান হইলে, পত্যন্তর-গ্রহণের জন্য তাহাকে ছাড়িয়া দিতে হইত।

ঐশ্বরিক জ্ঞান।

মানব যখন অত্যন্ত অসভ্য ও বন্য অবস্থায় ছিল, যখন পশু হইতে তাহার অল্পই পৃথকত্ব ছিল, তখন তাহার মনে কোন প্রকার ঐশী শক্তির বিশ্বাস ছিল

না। প্রাচীন হটেণ্টট্‌ এবং প্যাটাগোনিয়ান্স জাতির বিবরণে এই রূপ দৃষ্ট হয়। রো, পেরি, মার্টিনেয়ার, টোরি, ওভিংটন প্রভৃতি ভ্রমণকারিগণ অনেক জাতির কথা বলিয়াছেন, যাহাদের মধ্যে কোন প্রকার ধর্ম্মভাব এবং ঐশ্বরিক বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানবের যেমন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল, মানব যেমন অনেক কার্য্যে আপনার কর্তৃত্ব দেখিতে লাগিল, তেমনি তাহার মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উদয় হইল, এই পৃথিবী এবং জগতীয় যাবৎ ঘটনার কর্ত্তা কে? আপনার কর্তৃত্বে মানব দেখিয়াছেন, শক্তিই কর্ত্তৃত্বের নিদানভূত। তখন তিনি যাহাতে অপৌরুষেয় বল ও শক্তির অনুভব করিতে লাগিলেন, তাহাকেই জগৎ-কর্তৃত্বের ভারার্পণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে জাগতীয় যাবৎ বস্তুর পূজা আরম্ভ হইল এবং জগৎ-অতীত এক স্বতন্ত্র শক্তির বিশ্বাস উৎপন্ন হইল। অসভ্যজাতির বিশ্বাস ঐশ্বরিক বিশ্বাস নহে, কিন্তু সেই বিশ্বাস পরীক্ষা করিলে, প্রতীত হইবে যে, তাহারা যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির অত্যন্ত প্রবলতা অনুভব অথবা দর্শন করিতে এবং যে শক্তির কারণ অথবা প্রক্রিয়া কিছুই বুঝিতে পারিত না, সেই সকল শক্তিকেই জীবন্ত জ্ঞান করিত। তাহারা মানিত যে, সেই সকল শক্তির স্বতন্ত্র জীবন ও কর্তৃত্ব আছে। নদ, নদী, ঝড়, বৃষ্টি, অগ্নি, প্রভৃতি যাবতীয় শক্তি-বিশিষ্ট জড়পদার্থই মানবজাতির নিকটে আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া প্রতীত হইত। এ সমস্ত পদার্থই মানবাতীত শক্তিসম্পন্ন বলিয়া গৃহীত এবং অর্চ্চিত হইতে লাগিল। অসভ্যজাতির ধর্ম্ম এই প্রকার প্রকৃতি-পূজামাত্র। যখন কার্য্য-কারণের জ্ঞান অল্প অল্প স্ফুরিত হইতেছে মাত্র, যখন সকল বিষয়েই অজ্ঞানতাই প্রবল, তখন যে মানব-জাতির মনে কেবল ভ্রমেরই উৎপত্তি হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। যিনি বলেন, অসভ্যজাতির এই সকল ভ্রান্তি-মধ্যে ঈশ্বর নিজ-সত্তার স্বাভাবিক সংস্কার ও জ্ঞান নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সেই সংস্কার-প্রভাবে তাহারা নীয়মান হইয়া সর্ব্বজীব এবং সর্ব্বপদার্থকেই পূজা করিত, তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব কখনই উন্নত বলা যাইতে পারে না। এই স্বাভাবিক সংস্কার যদি ঐশ্বরিক সংস্কার হয়, তবে সকল জড় পদার্থ ও সকল পশু পক্ষীই ঈশ্বর। আর যদি স্বাভাবিক সংস্কার ভ্রান্ত হয়, তবে সে সংস্কার ঈশ্বর-প্রদত্ত নহে। মানব-সমাজের আদিম অবস্থায় যেমন সর্ব্ববিষয়েই ভ্রান্তি জন্মে, ধর্ম্মসংক্রান্ত ভ্রান্তিও সেই প্রকার। এই ভ্রান্তি সকল যে বিভিন্ন প্রকার কেন হইবে, আমরা বুঝিতে পারি না। অশিক্ষিত মনে জড়-জগৎ-সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞান ও বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যাহা ভবিষ্যৎ কালের বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষায় অসত্য বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। স্বাভাবিক সংস্কার ও বিশ্বাস হইলেই যে সত্য হইল, এ কথা কে শিখাইল? এ কথা কোন্ প্রমাণে স্বীকৃত হইয়াছে, বুঝিতে পারি না। প্রত্যুত আমরা জড়-জগৎ-সম্বন্ধে দেখিতে পাই, প্রায় সকল অপরীক্ষিত জ্ঞান ও বিশ্বাস, যাহা পূর্ব্বে স্বাভাবিক-রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, সে সমুদায় ভ্রান্তিমূলক। মন যদি বিশিষ্ট পরীক্ষা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করে, সে সিদ্ধান্ত প্রায়ই মিথ্যা হয়। অতএব অসভ্য জাতিসমূহ যখন প্রকৃতি ও তাহার শক্তি-সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, প্রকৃতির নিয়মাদি কিছুই অবগত ছিল না, তখন যে প্রকৃতি-অতিরিক্ত একটী স্বতন্ত্র সত্তাকে তাহার কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিবে, তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অন্যান্য জ্ঞান ও বিশ্বাস-সম্বন্ধে যে নিয়ম অবলম্বিত হয়, ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সে নিয়ম হয় না। অন্যান্য-জ্ঞান-সম্বন্ধে স্বাভাবিক সংস্কার সকল অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করা হয় না, কেবল ধর্ম্মসম্বন্ধে তাহা সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করা হইয়া থাকে।

স্বাভাবিক সংস্কার যাহা হইবে, তাহাই যদি অভ্রান্ত ও সত্য হয়, তবে আর পরীক্ষা ও বুদ্ধিচালনায় প্রয়োজন কি? সকল সত্য-নির্ণয়ের প্রধান উপায় পরীক্ষা ও বুদ্ধিচালনা। এই দুই উপায় ভিন্ন মানব-মন কখন সত্য নির্ণয় করিতে পারে না। প্রায়ই দেখা যায়, এই দুই উপায়াবলম্বনের পূর্ব্বে মনে যে সকল সংস্কার, জ্ঞান অথবা বিশ্বাস অনায়াসে উদিত হয়, তাহা ভ্রান্ত; এবং পরীক্ষার পরে তাহা ভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কি এরূপ করা হয়? এমন কি, মানব-মন এত দূর ভ্রান্তিপ্রবণ যে, অনেক প্রত্যক্ষ-জ্ঞানেরও সত্যতা স্থির করিতে পারে না। অনেক বুদ্ধিবিনিয়োগ করিয়া তবে তাহাদিগের যথার্থ তত্ত্ব নির্ণীত হয়।

কিন্তু মনে করুন, স্বাভাবিক জ্ঞান ও বিশ্বাস সত্য। তাহা হইলেও আমার কোন্ জ্ঞান ও বিশ্বাসকে স্বাভাবিক পাই, দেখিতে হইবে। মূর্খতা-সমাচ্ছন্ন অসভ্য-জাতি-মধ্যে কি ঈশ্বর-সম্বন্ধে কোন জ্ঞান পাই? অত্যন্ত অসভ্য পশুবৎ জাতি-মধ্যে এ প্রকার কোন জ্ঞানই দৃষ্ট হয় না। তার পরে, এই অসভ্য-মানবজাতি যদি কথঞ্চিৎ বুদ্ধি চালনা না করে, তবে তাহাদিগের মনে প্রকৃতির অতীত একটী স্বতন্ত্র সত্তার অস্তিত্ব-জ্ঞান উদয় হয় না। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক ও মানব-মনের সহজাত জ্ঞান হইল না। অপরাপর সিদ্ধান্ত যেমন মানব-মনের বুদ্ধিচালনা দ্বারা অর্জ্জিত হয়, ইহাও তদ্রূপ হইল। এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণ পরীক্ষা দ্বারা এবং যথানিয়মিত তর্ক-প্রণালীক্রমে অনুমিত হইয়াছে কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। সে কথার বিচার এ স্থলে নহে। অনুমান

করা মানব-মনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; কিন্তু কোন্ অনুমানটি সত্য, কি অসত্য, তাহা বিচারমূলীয়। অনুমান মাত্রই সত্য নহে।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে কোন প্রকার জ্ঞান মানব-মনে আদি-সংস্কার-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, এ কথা আমরা অস্বীকার করি না। যে সমস্ত ভ্রমণকারী বলেন যে, তাঁহারা অমুক অমুক বন্য ও অসভ্য জাতি মধ্যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়াছেন। তাঁহারা সে জ্ঞানের পরিচয় পাইতে পারেন, কিন্তু তাহা যে অর্জ্জিত এবং অনুমানপ্রণালী-ক্রমে সিদ্ধ হয় নাই, তাহার প্রমাণ কি? সে অনুমান যে কত দূর বিশুদ্ধ-যুক্তি-মূলীয়, তাহা স্বতন্ত্র কথা। ঐ সকল জাতি আদিতে যখন উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদের তখনকার মনের ভাব কেহ জানিতে পারে নাই। এই সকল জাতি অনেক দিন ক্ষুদ্রাকারে সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিলে, তবে তাহাদের মধ্যে অনেক প্রকার তর্ক ও অনুমান-মূলীয় জ্ঞান সঞ্জাত হইয়াছিল। যদি কোন প্রকার ঐশী শক্তির জ্ঞান ইহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, সে জ্ঞানও যে অপরাপর জ্ঞানের মত অনুমানসিদ্ধ নহে, ভ্রমণকারীরা এমত প্রমাণ দিতে পারিবেন না। যদি এ সকল জ্ঞান স্বাভাবিক সংস্কার হয়, তবে বল না কেন সর্ব্ববিধ জ্ঞানই স্বাভাবিক সংস্কার। অর্জ্জিত জ্ঞান কিছুই নাই।

আবার বিবেচনা করুন, ভ্রমণকারিগণের সিদ্ধান্ত সকল যে অভ্রান্ত নহে, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সকল যে প্রকৃত নিয়মানুসারে অনুমিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তাঁহারা যে তাঁহাদিগের নিজ পূর্ব্বসংস্কারে ভ্রান্ত হন নাই, যে সকল ঘটনা ও তত্ত্বের উপরি তাহাদিগের অনুমান স্থাপিত, সে সকল তত্ত্ব সম্পূর্ণ পরীক্ষা করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে কি না, ভাব (Positive) এবং অভাব (Negative) পক্ষীয় সমুদায় দৃষ্টান্ত অনুমান-মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছে কি না, এ সমস্ত বিষয় না জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত যে কত দূর প্রামাণ্য, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। ভ্রমণকারিগণের সিদ্ধান্তের উপরি আস্থা স্থাপন করিবার পূর্ব্বে আমাদিগের এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা উচিত। এ সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া কি আমরা তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকি? ভ্রমণকারিগণের সিদ্ধান্ত সকল কি নিশ্চয় অভ্রান্ত? তাঁহাদের অনুমান যুক্তিতে কি অপসিদ্ধান্ত থাকিতে পারে না? তাঁহাদের সিদ্ধান্ত সকল অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বলিয়াছেন যে অসভ্যজাতি-মধ্যে ঐশ্বরিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় এবং কতকগুলি তাহা অস্বীকার করিয়াছেন। কাহাদের কথা বিশ্বাস্য? অথবা কতকগুলি অসভ্য-জাতি-মধ্যে যদি ঐ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়

এবং কতকগুলি জাতি-মধ্যে যদি না পাওয়া যায়, তাহার সম্ভাবিত সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে? সে স্থলে সিদ্ধান্ত এই যে, কতকগুলি জাতি-মধ্যে ঐ জ্ঞান জন্মিয়াছে, এবং বাকি গুলিতে তাহা জন্মায় নাই। কিন্তু কতকগুলি জাতি-মধ্যে তাহা জন্মিয়াছে বলিয়া তাহাকে স্বাভাবিক সংস্কার অথবা সহজাত জ্ঞান বলা কখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

অনেকে বলেন, এই জ্ঞান যখন পৃথিবীস্থ সর্ব্ব সভ্যসমাজ মধ্যে বিদ্যমান দেখা যায়, তখন ইহা কখন অসত্য হইতে পারে না। এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। এ যুক্তি অবলম্বন করিয়া সকল প্রকার ভ্রান্ত মতই সত্য বলিয়া প্রমাণিত করা যাইতে পারে। ইহার যুক্তি এই,—যদি সকল মানবজাতি-মধ্যে একটী জ্ঞান অথবা সংস্কার পাওয়া যায়, তবে তাহা কখনই ভ্রান্ত নহে। বিজ্ঞানচর্চ্চার পূর্ব্বে জড়জগৎ-সম্বন্ধে অনেক সত্যের জ্ঞান অনাবিধ ছিল; এবং সেই সকল অন্যাবিধ জ্ঞান সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সকল সমাজ-মধ্যে প্রচলিত ছিল। তবে কি সেই অনাবিধ সংস্কার সত্য? বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রচলিত না থাকিলে, অথবা অবলম্বিত না হইলে, এবং অসম্পূর্ণ পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত করিলে, সকল লোকেই এক রকম ভ্রমে পতিত হইবে। সৌর-জগতের গূঢ়তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সকলেই জানিত যে, সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হইয়া পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করিয়া অস্ত যান। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এই প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের অনুমানমূলক অসত্যতা নিরসন করিয়াছে। কিন্তু এইরূপ নিরসন হইবার পূর্ব্বে সর্ব্বজাতি-মধ্যে ত একই প্রকার সংস্কার ও জ্ঞান ছিল। তবে তাহা অবশ্য সত্য হইবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে রামধনুককে সকলেই ধনুক বলিয়া অনুমান করিত। তবে সে অনুমান অবশ্য সত্য? এই রূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত এই মাত্র প্রমাণিত করে যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে মানব যত দিন না কোন তত্ত্বকে পরীক্ষা করে, অথবা কোন সিদ্ধান্তে আনীত না হয়, ততদিন সকলেই সমান ভ্রমে পতিত হয়। যে হেতু মানব মনের জ্ঞানার্জ্জনের নিয়ম একই প্রকার। মানবের কল্পনাশক্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী। সেই জন্য মানবমন এক একটী মত প্রণয়ন করিয়া দৃশ্যমান ঘটনাসকলের সামঞ্জস্য-সাধনে স্বভাবতঃই প্রবৃত্ত হয়। এক রকমে সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারিলেই মানবমন সন্তুষ্ট হয়। আমরা উপরে যে সকল ভ্রান্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তদ্দারা কিছু এমত সিদ্ধান্ত হয় না যে, তাহারা সর্ব্বজাতিমধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়া অবশ্য সত্য। অন্য সম্বন্ধে যাহা সত্য নহে ধর্ম্মসম্বন্ধেই বা তাহা সত্য হইবে কেন? অতএব সর্ব্বজাতি মধ্যে কোন একটী জ্ঞান অথবা মত বিদ্যমান থাকিলেই যে তাহা সত্য হইবে, একথা

স্বীকার্য্য হইতে পারে না। সর্ব্বজাতি মধ্যে ঐশ্বরিক ভাব এবং ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকাতে এই মাত্র প্রমাণিত করে যে, সর্ব্বজাতিই একই প্রকার অনুমান করাতে একই প্রকার সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। তদ্দ্বারা সেই সিদ্ধান্ত কত দূর সত্য কি অসত্য তাহা প্রমাণিত করে না। ধর্ম্মসম্পর্কীয় তত্ত্বানুসন্ধান মানব সমাজ সর্ব্বদেশেই এক রীতিতে করিয়াছে, সুতরাং তাহারা একই সিদ্ধান্তে আসিয়া পড়িয়াছে। এ সিদ্ধান্ত যদি ভ্রান্ত হয়, তবে ভ্রান্তি এক রকমই ঘটিয়াছে। ইহা ভ্রান্তি কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা। আমাদিগের মূল প্রতিজ্ঞা সে কথা ছিল না। আমাদিগের মূল প্রতিজ্ঞা যাহা ছিল, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে; প্রমাণিত হইয়াছে যে, সর্ব্বজাতি মধ্যে একটী জ্ঞান প্রচলিত থাকিলেই যে, তাহা তাহা অবশ্য সত্য হইবে, এমত সম্ভাবিত নহে।

অতএব, ঐশ্বরিক জ্ঞান যে স্বভাবজাত এবং নিশ্চয় সত্য এমত প্রমাণিত হয় না। এই জ্ঞান অসভ্য জাতি মধ্যে যে আকারে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় কি না তাহা স্বতন্ত্র প্রস্তাবের বিষয়। অসভ্য জাতিগণের ধর্ম্মভাবালোচনা স্থলে আমরা এই পর্য্যন্ত দেখিলাম যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার ঐশ্বরিক জ্ঞান স্বভাবজাত আছে এমত প্রমাণিত হয় না। সভ্য সমাজস্থ শিশুগণের সংস্কার সকল অবশ্য শিক্ষিত বলিতে হইবে। সে সকল সংস্কার দেখিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। আমরা আরও দেখিলাম, যে জ্ঞান সর্ব্বজাতি মধ্যে পাওয়া যায়, তাহাই যে নিশ্চয় সত্য এমত কথা বলা যাইতে পারে না।

আমরা দেখিতে পাই, মানবজাতির শৈশবাবস্থায় প্রকৃতি-পূজা। মানবজাতির যেমন ক্রমশঃ জ্ঞানোদ্রেক হইতে থাকে, তাহারা যেমন জড় প্রকৃতির বাহ্যগুণাদি এবং প্রাণী-জগতের বাহ্য প্রকৃতি বুঝিতে থাকেন, তেমনি তাহাদিগের প্রতি দেবভক্তি তিরোহিত হইতে থাকে। তাঁহারা দেখেন, জড়রাজ্যে স্বাধীন ইচ্ছা সম্ভাবিত নহে। জড়রাজ্য আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন কাজ করিতে পারে না। সুতরাং তাহাদিগের কোন প্রকার কর্তৃত্ব সম্ভাবিত নহে। যদি কর্তৃত্ব সম্ভাবিত হয়, তাহা প্রাণীরাজ্যে;—প্রাণীরাজ্যের শ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্যে সম্ভাবিত। এই প্রকার জ্ঞানোদ্রেক হইলে প্রকৃতি-পূজা ক্রমশঃ রহিত হইতে থাকে, এবং তৎপরিবর্ত্তে দেবতাগণের সৃষ্টি হইতে থাকে। মানব কল্পনায় মনুষ্যাকার ভিন্ন অন্য রূপ উদয় হইতে পারে না; সুতরাং দেবতাগণ মানবাকারে সজ্জিত হয়েন। জড় হইতে জ্ঞানরাজ্যে দেবভক্তি অর্পিত হয়। দেবোপাসনার প্রারম্ভ এই রূপ। দেবোপাসনার একবার প্রারম্ভ হইলে তাহা ক্রমশই সহস্র দেব-কল্পনায় বর্দ্ধিত

হইতে থাকে। প্রতি লোকের আরাধ্য দেবতা স্বতন্ত্র হয়। মানবমনে যত শক্তির জ্ঞানোদয় হইতে থাকে, তত রূপ দেবমূর্ত্তি কল্পিত হয়। সকল বিষয়েরই এক এক স্বতন্ত্র দেবতা হয়। প্রাকৃতিক সকল ঘটনা, সকল শক্তি, মানবীয় সমস্ত কার্য্য, ব্যবসা, বৃত্তি, শিল্প বিদ্যা সকল বিষয়েরই এক এক স্বতন্ত্র দেবতা। কবি-কল্পনা অসংখ্য আকারে দেবমূর্ত্তির সৃষ্টি করে; মানবকে দেবতা করে, দেবতাকে মানব করে। প্রতি স্থানের, প্রতি পরিবারের, প্রতি রাজ্যের, প্রতি জাতির, প্রতি সম্প্রদায়ের এক এক স্বতন্ত্র দেবতা হয়। প্রকৃতি-পূজা, গো, বৃক্ষকে দেবতা করিত; দেবোপাসনা মানবকে দেবতা করে। যে লোকের কিছু অসাধারণ গুণ থাকে, তাঁহাকে জীবদ্দশায় লোকে মহাজন জ্ঞান করে, এবং তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হইলেই তিনি দেবতাস্থানীয় হয়েন। জড় প্রকৃতি এখন জড় আকারে অর্চ্চিত না হইয়া দেবাকারে অর্চ্চিত হয়। উপাসনা একই, কেবল মূর্ত্তিভেদ। মানুষের যত মহাগুণ ও শক্তি, সে সমুদায় পূজার্হ হয়। প্রকৃতি-পূজায় শুদ্ধ জড়প্রকৃতির শক্তি পূজিত হইত, এখন তাহাও হয় এবং তৎ সঙ্গে মানবীয় মহৎগুণ সকলও পূজিত হয়। সুতরাং দেবতার আর ইয়ত্তা থাকে না। অবশেষে এই অসংখ্য দেবতা অসংখ্য বিরোধের কারণ হইয়া পড়েন। উপাসনা প্রণালীর প্রভেদ হয়। উপাসক দল স্বতন্ত্র হয়। সকলেই পরস্পর বিরোধী। সংসারের শান্তি একেবারে বিনষ্ট হয়। ধর্ম্ম মহা বিরোধ ও বিপত্তির কারণ হয়। দেবতা দেবতায় মানবে মানবে কেবল বিবাদ ও বিসম্বাদ; সংসার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। হিংসা, দ্বেষ, ও রক্তপাত সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। ইহার ফল এই হয় যে, অসংখ্য দেবতার শাসন ও বিবাদ ভঞ্জন জন্য একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবতার কল্পনা করিতে হয়। তাহার হস্তে সমগ্র দেবমণ্ডলের শাসনরজ্জু অর্পিত হয়।

জগতের কার্য্য এবং ঘটনা সকল অতি জটিল সম্বন্ধে গ্রথিত। মানবজাতি যখন মূর্খতায় সমাচ্ছন্ন থাকে, তখন এই জটিলতার কিছুই ভেদ করিতে পারে না। সকল কার্য্য ও ঘটনা এক এক স্বতন্ত্র শক্তি ও দেবতার কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। তাহাদের বোধ হইতে থাকে, এই সকল প্রাকৃতিক শক্তি স্বতন্ত্র রূপে কার্য্য করিতেছে, কাহারও সহিত কাহার সম্বন্ধ নাই। এ সমস্ত শক্তির প্রকৃতিও বিভিন্ন প্রকার। এক শক্তি হয়ত অপর শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত; কোন শক্তির সহিত কোন শক্তির সাদৃশ্য নাই। সুতরাং এ সমস্ত শক্তি একজন পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। অসম্ভব বলিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেব কল্পনা করিতে হয়। যত স্বতন্ত্র শক্তি অনুভূত হইতে থাকে, তত স্বতন্ত্র

দেবতা কল্পিত হয়। সুতরাং বহুবিধ দেবকল্পনার দিকেই দেবোপাসনার স্বাভাবিক গতি দৃষ্ট হয়। দেবোপাসনার স্বাভাবিক গতি একেশ্বর-বাদের দিকে নহে। কারণ, যদিও কোন কোন দেবোপাসনায় একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবের কল্পনা করা হয়, কিন্তু এই মহাদেবতা কার্য্যতঃ স্বতন্ত্র থাকেন। তিনি থাকাতেও কোন দেব দেবতার কার্য্য প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটে না। তিনি কেবল বিরোধের সময় বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেন মাত্র। যদিও সকল দেবতা তাহাকে শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া গণনা করিয়া সম্মান করেন, যদিও সকল দেবতা তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করেন, কিন্তু কার্য্যকালে সকল দেবতাই স্বাধীন। সকল দেবতাই আপন আপন কার্য্য স্বাধীন ভাবে সম্পন্ন করিতেছেন। যাঁহার যে ভার আছে, তিনি সেই ভার বহন করিতেছেন। কাহারও সহিত কাহার সম্পর্ক নাই। সকলেই স্ব স্ব প্রধান। যিনি মহাদেবতা তিনিও আপন নির্দ্দিষ্ট কাজে ব্যাপৃত। তবে প্রভেদ এই, অন্যান্য দেবতার সহিত তাহার বিবাদ ঘটা অসম্ভব। তিনি দেবরাজ্যের সর্ব্বপ্রধান মণ্ডল বিশেষ। * তিনি সকলকে শাসন করিতে পারেন বটে, কিন্তু তাঁহার শাসন-শক্তি সর্ব্বদা নিয়োজিত হয় না। সময় বিশেষেই সেই প্রভুশক্তি নিয়োজিত হয়।

৯ বিশ্বব্যাপার যতদিন মানব সকলই বিশৃঙ্খল দেখেন, ততদিন তিনি দেবোপাসক থাকেন। এই বিশ্বব্যাপার যে একজনের ইচ্ছা ও শাসনে চলিতেছে, এইরূপ প্রতীত করিতে মানব জাতির অনেক সহস্র বৎসর লাগিয়াছে। যতদিন না মানবজাতি কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার ভেদ বুঝিতে পারিয়াছেন, ততদিন তাহারা বহুবিধ দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়াছেন। আমরা যেমন পূর্ব্বে দেখাইয়াছি, প্রকৃতি-পূজা হইতে দেবোপাসনায় উঠিতে মানবজাতির কিয়ৎ পরিমাণে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধিচালনার আবশ্যক হইয়াছিল, তেমনি বহুবিধ দেবোপাসনা হইতে একেশ্বরবাদে উঠিতে তদপেক্ষাও অধিক সূক্ষ্মদর্শন ও অভিনিবেশের আবশ্যকতা হইয়াছে। মানবজাতি পূর্ব্বে যে বিশ্বধামে সকলই বিশৃঙ্খল দেখিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তথায় সকল সুশৃঙ্খল দেখিতে পাইলেন। দেখিতে পাইলেন, ঘটনা সকল আপাততঃ বিসদৃশ বোধ হয় বটে, কিন্তু তলিয়া দেখিতে গেলে সকলই এক কার্য্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত, ও সকলই এক নিয়মে সংঘটিত হইতেছে। এই বিশ্বব্যাপারের কারণ সমুদায় এত বহুবিধ এবং তাহাদিগের কার্য্য সমস্ত এত জটিল সম্বন্ধে অনুস্যূত যে, সহসা তাহাদিগের বন্ধনসূত্র অনুভূত হয় না, সুতরাং তাহা সামান্য মানব দৃষ্টির অগোচর থাকে। এই জগৎব্যাপারের নিকটস্থ এবং দূরবর্ত্তী ফলাফলও

সামান্য চক্ষে প্রতীত হয় না। যিনি বৈজ্ঞানিক চক্ষে ও অনুমান-প্রণালীক্রমে তাহাদিগের সূক্ষ্ম সূত্র এবং সম্বন্ধ ভেদ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই জগতে শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দেখিতে পান। ঘটনা সকল পরস্পর কার্য্যপথে দণ্ডায়মান হইয়া ফলাফলের বিপর্য্যয় ঘটাইতেছে। কিন্তু সহজে তাহাদিগের রহস্য উদ্ভেদ করা যায় না। যখন মানবজাতির চক্ষে এই বিশ্বব্যাপারের সুশৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য একবার প্রতীয়মান হইল, তখন হইতেই তাঁহারা সকলেই একজন নিয়ন্তার অসাধারণ শক্তি অনুভব করিলেন। এবং সেই সময় হইতে বহুদেবতার পূজা উঠিয়া যাইবার সূত্রপাত হইল। ক্রমে অসংখ্য দেবতা গিয়া মানবমনে একেশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল।

বিশ্বপর্য্যালোচনায় যখন সিদ্ধান্ত হইল, সকলেই একজন পুরুষের কর্তৃত্বে চলিতেছে, তখন অসংখ্য দেব দেবতার স্থলে একজন ঈশ্বর স্থাপিত হইল। এই সময় হইতে এক নূতন মতের সৃষ্টি হইল। ঈশ্বর যখন এক, সেই ঈশ্বরের স্বরূপ গুণাদি কি রূপ তাহা নির্ণয় করিতে পণ্ডিতগণ ব্যস্ত হইলেন। দেবোপাসনায় বিশ্বব্যাপারের ভাল মন্দ সকল বিষয়েই এক এক স্বতন্ত্র দেবতা ছিল। স্বতন্ত্র-ভাবে যাহার কল্পনা সম্ভবনীয়, একত্রভাবে কি সেই কল্পনা সম্ভবনীয় হয়। পূর্ব্বে ভাল বিষয়ের দেবতা স্বতন্ত্র ছিল, মন্দ বিষয়ের দেবতাও স্বতন্ত্র ছিল। এখন কথা হইল, একজনে ভাল মন্দ গুণ উভয়ই সম্ভবনীয় হইতে পারে কি না? মনুষ্যে এই ভাল মন্দ গুণ উভয়ই বর্ত্তমান। ঈশ্বরেতেও তদ্রূপ বর্ত্তমান ধরিলে ঈশ্বর মানবের সমতুল্য হয়েন। সুতরাং ঈশ্বরে সেরূপ সম্ভবনীয় নহে। মানবের ভাব হইতে ঈশ্বরের ভাব পৃথক করিবার জন্য ঈশ্বরেতে যত ভাল গুণের আরোপ করা হইল। অল্পই হউক আর অধিকই হউক বিশ্বব্যাপারে যে সমস্ত সদ্‌গুণ পরিদৃষ্ট হইতেছে, সেই সমস্ত সদ্‌গুণ ঈশ্বরে অবশ্য থাকিবে, এইরূপ অনুমানে ঈশ্বরের স্বরূপ নিরূপিত হইতে লাগিল। মানবের জ্ঞান, মানবের দয়া, মানবের শক্তি সকলই ঈশ্বরের স্বরূপ রূপে কল্পিত হইল। জগৎ এই স্বরূপের সাক্ষী। জগৎ সেই জ্ঞান শক্তি ও দয়ার পরিচয় দিতেছে। জগতে যে সমস্ত সদ্‌গুণ পরিদৃশ্যমান এক এক করিয়া ঈশ্বরে তাহা আরোপিত হইল। এইরূপে ঈশ্বর-কল্পনা সৃষ্ট হইতে লাগিল। জগৎ হইতেই এই ঈশ্বর অনুমিত, এবং জগৎই তাহার সাক্ষীভূত প্রমাণ।

ঈশ্বর কল্পনা এখানেও থামে নাই। এই অনুমানের এখনও পূর্ণতা সাধিত হয় নাই। ঈশ্বরবাদিরা সর্ব্বশেষে আর একটী কল্পনা আনিয়া ঈশ্বরকে সম্পূর্ণ করিলেন। সে গুণটী ঈশ্বরের অনন্ত ভাব।

ইহাই ঈশ্বর জ্ঞানের চরম কল্পনা। বিশ্বব্যাপার পর্য্যালোচনা করিলে, তন্মধ্যে এই মাত্র প্রতীত হয় যে, তাহা মানব অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানবান ও শক্তি সম্পন্ন পুরুষ দ্বারা সৃষ্ট হইয়া পরিচালিত হইয়াছে। কত অধিক, তাহার নির্ণয় করা দুরূহ বিষয়। সেই পরিমাণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া, মানব সেই পরিমাণকে অনন্ত ও অশেষ করিয়া দিল। নহিলে জগৎ হইতে কিছু অনন্ত ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে জগতে যে জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, মানব তাহার পরিমাণ করিতে পারিল না; যে হেতু, তাহা মানুষী কল্পনার অতীত। সেই জন্য মানব এইখানে একটী কল্পনা করিলেন। পরিমাণ কল্পনাতীত হওয়াতে তাহাকে অপরিসীম ও অনন্ত বলিয়া কল্পনা করিতে হইল। এই অপরিসীমতা ও অনন্তভাব সম্পূর্ণ কল্পনা মাত্র। জগৎ ইহার সাক্ষীভূত ও পরিচায়ক নহে। ঈশ্বরবাদির যুক্তি অনুসারে জগৎ ইহার প্রমাণও হইতে পারে না। অতএব এই অনন্তভাবটী সম্পূর্ণ কল্পনা। এই ভাবটী যদি কোন বিষয়ের পরিচায়ক হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে ইহা মনুষ্যের অজ্ঞানতার পরিচায়ক, মানব পরিমাণশক্তির অসমর্থতার পরিচায়ক। যাহা হউক, এই অনন্তভাবটী কেবল পরিমাণ-জ্ঞাপক। জগতে পরিদৃষ্ট যে সকল গুণ পূর্ব্বে ঈশ্বরে আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদিগেরই পরিমাণ স্থির করিবার জন্য মানব ঈশ্বরে অনন্তভাব অর্পণ করিলেন। বিশ্বব্যাপার সেই অনন্ত পরিমাণের কথঞ্চিৎ মাত্রা মাত্র পরিচয় দেয়। সেই কথঞ্চিতের সীমা কোথায়, তাহা মানবজ্ঞান স্থির করিতে পারে না। সুতরাং তাহাকে একেবারে অসীম ভাবিয়াছে। এইটুকু সম্পূর্ণ কল্পনা-সম্ভূত।

এই রূপে ঈশ্বর সৃষ্ট ও কল্পিত হইল। জগৎ এবং বিশ্বব্যাপারে মনুষ্যাপেক্ষা অধিকতর, শক্তির পরিচয় হইতেছে, এই জন্য তাহা অনন্তশক্তিবিশিষ্ট অথবা সর্ব্বশক্তিমান একজন স্বতন্ত্র পুরুষের সৃষ্ট হইয়া পরিচালিত হইতেছে। জগতে অসাধারণ মানব জ্ঞানের-পরিচয় আছে, এজন্য ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অথবা অনন্ত জ্ঞানবান পুরুষ। জগতে অনেক মঙ্গলের পরিচয় আছে, এজন্য ঈশ্বর অনন্ত মঙ্গলময় পুরুষ। সভ্যসমাজে এবং শিক্ষিত জনগণ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে এক্ষণে ঈশ্বরের এইরূপ কল্পনা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পণ্ডিতগণের এই ঈশ্বর কল্পনাটী কি ঠিক জড়োপাসকের কল্পনার সমান? না, দেবোপাসকের কল্পনার সমান? এই কল্পনাটী কি ক্রমে ক্রমে সিদ্ধান্ত করা হয় নাই? যদি সমান না হয়, এবং এই সিদ্ধান্তটী যদি ক্রমশঃ অনুমিত হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিতে

হইবে মানবীয় ঐশ্বরিক জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সহজাত অথবা স্বাভাবিক নহে। তাহা অনুমানমূলক জ্ঞান। এই অনুমানটী যুক্তিসিদ্ধ কি না, তাহা স্বতন্ত্র কথা।

এক্ষণে বোধ হয় আরও প্রতীত হইতেছে যে, এই বিশ্বব্যাপারের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নিদর্শন অনুসারে ঈশ্বরের কল্পনা নিরূপিত হইয়াছে। জগতে যাহা স্বতন্ত্র আকারে প্রমাণীকৃত হয়, ঈশ্বরে তাহা একত্রীকৃত হইয়াছে। জগতে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে শক্তি, জ্ঞান ও মঙ্গলের পরিচয় পাই, এজন্য তাহা ঈশ্বরে আরোপ করিয়াছি। ঈশ্বররূপ একাধারে এই সমস্ত গুণ একত্রিত হইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত জাল গুটাইয়া ঈশ্বর রূপ মহা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে। এখন কথা এই, যে সমস্ত গুণ আমরা এই রূপ বিভিন্ন দেশ হইতে আহরণ করিয়া একদেশে একত্রিত করিয়াছি, সেই সমস্ত গুণ এই একাধারে একত্রিত হইয়া পরস্পর সমঞ্জসীভূত হয় কি না? একত্রিত হইলে তাহারা পরস্পর মিলিয়া যায় কি না, তাহা যদি পরীক্ষিত না হয়, তবে আমাদিগের অনুমান ও সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ হয় নাই। কারণ, যাহা একে একে সম্ভবনীয়, তাহা হয় ত একত্র আকারে সম্ভবনীয় না হইতে পারে। স্বর্ণের স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভবনীয়, তাহার কল্পনাও সম্ভবনীয়। তদ্রূপ প্রস্তরের স্বতন্ত্র কল্পনাও সম্ভবনীয়। তাই বলিয়া স্বর্ণময় প্রস্তর অথবা প্রস্তরময় স্বর্ণের সত্তা সম্ভবনীয় নহে। এই জন্য সোণার পাথরবাটী বলিলে একটী মিথ্যা শব্দ মাত্র বুঝায়। তদ্রূপ ঈশ্বরে যে সকল গুণের একত্র সমাবেশ করা হইয়াছে, আমাদিগের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, সেই সমাবেশ কতদূর অনুমান ও যুক্তিসিদ্ধ হইল। এরূপ পরীক্ষা না করিলে সোণার পাথর বাটীর মত ঈশ্বর শুদ্ধ একটী মিথ্যা শব্দ মাত্র হইয়া রহিল, যাহার অর্থ এবং স্বতন্ত্র সত্তা সম্ভবনীয় নহে।

জগৎ নিদর্শন হইতে মানবজাতি ঈশ্বরের পক্ষে যাহা সিদ্ধান্ত করিবে, যে মানসিক গুণময় ঈশ্বর গড়িবে, তাহারই সত্তা যদি সম্ভব হয়, তবে আর ঈশ্বর সংখ্যার সীমা থাকে না। ঈশ্বর সম্বন্ধে পৃথিবীতে যখন যে মত প্রচলিত ছিল তখন সেই মতই যুক্তি সিদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইত, এবং সেই মতানুযায়ী যে দেব দেবতা ও ঐশ্বরিক সত্তা বিদ্যমান আছে এরূপ বিশ্বাস করা হইত। এখন সে সকল কল্পনা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হইল কেন? মানব কল্পনানুযায়ী দেবতাগণের সত্তা মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হইল কেন? সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিসিদ্ধ নয় বলিয়া যদি তদনুরূপ পুরুষের সত্তা মিথ্যা হইয়া পড়ে, তবে এক্ষণকার পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্তও যদি অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়, তবে তদনুরূপ ঈশ্বরও অবশ্য মিথ্যা বলিয়া গ্রহণ করা না হয় কেন? তবে ঈশ্বরের

সত্তা ও অসত্তা মানবসিদ্ধান্তের যুক্তি-মূলীয়তার উপর নির্ভর করিতেছে। মানব সিদ্ধান্ত যদি যুক্তিসিদ্ধ হয়, তবে তদনুরূপ ঈশ্বর সত্তা সম্ভবনীয়, নহিলে নহে। এ তর্কের প্রমাণ কি? মনে করুন, পণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণিত হইল, তাহা হইলেই যে তদনুরূপ একজন পুরুষ অবশ্য আছেন, একথা প্রমাণ্য বলিয়া কিরূপে গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। সিদ্ধান্ত অনুমত যদি পুরুষের বর্ত্তমানতা অবশ্য ম্ভাবী হয়, তবে আর ঈশ্বর সংখ্যার সীমা থাকে না। সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণিত হইলেই তদনুরূপ পুরুষসত্তার অবশ্য-ম্ভাবিতা প্রমাণিত হইতে পারে না। অতএব পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধই হউক, আর অযৌক্তিক হউক, সে সিদ্ধান্তানুসারে এক জন পুরুষ অবশ্য বিদ্যমান আছেন, এ কথা কথনই গ্রাহ্য হইতে পারে না।

জড়োপাসনা হইতে পণ্ডিতগণের ঈশ্বর পর্য্যন্ত, সৃষ্টিকর্ত্তা সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত মত কল্পিত হইয়াছে, সে সমস্ত মত যদি জগৎনিদর্শন হইতে অনুমিত হইয়া থাকে, তবে সে সমস্ত মতই মানব-জাতির সিদ্ধান্ত মাত্র। দেবোপাসকেরা জড়োপাসনা পরিত্যাগ করিল কেন, এবং এক্ষণকার ঈশ্বরবাদিরা দেবোপা-সনাই বা পরিত্যাগ করিল কেন? যদি সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতাই কারণ হয়, আর ঈশ্বরবাদও যদি অযৌক্তিক বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে সেই ঈশ্বর-বাদও পরিত্যক্ত না হইবে কেন? যদি না হয়, তবে অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

দেবোপাসকেরা জড়োপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলেন। ঈশ্বরবাদিরা দেবোপাসনাকেও পৌত্তলিকতা বলেন, জড়োপাসনা এবং দেবোপাসনা যদি পৌত্তলিকতা হয়, তবে ঈশ্বরবাদ যে কেন পৌত্তলিকতা হইবে না তাহা বুঝিতে পারি না। ঈশ্বরবাদিরাও কতিপয় মানসিক গুণ একত্র করিয়া একটী মানসিক পুত্তল গড়িয়াছেন, এবং মানসিক পৌত্তলিকতাকে যদি পৌত্ত লিকতা বলা যায়, তবে ঈশ্বরবাদকেও অবশ্য পৌত্তলিকতা বলিতে হইবে। দেবোপাসনায় যে সকল গুণের পূজা হইত, ঈশ্বরবাদিরা তাহার কতিপয় গুণ মাত্র লইয়া, কেবল সেই গুণ মাত্রেরই পূজা করিয়া থাকেন। তবে ঈশ্বরবাদ পৌত্তলিকতা না হয় কেন?

দেবোপাসকেরাও মানসিক গুণ এবং শক্তিরই পূজা করিয়া থাকেন। তবে সেই উপাসনা প্রণালীতে সদসৎ দুই প্রকার গুণই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বিপরীত প্রকার ধর্ম্মাদি একাধারে সমাবিষ্ট হওয়া একান্ত অসঙ্গত বলিয়া ঈশ্বরবাদিরা ঈশ্বর কল্পনায়, তাঁহারা যাহাকে সদ্‌গুণ বলেন, কেবল সেই সকল গুণ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে সকল গুণ তৎবিপরীত ধর্ম্মীয় বলিয়া গণনা করিয়াছেন, সে সমস্ত গুণ ঈশ্বর

কল্পনা মধ্যে সমাবিষ্ট করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যে সকল গুণ রাখিলেন, এবং যদ্দ্বারা ঈশ্বর-কল্পনা পূর্ণ করিলেন, সে সকল গুণ পরস্পর কত সঙ্গত হইল, তাহা দেখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। তাহা-দিগের সঙ্গতি প্রমাণিত করেন নাই। অনন্ত-শক্তির সহিত, অনন্তজ্ঞান মিলে কি না, ন্যায়-পরায়ণতার সহিত দয়া মিলে কি না, এরূপ বিচার করিয়া তবে ঈশ্বর-কল্পনার সৃষ্টি করা উচিত ছিল। এরূপ বিচার করিলে প্রতীত হইবে যে, যে দোষে দেবোপাসনা-সমাবিষ্ট অনেক মানসিক গুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, ঈশ্বর-কল্পনা-সমাবিষ্ট মানসিক গুণ-পরম্পরায়ও সেই দোষ স্পর্শিয়াছে। * তবে এ গুণ সকলও পরিত্যক্ত না হয় কেন ?

আমরা প্রদর্শন করিয়াছি, ঐশ্বরিক জ্ঞান একদিনে সঞ্জাত হয় নাই। তাহা ক্রমে ক্রমে মানবজাতির জ্ঞান-বুদ্ধির সহিত স্ফুরিত হইয়াছে। যে ঈশ্বর-কল্পনা এক্ষণে প্রচলিত আছে, তাহা পৃথিবীর অনেক জ্ঞানবৃদ্ধির পর তবে পণ্ডিতগণ অনুমান করিতে পারিয়াছেন। ক্রমশঃ এই জ্ঞান আরও যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে, মানবের জগৎ-পরীক্ষা যত বিশুদ্ধ হইয়া আসিবে, ততই এই জ্ঞান আরও পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিবে।

যে জ্ঞান উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হই-তেছে, সে জ্ঞান কখন সহজাত এবং স্বতঃসিদ্ধ বলা যাইতে পারে না। কারণ, যাহা স্বতঃসিদ্ধ এবং সহজাত হইবে, তাহা একবারে, এবং সম্পূর্ণ আকারে সকল মনুষ্যেরই মনে উদিত হইবে। কিন্তু এই ঐশ্বরিক জ্ঞানের লক্ষণ ত এরূপ নহে, তবে ইহাকে কিরূপে স্বতঃসিদ্ধ এবং সহজজ্ঞান বলিব? প্রত্যুত এই জ্ঞান যে অনুমানমূলীয় তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আমরা এই জ্ঞানকে যে প্রণালী ক্রমে উদয় হইতে দেখিয়াছি, সেই প্রণালীই এক প্রকার সম্ভব এবং যুক্তি-সঙ্গত। যদি অন্য কোন প্রণালী এতদপেক্ষা অধিকতর সম্ভব এবং যুক্তি-সঙ্গত বোধ হয়, তাহা হইলেও আমাদের মূলকথার কিছু বিপর্য্যয় ঘটিল না। প্রণালী স্বতন্ত্র হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইল না। সেই জ্ঞানকে অনুমানসিদ্ধ ব্যতীত স্বতঃসিদ্ধ বলিতে পারা গেল না। জগৎ পর্য্যবেক্ষণে মানবজাতি যত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিবেন, এবং সেই পর্য্যবে-ক্ষণের ফল স্বরূপ যেমন নূতন নূতন তত্ত্ব সকল আবিষ্কৃত এবং প্রতিপন্ন হইবে, সৃষ্টিকর্ত্তা সম্পর্কীয় মানবজাতির জ্ঞান ততই নূতন আকার ধারণ করিবে। জড়োপাসনায় শৈশবজ্ঞান ক্রমশ পরি-বর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরবাদির ঐশ্বরিক জ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। আবার জগৎ পরীক্ষা যত বিশুদ্ধ হইবে ততই এই ঈশ্বর-জ্ঞান পরিবর্ত্তিত হইবারই সম্ভাবনা।

অ, ল।

* Vide Chap. on Attributes.
Mill's Three Essays.

প্রেম-বিজ্ঞান।*

"He prayeth best who loveth best
All things both great and small
For the dear God who loveth us
He made and loveth all."

COLERIDGE.

জগতে পরমাণু পরমাণুর সহিত অদৃশ্য অথচ সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ। সূর্য্যকিরণে নৃত্যশীল বালুকণা, বাষ্পাকারে উড্ডীয়মান বারিবিন্দু পৃথিবী কেন্দ্রের দিকে স্বতঃই আকৃষ্ট। আবার এই সূত্রে আবদ্ধ হইয়াই চন্দ্রমা পৃথিবীর সহচর, জগৎ দূরস্থ মহান্ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে; কে জানে ঐ দূরস্থ মহান্ সূর্য্য দূরতর মহত্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরে কি না।

যেরূপ বহির্জগতে, সেইরূপ অন্তর্জগতেও হৃদয় হৃদয়ের প্রতি স্বতঃই আকৃষ্ট, হৃদয় হৃদয়কে স্বতঃই প্রেমভরে আলিঙ্গন করিতে চায়। জগতের সহস্র বাধা সে সমাগম রোধ করিতে পারে, কিন্তু এ শক্তি তাহাতে বিনষ্ট হয় না, কেবল মাত্র গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করে—কেন না, এ শক্তি প্রতিনিয়ত স্বাভাবিক ও অবিনশ্বর। ইহার নাম প্রেমাকাঙ্ক্ষা।

প্রেম অন্তর্জগতের মাধ্যাকর্ষণ। বহির্জগতে যেরূপ মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে চন্দ্র ছুটিয়া যাইত; পৃথিবী কোথায় চলিয়া যাইত, গ্রহ তারা মধ্যে মহা গোলযোগ ও অব্যবস্থা উপস্থিত হইত, সে সংগ্রামে নক্ষত্র নক্ষত্রের সংঘাতে ও সংঘর্ষণে বিচূর্ণ বা বাষ্পীভূত হইয়া যাইত, সেইরূপ অন্তর্জগতে প্রেম না থাকিলে হৃদয়, হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অজানিত পথে প্রধাবিত হইত,—সে ভীম সমরবহ্নিতে প্রতি হৃদয় ভস্ম হইয়া যাইত। প্রেম সজ্ঞান জগৎকে চালাইতেছে। ঘটনাচক্রে ভ্রাম্যমান্ মনুষ্য,—পিতা মাতা ভার্য্যা বা সন্তান যাহার দিকেই হউন,—এ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট। ইহা হইতে ছিন্ন হইলে মানব-হৃদয় শূন্য হইত, জগতের মোহ ভাঙ্গিয়া যাইত, সুন্দর সংসার নিবিড় অরণ্যে পরিণত হইত।

ঈশা বলিয়াছেন "তুমি ভালবাসিবে।" ইহা কি সঙ্গত? সত্য,—প্রেম জগতের আদি ধর্ম্ম। প্রেম সুন্দর ও পবিত্র। প্রেম মনুষ্যের সর্ব্বোচ্চ ও পরমোৎকর্ষতম গুণ। দয়া, ভক্তি, সত্যনিষ্ঠতা, ন্যায়-পরতা, উদারতা সবই প্রেম হইতে উৎপন্ন। প্রেমীর হৃদয় স্বর্গীয় আলোকে

* Science of Love.

উজ্জ্বল, আনন্দে বিহ্বল, ও সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। সে পাপের কথায় শিহরে; দুঃখের ছায়া তাহাকে স্পর্শ করে না। সে নিম্নে দৃক্‌পাত করে না, কারণ তাহার দৃষ্টি ত্রিদিবের দীপ্তির দিকে, সে দৃষ্টি সেই জ্যোতিতে বিভাসিত। তাহার শ্রবণ অপ্সরা-সঙ্গীত-মুগ্ধ; সে নিয়ত নন্দনকুসুম-রেণু-বাহী-সমীরণে সেবিত। সত্য, প্রেম স্বর্গীয়। আমাদের ঈশ্বরের সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান মহাদেব সৌন্দর্য্যের উপাসক পূর্ণপ্রেম। * অবশ্য প্রেম মনুষ্যের সাধনা। কিন্তু তুমি ভালবাসিবে এ আজ্ঞা কি সঙ্গত? ভালবাসা কি ইচ্ছাধীন? প্রেম কি বিবেকানুগত? ভালবাসা আদেশের অনুবর্ত্তী নহে। বঙ্কিম বাবু মনোরমার মুখ দিয়া হেমচন্দ্রকে একদা ভালবাসার এই তত্ত্বটি কেমন সুন্দর বুঝাইয়া দিয়াছেন।†

আমি জানি, মনুষ্যের হৃদয় ও মন স্বতন্ত্র। মন বুদ্ধি,—হৃদয় অনুভাবনা। মন তর্ক করে জানিতে চাহে; হৃদয় দেখে ভালবাসিতে চাহে। হৃদয় ভালবাসে, মনের উপদেশ গ্রাহ্য করে না। বুদ্ধি উপদেশ দেয়, যদি বিচার না করিয়া ভালবাস, তবে হৃদয়ের অন্ধ ভালবাসার পাত্র স্ত্রী, কুচরিত্র হইবে, প্রেমের পরিণাম অন্ধকারময় হইবে; অনুভাবনা সে উপদেশ তুচ্ছ করে আবার মন যাহাকে ভালবাসিতে বলে, হৃদয় তাহাকে বাসে না। কিন্তু হৃদয় হৃদয়ের দিকে স্বতঃই ধাবিত; স্বতঃই মিলিতে চায়। যদি না মিলে সে পার্থিব বাধার নিমিত্ত। খ্রীষ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ, বাধা অতিক্রম কর, দেখিবে প্রতি হৃদয় সমতালে নৃত্য করিতেছে; পূর্ণ স্পর্শে আনিলে মিলিত হইবে। *

হৃদয় স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্য ভালবাসে। কিন্তু সৌন্দর্য্য কি? আর হৃদয় সৌন্দর্য্যকে ভালবাসিতে চায় কেন? সৌন্দর্য্য, স্থান ও কালের ন্যায় অজ্ঞেয়, বুদ্ধির অতীত। কুসুমসুরভির ন্যায় ইহাকে অনুভব করিতে পারি, কিন্তু পরীক্ষা করিতে পারি না। ইহা অপার্থিব। "প্রতিমূর্ত্তি তখনই সুন্দর যখন তাহা অপরিধার্য্য, সমালোচন-বহির্ভূত অপরিমেয় হইতে আরম্ভ হয়; যখন তাহাকে অনুধাবন করিতে, তাহা কি করিতেছে, তাহা জানিতে, তৎপর (active) কল্পনার সহায়তা চাই। আর কবিত্ব তখনই সফলতা লাভ করে, যখন তাহা অভিলাষ পূর্ণ করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে না, আমাদিগকে বিস্মিত করে, এবং যাহা অপ্রাপ্য তাহার চেষ্টাতে হৃদয়কে মাতাইয়া তুলে।" †

* So says Emerson—Love is our highest word and the synonym of God.

—*Essay on Love.*

† মৃণালিনী—তৃতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

* "Man is by nature a Social anim[illegible]

HAMILTON's *L[illegible]ctures o[illegible]*

† "The statue is then b[illegible]

begins to be incomprehensible, when it is

সৌন্দর্য্য অজ্ঞেয় হইলেও সৌন্দর্য্য সত্য, এবং ইহাও সত্য, যে প্রেম সৌন্দর্য্যের চির-সহচর।

এই জগৎ এক তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য্য। উপরে সতারক-রবিচন্দ্রমা-নীল অনন্ত আকাশ, পদতলে শোভাময়ী সসাগরা ধরিত্রী, ইহার উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে সৌন্দর্য্য। মনুষ্য যেন প্রকৃতিকে ভালবাসিবে বলিয়াই প্রকৃতি সুন্দরী। কিন্তু জগতে সবই কি সুন্দর, আর সবই কি সমান সুন্দর? স্ফুটন্ত গোলাপ আর এক মুষ্টি কর্দ্দম কি সমান রমণীয়? আবার নব-দূর্ব্বাশ্যামল প্রান্তর-কান্তি দেখিলে কেন হৃদয় উৎফুল্ল হয়? আর পূতি গন্ধময় পরিত্যক্ত স্থান দেখিলে অন্তর কেন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়?

বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করেন যে, বহির্জগতে প্রতি পদার্থের অণুসমূহ (molecule) অশ্রান্ত আন্দোলনে (Vibration) বা ঘূর্ণনে (rotation) নিযুক্ত। ইহার কারণ তাপ। তাপ, আলোক ও বিদ্যুতের ন্যায়, একটি শক্তি (Energy) ইহার পরিমাণানুসারে কম্পন (Agitation) প্রবলতর বা ক্ষীণতর হয়।* যখন আমাদের শরীরের কম্পনের সহিত আর একটি পদার্থের কম্পন সমতাল না হয়, তখন আমরা সে পদার্থের তাপ বা শৈত্য অনুভব করি। অন্তর্জগতেও সম্ভবতঃ সেই রূপ একটি শক্তি আছে। মন ও হৃদয় সেই শক্তিতে সদা প্রকম্পিত। সেই প্রকম্পনের নাম অস্থিরতা। অস্থির মন অশ্রান্ত বলবতী জ্ঞানেচ্ছা কর্ত্তৃক প্রকৃতির দিকে চালিত; অস্থির হৃদয় বিশ্বগ্রাসী অতৃপ্ত প্রেমাকাঙ্ক্ষা-দ্বারা প্রকৃতির দিকে ধাবিত। মন তখনই বিশ্বাস করে যখন ইহার বিতর্কের সহিত সমস্ত বিষয় মিলে; যখন জ্ঞাতব্য বিষয় মনের সংস্পর্শে আসে ও মনের প্রকম্পনের সহিত বিশ্বাস্য পদার্থের প্রকম্পন এক হয়;—এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। হৃদয় তাহাকে ভালবাসে যে তাহাকে পরিতুষ্ট করে, অর্থাৎ সংস্পর্শে আসিয়া নিজের প্রকম্পনের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রকম্পন এক হয়; হৃদয় তাহার পাত্রের সহিত মিলিত হইয়া নবীন তালে নৃত্য করে; এই সমতাল নৃত্যের নাম সৌন্দর্য্য। ইহা হইলেই মিলন হয়। এই মিলনের নাম প্রেম। তবে সৌন্দর্য্য সমতাল প্রকম্পন মাত্র। প্রেম, এই সমতাল প্রকম্পনের ও সংস্পর্শের ফল—সংযোগ। সেই সংযোগ হইলে আমরা জানিতে পারি যে, প্রতি পদার্থে আমাদের হৃদয়ের সহিত মিলনোপযোগী কিছু আছে। কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ (Words-

passing out of criticism and can no longer be defined by compass and measuring wand, but demands an active imagination to go with it, and to say what it is in the act of doing. And of poetry, the success is not attained when it lulls and satisfies, but when it astonishes and fires, us with new endeavours after the unattainable.

Essay on Love. Emerson.

* See Tilden's Introduction to Chemical Philosophy.

worth) প্রকৃতিকে জীবন্ত মনে করিতেন। প্রকৃতির আত্মা নানা বস্তুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে সজীব করে। মনের এই বিশ্বাসের নাম প্রেম, কবিত্ব বা উন্মত্ততা। প্রেমীর নিকট, কবির নিকট, উন্মত্তের নিকট, প্রকৃতি সজীব,—কথা কহে, অনুভব করে। ইহা কাল্পনিক হইলেও তাহাদিগের আহার ও বিশ্রাম, পাঠ ও ক্রীড়া। এই প্রকার প্রকৃতিকে হৃদয়বান্ বিবেচনা করিলে তবে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারা যায়। তবে প্রেম হৃদয়ের সহিত,—বস্তুর সহিত নহে। তাহারই জন্য মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের প্রেম হৃদয়ে, শরীরে নহে। সৌন্দর্য্য বাহিরের হইতে ভিতরের হয়; আধিভৌতিক হইতে আধ্যাত্মিক হয়। সৌন্দর্য্য বহির্জগৎকে অন্তর্জগতে লইয়া আসে, পদার্থকে হৃদয়ের সহিত সংযুক্ত করে।

এই কম্পন প্রেমবিজ্ঞান ব্যাখ্যা করিলেও ইহা অনুমান-সম্ভূত। বাহ্য জগতে যেমন অণুসমূহের প্রকম্পন (Vibration of Molecules) আনুমানিক কেবল বহু বিষয় ব্যাখ্যা করে বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তেমনি মানসিক প্রকম্পন গ্রাহ্য হইতে পারে। বহির্জগতের একটি সাধারণ উদাহরণ দ্বারা ইহা স্পষ্টতর করা যাইতে পারে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, মনের একটি নির্দ্দিষ্ট (Fixed) গঠনসাম্য (Crystallography) আছে। বহির্জগতের বস্তু তখনই সুন্দর যখন তাহার ইন্দ্রিয়ানুভূত গঠনসাম্য মনের গঠনসাম্যের সহিত এক (Isomorphous) হয়। যদি সদৃশ গঠনসাম্য (Isomorphous) দুইটি পদার্থের জলীয় মিশ্রণ (Mixed Solution) করা যায় তাহা হইলে স্ফটিকের (Alum) ন্যায় একটি সম্পূর্ণ মিলিত পদার্থ হয়। যদি বিভিন্ন গঠনসাম্য হয় তাহা হইলে সংযোগ হয় না। সেই রূপ অন্তর্জগতেও সদৃশ গঠনসাম্য না হইলে হৃদয়ের মিলন হয়না, প্রেম সম্ভবে না। এই সদৃশ গঠন সাম্যের নাম সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য সমতানতা (Harmony) ইহারই জন্য তুষার গঠনসাম্য (Snow-Crystals) সুন্দর, কাচ অসুন্দর। *

মানুষ জন্মিয়াই আপনাকে ভালবাসে। সে নিজসুখে সুখী, নিজদুঃখে দুঃখী, অভিন্ন কাহাকেও জানে না। ইহার নাম স্বার্থপরতা। অস্থির হৃদয় প্রকৃতি কর্ত্তৃক উদ্বেলিত হইয়া জায়মান পরমাণুর (Nascent atom) ন্যায় নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। যদি অন্য হৃদয়ের সহিত সংস্পর্শ না হয়, তাহা হইলে নিজেরই পরমাণু পরমাণু মিলিয়া অণু (molecule) হয়, স্বার্থপরতায় পরিণত হয়। যদি বাধা দূর করিয়া জায়মান পরমাণু অন্য পরমাণুর সহিত সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের সংযোগ হয়। ইহার নাম প্রেম।

* Ice is music, glass is noise.
Heat as a Mode of Motion *Tyndall.*

দুই অণুরই একই গতি হয়, স্বার্থপরতা দূর হয়। এই ভিন্ন পরমাণু-সংযোগী অণু পারিলে, নাচিতে নাচিতে জগতের সহিত মিলিত হয়। ইহার নাম বিশ্ব-প্রেম। পরে সংমিলিত হৃদয় পারিলে অস্মানিতের সহিত—পূর্ণ সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিতে চায়। ইহা ধর্ম্ম। ইহা প্লেটো (Plato) ও প্লুটার্কের (Plutarch) পেট্রর্ক (Petrarch) ও আঞ্জেলোর (Angelo) বিজ্ঞান, যথার্থ সুন্দর, ও সত্য।

ঈশ্বর মনুষ্যের দুইভাগ করিয়া দিয়াছেন—পুরুষ ও রমণী। পুরুষ রমণীকে ভালবাসিবে বলিয়া তিনি রমণীকে সুন্দরী করিয়া জগতে প্রেরণ করিয়াছেন। স্বামী ভার্য্যা ঈশ্বরাভিপ্রেত বন্ধনে আবদ্ধ। প্রণয়ী প্রণয়িনীর প্রেম সুন্দর ও সুখময়। প্রণয়ী প্রণয়িনীকে সামান্য নারীর ন্যায় দেখে না; কল্পনায় তাহাকে সুন্দরতর করে; তাহাতে চন্দ্রমার মধুরিমা ও সূর্য্যের দীপ্তি, অমরাবতীর পবিত্রতা ও জগতের সৌন্দর্য্য মিশ্রিত করে। প্রণয়িনীর স্বর কর্কশ হইলেও তাহার নিকট কোকিলবিনিন্দিত, তাহার মুখ কুৎসিত হইলেও প্রেমিকের নিকট নবারুণকর-ফুল্ল-সরোজসুষমাময়; তাহার নিশ্বাস স্ফুটন্ত কুসুমচুম্বী বসন্তের প্রথম সমীর-হিল্লোল; তাহার গতি সৌন্দর্য্যের তরঙ্গভঙ্গ, বিদ্যাধরীর বিলাস নৃত্য। প্রণয়িনীর একটী কথাতে হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠে; একটি দৃষ্টিতে অন্তঃসাগর উচ্ছ্বসিত হয়; একটি হাসিতে স্বর্গের পুণ্য ও পৃথিবীর মাধুরী একত্রিত হয়। প্রণয়িনী পদার্পণ করে বলিয়া ধরণী সৌভাগ্যবতী; প্রণয়িনী জীবন ধারণ করে বলিয়া জীবন সুখময়। প্রেমিকের নিকট পৃথিবী স্বর্গ, সংসার উদ্যান; সমস্ত পদার্থ—শরতের জ্যোৎস্না। আবার প্রণয়িনীর দীর্ঘশ্বাস তাহার অন্ধকার, প্রণয়িনীর অশ্রুজল হৃদয়-ভেদী, প্রণয়িনীর প্রেমাপনয় তাহার মৃত্যু। ঈশ্বর রমণীকে এই প্রকার মানবের সঙ্গিনী করিয়াছেন। এই প্রেম—বিশ্বপ্রীতির ভিত্তি।

পরিবার ভালবাসার কেন্দ্র—যাহা হইতে প্রেম চারিদিকে বিকীর্ণ হয়। পরিবার কোমলতার আধার, শান্তির সংরক্ষক, বিশ্বপ্রেমের শিক্ষাগুরু। জগতের নিয়ম, প্রতি হইতে বিশেষ* যেমন কতকগুলি সত্য হইতে একটি সাধারণ প্রতিজ্ঞা তেমনি পারিবারিক প্রেম সাধরণ প্রেমে পরিণত হয়। নিজ গৃহ ভালবাসিয়া নিজদেশকে, পরে জগৎকে ভালবাসিতে শিখি*। নিজ পরিবার ভালবাসিয়া

* The order of nature is evermore from particulars to generals. As in operations of intellect, we proceed from the contemplation of individuals to general abstractions, so in the development of the passions, in like manner, from private to public affections.

Modern Infidelity Considered
ROBERT HALL

* "We begin our public affections at home—Reflections on the French Revolution—Burke.

নিজ জাতিকে, পরে মানবজাতিকে ভালবাসিতে শিখি *। পারিবারিক প্রেমের চরমোৎকর্ষ ফল—সার্ব্বজনীন প্রীতি।

পুরুষ-রমণীর চিরন্তন বন্ধন ভিন্ন স্থায়ী পরিবার হইতে পারে না। মনুষ্যের দ্বিবিধ সম্ভোগ, শারীরিক ও মানসিক—শারীরিক সম্ভোগ-স্পৃহা বলবতী হইলে জগতে অনিষ্ট ঘটে। তাহার দুই প্রকার প্রতিবিধান,—উচ্চনীতি ও রাজনীতি। উচ্চনীতি জগতে অতি বিরল; তাহার জন্য রাজবিধি আবশ্যক। এই বিবাহ বন্ধন সেই বিধির একটি গৌরবময়ী কীর্ত্তি; কামীর বিশ্বগ্রাসোদ্যত লালসাকে নিরস্ত করে। এই বন্ধন না থাকিলে বিবাদ, ঈর্ষা, চৌর্য্য প্রভৃতি সমাজকে ব্যাকুলিত করিত। কোমল প্রেমময়ী রমণী তাহাদের স্বামীদিগের ভয়ের নিদান, ও আকাঙ্ক্ষীদিগের আক্রমণের শীকার জন্তু হইত। তাহারা বিষম আত্মার লালসার কেন্দ্র হইত। তবে পরিণয় স্বর্গীয় প্রেমের আধার, অনুভাবনার দোলা, মানবিক বন্ধনের প্রথম সূত্র। পরিণয় সমাজের অবলম্বন, স্নেহের কেন্দ্র, সংসার সুখের নির্ঝরিণী। পরিণয় সুভাস্তার সুখময় ফল, মানবের গৌরবময়ী কীর্ত্তি, প্রকৃতির সফল আকাঙ্ক্ষা। যাহাদের ইচ্ছা, এই শুভ পরিণয়ে দোষারোপ করুক, আমি বলিব—স্বাগত, স্বর্গীয় পরিণয়! ঈশ্বর প্রণোদিত পবিত্র পদার্থ, বিশ্বপ্রীতির মূলমন্ত্র! আইস জগৎকে স্বর্গসন্নিধানে লইয়া যাও। *

পুরাকালে আর্য্যঋষিগণ অরণ্যে বাস করিতেন। কিসের নিমিত্ত? মানব জাতির দারুণ উৎপীড়নে বা সংসারের শত প্রলোভন ভয়ে? পরিবারের প্রতি মায়া, স্নেহ কি পাপ? —ধর্ম্মের চিরন্তন শত্রু? বাৎসল্য, প্রেম কি ঈশ্বর-নিষিদ্ধ কার্য্য? নিশ্চয়ই নহে। তাঁহারা জানিতেন, প্রেমই ধর্ম্মের আধার বা প্রেমই ধর্ম্ম। মনুষ্য উহার সমাদর না করে, স্বর্গে সমাদৃত হইবে। ক্ষত্রিয় রাজগণ শৈশবে বিদ্যাভ্যাস ও যৌবনে বিষয়কার্য্য করিতেন। বার্দ্ধক্যে যখন মানবিক প্রেম হৃদয় হইতে ফিরিয়া যায়, তখন প্রকৃতির শরণ লইতেন; এবং সেই সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া, ঈশ্বরে—অনন্ত সৌন্দর্য্যে হৃদয় সমাধান করিয়া অনন্ত প্রেমে জীবন বিসর্জন করিতেন।* ইহাই উচ্চ বিজ্ঞান। ঋষিগণ আজীবন বনে বাস করিলেও স্ত্রী পুত্র-কন্যা বিরহিত থাকিতেন না।

Hail wedded love, mysterious law, true source
Of human offspring, sole propriety
In Paradise, of all things, common else
* * *
Far be it that I should write thee sin or blame,
Or think thee unbefitting holiest place,
Perpetual fountain of domestic sweets
&c Paradise Lost. Milton.

শৈশবেঽভ্যস্তবিদ্যানাং যৌবনে বিষয়ৈষিণাং
বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনুত্যজাম্॥
রঘুবংশম্। কালিদাস।

পশু পক্ষী লতা নিকুঞ্জও তাঁহাদিগের আদরের সামগ্রী ছিল।

প্রেমের একটি বাধা অসৌন্দর্য্য। প্রেমের আর একটি বাধা ইহার অপ্রতিদান। মানবহৃদয় জড় বা উদ্ভিদ জগতের ন্যায় নিষ্কর্ম্মা (Passive) নহে। ইহা তৎপর (Active) ইহা বাধা অতিক্রমে বা বাধা আনয়নে সমর্থ। "যে ভালবাসে আমারে ভালবাসী তারে" §। কিন্তু যে ভালবাসে না বা ঘৃণা করে, কয়জন তাহাকে ভালবাসিতে পারে? কাছে আসিলে যে গ্রীবাভঙ্গী-সহকারে বক্রনয়নে সঙ্কেতে "চলিয়া যাও" আদেশ করে, তাহার প্রতি ভালবাসা কয় জনের থাকে? একটি হৃদয় নাচিতে নাচিতে, বাধা অতিক্রম করিতে করিতে, যখন আর একটির সহিত মিলিত হয়, তখন সেই অপর হৃদয় যদি নবীন বাধা নিয়ত নিক্ষেপ করে, কয়টি হৃদয় সহিষ্ণুতা সহকারে সেই নবীন বাধাপনয়ে যত্নবান হয়? কবি বাইরণ (Byron) মানব জাতিকে ভালবাসিতে পারেন নাই। ইহার কারণ ভালবাসার অপ্রতিদান। যখন মাতা, প্রণয়িনী ও মানবজাতি তাঁহার প্রতি বিমুখ হইলেন, তখন তিনি মানববিদ্বেষী হইলেন। যেমন বিশ্বপ্রীতির ভিত্তি পরিবার-প্রেম, তেমনি বিশ্ববিদ্বেষের ভিত্তি, পরিবার-বিদ্বেষ। কিন্তু তিনি প্রকৃতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। কারণ, প্রকৃতি তাঁহার ভালবাসার অপ্রতিদান করে নাই। নিশীথজাগরণে দূরস্থ নক্ষত্র হইতে আলোকতরঙ্গে চড়িয়া তাঁহার নিমিত্ত সান্ত্বনা আসিত, তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থে রজনী সঙ্গীত গাইত। তাই তিনি গভীর বিষাদের মধ্যেও স্নেহময়ী জননীকে সদা সপ্রেম সম্বোধন করিয়াছেন। যখন ম্যান্‌ফ্রেড্ (Manfred) বলিতেছেন—"মাতঃ পৃথিবি! হে নব-প্রভাতীয় দিবস! হে গিরিশ্রেণী, কেন তোমারা এত সুন্দর হইলে! আমি তোমাদিগকে ত ভাল বাসিতে পারি না" তখন প্রকৃতির প্রতি প্রেমোচ্ছ্বাস গিরিনিঃস্রাবের ন্যায় হৃদয় ফাটিয়া বাহির হইতেছে। চাইল্ড হারল্ড্স্ পিল্‌গ্রিমেজে (Childe Harold's Pilgrimage) এরূপ উচ্ছ্বাসের অভাব নাই।*

কিন্তু যথার্থ প্রেম ইহা হইতে বহু-ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করে। প্রেমীর হৃদয় নিরন্তর বাধা অতিক্রম করে; নিরন্তর পলায়ন-পর হৃদয়ের অনুসরণ করে। তাহার পূজ্য পদার্থকে সে সুখী দেখিলেই সুখী হয়। তাহাই তাহার স্বার্থসিদ্ধি। প্রেম আসঙ্গলিপ্সা করে বটে; কিন্তু তাহা পাশব নহে; বলের সহিত তাহার সম্বন্ধ

§ আর্য্য গাথা।

* "My mother earth and thou fresh breaking day
And you ye mountains, why are ye beautiful.
I can not love ye." *Manfred—Byron*

নাই। সে আসঙ্গলিপ্সা মানসিক সম্ভোগ। প্রেম বিয়োগে কাতর বটে; কিন্তু সে কাতরতা অত্যান্ত দর্শন-বিরহ-জনিত নহে। তাহা মানসিক যাতায়াত (Communication) রহিত হওয়ার জন্য। প্রেম প্রিয় কথা শুনিলে আনন্দিত হয; কিন্তু সে দুর্ব্বলতা-জনিত নহে—সে হৃদয়ে হৃদয় সংযোগ হইয়াছে, এই বিশ্বাসের নিমিত্ত।

আমি সুন্দর বস্তু ভালবাসি, কয়জন বাসে না? সায়াহ্নের জলধর, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাহিল্লোল, বালকের হাসি, ফুলের শোভা, সুন্দর মুখ, কয়জন ভালবাসিতে চাহে না? একখানি সুন্দর মুখ-দর্শন-জাত আনন্দে সামান্য লোকের অননুভাব্য বিষয় আছে। মনুষ্যের সুন্দর মুখ—যাহা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সীমা, ঈশ্বরের সর্ব্বোচ্চ কীর্ত্তি, মিল্টন যাহাকে স্বর্গীয় বলেন,—তাহা কয়জন না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে? আবার মনুষ্যের মুখ অন্তর্জগতের সুন্দর দর্পণ। কত চিন্তা, কত ভাব তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিবিম্বিত হইতেছে! যেখানে আবার বাহিরের সৌন্দর্য্য ভিতরের সৌন্দর্য্যের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে, তাহা কে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে? *

কিন্তু বিশ্বপ্রেমের বিজ্ঞান মহত্তর। বিশ্বপ্রেম শুদ্ধ সুন্দর মনুষ্যবিশেষকে ভালবাসিয়া ক্ষান্ত থাকে না। তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। প্রেমী যেরূপ প্রণয়িনীকে ভালবাসেন, মাতা যেরূপ শিশুকে ভালবাসেন, কবি যেরূপ প্রকৃতিকে ভালবাসেন, সেইরূপ বিশ্বপ্রেমী মনুষ্যজাতিকে ভালবাসে; সদা আলিঙ্গন করিতে চায়। আবার যে আপাত-অসুন্দর, সেও তাহার নিকট সুন্দর; পাপী ও নির্গুণ তাহার নিকট ধার্ম্মিক ও গুণময়। কারণ, মনুষ্যহৃদয়ের বাস্তবিক অসৌন্দর্য্য নাই। ঈর্ষা ঘৃণা ... নহে—প্রেমের অভাব; পাপ বিকৃত-স্বভাব, প্রেমের বাধা। বিশ্বপ্রেমী ঈর্ষা, ঘৃণা, শত্রুতাকে ঘৃণা করে ও তাহাদের দূরাপসরণে সচেষ্ট হয়; কিন্তু ঈর্ষী ঘৃণী ও শত্রুকে ঘৃণা করে না; বরং বিনিময় প্রেম ও দয়া বিতরণ করে; কারণ, ঈর্ষা, ঘৃণা হৃদয়-কম্পনের তালের ব্যতিক্রম করে না; তাহার জন্য হৃদয় সমান সুন্দর থাকে; সেই বাধার নিমিত্ত হৃদয়ের হৃদয়ের সংযোগ হয় না। সে হৃদয়—সৌন্দর্য্যে, পবিত্রতায়, দেবভাবে পূর্ণ। বিশ্বপ্রেমী ইহা বিবেচনা করিয়া মানবজাতিকে প্রাণের সহিত ভালবাসে। তাই সে নিশীথের শান্ত জ্যোৎস্নার ঢেউএর ন্যায়, বসন্তের সন্ধ্যানিল-হিল্লোলের ন্যায়, সমীর-দোলায়িত বল্লরী-বাহুর ন্যায়, যাহাকে নিকটে পায়, তারতম্য না করিয়া সকলের গায়ে

* There is no single object presented to our senses which engrosses so large a share of our thoughts, emotions, and associations, as that small portion of flesh and blood which constitutes the human face.

Quarterly Review, December 1851, *p* 162,

ছুটিয়া পড়ে। এই বিশ্বপ্রেম মহৎ হইতে মহত্তর, গভীর অর্থে পূর্ণ। এই বিশ্বপ্রেম মনুষ্যের দ্বিতীয় সাধনা, কারণ, প্রথম সাধনা প্রেম।

এই জগৎ এক বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। প্রতি মনুষ্যেরই উদ্দেশ্য আছে। জল-বিম্বের ন্যায় উঠিয়াই বিলীন হইয়া যাইতে, বা আলেয়ার ন্যায় জ্বলিয়াই নিবিয়া যাইতে মনুষ্য জন্মায় নাই। ক্ষুদ্র হউক, মহৎ হউক, উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য—সমগ্র মানবজাতির ক্রমিক উন্নতি। অনন্ত অগ্রসর এই মহৎ উদ্দেশ্যের অংশ মাত্র। মনুষ্য এই প্রেম একত্রিত না হইলে, সে উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। তাই মনুষ্যের প্রথম সাধনা প্রেম, দ্বিতীয় বিশ্বপ্রেম।

বিশ্বপ্রেম স্বর্গীয়। ইহা বাজিকরের ন্যায় লৌহকে ও মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করে। প্রভাতের প্রশান্ত দীপ্ত ভানুর ন্যায় সকলকেই উজ্জ্বল ও শান্ত করে, পবিত্র কোমল নৈশ নীহারের ন্যায় যাহার উপর পড়ে, নির্ম্মল ও কমনীয় করে। সমস্ত মানবকে ভালবাসিয়া মনুষ্য প্রকৃতিকে ভালবাসিতে শিখে।

প্রেমের গম্য স্থান যাহা, তাহাই ঈশ্বর বা পূর্ণ সৌন্দর্য্য। সুন্দর পৃথিবী, এই চমৎকার বিশ্ব দেখিয়া সুস্থ এবং তৎপর হৃদয় শুদ্ধ তাহাকে ভালবাসিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না; হৃদয় উঠে, আরও উঠে, যতক্ষণ সেই চরমোৎকর্ষতম পূর্ণপ্রেম ভাবে বিলীন না হয়, সেই ভাব, সেই পবিত্র আনন্দ, সেই নির্ম্মল প্রীতি প্রেমের উদ্দেশ্য। এই স্থানে মানবের বুদ্ধি এখনও হৃদয়ের অনুসরণ করিতে সাহসী হয় না। সেই প্রীতি পার্থিব প্রেমের চরমোৎকর্ষ, সেই প্রীতি অটল ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির ও নিশ্চল।

একদিন আসিতে পারে যখন মানব বিশ্বপ্রেমী, পরে পূর্ণ প্রেমী হইবে। যে দিন মানব বিশ্বপ্রেমী হইবে সে দিন সত্যই সংসার উদ্যান হইবে, পৃথিবী স্বর্গ হইবে, মনুষ্য দেবতা হইবে। সে দিন ঘৃণা, ঈর্ষা, ক্রোধ স্থানে প্রেম, দয়া, শান্তি বিরাজ করিবে। নরপতির সহিত নরপতির বিবাদ হইবে না, দেশ পরাধীন থাকিবে না, প্রজা বিদ্রোহবহ্নি জ্বালিবেনা, রাজা অত্যাচার করিবে না; তখন প্রজাই রাজা এবং রাজাই প্রজা হইবে; স্বার্থপরতা আর স্বার্থত্যাগ পরস্পর প্রতিবাক্য হইবে। প্লেটো-কল্পিত বাধ্যতা (Obligation) ও স্বত্ব (Right) এক হইবে * তখন মনুষ্য মনুষ্যকে যথার্থ সোদরের ন্যায় ভাল-বাসিবে। আমরা দেখিয়াছি, পুরুষ-রমণীর প্রেম কি কবিত্বময় ও সুখপ্রদ! ইহাতে নিরাশার দীর্ঘশ্বাস, অভিমানের দুঃখ, বিয়োগের যন্ত্রণা থাকিলেও ইহা কি প্রীতি-শান্তিপ্রদ! একজনের প্রতি প্রেমের যদি এই সুখময় পরিণাম হয়, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রতি প্রেম

* Read Plato's Republic.

কি লক্ষ লক্ষ গুণ সুখময় হইবে না? সে দিন প্রকৃতি জীবন্ত হইবে; সে হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের পরিণয়ে সংসার উৎসবময় হইবে; মেঘ বিবাহমণ্ডপের চন্দ্রাতপ হইবে; বিহঙ্গ বিবাহ-গীত গাইবে; প্রকৃতি শ্যামল বসনে পুষ্পের ডালা ধরিয়া প্রীতিভরে পরিণয় দেখিবে; ঋতু নাচিয়া নাচিয়া আসিবে, চলিয়া যাইবে। সে দিন অনন্ত নৃত্য, অনন্ত সংগীত, অনন্ত উৎসব; সে দিন অনন্ত যৌবন, অনন্ত সৌন্দর্য্য, অনন্ত বসন্ত।

ইহা কি কল্পনার উচ্ছ্বাস মাত্র? উন্মত্ত হৃদয়ের সবেগ ইচ্ছা? আমরা তত্ত্ব অনুসন্ধানে জানি যে, বহিঃপ্রকৃতি উন্নতির দিকে ধাবমান। জগতে ক্রমে উচ্চতর জীবের সৃষ্টি হইতেছে। যেমন বহির্জ্জগৎ তেমনি অন্তর্জ্জগৎও উন্নত হইতেছে। তবে বহুদিন পরে একদিন আসিতে পারে যবে এ মনুষ্যজাতি না হউক অপর উচ্চতর জাতি বিশ্বপ্রেমী হইবে। পরে এমন দিনও আসিতে পারে যে দিন এক জাতি পূর্ণপ্রেমী হইয়া ঈশ্বরে লীন হইবে। কারণ, পূর্ণ প্রেমই ঈশ্বর, ঈশ্বরই পূর্ণপ্রেম। আর ইহা হৃদয়ের কল্পনা হইলেও এরূপ কাল্পনিক আদর্শ ইচ্ছনীয়, কারণ মনুষ্যের উদ্দেশ্য মহৎ হইলে মনুষ্য শীঘ্র উন্নতি সোপানে উঠিবে। "To me it seems that human life,.........stands greatly in need of any wider range and greater height of aspiration for itself and its destination which the exercise of imagination can yield to it without running counter to the evidence of fact.*।

সেলির কবিত্বপূর্ণ হৃদয়ে প্রেমতত্ত্ব স্বতঃই কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছিল দেখুন:—

নির্ঝর তটিনী একত্রে মিলন,
নদীর মিলন পয়োধি সনে;
অনিলে অনিল চির-আলিঙ্গন,
হতেছে আবেশ বেগবহনে।

একাকী ধরায় কেহ নাহি রয়;
বিধির বিধানে চলিয়া সবে,
মিলিছে যখন অভেদ-হৃদয়
তুমি আমি কেন না মিলি তবে?

উচ্চে গিরি দেখ চুম্বিছে গগন,
তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিছে দেহ!
কুসুমে কুসুমে মিলন কেমন!
ঘৃণা নাহি করে কাহারে কেহ।

রবি করে ধরা করে পরশন,
শশধর-কর চুমে জলধি,
এসব চুম্বন হবে অকারণ
মানবে মানবে না মিলে যদি।

শ্রীদ্বিঃ

* Three Essays on Religion—*Mill.*

কাবুলের ভৌগলিক বিবরণ।

কাফের ইউরোপীয় জাতির উপর কাবুলের অধিপতি ও তদ্দেশবাসী সকলের বিজাতীয় ঘৃণা থাকাতে, কি ইংরেজ রাজপুরুষ, কি বণিক, কেহই তাহাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ইউরোপের সভ্য রাজন্যগণ স্ব স্ব ব্যয়ে বহুদর্শী ভূগোলবেত্তা অথবা ন্যায়াধ্যায়ী পণ্ডিতগণকে অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা জানিবার জন্য পাঠাইয়া থাকেন। তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া পৃথিবীর আদ্যান্ত পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও মহাদেশ, দ্বীপ, সাগর প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। দেশবাসী জাতিদিগের সামাজিক অবস্থা রাজনৈতিক ও শিল্পকৌশল, শিক্ষা অথবা দেশের নৈসর্গিক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, সংবাদ পত্রে অথবা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই প্রকার এক এক বিষয়ে পণ্ডিত নিযুক্ত থাকাতে ইংরেজরা এতশীঘ্র সকল বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন। কাবুলে প্রবেশাধিকার না থাকিলেও সার আলেকজন্দার বর্ণস, পটীনজার, কাপ্তেন বর্‌টন দূত স্বরূপ হইয়া ও হঙ্গেরী নিবাসী পণ্ডিত ভাম্‌ব্রে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া কাবুলের আভ্যন্তরিক অবস্থা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হইয়া আসিয়াছেন। আমীর ইংরেজবিদ্বেষী বলিয়া কাবুলের সম্যক ইতিহাস আজি অবধি প্রস্তুত হয় নাই। যতদূর জানা গিয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকটিত হইল।

কাবুলের উত্তর দিকে অক্‌সস নদী ও হিন্দুকুস পর্ব্বত; পশ্চিমে পারস্য রাজ্য, দক্ষিণে বেলচীস্থান; পূর্ব্বসীমা কাশ্মীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া কাঘান উপত্যকা ও সিন্ধুনদী তীরস্থিত কৃষ্ণপর্ব্বতে পরিবেষ্টিত হইয়াছে। পরে ঐ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া সিন্ধুনদীর তীরভূমি অবলম্বন করিয়া টরবেলায় উপনীত হইয়াছে। তাহার পর পেশোয়ার উপত্যকা বেষ্টন করিয়া পর্ব্বত পার্শ্বদিয়া খাইবার গিরিসঙ্কটে উপস্থিত হইয়াছে; এবং তথা হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া সিন্ধুনদীতে পুনবার সম্মিলিত হইয়া, আফ্রিডি পর্ব্বত বেষ্টন করতঃ কোহাটের মধ্য দেশ দিয়া চলিয়াছে। কোহাট পরিত্যাগ করিয়া মিরণজাই উপত্যকার পশ্চিম প্রান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক অবাকজাই ও জোয়েমকট্‌ পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া করম নদীতে মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া, ওয়াজিরি পর্ব্বত বেষ্টন পূর্ব্বক ডেরাইসমাইল খাঁ প্রদেশীয় তাখ্‌তী সলিমান পর্ব্বত-পার্শ্ব দিয়া, কতদূর চলিয়া গিয়াছে। পরে সিন্ধু প্রদেশের পশ্চিমোত্তর কাস্‌মোরে উপস্থিত হইয়া, পশ্চিম সীমায় মিলিত

পর্ব্বত ও সোয়াট উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা আরোহ চামলা ও বুনার নামা পার্ব্বতীয় জাতি দ্বারা গিরি-সঙ্কট রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় মানেনদারা তৃতীয় মোরাশাকট ও চতুর্থ মালা-কান্দ ইউসুফজাই হইতে সোয়াট পর্য্যন্ত প্রসারিত। ইহারা অপেক্ষা-কৃত প্রশস্ত। মালেন দ্বারা চামলা ও বুনার জাতির করতলগত। তৃতীয় ও চতুর্থ পথে চিত্রল ও বাদাক-শানে যাতায়াত করে। সোয়াটের আখন্দ (শাসনকর্ত্তা) এই বর্ত্মদ্বয়ের সম্পূর্ণ কর্ত্তা। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বাজা-ওয়ার ও হিন্দুরাজ, ইউসুফজাই হইতে জেলালাবাদ পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত আছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া সোয়াট, জেলালাবাদ ও কাবুলে গমনাগমন করে। এই পথে মহাবীর আলেক-জানদার ও মোগল সম্রাট বাবর ভারতে প্রবেশ করিয়া হিন্দুস্থান আক্র-মণ করেন। মোগল সৈন্য সকল-সময়ে এই পথে ভারত প্রবেশ করি-য়াছিল। সোয়াটের আখণ্ড এই বর্ত্মদ্বয় রক্ষা করেন। সপ্তম ও অষ্টম আব্খানা ও করাপা, পেশোয়ার হইতে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মামুন্দ জাতি ইহার সম্পূর্ণ কর্ত্তা। নবম খাইবার, পেশোয়ার হইতে কাবুল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ইহা অতিশয় প্রশস্ত এবং ভারত, কাবুল ও মধ্য এসিয়ার প্রধান বাণিজ্য পথ। ইংরেজ সৈন্য এই পথে কাবুলে প্রবেশ করেন। ইহা অতি উচ্চ পর্ব্বত শেখর বিদীর্ণ করিয়া চলিয়াছে। আলিমসজিদ নামে একটী দুর্গ ইহার পূর্ব্বদেশে কাবুল-সৈন্যে সুরক্ষিত আছে। আফ্রিডি জাতি এই বর্ত্মের উভয় পার্শ্বে বাস করে বলিয়া খাইবার তাহাদের আয়ত্বা-ধীন হইয়াছে। দশম ও একাদশ, টাটারা ও কাদাপা জমরুড হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উভয় বর্ত্ম অতি সংকীর্ণ এবং খাইবারের শাখা মাত্র। অল্পসংখ্যক সেনা সহ এই পথে প্রবেশ পূর্ব্বক গুপ্ত ভাবে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিতে পারা যায়। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ গালি ও জোয়াকি, পেশোয়ার ও কোহাটের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে জেলালাবাদ পর্য্যন্ত লম্বিত আছে। আফ্রিডি জাতি ইহাদিগের কর্ত্তা। ইংরেজরা গালি সঙ্কটে যাতায়াত করেন বলিয়া, কর-স্বরূপ আফ্রিডি দিগকে বাৎসরিক ১৩,৭০০ শত টাকা প্রদান করেন। চতুর্দ্দশ, গেলেরী অথবা গোমাল্, মিরনজা হইতে কাবুল পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে। গোমাল্ আফগানিস্থান ও মধ্য এসিয়ার এক প্রধান বাণিজ্য পথ। এই পথ ওয়া-জিরি জাতির হস্তে ন্যস্ত আছে। পঞ্চদশ, জারকানি দিরাজাট্ হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত লম্বিত আছে। ইহা বাণিজ্যের এক প্রসিদ্ধ পথ। শিরানিস জাতি ইহাকে আয়ত্বাধীন করিয়াছে। ষষ্ঠদশ লতমার পথ, বাহাদুর খেল্ হইতে

কান্দাহার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। এই পথ ওয়াজিরি জাতির করগত আছে। সপ্তদশ কোরা, দৌলতাবাদ হইতে কান্দাহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই পথ কাবুলের সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। আষ্টানিস জাতি ইহাকে হস্তগত করিয়াছে। অষ্টাদশ বোলান, সিন্ধু হইতে বেলুচীস্তানের মধ্য দেশ দিয়া কাবুল ভেদ করতঃ মধ্য এসিয়ায় উপস্থিত হইয়াছে। কোয়েটা এই পথের অনতিদূরে অবস্থিত। বোলান অতি প্রশস্ত বাণিজ্য পথ। সম্প্রতি ইংরেজরা ইহার তত্ত্বাবধারণ করেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত গিরি-সঙ্কট এক না এক পার্ব্বতীয় জাতির হস্তগত। তাহারা সকলেই স্বাধীন; সুতরাং পথ-প্রবিষ্ট বণিক অথবা পথিক দিগের নিকট হইতে অযথা ও অবাধে কর গ্রহণ করিয়া থাকে। কাবুলের অধিপতিগণ যথানিয়মে আফ্রিডিদিগকে খাইবার সঙ্কটের জন্য অর্থ দিয়া আসিয়াছেন। দোস্ত মহম্মদ বিংশতি হইতে সপ্তবিংশতি সহস্র মুদ্রা বাৎসরিক প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কাবুল আক্রমণ করিলে, নির্ব্বিঘ্নে ঐ পথ ব্যবহারার্থ আফ্রিডি দিগকে এক লক্ষ পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। কর না পাইলে, এই সকল দুর্দ্ধর্ষ অসভ্য গিরিবাসীরা অত্যন্ত উৎপীড়ন করে, এবং পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করতঃ বণিকদিগকে হত্যা করে। ইহারা কতবার অপ্রতিহত ইংরেজ সেনানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে।

এই সকল গিরি-সঙ্কট ভিন্ন কাবুল রাজ্যের আভ্যন্তরিক প্রদেশেও অনেক দুরারোহ বর্ত্ম আছে। তাহারা কখন পর্ব্বতোপরি, কখন নিম্ন প্রদেশে, কখন বা নির্ঝরিণী-বিক্ষত স্থানে নিহিত আছে। ভারতের ন্যায় সুখকর বর্ত্ম কাবুলের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এতদ্দেশে গিরি-সঙ্কটকে কোতল কহে—যথা পায়ের কোতল।

জমরুড, আলিমসজিদ, ঢাকা, হাজার পীর, সোযাট, লালপুরা, কুজ্জা, গণ্ডমক, জেলালাবাদ, কবম, পিশিন, গিজনী, কান্দাহার, হেরাট, কাবুল, ক্বেরা, মৈমেন, বাল্ক, তখ্তাপুল প্রভৃতি কাবুলের প্রধান জনপদ। এই সকল স্থানের মধ্যে জমরুড পেশোয়ারের অতি সন্নিহিত। এখানে একটী ভগ্নদুর্গ ও পঞ্চাশৎ গৃহ মাত্র আছে। এই স্থানে রণজিৎ সিং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে দোস্তমহাম্মদকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। জমরুড কাবুলের পূর্ব্বপ্রান্ত সীমায় ও খাইবার বর্ত্মের পার্শ্বে অবস্থিত। সম্প্রতি ইহা না কাবুল না ভারতের অধীন।

আলিমসজিদে মনুষ্যাবাস নাই। এখানে একটী মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ আছে। তাহা দৈর্ঘ্যে ১০২ হাত, ও প্রস্থে ৪০ হাত। খাইবার গিরি-সঙ্কট সন্নিহিত অত্যুচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে এই দুর্গ

হইয়াছে। এইরূপে পূর্ব্বসীমা কোন স্থান অতি বক্র ভাবে, কোথাও নদী ও পর্ব্বত পার্শ্বাবলম্বন করিয়া প্রায় ৬০০ শত মাইল লম্ববান আছে। পূর্ব্বদিকে যে সকল পর্ব্বতের নাম করা হইল, তাহা অসভ্য ও দুরন্ত পার্ব্বতীয় জাতির আবাসস্থান।

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুনদীর তীর পর্য্যন্ত কাবুল রাজ্য বিস্তৃত ছিল; এবং কাবুলাধিপতিগণ সময়ে সময়ে পেশোয়ারে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়া অবস্থিতি করিতেন। এই সীমা সম্বন্ধে পঞ্জাবরাজ রণজিৎ সীংহের সহিত কাবুলের অনেক যুদ্ধ হইয়াছে। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহ দোস্ত মহম্মদকে জমরুড যুদ্ধে পরাভূত করিয়া, সিন্ধু নদীর পরপার অধিকারভুক্ত করেন। কাল-সহকারে ইংরেজরা পঞ্জাবের শাসন ভার গ্রহণ করিয়া, কাবুলের পূর্ব্ব সীমা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সঙ্কুচিত করিয়াছেন।

কাবুল পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রায় ৪৩০ মাইল ও উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৫০০ মাইল বিস্তৃত। সমগ্র কাবুল ষষ্ঠদশ লক্ষ লোকের নিবাস-ভূমি। তন্মধ্যে অনধিক ৫ লক্ষ লোক অগ্নি-সেবক, ৩ লক্ষ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু। তাহারা সাধারণতঃ নগরে বাস করে। কুজিলবাস ও হাজারা সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকলই সুন্নি।

কাবুলের উত্তর প্রান্তে হিন্দুকুস বা হিন্দুকো পর্ব্বত সতত তুষার-মণ্ডিত হইয়া সৌধ ধবলিত শুভ্র অচল হিমাচলের ন্যায় পথিকের পথ রুদ্ধ করিয়া আছে। ঐ পর্ব্বত ঊর্দ্ধে প্রায় ১৮০০০ হাজার ফুট। মধ্যদেশ সফেদ-কো ও দক্ষিণে সিয়া-কো অপেক্ষাকৃত অনুচ্চ শৃঙ্গোত্তলন করিয়া কাবুলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন সমুদায় প্রদেশ খণ্ড-শৈল-মালায় পরিপূরিত। সুতরাং সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম নাই। সকল পন্থাই পর্ব্বতের মধ্যভাগ দিয়া গমন করাতে দুরারোহ ও অত্যন্ত গমন-ক্লেশকর হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে উপত্যকা ও অধিত্যকা প্রদেশ সমূহ মনুষ্যা-বাসের উপযুক্ত হইয়াছে। এই তিন পর্ব্বত ভিন্ন কোহিবাবা ও পূর্ব্বদিকে সলিমান পর্ব্বত, সাগাবান, কৃষ্ণ পর্ব্বত, খাইবার, আফ্রিডি, অবাকজাই, জোয়ে-মকট্, ওয়াজিরি প্রভৃতি অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি আছে।

মারঘাব, হরিরদ, বাল্ক, কাবুল, হেলমন্দ, করম, সোয়াট, প্রভৃতি নদী এতদ্দেশে প্রবাহিত আছে। মার ঘাব সফেদ-কো পর্ব্বতের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে উত্থিত হইয়া, মার্ভ অভিমুখে গমন করতঃ খিবার মরু-ভূমে বিশুষ্ক হইয়াছে। বাল্ক কোহি-বাবার হৃদয় হইতে উদ্ভূত হইয়া, বাল্ক জনপদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই, চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া সহস্র ক্ষেত্রকে আর্দ্র ও উর্ব্বরা করিয়াছে। কাবুল-নদী হিন্দুকো পর্ব্বতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া কাবুল রাজধানী

জেলালাবাদ ও লালপুরা নগরীর পার্শ্ব দিয়া খাইবারে উপনীত হইয়াছে। পরে ভারত-সীমায় প্রবেশ করিয়া, আটকের সন্নিকটবর্ত্তী সিন্ধু নদীতে সম্মিলিত হইয়াছে। হরিরুদ সিয়াকো পর্ব্বতের উত্তর-পূর্ব্ব ভাগ হইতে উত্থিত হইয়া হেরাটের দক্ষিণদিক দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছে। হেলমন্দ কোহিবাবা গিরি-গহ্বর ভেদ করিয়া প্রায় দ্বিশত মাইল পরিভ্রমণ করতঃ অন্য রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। করম, সোয়াট ও গোরবন্দ—ইহারা গিরি-তরঙ্গিনী মাত্র। পূর্ব্বোক্ত নদীর মধ্যে কাবুল ও হেলমন্দ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ও গভীর। সকল ঋতুতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা তাহাদের উপর বিচরণ করিতে পারে। শীতকালে দুই তিন হস্তের অধিক জল কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যখন নীহার দ্রবীভূত হইতে আরম্ভ হয়, তখন এই সকল নদী স্ফীত-কলেবরা হইয়া অতি ভয়ানক আকার ধারণ করে, এবং এত বেগবতী হয় যে, পারাপার একেকালে বন্ধ হইয়া যায়। সময়ে সময়ে জল রাশি গভীর নির্ঘোষে পর্ব্বত হইতে নামিয়া কূল-প্লাবিত করে। সেই সময় নৌকা মনুষ্য পশু যাহা কিছু সম্মুখে পতিত হয়, তাহা বিঘূর্ণিত হইয়া জলগর্ভে প্রবেশ করে। এই রূপে ১৮৭৯ সালের মার্চ্চ মাসে লেফ্‌টান্ট হারফোর্ড পঞ্চচত্বারিংশৎ সৈন্য সহ যৎকালে কাবুল নদী পার হইতে ছিলেন, সেই সময় অকস্মাৎ প্রবল জল-প্রবাহে তাড়িত হইয়া ধ্বংস-প্রাপ্ত হন।

ভারত হইতে কাবুলে প্রবেশ করিবার ন্যূনাধিক অষ্টাদশ বর্ত্ম আছে। তাহারা সকলেই অতি উচ্চ পর্ব্বত-শেখরের মধ্যদিয়া গমন করিয়াছে। এই সকল দুরারোহ গিরি-সঙ্কট এমন অপ্রশস্ত যে, কোথাও ভারবাহী দুইটী উষ্ট্রও সমভাবে যাইতে পারে না। যে সলিমান পর্ব্বত কাবুল ও ভারতের মধ্য প্রদেশে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে, যাহার শেখর সতত নিবিড় জলদজালে সুশোভিত হইয়া নভোমণ্ডলে সঞ্চরণ করে সে সমুদ্র জল হইতে ১৫০০০ ফুট উচ্চ। এই সকল গিরি-সঙ্কট পথিকের পক্ষে অত্যন্ত ভয়প্রদ ও গমন ক্লেশকর। এই অষ্টাদশ বর্ত্মের মধ্যে উত্তরে খাইবার ও দক্ষিণে বোলান সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। এই জন্য সকল সময়ে এই বর্ত্মদ্বয়ে যত পথিক ও বণিক যাতায়াত করে, তত আর কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না।

প্রধান প্রধান পার্ব্বতীয় বর্ত্মের নাম ও বিবরণ যথাক্রমে দেওয়া যাইতেছে।

প্রথম এম্‌বেলো পঞ্জাব অন্তর্গত ইউসুফজাই উপত্যকা হইতে চাবর

আমীর-সৈন্যে সুরক্ষিত থাকে। জেলালাবাদ কাবুলনদী-তীরে অবস্থিত। এখানে আমীরের একটী দুর্গ আছে এবং বৃহৎ মৃণ্ময় প্রাচীরে নগর পরিবেষ্টিত। জেলালাবাদ পূর্ব্ব বিভাগের রাজধানী স্বরূপ। এখানে একজন ওয়ালী (শাসন কর্ত্তা) অবস্থিতি করেন। সমগ্র নগরে সহস্রাধিক লোক-সংখ্যা হইবে না। সোয়াট, সোয়াট উপত্যকার রাজধানী, এখানে আখন্দ (শাসনকর্ত্তা) বাস করেন। তিনি এক প্রকার স্বাধীন। লালপুরা কাবুল-নদী পার্শ্বাবস্থিত এবং মোমন্দ জাতির রাজধানী। ঢাকা, হাজারপীর প্রভৃতি পল্লী মাত্র। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কাবুল ও ইংরেজে যে যুদ্ধ হয় তাহাতে এই সকল স্থানে কোথাও যুদ্ধ কোথাও বা সেনা সন্নিবেশিত হইয়াছিল। কাবুলের সকল পল্লী মৃণ্ময় প্রাচীরে সুরক্ষিত। এই জন্য অকস্মাৎ বহির্দ্দেশ হইতে আক্রমণ করিয়া কেহ কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

কান্দাহার বিভাগের রাজধানী কান্দাহার। এখানে একজন ওয়ালী নিযুক্ত আছেন। এখানকার জন সংখ্যা প্রায় চত্বারিংশৎ সহস্র। কান্দাহার চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ প্রাচীর ও পরিখা পরিবেষ্টিত, মধ্য স্থানে দুর্গ, তাহার মধ্যে পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্য সতত অবস্থান করে। কান্দাহার অতি প্রাচীন নগর, এইজন্য প্রাচীর ও দুর্গ জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অতি পূর্ব্বে গিজ্নী সমগ্র কাবুলের রাজধানী ছিল এবং সমগ্র ভারতের ধন ও রত্ন রাশি এই স্থানে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু কালের কঠোর হস্তে গিজ্নীর সে শোভা অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতের অপহৃত ধন ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সে রাজবংশের লোপ হইয়াছে। দুরাত্মা মামুদের কলঙ্ক রাশি সময়-স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে।

কাবুলের রাজধানী কাবুল। এখানে নানা সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। সমগ্র রাজধানী ষষ্ঠী সহস্র লোকের আবাস-ভূমি। এইখানে বালাহিসার নামে একটী দুর্জ্জয় দুর্গ আছে। নগরের চতুঃপ্রান্তে প্রাচীর ও পরিখা। সিংহ-দ্বার সতত রক্ষক-বর্গে সুরক্ষিত। ইহা ভিন্ন তিন চারিটী মনোরম রাজপ্রাসাদ নগরের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করে। কাবুল এই অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য-স্থান। নানা দেশ হইতে বণিক সমাগত হইয়া মধ্য-এসিয়ার উৎপন্ন দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করে। কাবুল বিভাগের শাসন-ভার একজন ওয়ালীর হস্তে অর্পিত আছে।

পশ্চিমে হেরাট বিভাগ। হেরাট অতি প্রসিদ্ধ স্থান। এই স্থানে কাবুল ও পারস্যের অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এইস্থানে সুদোজাই বংশের কুলপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়াছিল। হেরাট সমচতুর্ভুজ ইষ্টক-বিনির্ম্মিত সুদীর্ঘ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ইহার এক বাহু ৪,২০০ শত ফিট দীর্ঘ এবং ৩৫ ফিট উচ্চ। এই প্রাচীরের বহির্দ্দিকে গভীর পরিখা।

পার্শ্বদেশ ক্রমোন্নত মৃত্তিকা-স্তূপে দৃঢ়ী-ভূত। এই নগরের ছয় প্রবেশ-পথ। প্রত্যেক দ্বারে ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির দ্বাররক্ষকে রক্ষিত থাকে। নগরের পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে চাগার-বাগ-নামা অতি দুর্জ্জয় দুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। পঞ্চচত্বারিংশৎ সহস্র লোক এই স্থানে বাস করে।

বাল্ক একটী স্বতন্ত্র প্রদেশ। ইহা অতি পূর্ব্ব হইতে কাবুলের শাসনাধীন হইয়াছে। প্রায় অষ্টশত বৎসর অতীত হইল গিজ্‌নীর অধিপতি মামুদ ইহাকে আক্রমণ ও অধিকার করেন, কিন্তু অধিক দিন সম্ভোগ করিতে পারেন নাই। যে সময় সুপ্রসিদ্ধ আলেকজাণ্ডার ভারতাক্রমনাভিলাষে এই প্রদেশে উপস্থিত হন, তখন বাল্ক জন-পরিপূর্ণ অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ৩০০ খৃষ্টাব্দে পারস্যাধিপতি আর্টিজার্ক্সিস বাল্ক-সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তদবধি বাল্ক পাঁচশত বৎসর পারস্যের অধীনে অবস্থিত করে। অষ্ট খ্রীষ্টাব্দে আরবীর মুসলমানেরা দিক্‌বিজয় মানসে বহির্গত হইয়া বাল্ক আক্রমণ করতঃ সমুদায় অধিবাসীদিগকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে (১২২১ খ্রীষ্টাব্দে) দুর্দ্দান্ত জেঙ্গিস খাঁ বাল্ক আক্রমণ, ছিন্ন ভিন্ন ও অধিবাসী-দিগকে হত্যা করে। সেই সময় মনোরম দ্বাদশ-শত মস্‌জিদ দ্বি-শত স্নানাগার ও অনেক সুরম্য হর্ম্ম্য বিদ্যমান ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইয়া তৈমুরের করতলগত হয়। আবার সপ্তদশ শতাব্দীতে ইহা গ্রহণ করেন এবং নাদের সাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহাকে আক্রমণ করিয়া কিয়দ্দিন অধিকার করিলে পর, আফ্‌গানসর্দ্দার ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে কাবুল শাসনের অধীন করেন। অনতিবিলম্বে বোখারা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিলে, আমীর পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং দোস্তমহাম্মদের সেনাপতি মহম্মদ এক্রম খাঁ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে গ্রহণ করিলে, তদীয় (আমীরের) পুত্র আফ্‌জল খাঁ শাসন-কর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথায় প্রেরিত হন। তদবধি বাল্ক কাবুলের অধীন রহিয়াছে।

তক্তাপুল বাল্কের আধুনিক রাজধানী। ইহা পূর্ব্ব রাজধানীর অনধিক ১৭ মাইল দূরে স্থিত এবং বাল্‌কের ভগ্ন গৃহের ইষ্টক দ্বারা বিনির্ম্মিত। আজ পঞ্চাশৎ বৎসর অতীত হইল, কোন গৃহের ভিত্তির মধ্যে স্বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, সকল গৃহে এই প্রকার স্বর্ণ লুক্কায়িত আছে অনুমান করিয়া, সৈন্যেরা রাজাজ্ঞায় সমুদায় অট্টালিকা সমভূম করিয়া ফেলিল। এই প্রকারে অতি সমৃদ্ধিশালী বাল্‌ক দ্বিসহস্র বৎসর অবস্থিতি করতঃ অবশেষে সময়-স্রোতে নিমগ্ন হইয়াছে। এখনও এখানে সপ্তদশ সহস্র লোক বাস করে, তন্মধ্যে দশ সহস্র আফগান ও অবশিষ্ট উস্‌বেগ সম্প্রদায় ভুক্ত।

সমগ্র কাবুল ছয় ভাগে বিভক্ত। যথা কাবুল, কান্দাহার, গিজনী, জেলালাবাদ, হেরাট ও বাল্ক। পার্ব্বতীয় প্রদেশ ভিন্ন আভ্যন্তরিক সমুদায় স্থান আমীরের এক প্রকার বশীভূত আছে। প্রত্যেক বিভাগে এক জন করিয়া ওয়ালি বা শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত আছেন।

উত্তরে মেমেন, পশ্চিমে হেরাট ও ফেরা, রাজধানী কাবুল, মধ্যস্থানে গিজনী, দক্ষিণে কান্দাহার ও পূর্ব্বে জেলালাবাদ ও আলিমসজিদ আমীরের প্রধান প্রধান দুর্গ সুসজ্জিত পদাতি ও অশ্বারোহী সেনায় সুরক্ষিত আছে।

আমাদের বঙ্গদেশের ন্যায় কাবুল নিম্ন স্থান নহে। পার্ব্বতীয় প্রদেশ বিধায়, ইহা সমুদ্রজল হইতে অতিশয় উচ্চ। সমুদায় স্থান উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালায় এমন সুরক্ষিত যে, বহির্দ্দেশ হইতে প্রবল শত্রুও তাহাদিগকে শীঘ্র পরাজয় করিতে সমর্থ নহে। কাবুলের মধ্যে গিজনী সর্ব্বোচ্চ স্থান, ইহা সমুদ্র-গর্ভ হইতে ৭৪০০ ফিট উচ্চ। কাবুল, কান্দাহার ও হেরাট যথাক্রমে ৬৪০০, ৩৫০০ ও ২৫০০ শত ফিট উচ্চ। আমাদের কলিকাতা সমুদ্রজল হইতে ৫০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে। বাস্তবিকই কাবুল স্বর্গ-রাজ্য, মানবের দুরারোহ ও সাধারণ শত্রুর অজেয়। সংস্কৃত অধ্যাপক মনিয়র উইলিয়ম্‌স কাবুলকে এসিয়ার সুইজারল্যণ্ড বলিয়া অক্সফোর্ড কালেজের বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

কাবুলের জল বায়ু স্বাস্থ্যকর। নদীর জল সুমিষ্ট। পর্ব্বত-সঙ্কুল প্রদেশ বলি। শীত-প্রধান দেশ। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এখানে ভয়ানক শীত। এই সময় গভীর নির্ঘোষে বায়ু প্রবাহিত হইয়া শীতের মূর্ত্তি অধিকতর উগ্র করিয়া তুলে। তখন চতুর্দ্দিকে নীহার পতিত হইয়া সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত নদাম্বুর ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়। নিরবচ্ছিন্ন বরফপাতে পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। বাণিজ্য বন্ধ হয়। অধিবাসীরা পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ হইয়া চারি মাস এককালে গৃহবদ্ধ হইয়া শীত বস্ত্রে ও অগ্নুত্তাপে শীত নিবারণ করে। এই সময় দরিদ্র লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। গিজনী সর্ব্বাপেক্ষা শীতপ্রধান স্থান। এই সময় এই স্থানে তাপমান যন্ত্রের পারদ ১৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত শূন্যের নিম্নে (Below Zero) পতিত হয়। এক হস্ত স্থূল বরফের শ্বেত ক্ষেত্র চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিগোচর হয়। কাবুলে ২৭ ডিগ্রি অবধি তাপমান নামিয়া থাকে। কান্দাহার অপেক্ষাকৃত গ্রীষ্মপ্রধান স্থান। এই স্থানে নিম্ন-ভূমিতে প্রায় বরফ-পাত হয় না। হেরাটের বায়ু অতি চমৎকার; নাতি-শীতোষ্ণ দেশ বলিয়া সকল কালেই সুখকর। গ্রীষ্ম কালে সকল স্থানেই অধিক গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়া থাকে এবং তাপমান ১২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে। জেলালাবাদে অসহ্য লু

(Simoom) উড়িয়া বিষম কষ্টের কারণ হইয়া উঠে।

এখানে সর্ব্বত্র কৃষিকার্য্য সুচারু সম্পন্ন হয় না। অধিত্যকাভূমি কঙ্কর ও প্রস্তরময়। তথায় কোন শস্য উৎপন্ন হয় না। শৈল সকল পাষাণময়। অধিকাংশ শৈলে আরণ্য পাদপজাত বীজও অঙ্কুরিত হয় না। উপত্যকা ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা এবং গিরিতরঙ্গিণীতীরবর্ত্তী স্থান সমূহ সতত আর্দ্র থাকাতে, প্রচুর শস্যশালী হইয়া থাকে। প্রজারা স্বয়ং অথবা রাজা কৃত্রিম সরিৎ সমূহ কর্ত্তন করিয়া, কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান করেন। কাবুলের মধ্যে হেরাট সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা। এই স্থানে সকল প্রকার দ্রব্য পূর্ণমাত্রায় উৎপন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু পারস্য দেশবাসীদিগের সহিত ইহাদের সতত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে কৃষির সম্যক্ উন্নতি সাধন হইতে পারে না।

এখানে গোধূম, যব, তামাক, তুলা, হিং পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। হেরাট বাল্ক ও কুণ্ডুজ প্রভৃতি স্থানে চাউলও কিয়ৎ পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন ফলের জন্য কাবুল সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ। বিবিধ মনোহর ও সুস্বাদু ফলাবনত বৃক্ষ-সঙ্কুল উদ্যান প্রায় সকলেরই আছে। বেদানা পেস্তা, আকরট বাদাম, কিসমিস্, আঙ্গুর, আলুবোখারা, খোবানী, সফরিদার, নেবু, খর্জ্জুর প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এই সকল ফল পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইয়া থাকে। শ্বেত তুঁত বৃক্ষ যথেষ্ট পাওয়া যায়। তুঁত বিশুষ্ক ও চূর্ণীকৃত করিলে শক্তুর ন্যায় হয়; সেই শক্তু-দ্বারা পীষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আঙ্গুর হইতে উৎকৃষ্ট সুরা প্রস্তুত হয়। আমীরের অনুজ্ঞাপত্র ভিন্ন কেহই এই সুরা প্রস্তুত করিতে পারে না। মাদ্যোপজীবীদিগকে সুরার জন্য কর প্রদান করিতে হয়। কান্দাহার ও গিজনীতে মাদার নামে একপ্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহার নির্য্যাসে বস্ত্র রঞ্জিত হইয়া থাকে। এখানে এক প্রকার বেউচিনি জাতীয় বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইতে প্রদীপ জ্বালাইবার তৈল নির্গত হয়।

গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে উষ্ট্র, ঘোটক, মেষ, ছাগ পাওয়া যায়। মেষ ও ছাগের লোমে উৎকৃষ্ট পশম ও পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইয়া বিদেশে প্রেরিত হয়।

খনিজ ধাতুর এখানে অভাব নাই। কিন্তু রাজা ও প্রজার মূর্খতা নিবন্ধন মৃত্তিকা খনন করত, ধাতু সংগ্রহ করিতে কেহ আয়াস স্বীকার করে না। লেগমান, কাবুল, কনার ও তাহাদের কর্দ্দ নদীর গর্ভজাত বালুকায় স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। জেলালাবাদ, মিচনি পিশাট ও কার্চ প্রভৃতি স্থানে নদী-গর্ভ হইতে স্বর্ণ-বিন্দু উত্তোলিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কোজে স্থানে রৌপ্যের বৃহৎ আকর ছিল, কিন্তু এক্ষণে গোরবন্দ

উপত্যকায় রৌপ্য সংগৃহীত হয়। তাম্র হাজারা উপবিভাগে এবং সীসা হাজারা ও গোরবন্দ এই উভয় স্থানে পাওয়া যায়। এইস্থানে গন্ধক ও সোরা উৎপন্ন হয়। হিন্দুকুস পর্ব্বতে, কাবুলের দক্ষিণ ভাগে বাদকশান প্রভৃতি স্থানে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লৌহ জন্মে।

শ্রীহরি।

ওয়ালেস্।

নবম পরিচ্ছেদের শেষ।

ম্যাকফাডিয়ন্ স্কট্দিগের উপর অতি-শয় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার শোণিত-লোলুপ সৈন্যেরা বালক ও স্ত্রীবধেও কুণ্ঠিত হইত না, এই জন্য ওয়ালেস্ প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় তাহার এই পাপের সমুচিত শাস্তি বিধান করি-বেন, নয় রণস্থলে প্রাণবিসর্জ্জন করিবেন। এই প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া তিনি দ্বিসহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া ক্যাম্বেলের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্যাম্বেল্ তখন আর্গা-ইল্ সায়ারে ওয়ালেসের পথ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ডঙ্কান্ ওয়ালেসের পথ প্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে আর্গাইল্ সায়ারাভিমুখে লইয়া চলিলেন।

এদিকে ওয়ালেসের সেনা পথশ্রান্তিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ ক্ষুদ্রকায় কতিপয় সৈনিক অনেক পিছাইয়া পড়িল। আক্রমণে বিলম্ব করা বা বিশৃঙ্খল ভাবে আক্রমণ করা দুইই পরাজয়ের মূল ভাবিয়া ওয়ালেস্ নিজ সৈন্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট একশত অশ্বারোহী স্বয়ং লই-লেন ও আর একশত সার্ জন গ্রেহামকে দিলেন, এবং সার রিচার্ড লণ্ডিন্ ও এডাম্ ওয়ালেস্কে পাঁচশত করিয়া দিলেন। এই বারশত বাছাই সৈন্য লইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইলেন। অবশিষ্ট সৈন্যগণকে তিনি অবসর-ক্রমে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া গেলেন।

এই রূপে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তাঁহারা গ্লেণ্ডোকার্টে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে সার্ নীল ক্যাম্প্বেলের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। কাম্প্বেল ওয়ালেসের সহিত মিলিত হইবার জন্য কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। ওয়ালেস্কে সহসা দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তিন শত ক্যাম্পবেল্ সেনার সহিত গিলমাইকেল নামক এক ব্যক্তি শত্রুসেনার অবস্থান-পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত প্রেরিত হইলেন। গিল্মাইকেল একটী শত্রুদূতের মুখে সংবাদ পাইলেন যে,শত্রুসেনা সেই দিনই ক্রেসমোর পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। পাছে আবার সেই দূত ফিরিয়া গিয়া ম্যাক্ফেডিয়নকে তাঁহাদিগের অবস্থান-বিষয়ে সংবাদ দেয়, এই আশঙ্কায় স্কট্-

দূত ইংরাজদূতের প্রাণসংহার করিলেন। তাহার পর তিনি আসিয়া এই সংবাদ ওয়ালেস্‌কে বলিলেন।

ক্যাম্পবেলের সৈনা লইয়া ওয়ালেসের এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ অষ্টাদশ শত সৈনা জুটিয়াছে। বন্ধুর পথে যাইতে হইবে বলিয়া তাহারা অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাদচারী হইয়া শত্রুসেনার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। প্রচণ্ড ঝটিকার ন্যায় তাঁহারা আসিয়া শত্রুসেনার উপর পড়িলেন। শত্রুসেনা সেই বেগে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। সংখ্যার আধিক্য নিবন্ধন আবার শৃঙ্খলাবদ্ধ হইল। ওয়ালেস গেহাম ক্যাম্পবেল, লণ্ডিন্‌, এডাম ওয়ালেস ও রবার্ট বয়ীড—এই ছয় বীরের অদ্ভুত রণ-পাণ্ডিত্য ও অমানুষী শক্তি দেখিয়া শত্রুসেনা বিস্মিত ও ভীত হইল।

হতাশতায় উদ্দীপিত হইয়া ম্যাকফেডন ও তদীয় আইরিস সৈন্যগণ রণে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহারা ভীষণ রণ করিল। কিন্তু স্কটিশ জাতীয় দলের সমস্ত বেগ শেষে গিয়া ম্যাক্‌ফেডনের আইরিস্‌ সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। তাহারা সে বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিল। কতক পাহাড়ে উঠিল, কিন্তু অধিকাংশই অস্ত্রের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য জলে ঝাঁপ দিল। দুই সহস্র আইরিস জলে ঝাঁপ দিয়া আর উঠিতে পারিল না। অতল জলে সমাধিনিহিত হইল। ম্যাক্‌ফেডনের স্কটিশ সেনা শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, অবশেষে অস্ত্র ফেলিয়া ওয়ালেসের কাছে ক্ষমা চাহিল। ওয়ালেস্‌ আদেশ দিলেন যেন কোন মতেই স্বজাতির রক্তপাত না হয়। ম্যাক্‌ফেডন পলাইয়া এক গিরিগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডঙ্কান তথায় যাইয়া সকলকেই নিহত করেন, এবং ম্যাকফেডনের মস্তক আনিয়া ওয়ালেসকে উপহার দেন।

যাঁহারা ওয়ালেসের নিকট শান্তি ভিক্ষা চাহিল, তিনি তাহাদিগের সকলকেই স্ব স্ব ভূমি সম্পত্তিতে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। লোবনের সর্ব্বত্র অননুভূতপূর্ব্ব শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। স্বদেশানুরাগের পুরস্কার স্বরূপ ওয়ালেস্‌ ডঙ্কানের হস্তে লোবন্‌ সমর্পণ করিলেন।

অসংখ্য স্বজাতিপ্রেমিক স্কট্‌ ক্রমে ক্রমে ওয়ালেসের পতাকামূলে আসিয়া দাঁড়াইল। সার্‌ জন্‌ রামসে, পুরোহিত সিনক্লেয়ার লর্ড ষ্টীওয়ার্ট প্রভৃতি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। এদিকে ওয়ালেসের যে সৈনা চলিতে না পারায় পিছাইয়া পড়িয়াছিল, তাহারাও বিজয়-ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিল। রণস্থলে পতিত শত্রুসেনার গাত্রে যে সকল অস্ত্র ও সজ্জা এখনও অবশিষ্ট ছিল, তাহারা তাহা সংগ্রহ করিল। সমবেত স্কটিশ সেনাদল এক্ষণে সংখ্যায় পরিবর্দ্ধিত ও বিজয়-উল্লাসে প্রমত্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় কোন্‌ নগরে অর্ম্মেস্‌বী

নামক একজন ইংরাজ জজ বিচারকার্য্যে আসীন ছিলেন শুনিয়া ওয়ালেস্ সার উইলিয়ম্ ডগলাসকে সঙ্গে করিয়া সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের এরূপ অতর্কিত আক্রমণে সকলেই ভয়-বিহ্বল হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। অর্মেস্‌বী কতিপয় মাত্র লোক সহ পলায়ন করিতে সক্ষম হইলেন। অবশিষ্ট অনেকেই আক্রমণকারিদ্বয়ের শাণিত খড়্গে শমনসদনে প্রেরিত হইল। ওয়ালেস্ ও ডগলাস্ বহুমূল্য লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া জাতীয় শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

সুবিখ্যাত ব্রুসের সদলে আগমনে এই সময় জাতীয় দলের সবিশেষ বলোপচয় হইয়াছিল। যে জাতীয় স্বাধীনতা-যজ্ঞ ওয়ালেস্ আরম্ভ করিয়াছেন, সুপ্রসিদ্ধ ব্যানক্‌বরন্ রণক্ষেত্রে বীরবর ব্রুস সেই যজ্ঞের সমাপন করিবেন।

স্কটলণ্ডের বিদ্রোহ এরূপ ভীষণ আকার ধারণ করিল যে, এডওয়ার্ড তাঁহার ফ্লাণ্ডার্সে যুদ্ধযাত্রা স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইলেন। তিনি ভাগিনেয় লর্ড হেনরী পার্সী এবং বরার্ট ডি ক্লিফোর্ডের অধিনায়কত্বে চল্লিশ সহস্র পদাতিক ও ত্রিশত মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য স্কটলণ্ড ভূমিতে প্রেরণ করিলেন। যখন এই মহতী ইংরাজ সেনা এনমণ্ডেল দিয়া যাইতেছিল, সেই সময় রাত্রিযোগে কতগুলি স্কট ইংরাজসেনা আক্রমণ করিল। তাহাতে ইংরাজদিগের সবিশেষ ক্ষতি হইল বটে কিন্তু স্কটেরা তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারিল না।

এই মহতী ইংরাজ সেনার সহিত মিলিত স্কট্ সেনার ইর্‌ভিঙে সাক্ষাৎ হইল। স্কটেরা যুদ্ধ প্রদান মানসে এক উচ্চক্ষেত্রে সসজ্জ অবস্থায় ইংরাজদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

স্কটদিগের দল যেরূপ পুষ্ট ছিল, তাহাতে যুদ্ধ প্রদান করা নিতান্ত অসম্ভব হইত না, কিন্তু স্কটলণ্ডের দুরদৃষ্ট ক্রমে জাতীয় দলে এই মুমূর্ষু সময়ে অধিনায়কত্ব লইয়া এক ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। যে জাতির কপাল ফাটে, তাহারাই এইরূপ দলাদলিতে উন্মত্ত হইয়া জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যায়। জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া এমন সময় লুণ্ডিন্, ষ্টিওয়ার্ট, রবার্ট ব্রুস্, সার উইলিয়াম্ ডগ্‌লাস, আলেকজাণ্ডার ডি, লিন্‌সে, এবং ওয়ালেস প্রতিষ্ঠাপিত গ্লাসগোর নূতন বিসপ্ উইসার্ট প্রভৃতি জাতীয় দলপতিগণ আপন অনুযাত্রিকগণ জাতীয় দল পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজশিবিরে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুলাই তারিখে এই বিশ্বাস-ঘাতক জাতীয় দলপতিগণের সহিত এডওয়ার্ডের সন্ধি হইল। এডওয়ার্ড এই সন্ধির নিষ্ক্রয় স্বরূপ জাতীয় দলপতিগণের নিকট হইতে পূর্ণ অধীনতা ও জামিন্ গ্রহণ করিলেন। ইংরাজেরা ভাবিয়াছিলেন, চারিদিক্

আঁধার দেখিয়া ওয়ালেস অবশেষে এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সে আশা পূর্ণ হইল না। যে স্বজাতি-চরণে নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, যে নিজ স্বার্থ স্বজাতি স্বার্থে বলিদান করিয়াছে, সে কি জাতীয় গৌরবের বিনিময়ে শত্রুর নিকট নিজের প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে পারে? না—কখনই নহে। সেই স্কটকেশরী সার্ জন্ গ্রেহাম, সার আণ্ড্ মরে, ও অন্যান্য বন্ধু বান্ধব ও অনুযাত্রিকগণ সহ ভগ্নমনে উদীচ্য গিরিমালার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে ইংরাজ সেনাপতি পার্সী ও ক্লিফোর্ড স্কট্‌গণের অন্তর্বিচ্ছেদ সম্পাদন করিয়া ও শরণাগত স্কট ব্যারণগণের অধীনতা সম্পাদন করিয়া অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডাভিমুখে প্রতিযাত্রা করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তাঁহাদিগের সঙ্কল্প হইল যে, সেণ্ট জন্‌ষ্টন্ দুর্গ অধিকার করিতে হইবে। ঐ দুর্গ পরিখা ও প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। প্রাচীর খুব উচ্চ ছিল না, সুতরাং পরিখার উপর তক্তা ফেলিয়া অনতিবিলম্বেই সহস্র সৈনিক পুরুষ পরিখা পার হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গমধ্যে পতিত হইয়া দুর্গদ্বার খুলিয়া দিল। সমস্ত স্কটসৈন্য দুর্গদ্বার দিয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। ইংরাজসৈন্য এই হঠাৎ আক্রমণে অভিভূত হইয়া পড়িল। দুর্গপতি সার্ জন্ ষ্টিওয়ার্ট প্রধান প্রধান ষাটজন সৈনিক পুরুষ লইয়া নৌকারোহণে ডণ্ডী নগরে পলায়ন করিলেন। দুর্গ আক্রমণের সময় রুথভেন্ নামক একজন স্কোয়ার ত্রিশজন সহচর সহ স্কট্‌দিগের সাহায্যে আসিয়া ওয়ালেসের বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ওয়ালেস্ দুর্গমধ্যে তিন দিন থাকিয়া দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া, অবশেষে উক্ত রুথভেনের হস্তে দুর্গ রক্ষার ভার দিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

আবার্ডিনে তিনি একটী জাতীয় সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার আবির্ভাবে নগরের আবট্ কাউপর নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিল। উত্তরাভিমুখে যাইতে যাইতে গ্লামিস নগরে ওয়ালেস বিসপ্ সিন্‌ক্লেয়ারের সহিত মিলিত হইলেন। সিন্‌ক্লেয়ার তাঁহার অনুগামী হইলেন। ব্রেচিনে আসিয়া তাঁহারা রাত্রি যাপন করিলেন। প্রত্যূষে তাঁহারা সুসজ্জিত হইয়া স্কটলণ্ডের পতাকা উড্ডীন করিলেন এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মিয়ারন্‌স জেলার ভিতর দিয়া তাঁহারা রণসজ্জায় গমন করিলেন। ইংরাজেরা চতুর্দ্দিকে ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। অবশেষে চারিসহস্র ইংরাজ কেন নগরের গির্জ্জায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। উক্ত গির্জ্জার বিসপ ইংলণ্ডে যাইতে দিবার অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ওয়ালেসের হৃদয় আয়ারের বিশ্বাস-ঘাতকতার স্মৃতিতে প্রতিহিংসায় প্রদীপ্ত হইল। তিনি গির্জ্জায় অগ্নি প্রদান করিলেন;

অচির-কালমধ্যেই সেই চারিসহস্র ইংরাজ ভস্মরাশিতে পরিণত হইল।

তাহার পর তাঁহারা আবার্ডিনে গমন করিলেন। তথায় একশত ইংরাজ-রণ-তরি দ্রব্য-সামগ্রী সহ সগর্ব্বে সাগরবক্ষে বিরাজ করিতেছিল। ওয়ালেস্ সসৈন্য তাহার উপর পড়িয়া দ্রব্যসামগ্রী লুট করিয়া, অবশেষে তাহাতে অগ্নি-প্রদান করিলেন। পুরোহিত, স্ত্রী, ও শিশু ভিন্ন আর কাহাকেও পলাইতে দিলেন না। জাহাজের অবশিষ্ট সকল ইংরাজ পুড়িয়া মরিল। যাহারা উপকূলে ছিল, তাহারাও ওয়ালেসের শাণিত খড়্গে যমনসদনে প্রেরিত হইল।

ওয়ালেস্ বিজয়ী সেনা সহ তৎপরে বুকানের লর্ড বাউমণ্টের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইংরাজ লর্ড তাঁহার আগমন শুনিয়াই নগর পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্র-পথে পলায়ন করিলেন। তাহার পর তাঁহারা ডণ্ডীদুর্গ আক্রমণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই দুর্গ ভিন্ন ফোর্থের আর সমস্ত দুর্গই এক্ষণে ওয়ালেসের হস্তগত হইয়াছে। তাঁহার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বিশ্বাসঘাতক সার আমের ডি ভ্যালেন্স জন্মের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বথওয়েল হইতে ইংলণ্ডে পলায়ন করিলেন। ওয়ালেসের এই বিজয়বার্ত্তা তিনি পরম্পরায় এড্ওয়ার্ড সকাশে লইয়া গেলেন। এড্ওয়ার্ড নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় স্বয়ং ওয়ালেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু বাইট সহস্র সৈন্য সহ কে যাধ্যক্ষ ক্রেসিংহ্যাম ও আবল ওয়ারেন্‌কে স্কট্লণ্ডে পাঠাইলেন। ষ্টার্লিঙ দুর্গের পুনরাধিকার ও স্কট্লণ্ডের পূর্ণ পরাজয় এই রণসজ্জার অদ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল। বিশ্বাসঘাতক আবল ডন্‌বার এই অভিযানোদ্যত ইংরাজ-সেনার সহিত টুইড্ নদী-তীরে আসিয়া মিলিত হইলেন। এই মহতী সেনা ষ্টার্লিঙ্ কাসলের সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; উপস্থিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দুর্গ অবরোধ করিল। আরল্ ম্যাল্কম জাতীয় দলের প্রতিনিধিস্বরূপ এক্ষণে এই দুর্গ রক্ষা করিতেছিলেন।

এই বার্ত্তা শুনিয়া ওয়ালেস্ ডণ্ডির অবরোধে এক সহস্র মাত্র সৈন্য রাখিয়া সসৈন্য ষ্টার্লিঙ কাসল্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জপের হস্তে সৈন্য-পরিচালনার ভার দিয়া ও তাঁহাকে মঙ্গলবার সসৈন্য ষ্টার্লিঙ্ কাসলের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ দিয়া রাম্সে ও গ্রেহাম্ সমভিব্যাহারে ওয়ালেস্ শনিবার তারিখে উক্ত দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। একটী কাষ্ঠময় সেতুর উপর দিয়া উক্ত দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হয়। ওয়ালেস্ সেই সেতু-মধ্যখানে সুনিপুণ সূত্রধর দ্বারা এ পাশ ওপাশ করাত দিয়া কাটাইলেন এবং তাহাতে এরূপ মৃত্তিকালেপ দেওয়াইলেন যে কেহ সে কাটা টের পাইতে পারিল না। ঐ কর্ত্তিত ভাগের নিম্নে এরূপ করিয়া কাষ্ঠের চাড়া দিলেন, যে

সেতুর উপর দিয়া নির্ব্বিঘ্নে অসংখ্য সৈন্য চলিয়া যাইতে পারে। চাড়া এরূপ করিয়া দেওয়া হইল যে একটী চাড়া সরাইলে সব চাড়া পড়িয়া যাইবে এবং সেতু দ্বিধা বিভক্ত হইয়া নদী-গর্ভে পতিত হইবে।

ওয়ালেস উক্ত সূত্রধরকে আদেশ করিলেন যে, সে যুদ্ধের দিন যেন সেতুর নিম্নে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করে। যখন তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন, সেই সময় যেন চাড়া খুলিয়া দিয়া সরিয়া পড়ে।

সেই ভীষণ সংঘর্ষের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। ইংরাজসৈন্য স্কট সৈন্য অপেক্ষা পঞ্চাশ গুণ অধিক ছিল। ওয়ালেস্ সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য দুর্গ-মধ্যে আনিলেন। ইংরাজ সৈন্য দ্বিধাবিভক্ত হইয়া বিশসহস্র ক্রেসিং-হ্যামের অধিনায়কত্বে অগ্রসর হইল। ত্রিশসহস্র ওয়ারণের অধিনায়কত্বে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। ক্রেসিং-হ্যামের সেনাবিভাগ সেতু অতিক্রম করিল, শঙ্খধ্বনি হইল না। স্কটেরা ভীত হইলেন। নিমেষমধ্যে ওয়ারেণের সমস্ত সৈন্য সেতুর উপর আসিয়া পড়িল। অমনি শঙ্খধ্বনি হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রকাণ্ড দারুময় সেতু ওয়ারেণের সৈন্য সহ নদীগর্ভে পতিত হইল। ইংরাজ সৈন্য মধ্যে ঘোরতর শোকধ্বনি উত্থিত হইল। পতনোন্মুখ অশ্ব ও অশ্বারোহীর ভীষণ চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হইল। এদিকে ওয়ালেস, গ্রেহাম, বয়ীড্, রামস্ক প্রভৃতি প্রমত্ত কেশরীর ন্যায় ক্রেসিং-হ্যামের সৈন্যের উপর আসিয়া পড়িল। ওয়ালেস্ ক্রেসিংহামকে লক্ষ্য করিয়া অমিত পরাক্রমে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। তাঁহার সেই রণচণ্ডী মূর্ত্তি দেখিয়া শত্রুসেনা বাধা দিতে সাহস করিল না। তিনি অবাধে ক্রেসিং-হ্যামের সম্মুখীন হইয়া এক প্রচণ্ড অসি-প্রহারে অশ্ব ও অশ্বারোহীকে ছিন্নদেহ করিলেন। সেনাপতির পতনে ইংরাজ সেনা ভগ্নসাহস হইয়া পড়িল। তথাপি তাহারা অসীম সাহসের সহিত কিছু কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল যে, দশ সহস্র সৈন্য সেনাপতির অনুবর্ত্তন করিয়াছে, তখন তাহারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া বিশৃঙ্খল-ভাবে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। কিন্তু তাহারা শত্রু-সেনার অনুসরণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। যাহারা জলে ঝাঁপ দিয়া-ছিল, তাহারা ডুবিয়া মরিল; যাহারা সাহস করিয়া জলে ঝাঁপ দিতে পারিল না, তাহারা স্কটগণের প্রচণ্ড খড়্গ-প্রহারে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এই রূপে যে বিশসহস্র ইংরাজসৈন্য সেতুপার হইয়াছিল, তাহার একটীও আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারিল না। ওয়ারেণের সৈন্যের মধ্যে যাহারা সেতুর ওপারে ছিল, তাহারা এই ব্যাপার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ভর্ব্বার অভিমুখে পলায়ন

করিল। কিন্তু তাহারাও অনুসরণকারী স্কট্‌গণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইল না। ওয়ালেস ও গ্রেহাম্, শত্রুদিগকে হ্যাডিংটন্ নগরে গিয়া ধরিলেন। তাঁহাদিগের অস্ত্র-প্রহারে অনেকেই শমনসদনে প্রেরিত হইল। এখানে বাম্‌জে, বয়ীড্, লুণ্ডিন্, আডম্ ওয়ালেস, ও আবল ম্যাল্‌কম্ অনুযাত্রিক সহ তাঁহাদিগের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ই সেপ্‌টেম্বর এই বিখ্যাত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে অতি অল্পসংখ্যক স্কট-সৈন্য নিহত হয়, তাহাদের মধ্যে আণ্ড্ মরে ভিন্ন আর কোন সেনাপতিরই মৃত্যু হয় নাই। কিন্তু সেই বৃহৎ ইংরাজ সেনার অতি অল্পই পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল। ক্রেসিংহ্যাম প্রভৃতি মহারথিগণ সেই রণক্ষেত্রে অকালে সমাধিনিহিত হইলেন। এত দিনে স্কটেরা বারউইক্ ডন্‌বার্ আয়ার প্রভৃতি ভীষণ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইলেন। এতদিনে তাঁহাদিগের অন্তর্নিগূহিত যাতনানলে শান্তিবারি পতিত হইল।

স্কট্‌লণ্ডের শোণিতে যে ইংরাজদেহ পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই ইংরাজদেহের শোণিত মাংসে আজ স্কট্‌লণ্ড-ভূমি উর্ব্বরা হইল।

ওয়ালেস্ সহচরবৃন্দ সহ সে রজনী হ্যাটিংডন্ নগরে কাটাইয়া পরদিন ষ্টার্লিঙ কাসলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনতিবিলম্বেই ওয়ালেস ঘোষণা করিলেন যে, স্কটলণ্ডের ব্যারনগণের মধ্যে সকলেই আসিয়া যেন জাতীয় স্বাধীনতা পুনঃস্থাপন ও জাতীয় শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহার অধিনায়কত্ব স্বীকার করেন। যাঁহারা ইহাতে অস্বীকৃত হইলেন, ওয়ালেস্ তাঁহাদিগের দর্পের সমুচিত শাস্তি-বিধান করিলেন। সার্ জন্ মন্‌টীথ্ প্রভৃতি প্রাচীন বংশসম্ভূত ব্যারন্‌গণ আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিনেতৃত্ব স্বীকার করিল।

এদিকে ওয়ারেন্ আপনার সেই অসংখ্য সৈন্য ষ্টার্লিঙ-কাসল রণক্ষেত্রে হারাইয়া অতিবেগে বারউইক অভিমুখে পলাইলেন। স্বদেশবাসীদিগের নিকট সেই ইংরাজমেধ যজ্ঞের সংবাদ সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকেই দিতে হইল। এই সংবাদে স্কট্‌লণ্ডবাসী ইংরাজেরা এত ভীত হইলেন যে, এক মুহূর্ত্তও তাঁহাদিগের স্কটলণ্ডে থাকিতে সাহস হইল না। তাঁহারা আপন আপন দুর্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তীব্র গতিতে ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

এইরূপে ষ্টার্লিঙ যুদ্ধের পর দশ দিনের মধ্যে বারউইক ও রক্সবরা ভিন্ন স্কট্‌লণ্ডের আর সমস্ত দুর্গই ওয়ালেসের হস্তগত হইল। বহুদিনের পর আবার স্কট্‌লণ্ডের জাতীয় পতাকা স্ফীতবক্ষে উড্ডীন হইল। এতদিনে স্কটলণ্ড স্বাধীন হইল। আজ জাতীয় দলের হৃদয়ে আনন্দোচ্ছ্বাস ধরে না। পতিত জাতি ভিন্ন সে আনন্দের পরিমাণ আর কে বুঝিবে?

অতঃপর স্কটীয় পুনঃ পূর্ব্বপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি স্কুটের কাফার্ডের হস্তে এডিনবরা দুর্গ-রক্ষার ভার ন্যস্ত করিলেন।

এই বিষাদসম্বাদ সমুদ্র পার হইয়া ফাগুর্সে এডওয়ার্ডের নিকট গেল। তাঁহার মস্তক হইতে যেন মুকুট খসিয়া পড়িল।

বিয়োগান্ত নাটক।

ইউরোপীয় সমাজ যে অধুনা এতদূর সভ্য হইয়াছেন, তবু ইউরোপীয় সভ্যতা একাংশে ভারতীয় সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট রহিয়াছে। ইউরোপীয় ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইতে থাকে যে, ইউরোপীয় জাতিগণ যেন অতি প্রাচীন কাল হইতে অত্যন্ত নৃশংস-স্বভাব। তাহাদিগের প্রকৃতি মধ্যে ই কেমন এক কাঠিন্য আছে যাহা কিছুতেই অপনয়ন করিতে পারে নাই। অতি প্রাচীন কালে সেই যে ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি ইউরোপীয় বর্ব্বর জাতি সমূহ অত্যন্ত নির্দ্দয়-স্বভাব ছিল, আজও যেন তাহাদিগের উষ্ণ শোণিত আধুনিক জাতি মধ্যেও প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বে ইউরোপীয়গণ নৃশংসাচরণে যেরূপ আমোদ প্রাপ্ত হইত, সে আমোদ বরাবর চলিয়া আসিয়াছে। স্পার্টানগণের নৃশংসাচরণ, রোমানদিগের গ্লাডিয়েটরের ক্রীড়া আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করে। মধ্যযুগের ইতিহাস নরুরুধিরে কি ভয়ঙ্কর রূপে প্লাবিত হইয়াছে! ক্রুসেডের রক্তপাত, ইনকুইসিশনের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিক বিবরণ পড়িলে শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। আবার দেখ, ইহুদীজাতির প্রতি উৎপীড়ন, উইচ্‌ক্রাফ্‌টের শাস্তির বিবরণে যে প্রকার নৃশংসাচরণের পরিচয় হয়, কোন্ বর্ব্বর-জাতির ইতিবৃত্তে তত ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কিত আছে? আবার ঐ কি, আয়র্লণ্ডের ইতিবৃত্ত, ইংরাজগণ ও স্কটগণের হত্যাকাণ্ড, ফ্রান্সের প্রটেস্‌টাণ্ট এবং ক্যাথলিকগণের হত্যাকাণ্ড। এ সমস্ত পড়িলে আর কি ইউরোপীয়গণকে সভ্যজাতি বলা যায়? স্পেন আমেরিকা-জয়ের সঙ্গে কি অধমতম বর্ব্বরতারই পরিচয় না দিয়াছে! ইউরোপীয় ব্যবস্থা-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, তাহাদিগের পূর্ব্বকালের দণ্ডবিধান কেমন রুধিরের লোহিত বর্ণে অঙ্কিত ছিল। যে সমস্ত জাতি মধ্যে এতদূর নৃশংস ব্যবহার, তাহাদিগকে কি প্রকৃত রূপে সভ্য বলা যায়; অথবা তাহাদিগের সভ্যতা কেবল ভাণ মাত্র। এই সমস্ত ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হইতে

থাকে যেন, ইউরোপীয়গণের প্রকৃতিই কেমন নৃশংস উপকরণে গঠিত,—তাহা কিছুতেই নরম করিতে পারে নাই। খৃষ্টান ধর্ম্ম যে এত উন্নত বলিয়া গর্ব্ব করা হয়, তাহাও ইউরোপকে সম্যক্ সভ্য করিতে পারে নাই; ইউরোপীয় জাতি-নিচয়ের নৃশংসতার অপনয়ন করিতে পারে নাই। ধর্ম্ম তাহাদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে পারে নাই; তাহাদিগের স্বভাবকে বিনম্র করিতে পারে নাই এবং তাহাদিগের প্রকৃতি মধ্যে হৃদয়ালুতা ও দয়ার সিঞ্চন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা অপেক্ষা এই জন্য শ্রেষ্ঠ যে, সেই সভ্যতার ইতিহাস বর্ব্বরজাতীয় নৃশংসতায় কলঙ্কিত হয় নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ইতিহাসের কোন পত্র লালবর্ণে চিত্রিত নহে। নৃশংস ব্যবহার, কি নিষ্ঠুরাচরণ ভারতবর্ষীয়গণের প্রকৃতিতে কখনই স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। নিদান, যে পরিমাণে তাহা ইউরোপীয়গণের চরিত্রকে কলঙ্কিত করিয়াছে, সে পরিমাণে ভারতীয়গণের চরিত্র কখন কলঙ্কিত করে নাই। মনুষ্য চরিত্রকে উন্নত করা, মনুষ্য স্বভাবকে বিনম্র ও দয়ার্দ্র করা, যদি মানব-প্রকৃতিকে স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ করা ধর্ম্মের কার্য্য হয় তবে অবশ্য বলিব হিন্দুধর্ম্ম দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হইয়াছে। পৃথিবীতে যদি কোন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎও সংসিদ্ধ হইয়া থাকে, তবে অবশ্য বলিব, সে জয় পতাকা হিন্দুধর্ম্ম এক দিন লাভ করিয়াছে যদি খৃষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের কোন অংশে শ্রেষ্ঠত্ব থাকে, তবে অবশ্য বলিব, খৃষ্টান ধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্য-স্বভাবকে অনেকদূর সাধু ও সদ্ভাবযুক্ত করিয়াছে। যদি দয়া দাক্ষিণ্যের প্রচার ও চরিত্রের সাধুতা সংসাধন করা সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তবে অবশ্য বলিব ভারতবর্ষীয় সভ্যতা এককালে অতি উচ্চ সীমায় উত্থিত হইয়াছিল, আজিও সে সভ্যতার নিকট ইউরোপীয় সভ্যতা পরাজিত। সভ্য ইউরোপীয় জাতি যে দেশে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন, সেই দেশেই তাহারা অতি রুদ্রমূর্ত্তিতে, ভীষণ হুহুঙ্কার রবে রক্তহস্তে হত্যা, ব্যভিচার, ও লুণ্ঠন করিতে করিতে এবং নৃশংসতা ও বর্ব্বরতার পরিচয় দিতে দিতে প্রবেশ করিয়াছেন। কিন্তু সভ্য আর্য্যজাতি সভ্য হিন্দুজাতি কখন তদ্রূপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে উদয় হন নাই। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের উৎকর্ষের পরাকাষ্ঠা, ইহাই হিন্দু সভ্যতার জয় ও শ্রেষ্ঠত্ব। আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, ইউরোপীয় মিসনরিগণ অগ্রে নিজ ইউরোপখণ্ডকে ধর্ম্মশীল করিতে উদ্যোগী না হইয়া ভারতে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসেন! আমরা আশ্চর্য্য হইয়াছি তাঁহারা অগ্রে স্বদেশকে সংশোধন না করিয়া বিদেশকে সংশোধন করিতে উদ্যত হইয়াছেন!

ইউরোপীয় জাতির উল্লিখিত প্রকৃতি-মূলক দোষ শুদ্ধ যে তাহাদিগের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে এমত নহে, তাহাদিগের সেই রূঢ় বর্ব্বর স্বভাব তদীয় সাহিত্যের এক প্রধান ভাগকেও দূষিত করিয়াছে। তাহাদিগের নাট্য-রচনায় ইহা ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। ইউরোপীয় ট্র্যাজেডি শুদ্ধ ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্পত্তি। তাহা সেই সাহিত্যের গৌরব কি না তাহা আজিও বিচার্য্য বিষয়। আমাদিগের সাহিত্যে করুণ রসের পরিচয় আছে বটে, কিন্তু ইউরোপীয় ট্র্যাজিডিতে যে করুণ রস বীভৎসেতে আসিয়া পড়ে, যাহাকে করুণ রস বলিব কি বীভৎস রস বলিব ঠিক বুঝিতে পারি না, সে রূপ ভয়ঙ্কর ও শরীর-লোমাঞ্চকর করুণ-রস ভারতীয় সাহিত্য ও নাটকে নাই। আমারা জোর রামায়ণের, কি নৈষধের করুণ রসে মনকে আর্দ্র করি। কিন্তু আমরা কখন ইউরিপাইডিসের ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিক রসে শিহরিয়া উঠি না, কখন ম্যাক্‌বেথ ও ডেসিডিমোনার ভয়ঙ্কর নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া কাঁপিতে থাকি না। ভাবি এ করুণ রস নহে, ইহা মনুষ্যের নৃশংসতার পরিচয়, বর্ব্বরতার চিহ্ন। এ রসে শরীর কোপ-কম্পিত এবং কণ্টকিত হইয়া উঠে। ইহাতে দর্শক ও পাঠক যতদূর নৃশংসতায় অভ্যস্ত হইয়া আসেন ততদূর উৎ-পীড়িতের প্রতি অনুকম্পা করিতে শিখেন না। যতদূর তাঁহার প্রকৃতি উগ্র হয়, ততদূর তাঁহার প্রকৃতি বিনম্র হয় না।

আমরা কেমন ইংরাজ সাহিত্যের পক্ষপাতী, তাহাদিগের আত্মগৌরব কেমন নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিয়া থাকি যে, যখন আমরা তাহাদিগের ট্র্যাজিডির প্রশংসা করিতে শিখি, তখন আর সে বিষয়ের কিছুমাত্র বিচার করি না। ইউ-রোপীয় সাহিত্যে এক নূতন সামগ্রী দেখিলাম, সেই সামগ্রীকে তাহারা আপনারাই নিজ স্বভাবদোষে অনেক প্রশংসা করেন, আমরাও তৎসঙ্গে সঙ্গে তাহার আদর করিতে শিখি। শুদ্ধ আদর করি না, নিজ সাহিত্যমধ্যে সেই সামগ্রী প্রবিষ্ট করিতে চাই। এদিকে এত দূর যাই যে, আদর্শরীতিরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া পড়ি। ইউরোপীগণ নিজে যাহা দোষার্হ বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমরা তাহাও অনায়াসে গ্রহণ করিয়া প্রচলিত করিতে যত্নবান হইয়াছি।

প্রকাশ্য রঙ্গভূমে আমরা মারামারি, কাটাকাটি ও শোণিত-পাত প্রচলন করিতে চাহি না। আমাদের প্রকৃতি এত কঠিন নহে; আমরা এরূপ ব্যাপার চক্ষে দেখিতে পারি না, এবং দেখিয়া দেখিয়া আমাদের সহৃদয় স্বভাবকে নিষ্ঠুরাচরণে অভ্যস্ত করিতে চাহি না। সুরুচি-সম্পন্ন ইউরোপীয় সমালোচকগণও এরূপ ব্যাপার প্রকাশ্য অভিনয়ের অযোগ্য বলিয়া গিয়াছেন। পাপের প্রকাশ্য নৃশংস মূর্ত্তি রঙ্গভূমে দর্শকগণকে

না দেখানই ভাল। কিন্তু আমাদের কেমন দোষ, আমরা যেমন অন্যান্য বিষয়ে ইউরোপীয়গণের গুণভাগ পরিত্যাগ করিয়া দোষভাগ অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হই, সাহিত্যেও ,সে নিয়মের ব্যতিক্রম করি না। এক্ষণকার অনেক নাটকে এই প্রকার কুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন আর্য্য-সাহিত্যে যদিও ইউ-রোপীয় বিয়োগান্ত রীতি অবলম্বিত হয় নাই বটে, কিন্তু বিয়োগান্ত রীতির যাহা প্রধান গুণ তাহা আর্য্যসাহিত্যে ছিল। যে করুণরস বিয়োগান্ত রীতির প্রধান গুণ, তাহা আর্য্যসাহিত্যে প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা সেক্সপিয়ারের ডেস্‌ডিমোনার জন্য যেরূপ সন্তপ্ত হই, সীতা, দময়ন্তী, দ্রোপদী, শকুন্তলা, সাগ-রিকা, মালবিকা, মহাশ্বেতা প্রভৃতি কবি-কল্পিত নায়িকার জন্য কি তদপেক্ষা অনধিক প্রমাণে সন্তপ্ত হইয়া থাকি? অথচ ইঁহারা কেহই ডেস্‌ডিমোনার ন্যায় নৃশংস রূপে নিহত হয়েন নাই। বাল্মীকি এক জন মহাকবির ন্যায় কেমন কাল্পনিক সুন্দর দৃশ্যে সীতাকে আপন কাব্য হইতে অপসারিত করিয়াছেন। সরলা, নিষ্পাপিনী ডেস্‌ডিমোনা নিষ্ঠুর রূপে নিহত হইয়া স্বর্গে যাইলেন; সীতা কবি-কল্পিত স্বর্ণরথে দেবতাগণের পুষ্প-বৃষ্টি ও আনন্দ-ধ্বনি সহকারে স্বর্গারোহণ করিলেন। কিন্তু জন্মদুঃখিনী সীতার দুঃখ ও ক্লেশ তাঁহাকে চিরদিনের জন্য মানব-হৃদয়ের সহানুভূতি মন্দিরে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা ডেস্‌-ডিমোনার হত্যাকাণ্ড দেখিয়া একবার অশ্রুপাত করি; তাঁহার বিয়োগদুঃখে তাঁহার জন্য কাতর হই, তাঁহার সরলতা, পতিপরায়ণতা ও হৃদয়মাধুরী আমাদের মনে দ্বিগুণ বলে অঙ্কিত হয়। কিন্তু সীতার বনবাস সীতাকে ডেস্‌ডিমোনা অপেক্ষাও অনুকম্পাপাত্রী করিয়াছে। সীতার দুঃখে কাতর হইয়া আমরা বাল্মীকির সহিত প্রতি ঘটনায়, প্রতি পত্রে কাঁদি, কাঁদিয়া হৃদয়কাতরতায় তাঁহাকে পবিত্র জ্ঞান করি, তাঁহার হৃদয়-মাধুরী শনৈ শনৈ আমাদের হৃদয়ে জাগিতে থাকে, সীতার সকল গুণে পক্ষপাতী হই, পক্ষপাতী হইয়া সীতার জন্য হৃদয় অনবরত কাঁদিতে থাকে। সীতা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনোমন্দির অধি-কার করেন। তিনি আমাদের মনো-মন্দিরে অতি পবিত্র-মূর্ত্তিতে চিরদিনের জন্য স্থাপিত হয়েন। সীতা ভারতবাসি-গণের হৃদয় বিগলিত করিয়া রাখিয়া-ছেন। ভারতবাসিগণ সীতার জন্য চিরকালই অশ্রুবর্ষণ করিবেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইউরোপীয় কোন বিয়ো-গান্ত কাব্যের অধ্যয়নফল কি এত অধিক হইয়াছে? বাল্মীকির সহিত অন্যান্য কবির তুলনা হয় না বটে; কিন্তু এ প্রস্তাবে কবিদের বিচার হইতেছে না। আমরা দেখাইতে চাই, কাব্য নৃশংস-রূপে বিয়োগান্ত না হইয়াও মহান

করুণরসের আধার হইতে পারে। যদি তাহা হয়, তবে কাব্য মধ্যে নৃশংসতার দৃশ্য-যোজনা করিয়া তাহাকে কলঙ্কিত এবং পাঠকের কল্পনাকে নিপীড়িত করিবার প্রয়োজন কি? যখন নায়িকার দুঃখরাশি তাঁহাকে সমান সহানুভূতির পাত্রী করিতে পারে, তখন আর সে পাত্রীকে নিষ্ঠুররূপে নিপীড়ন অথবা হত্যা করিবার প্রয়োজন কি? এই কারণে আমরা ইউরোপীয় বিয়োগান্ত রীতিকে নিতান্ত নিষ্ঠুর জ্ঞান করি। সে রীতি আমাদের কোমল হৃদয়কে নিতান্ত ব্যথিত করে, আমাদের হৃদয়কে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করে। আমরা ততদূর নির্দ্দয় ব্যবহার সহ্য করিতে পারি না,—দেখিতে ও শুনিতে পারি না। আমাদের সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠে, হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। আমরা সেরূপ দৃশ্য পরিবর্জ্জন করিতে উদ্যত হই। সেরূপ দৃশ্য আমোদ করিতে চাহি না—তাহাতে কোন সুখ জ্ঞান করি না। ইউরোপীয় কাব্যের বিয়োগান্ত রীতি আমাদের কোন মতে অনুকরণীয় নহে। আমাদের সাহিত্যে যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহা ইউরোপীয় রীতি অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আর্য্য-হৃদয়, আর্য্য-রুচিকে পরিণত করিয়াছে। আমাদের নিজ গৃহেই মহার্ঘ রত্ন রহিয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা না দেখিয়া পরের চাকচিক্যে বৃথায় মোহিত হইতে যাই! আর্য্য রুচিতে হৃদয় আছে; কিন্তু ইউরোপীয় রীতি হৃদয়শূন্য পরিহার্য্য পদার্থ।

শ্রীপূ—

কি বলিব তায়?

স্থান—হুগলী, ইমামবাড়ীর ঘাট। সময়—মেঘাচ্ছন্ন প্রদোষ।

উন্মুক্ত স্মৃতির দ্বার নিরখি আমার,
জাহ্নবি, তোমার ওই প্রবাহের পথে!
এই শূন্য হৃদয়ের সর্ব্বস্ব আমার—
প্রাণ সহ তিল তিল খসিয়াছে যাহা—
ভাসিয়া গিয়াছে যেন ওই স্রোত-পথে।
নিরখি—নিরখে যথা দারুণ নীরবে
তীরস্থিত, ভগ্নদেহ প্রাচীন মন্দির—
অশ্রান্ত প্রবাহে তব মর্ম্মগ্রন্থি যার,
হইয়া শিথিল, ক্রমে খসিয়া পঞ্জর,
পড়িয়াছে তব গর্ভে,—নিরখি তেমতি।
সুদূর-বাহিনী তব ওই স্রোত সনে,
যেন ওই—মেঘাচ্ছন্ন প্রদোষ আঁধারে—
তীরস্থিত তরুরাজি ছায়ায় তা সহ—
মিশিয়াছে আমার সে অতীত জীবন;
পড়ে আছে স্মৃতি-চিহ্ন অঙ্গে অঙ্গে তার
গৃহতরু ছায়া যথা দুকূলে তোমার!
অতীত এ জীবনের প্রতিবিম্ব প্রায়
তোমার প্রবাহ,গঙ্গে,আজ ভেসে যায়!

ভেসে যায় প্রাণ, গঙ্গে, সলিলে তোমার
লহ ভাসাইয়া মোরে প্রবাহের সনে—
চল দেখি ওই দূর আঁধারে পশিয়া
মিলে কি না আমার সে—কি বলিব তায়?
কি বলিব তায়—প্রাণ কহ না আমায়?
কহ না আমায় তুমি, কল্পনা-সুন্দরি—
নিরখিলে ইহকাল দিবস শর্ব্বরী—
নিরখিলে অঙ্কে অঙ্কে নিভৃত অন্তরে
কহ না আমায় আজ কি বলিব তারে?
কি বলিব তায়?—তুমি কহ না প্রকৃতি
দেখায়েছি তোমারে যে বক্ষঃস্থ ছবি
হে ব্রহ্মাণ্ড! তব অঙ্গে কত শত বার
মিশায়ে দিয়াছি যত্নে প্রতিবিম্ব তার—
কহ না আমায় আজ কি বলিব তায়?
কি বলিব বলিতে যে * * *
বলিব কি আশা তায়?-না না ততোধিক
তা হতে পবিত্র তাহা—তা হতে উন্নত
তা হতে নিঃস্বার্থ তাহা—তা হতে মধুর।
তবে কি বলিব?—সেকি পিপাসা আমার?
না না সে যে উগ্রতর প্রভাব তাহার,
শান্তি-তার স্নিগ্ধতর-নহে সে পিপাসা।
কি বলিব তবে—সে কি জীবনের সুখ?
অহো সে কি সুখ? না না সুখ নহে তাহা।
তবে কি বলিব তায়? বলিব কি দুঃখ?
দুখ!—দুখ!—দুখো নয় নহে সুখ দুখ
তা হতে গভীর তাহা—দীর্ঘতর স্থায়ী
তা অধিক মোহময় ছিল সে আমার!
স্বপ্ন নয়—এখনো সে বিরাজে অন্তরে,
মোহ নয়—ভ্রান্তি কভু ছিল না তাহার।
কেমনে বলিব তবে কি যে সে আমার।
আজীবন বক্ষঃস্থলে ধরিয়াও যায়
বুঝি নাই কিসে মম—...
কেমনে বুঝিব সে যে কি ছিল আমার?
আশাময়—শঙ্কাময়—সুধাময়—বিষময়
দুখময়—সুখময়—স্বপ্নময়—মোহময়
হৃদয়ের স্মৃতি মম—দৃষ্টি নয়নের
কল্পনার মূলমন্ত্র—ভাবনার ধৃতি
জাগ্রতে ব্রহ্মাণ্ড তাহা—নিদ্রায় স্বরগ
জীবনে সে ধর্ম্ম মম—মরণে সে মুক্তি
সেই সে সর্ব্বস্ব সার জগতে আমার
মনে হয় যেন ওই আঁধারে মিশেছে।
প্রকৃতি! তোমার দীপ্তি কর তরলিত,
কর ঘনীভূত ছায়া প্রদোষ তোমার
গাঢ়তর করি অঙ্গ উর জলধর—
দুকূল বিরাজি ওই তরুরাজি-শিরে,
গৃহতরু, তোমাদের ছায়া প্রসারিত
করি তটিনীর বক্ষ কর আবরিত।
তট-বিলাসিনী ওই স্রোতস্বিনি তুমি
কৃপা করি ক্ষণকাল ত্যজ এ বিলাস
লহ দ্রুত ভাসাইয়া ওই স্থানে মোরে
শূন্যে শূন্য অন্ধকার মিশিয়াছে যথা।
দেখিব বারেক আমি শূন্যে ও আঁধারে
আমার সর্ব্বস্ব ধন কোথায় বিরাজে!
না মিলে হেথায় যদি—দাঁড়ায়ে বারেক
দাঁড়াইয়া শূন্যমর্ত্ত সন্ধিস্থলে ওই
সংসারের পরপ্রান্তে দেখিব বারেক।
প্রীতির পীযূষ যাহা মানব-জীবনে
হেরিব কোথায় যায় ভাসি কালস্রোতে।
অদৃশ্য নয়নে যদি—বিলুপ্ত সে নয়
বিলুপ্ত হইলে কেন স্মৃতি রহে তার?
অবশ্য ভাসিয়া তাহা কালের প্রবাহে
মিশে যায় ওই শূন্যে পরমাণু হয়ে;

তাই যদি—শূন্যপ্রান্তে পড়ি একবার
মুদিয়া নয়নদ্বয় খুলিয়া হৃদয়
বারেক ধরিব বক্ষে প্রতিধ্বনি তার।
প্রতিধ্বনি আছে তার নাহিক সংশয়—
এত কোলাহল-পূর্ণ আছিল সে তাহা
সসীম মানব-হৃদে!—অসীম আকাশে
না জানি সে কোলাহল কতই তাহার!
কেবলি আমার নহে, অসংখ্য জীবের,
অনন্ত প্রাণের স্রোত মিশিয়াছে তথা।
শিশুর তরল—আর যুবার প্রখর
প্রৌঢ়ের প্রগাঢ় আর বৃদ্ধের গভীর
স্নেহ মায়া মোহ প্রেম অনন্ত প্রবাহে
মিশিয়াছে ওই শূন্যে পরমাণু হয়ে।
হায় রে সে সুখ! পড়ি ওই শূন্যতলে
ধরিতে পরাণে নূর প্রতিধ্বনি তার।
নীরব হৃদয়-যন্ত্রে যাইবে বাজিয়ে
একে একে কত ধ্বনি তা সহ আমার—
আমার সে অপহৃত প্রীতির পরশে
বেজে ওঠে প্রাণ সূত্র যদি একবার
তবেই হইল মম পূর্ণ অভিলাষ।
লহ গঙ্গে! ভাসাইয়া ওই স্থানে মোরে
সেই প্রতিধ্বনি বক্ষে ধরিব বারেক।

শ্রীঈ—

রত্ন-রহস্য।

ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল ও নীলকান্তমণি এক বস্তু। আধুনিক জহরিরা ইহাকে "নীলম্" ও "নীলা" বলিয়া থাকেন। ইহার "সৌরিরত্ন" "নীলাশ্ম" "নীলোপল" "তৃণগ্রাহী" "মহানীল" "নীল" প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত নাম আছে।

শুক্রনীতির মতে ইহা মধ্যম শ্রেণীর রত্ন, শনিগ্রহের প্রিয় এবং নিবিড় নব মেঘ-প্রভার ন্যায় প্রভাযুক্ত। যথা—

"হিতঃ শনেরিন্দ্রনীলোঽপ্যসিতো
ঘনমেঘরুক্।"

"ইন্দ্রনীলং পুষ্পরাগেণ বৈদূর্য্যং
মধ্যমং স্মৃতম্।"

মানসোল্লাস গ্রন্থে ইহার বর্ণ, ছায়া ও উৎপত্তি-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—

"অতসীপুষ্পসংকাশমীন্দ্রনীলং
প্রভাবৃতম্।
রোহিনাদ্রিসমুদ্ভূতং তৃণগ্রাহি
মনোহরম্।"

এতদ্ভিন্ন অগস্ত্যমুনি-কৃত মণি-পরীক্ষা ও গরুড় পুরাণে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। অগস্তি মতের মণি-পরীক্ষায় লিখিত আছে "সিংহলে ও কলিঙ্গ দেশে এই মণি উৎপন্ন হয়।" যথা——

"বিষয়ে সিংহলে চৈব গঙ্গাতুল্যা
মহানদী।"

"তীরদ্বয়ে চ তন্মধ্যে বিক্ষিপ্তো
নয়নে যথা।"

"ঈষন্মাত্রে পৃথক্ স্থানে কালিঙ্গ-
বিষয়ে তথা।"

"পতিতে লোচনে যত্র তত্র জাতা
মহাকরাঃ।"

সিংহল দেশের মধ্যে গঙ্গার ন্যায় এক মহানদী আছে। তাহার উভয় কূলে সেই মহাদানবের নেত্রদ্বয় পতিত হইয়াছিল এবং তাহার কিয়দংশ কলিঙ্গ দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেও পতিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহার নেত্র যেখানে যেখানে পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থানেই ইন্দ্রনীল মণির মহাকর সকল জন্মিয়াছে। তন্মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাহা সিংহলোৎপন্ন, তাহার নাম মহানীল।

অগস্ত্যমতের মণিপরীক্ষা পুস্তক খানি আমরা স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিব; এ জন্য তদ্ গ্রন্থের রচনাবলি উদ্ধার না করিয়া এক্ষণে গরুড় পুরাণোক্ত বচন গুলি উপস্থিত করিলাম।

আকর।

"তত্রৈব সিংহলবধূকরপল্লবাগ্র,
* * * লবলীকুসুমপ্রবালে।
দেশে পপাত দিতিজস্য নিতান্তকান্তং,
প্রোৎফুল্ল-নীরজ-সমদ্যুতি-নেত্রযুগ্মম্।
তৎপ্রত্যয়াদুভয়শোভনবীচিভাসা,
বিস্তারিণীজলনিধেরুপকচ্ছভূমিঃ।
প্রোদ্ভিন্ন-কেতকবনপ্রতিবদ্ধলেখা,
সান্দ্রেন্দ্র নীলমণি রত্নবতী বিভাতি।"

শীতল প্রদেশের সেই সেই স্থানে, সেই দৈত্যের অত্যন্ত রমণীয় ও সুন্দর প্রোৎফুল্ল নীলপদ্মাকার নেত্রযুগল পতিত হইয়াছিল। সেই কারণেই তত্রত্য জলনিধির তীরভূমি সকল নীলরত্নময় হইয়াছে।

বর্ণ ও বর্ণের সাদৃশ্য।

তত্রাসিতাব্জহলভৃদ্বসনাসি ভৃঙ্গ-
শার্ঙ্গায়ুধাঙ্গ হরকণ্ঠকলায় পুষ্পৈঃ।
শুক্লেতরৈশ্চ কুসুমৈর্গিরিকর্ণিকায়া-
স্তস্মিন্ ভবন্তি মণয়ঃ সদৃশাবভাসঃ।
অন্যে প্রসন্নপয়সঃ পয়সাং নিধাতুরম্বু-
ত্বিষঃ শিখিগণ-প্রতিমাস্তথান্যে।
নীলীরসপ্রভাবুদ্বুদভাশ্চ কেচিৎ,
কেচিত্তথা সমদকোকিল-কণ্ঠভাসঃ॥
একপ্রকারা বিস্পষ্টবর্ণশোভাবভাসিনঃ।"
জায়ন্তে মণয়স্তস্মিন্নিন্দ্রনীলা মহাগুণাঃ।

সেই সকল আকরে যে সমস্ত ইন্দ্রনীল জন্মে, তাহাদের মধ্যে কতক নীলপদ্মের ন্যায়, কতক রামের বস্ত্রের ন্যায়, কতক খড়্গধারার ন্যায়, কতক ভ্রমরের ন্যায়, কতক শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের ন্যায়, কতক নীলকণ্ঠ অর্থাৎ শিবকণ্ঠের ন্যায়, কতক কলায় পুষ্পের বর্ণের ন্যায়, কতক কৃষ্ণ অপরাজিতা পুষ্পের ন্যায়, কতক গিরিকর্ণিকার ন্যায় প্রভাযুক্ত হইয়া থাকে। অপর কতকগুলি নির্ম্মল সমুদ্রজলের ন্যায়, কতক বা ময়ূরকণ্ঠের ন্যায়, কতকগুলি নীলীরসের বুদ্বুদের ন্যায়, কতক বা মত্ত-কোকিলের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট

হইয়া থাকে। তথায় একাকারের বহু নীলমণি জন্মে। সে সমস্তই মহাগুণশালী ও বিস্পষ্ট বর্ণ ও শোভাধারী।

দোষ ও গুণ।

"মৃৎপাষাণশিলাবজ্রশর্করাভাস-
সংযুতাঃ।
অভ্রিকাপটলচ্ছায়া বর্ণদোষৈশ্চ
দূষিতাঃ॥"

মৃত্তিকা, পাষাণ, শিলা, বজ্র, (অথবা গিরি বজ্র—ইহাও এক প্রকার প্রস্তর) ও শর্করা-যুক্ত এবং অভ্রিকা পটল ছায়াদি বর্ণদোষে দূষিত মণি সকল উৎপন্ন হয়।

তত এব হি জায়ন্তে মণয়স্তবকভূষয়ঃ।
শাস্ত্রসংবোধিতধিয়স্তান্ প্রশংসন্তি
সূরয়ঃ॥"

"ধার্য্যমানস্য যে দৃষ্টাঃ পদ্মরাগ
মণের্গুণাঃ
ধারণাদিন্দ্রনীলস্য তানেবাপ্নোতি
মানবঃ॥
যথাচ পদ্মরাগাণাং জাতু কর্ত্তৃত্বং ভবেৎ
ইন্দ্রনীলেষ্বপি তথা দ্রষ্টব্যমবিশেষতঃ॥"

সে স্থানে ঐরূপ অনেক প্রকার মণি জন্মে। রত্নশাস্ত্রজ্ঞানজ-নির্ম্মলবুদ্ধিসম্পন্ন পণ্ডিতেরা সে সকলকেও প্রশংসা করিয়া থাকেন।

ধার্য্যমান পদ্মরাগ মণির যে সকল গুণ নির্দ্দিষ্ট আছে—মনুষ্য ইন্দ্রনীল ধারণ দ্বারা সে সমস্তই লাভ করিয়া থাকে।

পদ্মরাগ মণিতে যে সকল ভয়-সম্ভাবনা আছে, ইন্দ্রনীল মণিতেও সে সমস্তের সম্ভাবনা আছে।

পরীক্ষা।

"পরীক্ষাপ্রত্যয়ৈর্যৈশ্চ পদ্মরাগঃ
পরীক্ষ্যতে।
ত এব প্রত্যয়া দৃষ্টা ইন্দ্রনীলমণাবপি॥"

যে সকল কারণ বা উপকরণ দ্বারা পদ্মরাগের পরীক্ষা সিদ্ধ হয়, সেই সমস্ত দ্বারাই ইন্দ্রনীলের পরীক্ষা হয়।

"যাবন্তঞ্চ ক্রমেদগ্নিং পদ্মরাগপয়োগতঃ।
ইন্দ্রনীলমণিস্তস্মাৎ ক্রমেত সুমহত্তরম্॥"
"তথাপি ন পরীক্ষার্থং গুণানামভিবৃদ্ধয়ে।
মণিরগ্নৌ সমাধেয়ঃ কথঞ্চিদপি কশ্চন॥"
"অগ্নিমাত্রাপরিজ্ঞানে দাহদোষৈশ্চ
দূষিতঃ।
সোঽনর্থায় ভবেদ্ভর্ত্তুঃ কর্ত্তুঃ
কারয়িতুস্তথা॥"

পয়ঃস্থ পদ্মরাগমণি যে পরিমাণে উত্তাপ আক্রম (সহ্য) করিতে পারে, ইন্দ্রনীল মণি তাহা অপেক্ষা মহত্তর উত্তাপ সহ্য করিতে পারে।

যদিও অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা হয়, তথাপি তাহা করিবে না অর্থাৎ কোন ক্রমেই পরীক্ষার জন্য অগ্নি সংযোগ করিবে না। কারণ, অগ্নির পরিমাণ না জানিতে পারিলে, তাহা দাহ দোষে দুষ্ট হয় এবং সেই দূষিত মণি তখন ধারণকর্ত্তার ও পরীক্ষাকর্ত্তার অনিষ্টের হেতু হইয়া দাঁড়ায়।

"কাচোৎপল করবীরস্ফটিকাদ্যা
ইহ বুধৈঃ সবৈদূর্য্যাঃ।

কথিতা বিজাতয় ইমে সদৃশা
মণিনেন্দ্রনীলেন ॥"

"গুরুভাবকঠিনভাবাচ্চ তেষাং
নিত্যমেব বিজ্ঞেয়ৌ।
কাচাৎ যথা বহুত্ববিবর্দ্ধমানৌ
বিশেষেণ ॥"

রত্নজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, কাচ, উৎপল, করবীর, স্ফটিক ও বৈদূর্য্য নামক কতকগুলি বিজাতীয় মণি আছে, সে সমস্তই দেখিতে ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়।

উহাদের প্রত্যেকটীতেই গুরুত্ব ও কাঠিন্য—এ দুটী সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিবে। বিশেষতঃ কাচ অপেক্ষা ঐ দুয়ে যথাযোগ্য আধিক্যের অনুভব থাকিবে।

"ইন্দ্রনীলো যদা কশ্চিৎ
বিভর্ত্ত্যা তাম্রবর্ণতাম।
রক্ষণীয়ৌ তথা তাম্রৌ
করবীরোৎপলাবুভৌ ॥'

"যস্য মধ্যগতা ভাতি
নীলস্যেন্দ্রায়ুধপ্রভা।
তদিন্দ্রনীলমিত্যাহুর্মহার্ঘ্যং
ভুবি দুর্লভম্ ॥"

"যস্তু বর্ণস্য ভূয়স্ত্বাৎ
ক্ষীরে শতগুণে স্থিতঃ।
নীলতাং তন্নয়েৎ সর্ব্বং মহানীলঃ
স উচ্যতে।"

যে ইন্দ্রনীল অল্প তাম্র ধারণ করে, তাহা এবং করবীর ও উৎপল এই দুই তাম্রাভ ইন্দ্রনীল রাখিবার যোগ্য।

যে ইন্দ্রনীলের অভ্যন্তরে রামধনুর ন্যায় আভা বিস্ফুরিত হয়, সেই ইন্দ্রনীল মহামূল্য ও দুর্লভ।

অগ্নিপুরাণেও ঠিক এইরূপ উল্লেখ আছে। যথা—

"ইন্দ্রনীলং শুভং ক্ষীরে রাজতে
ভ্রাজতেঽধিকম্।
রঞ্জয়েৎ স্বপ্রভাবেণ তমমূল্যং
বিনির্দ্দিশেৎ।"

যে সুশোভন ইন্দ্রনীল রজত-পাত্রস্থ-দুগ্ধে স্থাপিত হইলে, অধিকতর কান্তিমান্ হয় এবং সেই পাত্রস্থ দুগ্ধকে আপনার ন্যায় বর্ণে অনুরঞ্জিত করে, সে ইন্দ্রনীল মণি অতি দুর্লভ ও অমূল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে।

মূল্য।

যৎ পদ্মরাগস্য মহাগুণস্য মূল্যং
ভবেন্মাষ-সমুশ্রিতস্য।
তদিন্দ্রনীলস্য মহাগুণস্য সুবর্ণসংখ্যা
তুলিতস্য মূল্যম্ ॥"

এক মাষ পরিমিত মহাগুণ পদ্মরাগ মণির যে সুবর্ণ সংখ্যা তুলিত মহাগুণ ইন্দ্রনীল মণির সেই মূল্য। এ বিষয়ে শুক্রনীতি গ্রন্থের মত এইরূপ !

"রতিমাত্রঃ পুষ্পরাগো নীলঃ
স্বর্ণার্দ্ধমর্হতঃ।"

এক রতি ওজনের পুষ্পরাগ ও নীলকান্তমণি এক সুবর্ণের অর্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য। অবশেষে বলিয়াছেন যে, মনোহারিতা ও দুর্লভতা অনুসারে ইহার মূল্য ঐচ্ছিক।

পুষ্পরাগ।

আধুনিক জহরীরা ইহাকে "পুখরাজ" ইত্যভিধেয় প্রদান করিয়া থাকেন। ভাবপ্রকাশ ও অন্যান্য কোষগ্রন্থ অনুসন্ধান করিলে, ইহার ৮টী নাম পাওয়া যায়। "মঞ্জুৎমণি" "বাচস্পতিবল্লভ" "পীত" "পীত স্ফটিক" "পীতরক্ত" "পীতাশ্ম" "গুরুরত্ন" ও "পীতমণি"। রাজনির্ঘণ্ট গ্রন্থে ইহার ভৈষজ্যোপযোগী গুণ ও ধারণের ফলাফল বর্ণিত আছে। গরুড় পুরাণের ৭৫ অধ্যায়ে ইহার রূপ, গুণ ও পরীক্ষা ও মূল্যাদির ব্যবস্থাও লিখিত আছে।

সুলক্ষণ।

রত্নবিৎ শুক্রাচার্য্য ঋষি ইহাকে মধ্যম শ্রেণীর রত্ন বলিয়াছেন। কেহ বা ইহাকে মহারত্ন-মধ্যে গণনা করিয়াছেন। কেহ নবসংখ্যক মহারত্নের মধ্যে গণনা না করিয়া, একাদশ রত্ন মধ্যে গণনা করিয়া ইহার স্বল্পতা জানাইয়াছেন।

সুচ্ছায়পীতগুরুগ ত্রসুরঙ্গশুদ্ধং
স্নিগ্ধঞ্চ নির্ম্মলমতীব সুবৃত্তশীতম্।
যঃ পুষ্পরাগসকলং কলয়েদমুষ্য
পুষ্ণাতি কীর্ত্তিমতিশৌর্য্যসুখায়ুরর্থান্।

সুন্দর পীত বা ছায়া-বর্ণবিশিষ্ট, ওজনে ভারি, সুন্দর কান্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে সমান রঙ, পরিষ্কার, স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, সুগোল ও সুশীতল,—যে ব্যক্তি এতদ্রূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করে, তাহার কীর্ত্তি ও শৌর্য্য বীর্য্য বৃদ্ধি হয় এবং সুখী, দীর্ঘায়ু ও ধনবান্ হয়।

কুলক্ষণ।

"কৃষ্ণবিন্দ্বঙ্কিতং রূক্ষং ধবলং
মলিনং লঘু।
বিচ্ছায়ং শর্করাগারং পুষ্পরাগং
সদোষকম্।"

কৃষ্ণ বিন্দুচিহ্ন অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কালীর ছিটার ন্যায় দাগযুক্ত, রূক্ষ, ধবল, মলিন, হালকা, বিকৃত বর্ণ বা ছায়াহীন, শর্করা অর্থাৎ কাঁকরওয়ালা, এরূপ পুষ্পরাগ সদোষ।

বর্ণ।

"ঈষৎপীতঞ্চ বজ্রাভং পুষ্পরাগং
প্রচক্ষতে।"
[মানসোল্লাস।

রত্নবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুষ্পরাগ অল্পপীতবর্ণ অথচ হীরকের ন্যায় প্রভাশালী হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর।

"শণপুষ্প সমঃ কান্ত্যা স্বচ্ছভাবঃ
সুচিক্কণঃ।
পুত্রদোধনদঃ পুণ্যঃ পুষ্পরাগমণির্ধৃতঃ।"

শণপুষ্পের ন্যায় কান্তি, স্বচ্ছ ও সুচিক্কণ,—এরূপ পুষ্পরাগ মণি ধারণ করিলে, ধন পুত্র লাভ ও পুণ্য হয়।

"দৈত্যধাতুসমুদ্ভূতঃ পুষ্পরাগ-
মণির্দ্বিধা।
পদ্মরাগাকরে কশ্চিৎ কশ্চিত্তার্ক্ষ্যা
শলাকরে॥

ঈষৎপীতচ্ছবিচ্ছায়া স্বচ্ছং কান্ত্যা মনোহরম্।
পুষ্পরাগমিতি প্রোক্তং রঙ্গসোম-মহীভুজা ॥"
"ব্রহ্মাদিজাতিভেদেন তদ্বিজ্ঞেয়ং চতুর্বিধম্।
ছায়া চতুর্বিধা তস্য সিতাপীতা-সিতাসিতা ॥"

[কল্পদ্রুমোদ্ধৃত যুক্তিকল্পতরু।

দৈত্যোব ত্বক ধাতু হইতে সমুৎপন্ন পুষ্প-রাগমণি দুই প্রকার হইয়া থাকে। যাহা পদ্মরাগ মণির আকরে উৎপন্ন হয়, তাহা এক প্রকার এবং যাহা ইন্দ্রনীল-আকরে উৎপন্ন, তাহা অন্য প্রকার।

রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রঙ্গসোম বলেন যে, যাহা ঈষৎ পীত বর্ণ, নির্ম্মল, ছায়াযুক্ত ও মনোহর কান্তি, তাহাই পুষ্পরাগ।

এই পুষ্পরাগ মণির ব্রাহ্মণাদি চারি প্রকার জাতি আছে এবং উহাদের ছায়াও চারি প্রকার। শুভ্র, তরল পীত, অল্প কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ। এই চতুর্বিধ জাতি নির্ণয় হয়। গরুড় পুরাণে এতদপেক্ষা কিছু বিশেষ উক্তি আছে। যথা।—

"পতিতায়া হিমাদ্রৌ হি ত্বচস্তস্য সুরদ্বিষঃ।
প্রাদুর্ভবন্তি তাভ্যস্তু পুষ্পরাগা মহাগুণাঃ।"

সেই অসুরের চর্ম্ম সকল হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাগুণ পুষ্পরাগ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়াছে।

"আপীত পাণ্ডুরুচিরঃ পাষাণঃ পুষ্পরাগ-সংজ্ঞস্তু।
কৌরুণ্টকনামা স্যাৎ স এব যদি লোহিতা পীতঃ ॥
"আলোহিতস্তু পীতঃ স্বচ্ছঃ কাষায়কঃ স এবোক্তঃ।
আনীল-শুক্লবর্ণঃ স্নিগ্ধঃ সোমালকঃ স্বগুণৈঃ।
"অত্যন্ত লোহিতো যঃ স এব খলু পদ্মরাগসংজ্ঞঃ স্যাৎ।
অপিচেন্দ্রনীলসংজ্ঞঃ স এব কথিতঃ সুনীলঃ সন্ ॥"

তরল পীত ও পাণ্ডু কান্তি নির্ম্মল প্রস্তর-বিশেষ পুষ্পরাগ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আবার সেই পাথর যদি রক্তযুক্ত অল্প পীত রঙের হয়, তাহা হইলে তাহা পুষ্প-রাগ না হইয়া কুরুণ্টক নাম প্রাপ্ত হয়। আবার তাহাই যদি স্বচ্ছ ও অল্পরক্ত-যুক্ত পূর্ণ পীত বর্ণের হয়, তাহা হইলে তাহাকে কাষায় বলিয়া অভিহিত করা যায় এবং সেই বস্তুই আবার অল্প-নীল মিশ্রিত শুক্ল বর্ণ, স্নিগ্ধ ও গুণোৎপন্ন হইলে, সোমালক নাম হইয়া থাকে। সেই একই প্রস্তর অত্যন্ত লোহিত বর্ণ হওয়ায় পদ্মরাগ নাম ধারণ করিয়াছে এবং সুন্দর নীল বর্ণ হওয়ায়, তাহাই ইন্দ্রনীল আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

পরীক্ষা।

কর্কোন্তবং ভবেৎ পীতং কিঞ্চিত্তাম্রঞ্চ সিংহলে।
বিন্দুব্রণ-ত্রাসযুক্তং দহনৈর্দীপ্তিমান্ গুরু ॥"

[মণি পরীক্ষা।

কক স্থানান্তর পুষ্পরাগ পীত বর্ণ হয়। সিংহল দেশে অল্প তাম্র বর্ণের পুষ্পরাগ জন্মে। কিন্তু তাহাতে বিন্দু, ত্রণ ও ত্রাস দোষ থাকে। অগ্নি-সংযোগে ইহার দীপ্তি বৃদ্ধি হয় এবং স্বভাবতঃই ইহা ওজনে ভারি।

"ঘৃষ্টো বিকাশয়েৎ পুষ্পরাগমধিক-
মাত্মীয়ম।
ন তু পুষ্পরাগো জাত্যতয়া পরীক্ষকৈ
রক্তঃ।,,
[রাজ নির্ঘণ্ট।

পুষ্পরাগ মণিকে শাণ বস্ত্রাদি দ্বারা ঘর্ষণ করিলে, তাহার বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। রত্নপরীক্ষকেরা এই মণির জাতি বিজাতি থাকা অর্থাৎ কৃত্রিম অকৃত্রিম হওয়ার কথা বলেন নাই।

মূল্য ও ফল।

"মূল্যং বৈদূর্য্যমণেরিব গদিতং হাস্য-
রত্নশাস্ত্রবিদা।
ধারণফলঞ্চ তদ্বৎ কিন্তু স্ত্রীণাং সুত-
প্রদো ভবতি।।,,
[গরুড় পুরাণ।

রত্নশাস্ত্রবেত্তৃগণ বলিয়াছেন যে, বৈদূর্য্য মণির ন্যায় পুষ্পরাগ মণির মূল্য হইয়া থাকে। ধারণ করিলে, বৈদূর্য্য মণির ন্যায় ফল হয়। পরন্তু স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্রদায়ক হয়।

মূল্য-সম্বন্ধে শুক্রনীতির মত এই যে—

রতিমাত্রো পুষ্পরাগো নীলঃ স্বর্ণার্দ্ধ
মর্হতঃ।,,

এক রতি পুষ্পরাগ ও নীলম সুবর্ণার্দ্ধ মূল্য পাইবার যোগ্য।

মানসোল্লাসের মতে রত্নের মূল্যের অবধারণা হইতে পারে না। তিনি বলেন যে, মূল্যের একটা সামান্যাকারে ব্যবস্থা আছে মাত্র। নচেৎ

"নিজবর্ণসমুৎকর্ষাৎ কান্তিমত্বাৎ
মহার্ঘতা।"

বর্ণের উৎকর্ষ, কান্তির আধিক্য ও মনোহারিত্ব অধিক হইলে, সকল রত্নই অধিক মূল্যবান্ হইয়া থাকে।

শ্রীরামদাস সেন।

ভারতে ব্রাহ্মণ।

কত শত বৎসর অতীত হইল, ভারতে ব্রাহ্মণের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে; কত শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, তথাপি সে রাজত্ব অটল রহিয়াছে। রাজ্য গিয়াছে, তথাপি রাজসম্মান আজও অটুট রহিয়াছে। এ রাজত্বের নিকট ইংরাজের রাজত্ব অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়। যে যে মাহাত্ম্যে ব্রাহ্মণ এই রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সে মাহাত্ম্য প্রায় চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এখনও সেই পূর্ব্বপুরুষ-মাহাত্ম্য-জনিত পূজা বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও ব্রাহ্মণে প্রতি-প্রণাম করিলে শূদ্রসাধারণের হৃদয় শিহরিয়া উঠে। যেন শূদ্রের তাহাতে পাপস্পর্শ হয়; যেন ইহা কোন ভবিষ্য অমঙ্গল সূচিত করে। কাহার সাধ্য হিন্দু-শূদ্রকে বুঝায় যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের সমান? শূদ্র স্বপ্নেও এ কথা বিশ্বাস করে না যে, তাহার ঐ দেবতা ব্রাহ্মণ তাহার সমকক্ষ। ব্রাহ্মণের হস্তে এখন কোনও প্রভু-শক্তি নাই, তথাপি ব্রাহ্মণের প্রতি শূদ্রের এ ভক্তি-বিগলিত ভাব কেন? হৃদয়ের স্তরে স্তরে, দেহের অস্থি মজ্জাতে এ প্রেম-বিগলিত ভাব কেন? জেতা ব্রাহ্মণের চরিত্র-মাহাত্ম্যে একদিন জিত শূদ্রসমাজ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন,—তাঁহার কাছে আসিয়া অনেক ভালবাসা ও অনেক উপকার পাইয়াছিলেন বলিয়াই আজও তাহার প্রতিদান করিতেছেন। ব্রাহ্মণের আইনে যতই কেন কঠোরতা থাকুক না, ব্রাহ্মণের ব্যবহারে অতি আদর পাইয়াছিলেন বলিয়াই শূদ্রজাতি আত্মাভিমান ও জাতীয় অভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণের চরণতলে পতিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যে শূদ্রদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন ও কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শুভাকাঙ্ক্ষা করিতেন, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণের অন্তরে দুর্ব্বলতা ছিল বলিয়া পরিণাম বিষময় হইয়াছে। বিজিত অনার্য্য জাতি যাহাতে কখন উঠিতে না পারে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারেরা অনেকেই তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ সামাজিক প্রভুতার প্রধান কারণ; সুতরাং, শূদ্রেরা যাহাতে কখন সামাজিক প্রভুতা লাভ করিতে না পারে, এই জন্য তাঁহারা শূদ্রকে ধর্ম্মনৈতিক উৎকর্ষ হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে শূদ্রের কোন অধিকার নাই। শূদ্র-তাপস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবার যোগ্য। একবার শূদ্রমুনি ঘোরতর তপস্যায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণগণ আর্ত্তনাদ করিয়া করুণাময় রামচন্দ্র দ্বারা তাঁহার শিরশ্ছেদন করাইয়া ছিলেন। যজন যাজনাদিতে ও শূদ্রের

পূর্ণ অনধিকার বিধান করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ আপনাকে সর্ব্ব বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াও—আত্ম ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াও এই এক বিষয়ে স্বার্থপরতা ছাড়িতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া, জগতের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য আপন আপন জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তথাপি এই একটী বিষয়ে নিজ স্বার্থ বলি দিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা শূদ্রদিগকে—বিজিত অনার্য্যদিগকে—স্বধর্ম্মে আনিলেন, হিন্দু সমাজভুক্ত করিলেন, তথাপি ধর্ম্মনৈতিক সাম্য প্রদান করিলেন না।

ব্রাহ্মণেরা রাজনৈতিক প্রভুতা-প্রয়াসী ছিলেন না, সুতরাং শূদ্রদিগকে তাহা হইতে সর্ব্বথা বঞ্চিত করেন নাই। ধর্ম্মনৈতিক প্রভুতায় তাঁহাদের যেমন পূর্ণ অনধিকার, রাজনৈতিক প্রভুতায় সেরূপ ছিল না বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ শূদ্রেরা দুইএতেই বঞ্চিত ছিলেন। কারণ, ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণগণের প্রতিদ্বন্দ্বী, সুতরাং ক্ষত্রিয়গণকে ভুলাইবার জন্য তাঁহাদিগের হস্তে রাজনৈতিক প্রভুতা কিছুকাল এক চেটিয়া করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহারা রাজ্য-শাসনের ভার ক্ষত্রিয়গণের হস্তে দিলেন বটে, কিন্তু আপনারা কেবল আধ্যাত্মিক রাজ্যের অধীশ্বরত্ব লইয়া পরিতৃপ্ত রহিলেন না। রাজনীতির শাসন-বিভাগ ক্ষত্রিয়গণের হস্তে ছিল বটে, কিন্তু ব্যবস্থা-বিভাগ ব্রাহ্মণগণের হস্তচ্যুত হয় নাই। রাজনীতির প্রয়োগের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রণীত আইন লইয়া রাজারা রাজ্য শাসন করিতেন। মনুসংহিতা নামক যে আইন বহুকাল ধরিয়া আর্য্যজাতির কার্য্যের নিয়ামক হইয়া আসিতেছিল, তাহা সূর্য্যবংশের আদি পুরুষ মনু কর্ত্তৃক প্রণীত নহে। ব্রাহ্মণগণের যে সকল উপদেশ-বাক্য সর্ব্বত্র পূজিত ও অনুষ্ঠিত হইত, সেই সকল একত্র করিয়া মনুসংহিতাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। এই মনুসংহিতা ব্রাহ্মণগণের তীব্র বুদ্ধি ও বিশালহৃদয়তার কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ। পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়মস তদীয় "ভারতীয় অভিজ্ঞতা" নামক গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে, সমস্ত পৃথিবীর সাহিত্য মধ্যে ইহার স্থান অতি উচ্চ, ইহার নৈতিক উপদেশগুলি খ্রীষ্টধর্ম্মের উপদেশমালা হইবার যোগ্য (১)। সার উইলিয়ম জোন্‌স খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দ মনুসংহিতার কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতঃ ইহা যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের অনেক পূর্ব্বের, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। কারণ

(১) It is................one of the most remarkable books that the literature of the world can offer, and some of its precepts are worthy of christianity itself.

Indian Wisdom. P. 212.

ইহাতে বর্ণবৈষম্যের অনুকূল অতি কঠোর শাসন আছে। বৌদ্ধধর্ম্ম সেই শাসনের শৃঙ্খল-ভেদের উদ্যম মাত্র। জোনস্ সংহিতার কাল নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু শাসন গুলির উৎপত্তিকাল আজও নির্ণীত হয় নাই। স্বীকার করি, সেই শাসনগুলিতে শ্বেত কৃষ্ণ প্রভেদ আছে; স্বীকার করি,—ইহার সাধারণ ভাব জেতৃ ও জিত বৈষম্যে পরিপূর্ণ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সেই মানব জাতির শৈশবকালে পৃথিবীতে আর কোন্ জাতি ছিল, যাহারা পরাজিত শত্রুকে এরূপ কোন দিয়াছিলেন? সেই আদিকালে কোন্ জাতি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা বিজিতগণের উপর অধিকতর ঔদার্য্য প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন? ইতিহাস বা পুরাবৃত্ত এ বিষয়ে আমাদিগকে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেয় না। গ্রীসের হেলট্, রোমের শ্লাডিএটর এবং ব্রিটন ও রুসিয়াদির সার্ফের অবস্থা মনে করিলে ভারতীয় আর্য্যদিগকে দেবতা বলিয়া বোধ হয়। তাঁহারা বিজিত অনার্য্যদিগকে পূর্ণ সাম্য দেন নাই বটে, কিন্তু যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, তাহা আর কোন প্রাচীন জাতি দেন নাই। অধিক কি, সভ্যতাভিমানী ইংরাজ ক্যাথলিক "ইমানসিপেসন্ বিল" পাস হওয়ার পূর্ব্বে বিজিত আইরিস্দিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, সেই পুরাকালে ভারতীয় আর্য্যেরা বিজিত অনার্য্যদিগের প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন। হেলট্ ও সার্ফদিগের ন্যায় শূদ্রদিগকে স্বোপার্জ্জিত ধনে বঞ্চিত হইতে হইত না; গ্লাডিএটরের ন্যায় শূদ্রকে প্রভুর প্রমোদবিধানার্থ পরস্পর মারামারি করিয়া মরিতে হইত না; আইরিস ক্যাথলিকদিগের ন্যায় শূদ্রগণকে ভূমি-সম্পত্তিতে বঞ্চিত থাকিতে হইত না। সুপ্রসিদ্ধ ইতালির মন্ত্রী কাউণ্ট কাবুর আইরিস্ ক্যাথলিক প্রজার অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এবং তাহার সমালোচনা উপলক্ষে ১৮৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতে যে সমালোচনা বাহির হয়, তাহার মর্ম্ম প্রদান করা যাইতেছে। পাঠক মিলাইয়া দেখুন—"সপ্তদশ শতাব্দীর উপর্য্যুপরি আত্মসাৎকরণে আয়র্লণ্ডের সমস্ত ভূমি-সম্পত্তি ক্রমে ইংরাজ প্রটেষ্টাণ্টের হাতে আসিয়া পড়িল। একশত বৎসর বিদেশী ও বিধর্ম্মী জমীদারে ও দেশীয় ক্যাথলিক প্রজায় ঘোরতর বিবাদ চলিতে লাগিল। জমিদার বিদেশী, বিধর্ম্মী, উদ্ধত ও ধর্ম্মান্ধ বিজিত অধিবাসিবৃন্দের প্রতি সবিশেষ ঘৃণা বিশিষ্ট। বিজিত অধিবাসিরা দীন দুঃখী ও অপহৃতসর্ব্বস্ব আপনার বলিয়া দাবি করিতে পারে এমন এক পদপরিমিত ভূমি ও নাই; সুতরাং অপহারক বিজেতৃজাতির প্রতি দুর্নিবার বিদ্বেষবিশিষ্ট। প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিতগণ আবার শীতের উপর বিস্ফোটক।

জমীদার কাড়িয়া কুড়িয়া লওয়ার পর প্রজার যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এই প্রটেষ্টাণ্ট পুরোহিতগণ তাহা শোষণ করিয়া লইতেন। ক্যাথলিক প্রজাবৃন্দের সহিত প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের কোন সংস্রব ছিল না, অথচ অবশিষ্ট কপর্দ্দক দিয়া প্রজাবৃন্দের তাহা পোষণ করিতে হইত। প্রটেষ্টাণ্ট গির্জা যেন তাহাদিগের পুঞ্জীভূত দুঃখ-রাশি, যেন অত্যাচার ও পরাজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ, যেন তাহাদিগের পতনের ও অপমানের সন্ধুক্ষণ-শলাকা (২)। এই চিত্রের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষীয় প্রাচীন শূদ্রগণের অবস্থা সহস্র গুণে উৎকৃষ্ট ছিল। শুদ্ধ যে ভূমি-সম্পত্তিতে শূদ্রের অধিকার ছিল, এরূপ নহে,—শূদ্র সেনাপতি হইতে পারিতেন,—মন্ত্রী হইতে পারিতেন,—অধিক কি রাজা পর্য্যন্তও হইতে পারিতেন। গুহক চণ্ডালাদি তাহার প্রমাণ। কেবল তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন না। এ অধিকার যে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ শূদ্রকে দেন নাই এরূপ নহে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণকেও এ অধিকারে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানে জেতৃ-বিজিত ভাবে সঞ্চালিত হন নাই। তাঁহারা ব্রাহ্মণেতর সমস্ত বর্ণকেই এ অধিকার হইতে বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়-কুলতিলক মহর্ষি বিশ্বামিত্র

(২) The land-question, Count Cavour considered, at the time he wrote, as the root of all the troubles in Ireland. His sketch as to the relations of the landlord and tenant is graphic. 'As a consequence' he says 'of the successive confiscations which have taken place during the whole course of the seventeenth century, Ireland for a hundred years has been divided into two hostile classes; one of which possesses, the other tills the soil. Its population is composed of proprietors, intolerant and haughty Protestants treating with contempt those whom they have conquered; and of tenants, poor, ignorant and superstitious Catholics, animated by an inveterate hatred of the despoilers of their country.' It is easy from this to see that, Count Cavour is no admirer of the land-system of Ireland. He appreciates fully how the evils were aggravated by the presence of the Protestant clergy, who divided with the rich proprietors the fruit of the labour of the devoutedly Catholic population, in the midst of whom they lived, and he describes the Established Irish Church as being to Catholics 'the representative of the causes of their miseries, a sign of defeat and oppression which exasperates their sufferings and makes their humiliation more keenly felt.

No. 67, Sept 1882. Nineteenth Century Count Cavour on Ireland. P. 369.

ঘোরতর তপস্যা করিয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারেন নাই। তিনি মহর্ষি উপাধি মাত্র পাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপরে ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে কৌশলে ব্রহ্মর্ষি উপাধি হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। এইজন্যই বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণ-দ্বেষ নিবারিত হয় নাই। এই জন্যই তাঁহার ব্রহ্মার সৃষ্টির উপর আপনার নব ও উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি-কল্পনা। ব্রাহ্মণেরা রাজ্য ছাড়িয়াছিলেন, অস্ত্র ব্যবহার ছাড়িয়াছিলেন, অতি কঠোর বৈরাগ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তথাপি এই ক্ষুদ্র অধিকারের একচেটিয়া ছাড়িতে পারেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, কি স্বার্থে প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়াও এই বিষয়ের অধিকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বেচ্ছা-সন্ন্যাসী ছিলেন; সুতরাং, ধর্ম্মনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা ধন-সম্পত্তি-উপার্জ্জন-প্রয়াসী ছিলেন, সম্ভব বোধ হয় না। যাঁহারা যুদ্ধ-বিদ্যার অধ্যাপক হইয়াও অস্ত্র-প্রয়োগ-বিধুর ছিলেন, তাঁহারা প্রভুত্ব কামনায় এরূপ করিয়াছিলেন ইহাও সম্ভবপর বোধ হয় না। কোটী কোটী রাজ-মুকুট চরণ-তলে গড়াগড়ি গেলেও যাঁহাদিগের ভ্রূক্ষেপ হইত না, তাঁহারা রাজ-সম্মান-ভিখারী হইয়া এরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। তবে কি বলিয়া আর্য্যযোগিগণ এরূপ একচেটিয়া ধর্ম্মের সমর্থন করিলেন? না ভ্রাতৃবৃন্দ! তাঁহারা শুদ্ধ স্বার্থ-পরতায় অন্ধ হইয়া এরূপ করিয়াছিলেন, এমত ভাবিতে পারি না। যাঁহারা জগতের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বত্যাগী হইয়া অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগতের গভীর গবেষণায় নিমগ্ন ছিলেন, স্বজাতি ও স্বদেশের উন্নতি-যজ্ঞে যাঁহারা আত্ম-আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে শুদ্ধ স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যের একেশ্বরত্ব হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা অনুমান-সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। সর্ব্বপ্রথমে যে যোগ্যতানুসারে বর্ণভেদ হয়, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান আছে।

আর্য্যদিগের বিশ্বাস ছিল যে, এই যোগ্যতা পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইলে অধিকতর পরিপুষ্ট ও সংস্কৃত হইতে পারিবে। হয় ত এই জন্যই তাঁহারা স্বধর্ম্মাতিক্রম অর্থাৎ এক বর্ণের কার্য্যে বর্ণান্তরের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন। সাধারণতঃ ধার্ম্মিকের পুত্র ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমানের পুত্র বুদ্ধিমান, বলবানের পুত্র বলবান; এবং তদ্বিপরীত হইতে যে তদ্বিপরীত হয়, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা প্রতিদিন দেখিতে পাই। জনকজননীর গুণ যে সন্তান-সন্ততিতে বহুল পরিমাণে সংক্রামিত হয়, তাহা আধুনিক স্ফোটন-বাদীরা (Evolutionists) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, এবং আমরাও সর্ব্বত্র তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। তবে বহিষ্কর কারণ-পুঞ্জের

প্রক্রিয়ায়, সেই সাধারণ কার্য্যের সময়ে সময়ে ব্যভিচারও দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য মধ্যে মধ্যে ধার্ম্মিকের পুত্র অধার্ম্মিক, বুদ্ধিমানের পুত্র নির্ব্বোধ, বলবানের পুত্র দুর্ব্বল এবং অধার্ম্মিকের পুত্র ধার্ম্মিক, নির্ব্বোধের পুত্র সুবোধ এবং দুর্ব্বলের পুত্র সবল, এরূপও দেখিতে পাওয়া যায়। বহিশ্চর ঘটনাপুঞ্জ যে, এই সকল ব্যভিচারের কারণ, প্রত্যেক ঘটনা আমূল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই অনুভব করা যাইতে পারে। স্থানে স্থানে হয় ত আমাদের বিশ্লেষণশক্তি পরাভূত হইতে পারে। তাহার কারণ, বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ণতা, অথবা কারণপুঞ্জের জ্ঞানাভাব। এরূপ ব্যভিচার সর্ব্বদা ঘটিবে—ব্রাহ্মণেরা যে তাহা জানিতেন না, এরূপ বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। ব্রাহ্মণেরা শাসন দ্বারা সেই ব্যভিচারের সংখ্যা কমাইবেন, স্থির করিয়াছিলেন মাত্র। এই জন্য হয় ত তাঁহারা এক বর্ণের ধর্ম্মে বর্ণান্তরের হস্তক্ষেপ অবৈধ বলিয়া বিধান করিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চরমস্থলে অনুলোম ক্রমে উচ্চবর্ণকে নিম্নবর্ণের বৃত্তি অবলম্বন করিবার ব্যবস্থাও দিয়া গিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মণকে দাসবৃত্তি অবলম্বন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। মনুতে ইহার সুস্পষ্ট বিধান আছে। পারতপক্ষে এক বর্ণের ধর্ম্মে বর্ণান্তরের হস্তক্ষেপের নিষেধে কিছু কাল সুফল ফলিয়াছিল, তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। এই শাসনের বলে কত শত বৎসর ব্রাহ্মণেরা নৈতিক উৎকর্ষে, বুদ্ধিমত্তায় ও আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যে জগতের আদর্শস্থানীয় ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা সব ছাড়িয়া কেবল জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়াই আজও ব্রাহ্মণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, দর্শনাদি জগতের বিস্ময় উদ্দীপন করিতেছে। সুসভ্য ইউরোপও সেই সকলের আলোকে ঝলসিত হইতেছে। সেই রূপ, ক্ষত্রিয়েরা স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন বলিয়াই একদিন ভারত-জননী বীর প্রসবিনী হইয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই শাসনের মাহাত্ম্যেই রাজপুতনার প্রত্যেক স্থান মহাত্মা টড্ কর্ত্তৃক ভারতীয় থার্ম্মোপলি এবং প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ভারতীয় লিয়োনিডাস্ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন (৩)। এই শাসনমহাত্ম্যে বৈশ্যেরা স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন বলিয়াই একদিন ভারতের রথস্চাইল্ড শ্রীমন্ত সওদাগরের বাণিজ্য-পোত সকল সপ্তসিন্ধু আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই রূপ, শূদ্রেরাও আপন আপন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকাতেই ভারতে কৃষিকার্য্যের এত দূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। আমরা দেখাইতে পারি যে, কোন দেশই

৩ "There is not a petty state in Rajasthan that has not had its *Thermopylae* and *scarcely a city* that has not produced its Leonidas."
Tod's Rajasthan.

কখন কোন না কোন প্রকার জাতিভেদ-ব্যবস্থার হস্ত হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইতে পারে নাই। পূর্ণসাম্য সকল সমাজের লক্ষ্য বটে, কিন্তু তাহা জাতি-সাধারণের সমযোগ্যতা ভিন্ন সম্ভবে না। সমযোগ্যতা জাতি সাধারণের অদৃষ্টে কখন ঘটে নাই; সুতরাং কোন দেশে আজও পূর্ণ সাম্য হয় নাই। যোগ্যতার তারতম্য অনুসারেই সাম্যের তারতম্য হইয়া থাকে। এই যোগ্যতার মূল দেশ-কালপাত্রভেদে নানা প্রকার হইতে পারে।

এই বর্ণ প্রধানতঃ তিন প্রকার, জাতি-গত, শ্রেণী-গত, এবং ব্যবসায়-গত। প্রথমতঃ যখন এক জাতির সহিত আর এক জাতি আসিয়া মিলিত হয়, তখন জাতি-গত (Ethnological) জাতের সৃষ্টি হয়। শ্বেত ও কৃষ্ণ জাতির সংঘর্ষে পৃথিবীর নানা স্থানে এই জাতের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্বেত জাতি সর্ব্বত্র বিজয়ী, কৃষ্ণ জাতি সর্ব্বত্র বিজিত। ভারতবর্ষে আর্য্য ও অনার্য্য জাতি মিলিত হওয়ায় এই শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণভেদ হইয়াছে। যেখানে বর্ণের তারতম্য নাই, সেখানেও বিভিন্ন জাতির মিলনে এক প্রকার জাতি-বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। সাক্‌সন ও নর্ম্মাণ, সাক্‌সন ও কেল্‌ট, রুশ ও পোল প্রভৃতি জাতির মধ্যে বর্ণ-গত প্রভেদ না থাকিলেও জাতি-গত ভীষণ বিদ্বেষ বহুকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। এই জাতি-গত বিদ্বেষ পুরাকালে অতি তীব্র ছিল। অন্যান্য দেশের তাৎকালিক অবস্থার সহিত তুলনায়, ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য বিদ্বেষ অতি লঘু বলিয়া বোধ হয়। পুরাকালে যাইতে হইবে কেন? আমাদের প্রতি ইংরাজদিগের বিদ্বেষ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। সুসভ্য ইংরাজ এই জাতি-গত বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদ আপনাদিগের একচেটিয়া করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আপনাদিগের ধর্ম্ম যাজনের ব্যয় নিরীহ বিজিত অধিবাসী বৃন্দের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন। যাহাকে অকারণে ও অন্যায় পূর্ব্বক এই ভার বহাইতেছেন, তাহার সম্মতি লইতেও ইঁহারা লজ্জা বোধ করেন। ইঁহারা আমাদিগকে ভারবাহী পশুর সমান মনে করেন। পশুর যেমন মতামত কেহ গ্রহণ করে না, ইঁহারাও তেমনি আমাদের মত লয়েন না। কিন্তু সেখানেও পশুর উপর মানুষের কিছু দাবি আছে কারণ মানুষ তাহাকে খাওয়ায় ও বিশ্রাম করিতে আলয় দেয়। কিন্তু আমাদিগকে ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে হয়। শুদ্ধ ইহা নহে—ইংরাজ-জাতি অন্যান্য দেশের সহিত যে সকল অবৈধ সমরে প্রবৃত্ত হইবেন, নিরীহ মানবজাতির স্বাধীনতা হরণে যে সকল ন্যায়বিগর্হিত সমরানল প্রজ্বালিত করিবেন, ভারতীয় প্রজাবৃন্দের উপর সেই ব্যয়-ভার অংশতঃ বা পূর্ণতঃ চাপাইবেন। যেই ইহার প্রতিবাদ

করিবে—গবর্ণমেণ্টের কঠোর দৃষ্টি তাহার উপর পতিত হইবে। আরও দেখ, ইংরাজ ফৌজদারি কার্য্যবিধি শ্বেত কৃষ্ণ প্রভেদে অতি দূষিত হইয়া রহিয়াছে। তাহাতে শ্বেতের সুবিধা অনেক, কিন্তু কৃষ্ণের কিছুতেই নিস্তার নাই। একই ম্যাজিষ্ট্রেট,—কিন্তু শ্বেতকে তিনি ৩ মাসের উর্দ্ধ শ্রীঘরে পাঠাইতে পারিবেন না; কিন্তু দেশীয় হইলে তাহাকে দুই বৎসর দিতে পারিবেন। দেশীয় হাকিম পূর্ণ-শক্তি-সম্পন্ন হইলেও তিনি, শ্বেতের বিচার করণে অধিকার প্রাপ্ত হইবেন না।

কৃষ্ণ অপরাধীকে শ্বেত-বিচারক ফাঁসি পর্য্যন্ত দিতে পারেন, কিন্তু শ্বেত অপরাধীকে কৃষ্ণ বিচারক সম্মুখে আনিতেও অক্ষম। ইংরাজদিগের কৃষ্ণ-বিদ্বেষ এত প্রবল যে, ইহার খর্ব্বতা করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইলে, সমস্ত ভারতবাসী ইংরাজ রৈ রৈ করিয়া উঠেন। ধার্ম্মিকপ্রবর মহামতি লর্ড রিপন্ এই বিসদৃশ অবস্থার পরিশোধন করিতে সমুদ্যত হওয়ায় ভারতীয় ইংরাজবর্গের সবিশেষ বিদ্বেষ-ভাজন হইয়াছেন। লর্ড রিপনের সারগর্ভ যুক্তি তাঁহারা খণ্ডন করিতে অক্ষম। তাঁহারা সেই জন্য যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন যে, লর্ড রিপনের যুক্তিমার্গ অবলম্বন করাই ভুল হইয়াছে; কারণ, যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে দাঁড়াইবার স্থল কোথায়? তাঁহারা বলেন 'শ্বেত কৃষ্ণ ভেদ রাখা অন্যায়, এই কথা স্বীকার করিতে হইলে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে রাজকীয় সমস্ত অধিকার ভারতবাসিগণের হস্তে দিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। যখন তাহাতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তখন ন্যায়ান্যায়ের কথা তুলিতে তাঁহারা লর্ড রিপনকে নিষেধ করিয়াছেন। পাইওনিয়র পত্র ভারতাগত ইংরাজজাতির মুখপাত্র স্বরূপ। তিনি লর্ড রিপনকে এই বিষয়ে যাহা উপদেশ দিয়াছেন (৪) তাহার

(৪) Already one of the leading exponents of native public opinion in Bengal has put forward a claim that the extension of Jurisdiction over Europeans shall not be confined to the classes mentioned in the *Bill,* but shall take in Magistracy generally. Looking to the line taken by Lord Ripon and Mr Ilbert, on what ground can this claim be registered? On none. And, this granted, on what ground can the maintenance of a separate procedure for the trial of Europeans at all be justified? On none. It is anomalous; it is illogical; it is entirely opposed to Radical principles. And pray, upon what ground can the existence of Government of India itself, an anomaly of anomalies, be justified? It was formed for other than those arguments which are wont to be used by hair-splitting Barristers; and until

কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ পড়িয়া বুঝিবেন, ইঁহাদের জাতীয় বিদ্বেষ কত দূর প্রবল। উনবিংশ শতাব্দীতেও যখন সভ্যতাভিমানী ইংরাজ এই জাতিগত বিদ্বেষের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই, তখন মানবজাতির সেই আদি কালে আর্য্যেরা যদিই সেই পাপে দুষ্ট হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। পাইওনিয়র যে যুক্তি দ্বারা লর্ড রিপণকে বুঝাইতেছেন, আর্য্যেরাও যে সেই যুক্তি অনুসারে অনার্য্যগণের উপর আধিপত্য রাখিয়াছিলেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পাইওনিয়রের যুক্তির স্থূল মর্ম্ম এই—ন্যায় বিচারে ইংরাজ কর্তৃক ভারতাধিকার সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। ভারতীয় ইংরাজ-রাজনীতি ন্যায়ের তুলাদণ্ডে সংযমিত করিতে গেলে, ইংরাজগণকে ভারতবাসীদিগের হস্তে ভারতের শাসনভার অর্পণ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। যখন তাহাতে প্রস্তুত নহে, তখন ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে গিয়ে, তখন মাঝামাঝি যাইয়া সন্তুষ্ট হয় না, ক্রমে ক্রমে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সে শেষ সিদ্ধান্তের ফল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। তাহা যখন আমরা দিতে প্রস্তুত নহি, তখন লর্ড রিপণের ও কথা তোলাই বোকামি হইয়াছে। এই বোকামির দরুণ আমাদের যে ক্ষতি, তাহার পূরণের সম্ভাবনা নাই। লর্ড রিপণকে আরও যাইতে দিলে শেষে ইংরাজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা হওয়া দায় হইবে। অতএব আমাদিগকে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া তাঁহাকে নামাইতে হইবে। নতুবা সব রসাতলে যাইবে। পাইওনিয়রের কোমর বাঁধায় ফল হাতে হাতে ফলিতে চলিল। ২০ এ ফেব্রুয়ারির পাইওনিয়রে দেখা গেল যে, লর্ড রিপণের প্রস্তাব অচিরকালমধ্যেই সিঁকেয় উঠিবার উপক্রম হইয়াছে। কৃষ্ণ মাজিষ্ট্রেটের নিকট শ্বেত আসামীর বিচার-সম্বন্ধে ইংরাজ সমাজের এত দূর বিদ্বেষ, যে লর্ড রিপণের উদার প্রস্তাবে এক আধ জন ভিন্ন আর সকলেই অসম্মত হইয়াছেন। এ বৎসর ইহা ছাই চাপা রহিল—ইহাতেই যদি আগুণ নিবিয়া যায় ভালই, নতুবা আগামী বৎসর আবার ছাইচাপা দেওয়া যাইবে। পাঠক নিম্নে পাইওনিয়রের সংবাদ-

---

blood and iron have been finally exercised, it is not the part of practical statesmanship to condemn anything merely because it is anomalous and illogical. Every day makes it more apparent what a serious mistake the Government has made in raising this discussion at all. The mischief done is irreparable, but it is to be earnestly hoped that it may be stopped before it becomes the cause of actual political danger.

February 16, 1883.

দাতার প্রেরিত সমাচার পড়িয়া দেখুন ইহা বুঝিতে পারিবেন (৫)।

ইহার পর ২৮ এ ফেব্রুয়ারী এই বিলের প্রতিবাদ করিবার জন্য টাউন হলে শ্বেতজাতির একটী বিরাট অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহাতে কেস্‌উইক ও ব্রান্‌সন দেশীয়গণকে যেরূপ বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা কখন সেরূপ করেন নাই। কেসউইক বলিয়াছেন—দুই তিন বৎসর বিলাতে থাকিলে বাঙ্গালী কখন সাহেব হয় না; যে বাঙ্গালী সেই বাঙ্গালিই থাকে। "Can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots?" ইথিয়োপিয়ো কখন শ্বেত হইতে পারে না, চিতাবাঘ কখন আপনার গায়ের দাগ তুলিতে পারে না। মহাত্মা ব্রান্‌সন্ শ্বেতগণকে অনুরোধ করিয়াছেন—"Protest! say that these men are not to rule over us, that these men cannot judge us, and we will not be judged by them"—প্রতিবাদ কর যে, কৃষ্ণ কখন শ্বেতের উপর রাজত্ব করিতে পারে না—কৃষ্ণ শ্বেতের বিচারক হইবার যোগ্য নহে, সুতরাং শ্বেত কখন কৃষ্ণের কর্ত্তৃক বিচারিত হইবে না!! ইহা অপেক্ষা জাতিগত বিদ্বেষ আর কি হইতে পারে?

যখন উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-মার্গের নেতা,—জাতীয় স্বাধীনতার প্রবর্ত্তয়িতা,—দাসত্বের উন্মূলনে গৃহীত-ব্রত,—প্রতিনিধি-শাসন প্রণালীর সৃষ্টি কর্ত্তা,—ইংরাজ বিংশ শতাব্দীর প্রায় প্রকালে এই সামান্য অধিকার টুকু দেশীয় বিচারপতিগণের হস্তে দিতে কিছুতেই সম্মত নহেন, তখন মানবজাতির সেই শৈশবকালে আর্য্যেরা যদি কিঞ্চিৎ স্বার্থ-দুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ কি? তুলনায় আর্য্যগৌরব বরং উজ্জ্বলতর হইবে। আর্য্যেরা শূদ্রগণকে ঔদার্য্য গুণে স্বধর্ম্মে আনিয়াছিলেন—তথাপি আর্য্যধর্ম্ম রক্ষার জন্য তাঁহাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করিতেন না। কারণ তাঁহাদিগের পুরোহিতগণ—ব্রাহ্মণেরা—উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন—প্রজার রক্তে জুড়ি গাড়ি চড়িয়া নবাবী করিয়া বেড়াইতেন না। পাছে ধর্ম্মব্যপদেশে শূদ্রগণের নিকট অর্থ লইতে প্রবৃত্তি জন্মে, এই জন্য সে পথে বিশেষ বাধা জন্মাইয়া রাখা হইয়াছিল। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের নিকট

(৫) The feeling against the Native Jurisdiction Bill grows stronger hourly. The opinion of those best informed is that after the measure has been made over to a select committee next Friday, it will be allowed to drop till the Council next meets in Calcutta, and if in the meantime the opposition continues, it will be shelved altogether.

February 20, 1883

দান গ্রহণ করিবেন, তিনি পতিত ব্রাহ্মণ হইবেন। যিনি অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী, তিনিই সমাজে বিশেষ আদৃত। এই শাসন ছিল বলিয়াই, ব্রাহ্মণেরা এই আত্মসংযম দেখাইতে পারিয়াছিলেন; এবং তজ্জন্য আজও শূদ্রসাধারণের নিকট ব্রাহ্মণজাতির এত আদর। এখন যদি সে আদর কিছু কমিয়া থাকে ত, ব্রাহ্মণ জাতির নিজের দোষে—আত্ম-সংযমের অভাবে।

দ্বিতীয় বর্ণ রাজনৈতিক বা শ্রেণীগত। আমরা পরে দেখাইব যে, এই শ্রেণীগত জাতির উৎপত্তি ভারতে পরে হইয়াছে। যখন আর্য্যেরা ভারতে প্রথম আসেন, তখন আর্য্য ও অনার্য্য এই জাতিগত জাতি মাত্র ছিল। তখন আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে বর্ণভেদ ছিল না—'আদৌ এক এব বর্ণ আসীৎ'। যখন আর্য্যেরা অনার্য্য জাতিকে জয় করিয়া ভারতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন, তখনই কার্য্য ভেদে চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়;—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি কালের ফল। এই রাজনৈতিক ও শ্রেণীগত বর্ণভেদ সকল দেশেই ছিল, দেখিতে পাওয়া যায়। রোমের প্রেট্রিসীয় ও প্লীবীয়গণের মধ্যে এই বর্ণভেদ অনেক দিন চলিয়া আসিয়াছিল। ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায় ইহাদিগের মধ্যেও আদান প্রদান কিছু কাল ছিল না। কিছু কাল রোমে এই দুই বর্ণে ঘোরতর সংঘর্ষ চলিয়াছিল। ক্রমে উভয়ে আপন আপন ভ্রম বুঝিয়া পরস্পর মিশিয়া গেলেন। ভারতে এই শ্রেণীগত জাতির উৎপত্তি ও ক্রমিক পরিণতি-বিষয়ে আমরা সবিস্তার বলিতেছি।

তৃতীয়বর্ণ ব্যবসায়গত। এই বর্ণও রাজনৈতিকবর্ণের ন্যায় সামাজিক ক্রমিক স্ফোটনের ফল। দেশ যত সভ্য হইতে থাকে, ততই নানাপ্রকার ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়। ব্যবসায়-ভেদে ক্রমেই অসংখ্য অবান্তর বর্ণের উৎপত্তি হয়। ব্যবসায়গত বর্ণভেদ ভারতে যেরূপ জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এরূপ আর কোন দেশে কখন হইয়াছে কি না জানি না। কামার, কুমার; ধোপা, নাপীত; তেলি, তামলি; ময়রা, বেহারা, হাড়ী, বাগদী; মুচি, ডোম; জেলে, মালী; শুঁড়ী, সেকরা; বেণে, ম্যাথর;—প্রভৃতি অসংখ্য বর্ণ ক্রমে ক্রমে অতর্কিত ভাবে ভারতে বদ্ধমূল হইয়াছে। অতি প্রাচীন হিন্দু-সমাজ-মন্দিরে বটবৃক্ষের ন্যায় এই অসংখ্য ব্যবসায়গত বর্ণ আপন আপন শিকড় নামাইয়াছে। কেহ কাহার সঙ্গে মিশ খায় না। আপাততঃ দেখিলে বোধ হয়, যেন এই শিকড়গুলি হিন্দু-সমাজ-মন্দিরকে রক্ষা করিতেছে। কিন্তু তাহা নহে—এই পরস্পর-বিদ্বেষী বর্ণ গুলি সেই প্রকাণ্ড মন্দিরকে শতধা বিভিন্ন করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে যে বিদ্বেষ, ইহাদিগের মধ্যে তাহা অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বেষ।

তাহার কারণ এই যে হিন্দুজাতি চতুর্ব্বর্ণ ভেদে অনেক দিন হইতে অভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে—আর বর্ত্তমানের স্বতন্ত্র স্ফোটনে চারিবর্ণের পরস্পর পার্থক্য ইন্দ্রিয়ের হঠগ্রাহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; সুতরাং সে পার্থক্য সহজে অস্বীকার করা যায় না, করিলেও লোকে শোনে না। অবহমান কাল পুরুষ পরম্পরায় ব্রাহ্মণ পরমার্থ তত্ত্বের চিন্তা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পুত্র স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সম্পন্ন। ইংরাজ সে উৎকর্ষ নষ্ট করিবার অনেক উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন, তথাপি ব্রাহ্মণ সাধারণের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারেন নাই। মনরো প্রভৃতি মহাত্মারা ভারতীয় জাতি-সাধারণের মনে ব্রাহ্মণগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত করিয়া দিতেছেন, তথাপি কই হিন্দুজাতি-সাধরণ ব্রাহ্মণবিদ্বেষী কই? ব্রাহ্মণের হস্তে এখন কোন প্রকারই প্রভুশক্তি নাই, এবং সংখ্যায়ই বা ব্রাহ্মণ কয় জন? তথাপি এখনও যে জাতি-সাধারণ ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করিতেছেন, সে কি ব্রাহ্মণের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ নহে? কে বলিতে পারে নহে? কথায় বলে 'মরা হাতি লাক টাকা'—সে ব্রহ্ম-তেজ অনেক পরিমাণে গিয়াছে সত্য, সে আত্মত্যাগ অনেকটা অন্তর্হিত হইয়াছে সত্য, তথাপি এ পতিত জাতিতে যদি কিছু তেজ, যদি কিছু আত্মত্যাগ থাকে—সে ব্রাহ্মণে আছে। ব্রাহ্মণ এখনও জাতীয় সঞ্জীবনের নেতা। আমরা অধিক দূরে যাইতে চাই না। চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেখা যায় যে, যাঁহারা সমাজকে তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন—সকলেই ব্রাহ্মণ। বৈদ্য ব্রাহ্মণের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত। সুতরাং ব্রাহ্মণ অংশ আছে বলিয়া বৈদ্যজাতির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ব্রাহ্মণেতর বর্ণমাত্রের অপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক ক্ষত্রিয়বংশ পরশুরামের ভয়ে কায়স্থ জাতির মধ্যে ঢুকিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান কায়স্থ-বংশ যে মানসিক উৎকর্ষে মহান্, তাঁহাদিগের শরীরে আর্য্য-অংশের সদ্ভাই তাহার সম্ভাবিত কারণ বলিয়া বোধ হয়। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথার আবির্ভাবে ব্রাহ্মণেতর বর্ণমাত্রেই প্রায় কিছু না কিছু পরিমাণে আর্য্য-অংশ প্রবেশ করিয়াছে। সেই অংশের পরিমাণানুসারে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের তারতম্য হইয়া থাকিবে। ব্রাহ্মণ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য সব ছাড়িয়াছিলেন—এই জন্য ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ আজও অল্প বা বিনা চর্চ্চাতেও কিছু রহিয়াছে। ক্ষত্রিয়সাধারণ প্রধানতঃ রাজনৈতিক প্রভুতাপ্রয়াসী হইয়াও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য ব্রাহ্মণগণের সহিত কিঞ্চিৎ প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন বলিয়াই আজও যেখানে ক্ষত্রিয়-অংশ, সেই খানেই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ

কিঞ্চিৎ দেখা যায়। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের সঙ্গে যে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ সংশ্লিষ্ট আছে, অল্প অনুধাবন করিলেই দেখা যায়। পরমার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধানই আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মূল। এই পরমার্থ তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে গিয়াই মানুষকে জড়জগতের বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। আধুনিক ও পুরাকালিক সভ্যতার মূল এই জড়জগতের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ। কোথা হইতে আমরা আসিলাম, কোথায় যাইব? শরীর কি, ইহার অভ্যন্তরে জড় ভিন্ন আর কোন পদার্থ নিহিত আছে কি না; এই প্রত্যক্ষ-পরিদৃশ্যমান জগৎ কি, ইহা স্বয়ং চালিত, কি ইহার জড়েতর চালক আছে; ইহা পূর্ব্বে কি ছিল; ছিল কি না; যদি না ছিল স্বীকার করা যায় তবে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কি রূপে হইল; যদি সৎ হইতে সতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে সে সৎ প্রথম অবস্থায় পরমাণুরূপে কি অন্য কোন অবস্থায় ছিল; যদি পরমাণু অবস্থায় ছিল স্বীকার করা যায়, তবে সেই পরমাণু-পুঞ্জকে কে প্রথমে মিলিত করিল; কোন্ শক্তি সেই পরমাণু-পুঞ্জের অবিরাম সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ করিতেছে; এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে পরমাণু-পুঞ্জের নিরন্তর অভিনয় ভিন্ন আর কিছু আছে কি না; ক্ষিতি কি, অপ্ কি, তেজ কি, মরুৎ কি, এই অনন্তনীলিমাধার ব্যোম কি—প্রভৃতি জড় ও অজড় জগৎ সম্বন্ধীয় গূঢ়তত্ত্ব নিচয়ের মীমাংসা করিতে যাওয়ায় যে ভারতীয় আর্য্যজাতির বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতরে পরিণত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পদার্থজ্ঞানবলে তাঁহারা যে সুস্থ-শরীর, সবলকায় ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান আছে। আর্য্যেরা সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই আজও আর্য্য অংশের এত আদর। এই জন্যই শূদ্রজাতির মধ্যে আর্য্য-অংশসত্তার প্রমাণের চেষ্টার এত বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে প্রস্তুতের অনুসরণ করি। আমরা দেখাইলাম যে, ব্রাহ্মণ আজও পূর্ব্বাগত উৎকর্ষের অংশ আছে বলিয়া এই অসংখ্য বর্ণ তাঁহার প্রভুতা স্বীকার করিতেছে। তাই জোর নাই, প্রভুতা নাই, অথচ ব্রাহ্মণের আধিপত্য আজও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। উৎকর্ষের প্রতি অপকর্ষের ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ। চাও বা না চাও, এ পূজা আপনি আসিবে। কিন্তু কায়স্থ ও বৈদ্য; তেলী ও তামলিতে; ধোবা ও নাপিতে; কামার ও কুমারে; হাড়ি ও বাগদীতে, মুচি ও ডোমে; এবং জেলে ও মালী প্রভৃতি প্রতিদ্বন্দ্বী অব্যান্তর বর্ণ সমুদায়ে উৎকর্ষের তাদৃশ পার্থক্য না থাকায় তাহারা পরস্পরের প্রভুতা স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক। এই জন্য এই সকল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বীবর্গের

মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, তাহারা মীমাংসার জন্য ব্রাহ্মণের নিকট যায়। এই জন্যই আজও ব্রাহ্মণেরা হিন্দুসমাজের শক্তিসামঞ্জস্যের তুলাদণ্ড ধারণ করিয়া আছেন। এ সামান্য অধিকার নহে। ব্রাহ্মণেরা এ অধিকারচ্যুত হইবেন কি না হইবেন,সে তাঁহাদিগের নিজের ইচ্ছাধীন। ক্রমিক স্ফোটন-মার্গে তাঁহারা ভারতীয় জাতিনিচয়ের অগ্রণী এখনও রহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে অন্য জাতিনিচয়ের সহিত তাঁহাদিগের দূরত্ব যে কমিতেছে, তাহার কারণ ব্রাহ্মণেরা যে গতিতে অগ্রসর হইতেছেন, নিম্নতর জাতিগুলি তাহা অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হইতেছে। কায়স্থ ও বৈদ্য যেন ব্রাহ্মণের কাছাকাছি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ব্রাহ্মণের আধিপত্য যেন পড়ে পড়ে। ব্রাহ্মণের এ গতি-মান্দ্যের কারণ কি জানি না। ব্রাহ্মণ জাতি কি ক্রমিক স্ফোটন-বর্ত্মে অতিদ্রুত গমনে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন? এ অবসাদ কি অতি শ্রমের ফল? অথবা আমরা এরূপ বিচ্ছিন্ন ভাবে অগ্রসর হওয়াতেই শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়াছি এবং সকলে একত্র মিলিত না হইলে নিহত হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই ভারতের শুভাকাঙ্ক্ষিণী কোন দৈবীশক্তি কি ব্রাহ্মণজাতিকে ধীরে ধীরে যাইতে বলিতেছেন ও সেই বেগগামী মহাশ্বের বল্গা ধরিয়া রাখিয়াছেন এবং পশ্চাৎবর্ত্তী জাতগুলিকে শীঘ্র আসিয়া জুটিতে বলিতেছেন? জানি না। কোন্‌টী সত্য! ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় তিনিই বুঝেন! তবে যত দূর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়,না বলিয়া, বা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

ব্রাহ্মণের এই স্তম্ভিত ভাব ধাবণে বা গতিমান্দ্যে ব্রাহ্মণজাতির যে অনিষ্ট হইতেছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভারতীয় জাতিসাধারণের অনিষ্ট হইতেছে কি না দেখা যাউক। কারণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প, সুতরাং অল্পের অনিষ্টে যদি অনেকের ইষ্ট হয়, তাহা অবশ্য করণীয়। এই বিষয় বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য এখানে আমরা ঈশ্বর তত্ত্বের একটী কথা তুলিব।

এক্ষণে অনেক দার্শনিকই স্বীকার করেন যে, ঈশ্বর কেহ কখন দেখে নাই, এ জগতে কেবল ঈশ্বর দেখিবার চেষ্টা হইতেছে মাত্র। লোকে যে জিনিস দেখিতে পায় না, অথচ আছে বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাকে আপন আদর্শ অনুসারে সাজাইতে চেষ্টা করে। আপন আপন আদর্শ অনুসারে ঈশ্বর গঠিতে গিয়াই মানুষ এত প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। সকলেই নিরন্তর আপন আপন আদর্শ ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিতেছে। হিন্দুরা প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন আপন আদর্শ ঈশ্বরের বা ইষ্টদেবতার অনুবর্ত্তন ও পূজা করিতে বলিয়াছেন। কারণ,ব্যক্তিমাত্রেরই নিজ নিজ পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আদর্শেরও

পরিপুষ্টি বা পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। যে ঈশ্বর পূর্ব্বে আদর্শ ছিলেন, সে ঈশ্বরে বিলীন হইলে, আবার নূতন ঈশ্বর আদর্শ হইয়া দাঁড়ান। লক্ষ্যস্থল না থাকিলে, মানুষ অগ্রসর হইতে চাহে না। এই জন্য সকলেই আপন আপন লক্ষ্যস্থল স্থির করিয়া লয়। সকলেরই লক্ষ্যের দিক্ এক, ক্রমিক সেই পথে অগ্রসর হওয়ার নামই উন্নতি বা—পরিপুষ্টি। অধিকাংশ ধর্ম্ম সংপ্রদায়েরই মত যে জীবাত্মা ক্রমে প্রকৃতি-শৃঙ্খল ভেদ করিয়া সেই অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত পরমাত্মাতে গিয়া বিলীন হইবে। কোন কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়েই অবিচ্ছিন্ন ভাবে স্থূল নির্ম্মোকাবলী পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে অতীন্দ্রিয় বা অব্যক্ত অবস্থায় পরিণত হয়। উভয়েরই নাম মোক্ষ বা মুক্তি। ভারতীয় আর্য্যেরা জীবাত্মার পরিপাক-গতি সামান্য কীটাণু হইতে দেব-শরীর পর্য্যন্ত বলিয়া গিয়াছেন। অশিক্ষিত হিন্দুরমণীর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায় যে, জীবাত্মা অশীতি কোটী যোনি পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানব জন্ম প্রাপ্ত হন। এই বিশ্বাস হিন্দুদিগের অস্থি-মজ্জাজড়িত। প্রবাদ আছে এইমত ভারত হইতে গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরস ইউরোপে লইয়া যান। তিনি এই মতের নাম আত্মার যোনিপরিভ্রমণ (Transmigration of souls) রাখিয়াছিলেন। হিন্দুরা ইহাকে জন্মান্তর পরিগ্রহ বলিয়া থাকেন। আত্মা সূক্ষ্ম পরমাণু-পুঞ্জ বা স্পিরিট পদার্থ, সে দুরবগাহ তত্ত্বের মীমাংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। আমরা শুদ্ধ এই বলিয়া ক্ষান্ত হইব যে, এই ক্রমিক স্ফোটনবাদ আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুমোদিত। বর্ত্তমানকালে সুবিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ ডারউইন ও প্রখ্যাত-কীর্ত্তি দার্শনিক স্পেনসার এই মতের প্রচারক। এই মতে আমাদিগের প্রগাঢ় আস্থা। সুতরাং আমরা প্রকৃতি-আত্মার এই অনন্ত স্ফোটনে বিশ্বাস করিয়া থাকি।

যাঁহারা মুক্তিবাদী, তাঁহারা আত্মার পরিপাকের সীমা নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন, আত্মা যোনি যোনি ক্রমে ক্রমশঃ স্থূল নির্ম্মোক পরিত্যাগ করিতে করিতে পরিণামে অনন্ত আত্মারূপ সাগরে গিয়া মিলিত হইবে। যেমন অসংখ্য নদ নদী পর্ব্বতাদি হইতে উঠিয়া নানা দেশ পর্য্যটন পূর্ব্বক শেষে সাগরে আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ আত্মা বা স্পিরিট পদার্থ স্থূল শরীরের বন্ধন পরিত্যাগ করিতে করিতে কালে বিশ্ব-আত্মায় গিয়া পতিত হয়। যতক্ষণই স্থূলতা থাকিবে, ততক্ষণই পরিপাক প্রয়োজনীয়। পূর্ণ স্থূলতা বিমুক্তিই ভব-বন্ধন হইতে মুক্তি। গুণ ও ক্রিয়া স্থূলতা ভিন্ন থাকিতে পারে না। পরমাত্মা স্থূলতাস্পর্শ-শূন্য বলিয়া কপিলাদি যোগিবৃন্দ পুরুষ বা পরমাত্মাকে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় বলিয়া গিয়াছেন। স্থূলতাই

প্রকৃতি। কপিলের মতে প্রকৃতিই স্বয়ং কর্ত্রী। পুরুষ কর্ত্তা নহেন; প্রকৃতি-কার্য্য-পর্য্যবেক্ষী মাত্র। পুরুষের কর্ত্তৃত্বারোপ করিলে, তাহাতে স্থূলতা আছে স্বীকার করিতে হয়। কারণ স্থূলতা ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই। কপিল প্রকৃতি ও পুরুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি ও অনন্ত; উভয়ই স্বতন্ত্র অথচ উভয়ে অবিচ্ছিন্ন; যখন উভয়ই স্বতন্ত্র, তখন এক হইতে অপরের উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই, অথচ প্রকৃতি পুরুষের বিচ্ছেদে সৃষ্টির সম্ভাবনা নাই।

সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষ প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন আবার যখন বিচ্ছিন্ন হইবেন, তখন সৃষ্টিলোপ হইবে। তখন জগৎ আবার তমোময় বিচ্ছিন্ন পরমাণুপুঞ্জে পরিণত হইবে। আবার মিলন, আবার সৃষ্টি ও স্থিতি; আবার বিচ্ছেদ, আবার প্রলয়; সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় প্রকৃতি ও পুরুষের নিরন্তর সংযোগ-বিয়োগের স্থল মাত্র। যখন মহান্ পুরুষ সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন, তখনই মহাপ্রলয় উপস্থিত হয়। এই অবস্থা ক্ষণিক বলিয়াই কপিল প্রকৃতি ও পুরুষকে অবিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-সাপেক্ষ বলিয়া গিয়াছেন। চার্ব্বাক বলেন, প্রকৃতি ভিন্ন অন্য অস্তিত্ব নাই। যাহাকে আমরা আত্মা বলি, তাহা প্রকৃতি পদার্থের শক্তি মাত্র। যেমন অন্নাদি পচা-ইলে তাহা হইতে মদ্য উৎপন্ন হয়, সেই রূপ আত্মা মস্তিষ্কাদির নিকৃষ্ট সার ভিন্ন আর কিছু নহে। চার্ব্বাক প্রকারান্তরে কপিলের মত সমর্থন করিলেন। কারণ তিনি *প্রকারান্তরে বলিলেন যে প্রকৃতি* পুরুষ দুইই আছে, তবে একের পরিপাকে অপরের উৎপত্তি। চার্ব্বাক বলিলেন পুরুষ কার্য্য, প্রকৃতি কারণ। কপিল বলিলেন উভয়ই স্বয়ং সৃষ্ট, কেহ কাহার ও কারণ নহে। কপিল বলিলেন প্রকৃতি ও পুরুষ সহসত্ত্বা (Co-Existent) চার্ব্বাক বলিলেন প্রকৃতিই কেবল অনাদি, কারণ পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, সুতরাং পুরুষ অনন্ত হইতে পারেন, কিন্তু অনাদি নহেন। বিশ্লেষণশক্তিবলে এই মতের অভ্যন্তরে যাইলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে চার্ব্বাক জড় হইতে আত্মার পরিপাক আরম্ভ হইয়াছে প্রকারান্তরে এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। ডারউইন কীটাণু হইতে আত্মা বা স্পিরিট পদার্থের পরিপাক আরম্ভ হইয়াছে স্বীকার করিয়াছেন। চার্ব্বাক সেই মত আরও পূর্ব্বে প্রযুক্ত করিয়াছেন মাত্র। কারণ তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে অন্নের পরিপাকে যে স্পিরিট উৎপন্ন হয়, আর মানবদেহান্তর্গত উপকরণ সামগ্রীর পরিপাকে যে আত্মা পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা সমশ্রেণীক। পরিপাক তারতম্যে *নামভেদ মাত্র।* প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে চার্ব্বাককে নাস্তিক বলা ভ্রম মাত্র। যিনি প্রকৃতির

পরিপাক হইতে পুরুষ বা স্পিরিটের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, তিনি প্রকারান্তরে প্রকৃতি-মাত্রে অস্ফুটস্থ অবস্থায় পুরুষের অবস্থানও স্বীকার করিয়াছেন। এই পুরুষ কোথাও স্পিরিট, কোথাও আত্মা, কোথাও বা শক্তি, কোথাও বা অব্যক্ত (এখনও-অস্ফুটস্থ) নামে অভিহিত হইয়াছেন। লাপ্লাসাদি দার্শনিকগণও পরমাণুর আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তি অস্বীকার করেন নাই। লাপ্লাস বলেন যে, যে দিন একটী পরমাণু আর একটী পরমাণুকে আকর্ষণ করিয়া দ্ব্যণুক সৃষ্টি করিল, সেই দিনই জগৎ-সৃষ্টির সূত্রপাত হইয়াছে। দুই বন্ধুতে পরস্পর দেখা হইলে যেমন কোলাকুলি করে, সেইরূপ প্রথম দিন দুই পরমাণু অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-শক্তি বলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। যদি সকলেই স্বীকার করেন যে, অন্তর্নিহিত আকর্ষণ-শক্তিবলেই প্রথম দিন এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে টানিয়া লইয়াছিল, তাহা হইলে আস্তিকে নাস্তিকে বিবাদ মিটিয়া গেল। কিন্তু ঈশ্বর-বাদীরা বলেন যে, ঈশ্বর সেই মিলন-কর্ত্তা। আমরা এই মিলন-কারিণী শক্তিতে ও এই মিলনকারী ঈশ্বরে কোন ভেদ দেখি না। যাঁহারা ঈশ্বরকে হস্তপদাদি-বিশিষ্ট বলিয়া মনে করেন, তাঁহারাও তাঁহাকে সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বলিয়া স্থাপন করেন। অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাঁহারা প্রতি পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তির সমবায় বা পরিপাককে ঈশ্বর বলিয়া থাকেন। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর যখন শক্তি-সমষ্টি বা শক্তির পূর্ণ পরিপাক বই আর কিছু নন, তখন শক্তিবাদী নাস্তিকে ও ঈশ্বরবাদী আস্তিকে কি বেশী প্রভেদ রহিল! সুতরাং প্রতিপন্ন হইল যে, জগতে নাস্তিক নাই, ঈশ্বরবাদীরা শক্তিবাদিগণকে গালি দিবার জন্যই নাস্তিক শব্দের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। যে চার্ব্বাকের উপর লোকের এত রাগ, সে চার্ব্বাকও এমন কথা বলেন নাই যে, শক্তি বা স্পিরিট অস্ফুট অবস্থায় পদার্থের অভ্যন্তরে নিহিত নাই।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্যও আত্মার এই অস্ফুট অবস্থা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তবে তিনি এই অস্ফুট অবস্থার নাম মায়া বা অবিদ্যা দিয়াছেন মাত্র। তাঁহার মর্ম্ম এই যে, অবিরাম ও ক্রমিক স্ফোটনে অস্ফুট বা ব্যক্ত অবস্থার ধ্বংস হইয়া যাইবে; চরমে কেবল সেই অব্যক্তরূপী পরমাত্মা থাকিয়া যাইবেন; ব্যক্ত অনিত্য, সুতরাং তাহাকে নিত্যত্বের ভাণ অজ্ঞান বা অবিদ্যার কার্য্য মাত্র; এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ, ইহার অবিরাম পরিবর্ত্তন বা স্ফোটন হইতেছে; যখন চরম স্ফোটন হইবে, তখন ব্যক্তের পূর্ণ ধ্বংস হইয়া কেবলমাত্র অব্যক্তের সত্তা থাকিবে।

এই ব্যক্ত বা স্থূল হইতে অব্যক্ত বা সূক্ষ্মে পরিণত হওয়াই সকলেরই লক্ষ্য

এবং সেই চেষ্টাই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি-ভূমি। অব্যক্ত বা ব্যক্ত মাধ্যমিক অবস্থার সাপেক্ষ মাত্র (Relative) অর্থাৎ জড় অপেক্ষা উদ্ভিদ, উদ্ভিদ অপেক্ষা কীটাণু, কীটাণু অপেক্ষা প্রাণী, প্রাণিসাধারণ অপেক্ষা মানব, মানব অপেক্ষা দেবতা ক্রমশঃ অধিকতর অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম। ইহাই স্ফোটনবাদের সূক্ষ্ম অর্থ। এই ক্রমিক স্ফোটন বা ক্রমিক অব্যক্তত্বের সীমা নির্দ্দেশ করিতে গেলে, ঈশ্বর কে সসীম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। আবার চরম স্ফোটন অস্বীকার করিতে গেলে, ঈশ্বরে অপূর্ণতার আরোপ করা হয়। এই ক্রমিক স্ফোটনের বিরাম আছে কি না জানি না। তবে ইহা স্থির যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অব্যক্ত, সূক্ষ্ম বা পরিস্ফুট তিনিই সকলের ঈশ্বর।

আইস ভাই! আমরা সকলে সেই অধিকতর পরিস্ফুট পরম পুরুষের পশ্চাদ্-গামী হই। তাঁহার পরিপাকের সীমা থাকে ত এক দিন তাঁহাকে ধরিতে পারিব। অনন্ত স্ফোটন মার্গে যদি তিনিও অবিরাম অগ্রসর হইতে থাকেন, আমরাও সেই সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইতে থাকিব। ধরিতে পারি, মিশিয়া যাইব, না পারি চিরকালই কাছাকাছি থাকিব; উঠিব বই নামিব না। তবে ব্রাহ্মণ! ভয় কি চল,অগ্রসর হই। যাঁহারা পশ্চাদ্-বর্ত্তী রহিয়াছেন, তাঁহাদের পথ পরিষ্কার করিয়া চল! দেখো যেন সে পথে কাঁটা দিও না! এই তীর্থযাত্রার যাত্রিগণের শুভ কামনা করিতে করিতে অগ্রবর্ত্তী হও, অনন্ত উন্নতিমার্গ সম্মুখে বিরাজমান। তোমার পুরোগামিনী গতি রোধ করিবার কেহ নাই, তবে তুমি কেন পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রিগণের সে গতি রোধ করিতে চেষ্টা কর? তোমরা অধিকতর পরিস্ফুট, সুতরাং তোমাদের এ ঈর্ষা-এ দ্বেষ, সাজে না। তোমরা ভয় পাও কেন? পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রিগণ তোমাদিগকে ধরিবে বলিয়া? সে ভয় বৃথা! তোমরা যে গতিতে পূর্ব্বে চলিয়া আসিতেছিলে, যদি সেই গতিতে চলিতে পার, কোন যাত্রী তোমাদিগকে ধরিতে পারিবে না! তবে ভয় কেন? তোমাদের মধ্যে কাহা-রও কাহারও বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, পথ ছাড়িয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াও, পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রিগণ অগ্রসর হউক, তাহার পর নিদ্রা যাইও। কাহারও উন্নতির পথে কণ্টক-স্বরূপ না হইলে, কেহ তোমার নিদ্রার ব্যাঘাত করিবে না। যদি সে পথের কণ্টকস্বরূপ হও, তোমায় উৎপাটিত করিয়া দূরে প্রক্ষেপ করিয়া সকলে চলিয়া যাইবে! যদি আড় হইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাক, তোমায় পদদলিত করিয়া যাইবে! এই মহাঅভি-যানে যে থামিল, সেই মরিল? যে অগ্রসর হইল, সেই নেতা হইল! এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি!!!

হিন্দুবিবাহ-প্রণালী।

কলিকাতা বহুবাজার-স্থিত সাবিত্রী লাইব্রেরীর ৪র্থ বাৎসরিক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। আমাদের হিন্দু বিবাহ-প্রণালী-সম্বন্ধে দুই জন এম এ উপাধিধারী কৃতবিদ্যের অভিপ্রায় কি, জানিবার জন্য আমি তথায় উপস্থিত হই। বক্তা বাবু চন্দ্রনাথ বসু একটী লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাহার কথাগুলি আমার সমুদায় প্রতিবাদ-সহ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সভাস্থলে আমি কোন কথা বলিতে সাহসী হই নাই। এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিতে সাহসী হইলাম।

আমাদের বিবাহ প্রণালীর ব্যবস্থাপকগণ পূর্ব্বে কিরূপ উন্নতভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহা প্রবর্ত্ত করেন, তাহাই প্রদর্শন করা বোধ হয় প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু লেখক যদি শুদ্ধ তাহাই বর্ণন করিয়া ক্ষান্ত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রবন্ধ তত প্রতিবাদ-সহ হইত না। তিনি তন্মধ্যে এত অবান্তর কথা আনিয়াছেন, এত তুলনা করিয়াছেন, এত যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাহাতে তিনি প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হইতে অনেক দূর ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার প্রবন্ধকে একটি স্বতন্ত্র বস্তু করিয়া ফেলিয়াছেন, তিনি যদি শাস্ত্রোক্তি হইতে আমাদের বিবাহ প্রণালীর ভাব দেখাইতে চান, তাহা হইলে সেই শাস্ত্রের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল করিয়া আলোড়ন করিলে, যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, সেই সমুদায় সিদ্ধান্ত করাই তাহার উচিত ছিল। সেরূপ করিলে তিনি দেখিতে পাইতেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত সকল হয় ত অন্যবিধ হইত। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া আপন মতের প্রতিপোষক শাস্ত্রোক্তিগুলিই কেবল গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের বর্ত্তমান বিবাহ-পদ্ধতি একদিনের ফল নহে, তাহা বহুপরিবর্ত্তনের ফল। সেই সমুদায় পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য সমালোচন করিয়া যদি প্রবন্ধলেখক আপন মত স্থাপন করিতেন, তবে তাঁহার কথার প্রতি আমাদের অধিকতর শ্রদ্ধা হইত। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা দেখাইতে চাই, তাঁহার প্রতি বাক্য কেমন প্রতিবাদ-সহ।

তিনি বলিয়াছেন, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৃহস্থাশ্রমের প্রধান প্রয়োজন দার-পরিগ্রহ। হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য মনুষ্য-সমাজে দার-পরিগ্রহ যেমন মনুষ্যের একটী স্বাভাবিক অভাব হইতে উৎপন্ন হয়, হিন্দু-সমাজের বিবাহপ্রণালী সেরূপ নহে। ধর্ম্ম এবং সমাজের হিতার্থ হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য। এজন্য এখানে বিবাহে কন্যা-নির্ব্বাচনের ভার কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর ন্যস্ত আছে। হিন্দুবিবাহ সামান্য চুক্তি মাত্র

নহে, তাহা একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের দ্বারস্বরূপ। অতএব এই মহৎ উদ্দেশ্য ভাবিয়া কর্তৃপক্ষের কন্যানির্ব্বাচনেই সন্তুষ্ট থাকা আমাদের কর্ত্তব্য। প্রবন্ধের প্রথমাংশের সার মর্ম্ম এই রূপ। দেখা যাউক, এই কথা গুলি কতদূর যুক্তি এবং শাস্ত্রসঙ্গত।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্র একখানি গ্রন্থ নহে এবং আমাদের রীতি নীতি একখানি ব্যবস্থা পুস্তকের উপর স্থাপিত নহে। এই রীতি নীতি সকল বহুকাল ও বহু পরিবর্ত্তনের ফল। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র এত বিস্তৃত এবং বহুমতযুক্ত যে উহার মধ্য হইতে সর্ব্ববিধ মতের প্রতিপোষক উক্তিই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমত কি, বিপরীত মত ও ব্যবস্থার প্রতিপোষক শাস্ত্রোক্তিরও অভাব নাই। কি ধর্ম্মমত, কি দার্শনিক মত সর্ব্ববিধ মতামতই হিন্দুশাস্ত্র স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘোর নাস্তিকতা হইতে ঘোর পৌত্তলিকতা পর্য্যন্ত ইহাতে পাওয়া যায়। আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয়গণ এমত কোন মতামত বাহির করিতে পারেন নাই, যাহা হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে এক প্রকার না এক প্রকার আকারে দৃষ্ট হইয়া না থাকে। এত দিনের পর, এত যুগ যুগান্তরের পর সেই হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে আমাদের কোন রীতি নীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য দেখিয়া বাহির করা বড় সহজ কথা নহে। হইতে পারে, সে রূপ উদ্দেশ্য কোন বিশেষ কালে ছিল, অথবা কোন বিশেষজাতি মধ্যে ছিল। কিন্তু সেই একই উদ্দেশ্যে যে কোন রীতি চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, একথা প্রতিপন্ন করিতে হইলে সকল কালের সকল শাস্ত্র আলোড়ন করা আবশ্যক। কারণ, এক কালে যাহা ছিল, অন্য কালে হয় ত তাহা ছিল না। কারণ, হিন্দুসমাজ ও হিন্দু রীতিনীতি বহু কালের ও বহু পরিবর্ত্তনের ফল। এই সর্ব্বপরিবর্ত্তনের মধ্যে যদি কোন একটি ভাব বরাবর বিদ্যমান থাকিয়া থাকে, তবেই তাহা কোন রীতির একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে, নহিলে নহে।

কি বিশেষ ধর্ম্মউদ্দেশ্য সাধন এবং সমাজের হিতার্থ হিন্দু বিবাহ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহা প্রবন্ধ মধ্যে বিবৃত হয় নাই; সুতরাং আমাদের শাস্ত্র মধ্যে তাহা খুঁজিতে হইতেছে। অতি প্রাচীন কালে হিন্দু দ্বিজাতিগণের জীবন ধর্ম্মজীবন ছিল। তাঁহাদের সমস্ত জীবনই এক ধর্ম্মব্রত-পালন মাত্র। ধর্ম্মময় দ্বিজাতিগণের জীবন-কাল চতুর্ব্বিধ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। এই এক এক ভাগকে এক একটি আশ্রম বলা যাইত। যিনি এই চতুর্ব্বিধ আশ্রমাবলম্বী হইয়া জীবন যাপন করিতেন, তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চতুর্বর্গের ফললাভ করিতেন। কিন্তু সকলেই চতুর্ব্বিধ আশ্রম লইতে পারিতেন না। কেহ কেহ বা দুই, কেহ বা এক মাত্র, কেহ বা তিন কেহ বা চারি প্রকার আশ্রম-নিয়মই সাধন করিতেন। দ্বিজাতিগণ-মধ্যে

যখন এই নিয়ম ছিল, তখন তাহাদের উদ্বাহ-প্রথার যে উদ্দেশ্য হইবে, শূদ্রগণের উদ্বাহ-প্রথার সে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। চারি আশ্রমী দ্বিজাতির উদ্বাহের উদ্দেশ্য অবশ্য ধর্ম্ম উদ্দেশ্য হইবার সম্ভাবনা, যেহেতু তাহার জীবনের সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে গৃহীত হইত। কিন্তু সেই দ্বিজাতি হইতে যাহারা স্বতন্ত্র ছিল, তাহাদেরও উদ্বাহ-প্রথা যে সেই ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, এমত অনুমান করা যায় না। যেহেতু শূদ্রগণের জীবন-উদ্দেশ্য এবং দ্বিজাতিগণের-জীবন উদ্দেশ্য একই মত ছিল না। তবে দেখা যাইতেছে, শূদ্রগণের উদ্বাহ-প্রথা কোন ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য-সাধন জন্য স্থাপিত হয় নাই। তাহাদের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র ছিল। কিন্তু দ্বিজাতিগণের উদ্দেশ্যও কি চিরকাল এক ছিল?

উদ্বাহকার্য্য গৃহস্থাশ্রমের দ্বারস্বরূপ; তাহা অন্যান্য আশ্রমের নিয়ম নহে। দ্বিজাতিগণকে একটী বিশেষ আশ্রম অবলম্বন করিতে হইলে, এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইতে হইত। এই আশ্রম প্রবেশ করিবার যে সাধারণ উদ্দেশ্য, সেই আশ্রমের প্রতিকার্য্যের উদ্দেশ্যও তাহাই হইবে। অথবা সেই সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায়স্বরূপ সেই আশ্রমের প্রধান প্রধান কার্য্য। সুতরাং গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্ম উদ্দেশ্য বিবাহ কার্য্য দ্বারা সংসিদ্ধ হইত। পুত্রোৎপাদন করিয়া পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ করা এবং সংসারের প্রজাবৃদ্ধি করিয়া সমাজের হিত-সাধন করা এই আশ্রমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বিবাহের জন্য অন্য কি ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না।

যখন চারি আশ্রমের নিয়ম প্রবর্ত্তিত ছিল, তখন উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য হইতে পারে। কারণ, অপর ত্রিবিধ আশ্রমাবলম্বনে উক্ত দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার যো ছিল না। যদি সকল দ্বিজাতিগণ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া অপর ত্রিবিধ আশ্রমে নিযুক্ত থাকিত, তবে সংসার রসাতলে যাইত, এবং আর্য্যবংশীয় মনুষ্য সমাজ ভারতে উঠিয়া যাইত। সুতরাং তখনকার কালে পুত্রোৎপাদন করাতে মনুষ্য-সমাজ রক্ষা হইত, এবং তজ্জন্য শুদ্ধ পুত্রোৎপাদনে সমাজের হিত সাধন হইত। এইরূপ সমাজের হিত সাধন করা যেরূপ ধর্ম্ম উদ্দেশ্য, পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ করা সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। একের উদ্দেশ্য, সমাজের হিত, অন্যের উদ্দেশ্য আপনার মঙ্গল; একটী স্বার্থপর ধর্ম্ম, অন্যটি পরার্থপর ধর্ম্ম। ব্রহ্মচারীর নিকট এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য বিশেষ রূপে প্রতীত হইত। কারণ তাঁহার আশ্রমে এই দ্বিবিধ উদ্দেশ্য-সাধনের উপায় ছিল না।

যখন ব্রহ্মচারী এই দ্বিবিধ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন জন্য গৃহী হইতেন, তখন তিনি শুদ্ধ পুত্রোৎপাদন জন্য গৃহস্থাশ্রমে

আসিতেন। কিছুকাল পরে তিনি আবার এই গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অপর আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম অল্পদিনের মাত্র ছিল।

ভারতীয় ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ক্রমে দ্বিজাতিত্ব হইতে বিচ্যুত হন এবং নানা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই সমস্ত জাতি মধ্যে ঐ আশ্রমের নিয়ম ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া আইসে। ইহারা সকলেই অপর ত্রিবিধ আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং দারপরিগ্রহ-সম্বন্ধে ব্রহ্মচারীর যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, এই জাতি সমুদায় মধ্যে সে প্রকার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল না। তখন প্রজাবৃদ্ধি সাধারণ নিয়ম এবং লোকে পুন্নাম নরক হইতে মুক্তিলাভ করিতে গিয়া অন্য একপ্রকার পার্থিব নরকভোগে পতিত হইতেন। তাঁহাদের নিকট ঐ দ্বিবিধ উদ্দেশ্য এত সামান্য বোধ হইয়াছিল যে, ক্রমে ক্রমে লোকে সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাইতে লাগিল। তখন বিবাহ-কার্য্য একটি স্বাভাবিক প্রয়োজন মাত্র হইল; তাহার ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যের ক্রমশঃ অপলাপ হইল। ভারতের ইতিহাসের এমত সময় আসিল, যখন দ্বিজাতিত্ব শুদ্ধ ব্রাহ্মণজাতি মধ্যে আবদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণজাতিই একমাত্র দ্বিজাতি-শ্রেণীভুক্ত। ক্রমশঃ আবার এই ব্রাহ্মণজাতিও সাধারণতঃ গৃহী হইয়া পড়িলেন। দুই দশ জন অবশ্য চারি আশ্রমের নিয়ম পালন করিতেন বটে, কিন্তু সাধারণ লোকে কেবল গৃহস্থাশ্রম-ভুক্ত হইয়া পড়িলেন; তাঁহারা অপর ত্রিবিধ আশ্রম পরিত্যাগ করিলেন। এই সময় সমস্ত হিন্দুজাতির সাধারণ সর্ব্বলোকেই প্রায় গৃহী। যখন ভারতের এই সময় উপস্থিত, তখন কি হিন্দুগণের নিকট বিবাহ-কার্য্যের বিশেষ ধর্ম্ম উদ্দেশ্য ছিল? তখন তাঁহারা অপরাপর সভ্য মানবজাতির ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

যে দুই বিশেষ উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা কন্যা নির্ব্বাচিত না হইয়া যদি আপনাদের দ্বারাই হয়, তবে সেই উদ্দেশ্য সাধনের কি ব্যাঘাত উপস্থিত হইতে পারে? আর যদি চন্দ্রবাবু বলেন, উক্ত দুই উদ্দেশ্য প্রকৃত ধর্ম্ম উদ্দেশ্য নহে; হিন্দু বিবাহের ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য অন্যবিধ ছিল, তাহা হইলে অন্য কি দ্বিবিধ ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য ছিল, অথবা হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতে চাই।

কিন্তু মনে করুন, অন্য প্রকার ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য ছিল এবং সেই ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ জন্য কর্ত্তৃপক্ষের কন্যানির্ব্বাচন আবশ্যক। চন্দ্রবাবুর মতানুযায়ী আমরা ধরিয়া লইলাম এই দুই উদ্দেশ্য আপনার ও সমাজের মঙ্গল।

বোধ হয়, আপনার মঙ্গল বলিলে চন্দ্রবাবুর অর্থ কর্ত্তৃপক্ষের মঙ্গল নহে, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষেরা যাহার জন্য কন্যা

নির্ব্বাচন করিবেন, তাহার ধর্ম্মার্থ। যে পুরুষের বিবাহ হইবে, যদি তাহার ধর্ম্মার্থ এবং সমাজের কোন হিতার্থ কন্যা-নির্ব্বাচন কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি সমর্পিত থাকা বিধেয় হয়, তবে দেখা উচিত তাঁহারা সেরূপ উদ্দেশ্য-সাধন জন্য কন্যা-নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ কি না। অষ্টম বর্ষ হইতে দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যে দেশে কন্যাগণের কৌমার অবস্থা, এবং যে দেশে বালিকার নির্দ্দিষ্ট বয়সের পর বিবাহ হইবার যো নাই, বয়স অতিক্রম করিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়, সে দেশে কন্যা-নির্ব্বাচন কথার অর্থ কি বুঝিতে পারা যায় না। যদি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য কন্যা নির্ব্বাচিত হওয়া আবশ্যক হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, সেই উদ্দেশ্য-সাধনোপযোগী কন্যার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক। যে কন্যাতে সেই গুণ বর্ত্তমান, তিনিই নির্ব্বাচিত হইবেন। কিন্তু অষ্ট বা ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালিকার কি গুণ দেখিয়া লইব? সেরূপ বালিকাতে কোন্ গুণের উন্মেষ বা বিকাশ হইতে পারে? এবং যদি বিশেষ ধর্ম্মোদ্দেশ্য-সাধন জন্য বিশেষ প্রকার গুণবতী ভার্য্যার আবশ্যক হয়, তবে যে সকল কন্যার সেই সমস্ত গুণের অভাব, সে সকল কন্যার বিবাহ হয় কই? এদিকে বিবাহ না হইলে, জাতিভ্রষ্ট হইতে হয়। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষেরা কন্যার কেবল জাতকুল ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিয়া লইতে পারেন না। তাঁহাদের নির্ব্বাচন, গুণের নির্ব্বাচন নহে, রূপ জাতি ও কুল বাছিয়া লওয়া মাত্র। আমরা জিজ্ঞাসা করি, এই জন্য কি কর্ত্তৃপক্ষের হাতে বিবাহার্থ কন্যানির্ব্বাচন কার্য্য ন্যস্ত করা উচিত?

অধুনা বৈবাহিক ব্যবস্থা যেরূপ আছে, যদি জাতিভয় রাখিতে হয়, তবে এক্ষণে কন্যানির্ব্বাচন-কার্য্য কর্ত্তৃপক্ষের হাতেই থাক, অথবা বিবাহার্থী পুরুষের নিজ-হস্তেই থাক, তাহাদের উভয়ের নির্ব্বাচন প্রায় সমান হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বিবাহ নিজ ইচ্ছামত কিছুই হইবার যো নাই। বিবাহার্থী পুরুষের নিজেচ্ছার অন্তরায়স্বরূপ জাতি, কুল, প্রভৃতি নানা প্রকার অলঙ্ঘ্য নিয়ম রহিয়াছে। সুতরাং পরিণয় কার্য্যে তাহার কিছুই ইচ্ছা চলে না। তাহাকে কতিপয় সামাজিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করিতে হইবে, না করিলে তাহার জাতি যাইবে। যাহাদের বিবাহ, যখন তাহাদের ইচ্ছা চলে না, তখন সে বিবাহ অপর কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইলে কিছুই ক্ষতি নাই। বিশেষতঃ যে সময়ে বর কন্যার বিবাহ হওয়া এ দেশে রীতি আছে, সে সময় তাহাদের কাহারই বিবাহের প্রতি কিছুই প্রবৃত্তি জন্মে না। তাহারা উভয়েই হয় ত তখন খেলিয়া বেড়ায়, না হয় পাঠদশায় নিযুক্ত। বিবাহের চিন্তা, কি ইচ্ছা, তখন তাহাদের

মনে উদয়ই হয় না। তখন তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাও কিছু পরিণত হয় না। তখন তাহারা কোন বিষয় বিবেচনা করিতে সমর্থ নহে। সুতরাং তখন যদি বিবাহ বিধেয় হয়, তবে সে বিবাহ পর-দ্বারা নির্ব্বাহিত হওয়াই ভাল। কর্ত্তৃপক্ষেরা হয় ত জাতি-রক্ষা করিবার জন্য, না হয়, শীঘ্র শীঘ্র নাতিপুতির মুখ দেখিয়া সুখী হইবার জন্য, না হয় ত অর্থ ও কামনার জন্য আপন আপন পুত্র কন্যাদিগের বিবাহ দিয়া থাকেন। যখন পুত্র কন্যার বিবাহ হয়, তখন তাহারা বিবাহ কার্য্যকে এক প্রকার আমোদ বলিয়াই জানে। এইরূপ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষেরা যে বিবাহ দেন, তাহা কি বর কন্যার মোক্ষার্থ, না সংসারে প্রজাবৃদ্ধি করিয়া সমাজের হিত সাধনার্থ? না যাহারা বিবাহ করে, তাহারা জানিতে পারে যে, আমাদের পরিণয়-বন্ধন কেবল ধর্ম্মার্থ ও সমাজের হিতার্থ সম্পন্ন হইতেছে? কন্যা কতক কতক বুঝিতে পারেন যে তাহার পরিণয় দিয়া পিতা মাতা জাতি রক্ষা করিলেন, বরও জানিতে পারেন, তাহাকে গৃহী করিবার জন্য পিতা মাতা তাহার বিবাহ দিলেন।

আর একটী কথা আছে। আমাদের শাস্ত্রমতে স্ত্রী সহধর্ম্মিণী; তাঁহার একটী নামও সহধর্ম্মিণী। যাগ, যজ্ঞ, ব্রতাদি সস্ত্রীক হইয়া করিলে, তাহাতে অধিকতর পুণ্য সঞ্চয় হয়। কিন্তু কথা এই, সস্ত্রীক হইয়া না করিলে, কি তাহাতে কোন ফল লাভ নাই? যদি থাকে, তবে সেই সকল যাগ যজ্ঞাদির যে ফল, তাহা ব্রতী ব্যক্তি-মাত্রকেই স্বতন্ত্ররূপে অর্শে। স্ত্রী ব্যতীত কি যাগ যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে পারে না, এরূপ বিধি আছে? যদি থাকে, তবে আমরা দেখিতেছি সেই যাগ যজ্ঞাদির কাল অনেক দিন অতীত হইয়াছে। সুতরাং এখন বিবাহের আর সে উদ্দেশ্য হইতে পারে না। আর যদি স্ত্রী ব্যতীত যাগ যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইতে পারে, এবং তাহার স্বতন্ত্র ফললাভও থাকে, তবে স্ত্রীর সহিত সেই কার্য্য সম্পন্ন করিলে, এই মাত্র অধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় যে, আর একজনকেও তাহার ফলভোগী করা হইল। বিশেষতঃ যে স্থলে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে স্বামীর অধীন, তাহার স্বতন্ত্র অর্থ সামর্থ্য নাই, সে স্থলে যাগ যজ্ঞাদি করিবার সময় তাহাকে সহযোগিনী করিয়া না লইলে, তাহার আর কোনরূপে তদ্বিষয়ক পুণ্য সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা নাই? এই ব্যবস্থা, বোধ হয়, শুদ্ধ স্ত্রীর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য বিধানিত হইয়াছে। এ ব্যবস্থা দ্বারা বিবাহের উদ্দেশ্য নির্ণীত হইতেছে না; কিন্তু স্ত্রীর পারত্রিক মঙ্গলের উপায় বিধান করা হইয়াছে মাত্র। পাছে স্ত্রীর পারত্রিক মঙ্গল উপেক্ষিত হয়, তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু যখন সেই যাগ যজ্ঞাদির কাল বহুদিন অতীত হইয়াছে, তখন আর এ কথা লইয়া আলোচনা করা বৃথা।

যখন এই যাগ যজ্ঞাদি ছিল, তখন কি পরিণয়-কার্য্য শুদ্ধ যাগ যজ্ঞাদি সাধন করিবার জনাই সম্পন্ন হইত? আর যদি সেই উদ্দেশ্য হেতুই বিবাহ বিধানিত হইয়া থাকে, তবে তজ্জনা কর্ত্তৃপক্ষগণ কন্যা-নির্ব্বাচন কি করিবেন? অথবা তাহাদের হাতে কন্যা নির্ব্বাচনের ভার সমর্পিত থাকাতে কি অধিক ফল লাভ হইত? এ সমস্ত বিষয়ের বিচার না হইলে, সমালোচ্য প্রবন্ধের সার কথাগুলি স্থাপিত হইতে পারে না।

পূর্ব্বকালে হিন্দু বিবাহ-প্রণালী এক্ষণকার মত কেবল এক প্রকারে সম্পন্ন হইত না। মনুতে যাহা লিখিত আছে, তাহাই যদি কোন কালের ব্যবহার বলিয়া গণ্য হয়, তবে দেখা যাইতেছে পূর্ব্বকালে অষ্ট প্রকার বিবাহ-প্রণালী চলিত ছিল। এই সর্ব্ববিধ বিবাহ কি একই উদ্দেশ্যে সম্পন্ন হইত? যদি উদ্দেশ্য একই থাকে, তবে তাহাদের প্রণালী এত বহুবিধ হইবে কেন? একই উদ্দেশ্য থাকিলে প্রণালীও এক হওয়া উচিত। কারণ, যখন উদ্দেশ্যই প্রধান লক্ষ্য হইবে, তখন একই সমাজে প্রণালী লইয়া এত প্রকার ভেদাভেদ থাকিবে কেন? যদ্দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেই প্রণালী মাত্র গ্রহণীয়। এই সমস্ত প্রণালী ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা বিদ্যমান ছিল, তখন তাহাদের সমস্তেরই উদ্দেশ্য যে একমাত্র ছিল, তাহা প্রদর্শন করা আবশ্যক। এই জন্য বলিতেছি, আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিচার করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা উচিত।

চন্দ্রনাথ বাবু বলেন, হিন্দুবিবাহ শুদ্ধ চুক্তি (contract) নহে। এক্ষণে কি ইহা শুদ্ধ চুক্তিতে পরিণত হয় নাই। হিন্দুবিবাহ-প্রণালী এক প্রকার আশ্চর্য্য রকম চুক্তি। এই চুক্তিতে হিন্দুনারী চিরকালের জন্য একমাত্র স্বামীতে বদ্ধ, কিন্তু হিন্দুপুরুষ সেরূপ নহেন। তিনি ইচ্ছা করিলে, এক সহধর্ম্মিণী সত্ত্বেও বহু নারীর পাণি-গ্রহণ করিতে পারেন। হিন্দনারী যে স্বামীতে চিরকালের জন্য বদ্ধ, যাহার পরলোক প্রাপ্তি হইলেও তাহার পক্ষান্তর গ্রহণ করিবার যো নাই, সেই স্বামী ইচ্ছা করিলে, সেই স্ত্রীতে আবদ্ধ না থাকিতেও পারেন। এতদপেক্ষা অন্যায় চুক্তি আর কি হইতে পারে? যদি হিন্দু বিবাহের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুশাস্ত্রে বহুবিবাহের ব্যবস্থা কেন বিধানিত হইয়াছে? একমাত্র স্ত্রী দ্বারা কি বিবাহের ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না? যখন এক স্ত্রী বর্ত্তমানে বহুবিবাহের ব্যবস্থা রহিয়াছে, তখন অবশ্য বলিতে হইবে, হিন্দুবিবাহের উদ্দেশ্য শুদ্ধ পারত্রিক মঙ্গল, ধর্ম্ম, এবং মোক্ষ নহে, ঐহিক সুখ, অর্থ এবং কামনাও অন্যতর উদ্দেশ্য। যদি অর্থ ও কামনা অন্যতর উদ্দেশ্য হয়, তবে সে উদ্দেশ্য কর্ত্তৃপক্ষের

হাতে কন্যা-নির্ব্বাচন কার্য্য মাত্র থাকিলে, কিরূপে সুসিদ্ধ হইতে পারে? যদি আত্মসুখের জন্য বিবাহ হয়, তবে পরে আমার সুখ কি বুঝিবেন?

উপরে হিন্দু-বিবাহপ্রণালীর যেরূপ পর্য্যালোচনা হইল, তাহা হইতে প্রতীতি হইতেছে যে, ভারতে আর্য্যজাতির আদিম অবস্থায় যখন আর্য্যজাতি বিস্তৃত হয়েন নাই, যখন তাঁহাদের লোক-সংখ্যা অধিক ছিল না, যখন আর্য্যজাতির জীবন ধর্ম্মময় ছিল, যখন তাঁহারা চারি আশ্রমের নিয়ম পালন করিতেন, যখন তাঁহারা সকল কার্য্যই ধর্ম্ম-উদ্দেশ্যেই করিতেন, তখন তাঁহাদের পরিণয়-কার্য্যের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কেবল সাধু ও ধর্ম্মভাবে সমগ্র জাতি পরিচালিত হইতে পারে না। ইহা মনুষ্য-স্বভাব-বিরুদ্ধ। একটি জাতির সকলেই ধর্ম্মপথে থাকিতে পারে না। এ নিয়ম হিন্দুজাতি-মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুজাতি ক্রমশ যেমন বহুল বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, যেমন বংশবৃদ্ধি-পরম্পরায় আর্য্যজাতি ভারতের চারি দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন, যখন তাঁহারা ক্রমশ একটি বৃহৎ জাতি হইয়া পড়িলেন, তখন সেই সমগ্র জাতি ধর্ম্মের কঠিন নিয়মে চলিত না। মানব প্রকৃতির শৈথিল্য ঘটিল। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব ক্রমশ দেখা দিল। তাহা প্রথমে যেরূপ ঘোর ধর্ম্মশাসনে ছিল, সে ধর্ম্মশাসনের ক্রমে ক্রমে শৈথিল্য জন্মিল। মানব-প্রকৃতি স্বভাবতঃ যেরূপ ভাল মন্দে মিশ্রিত, ক্রমশ সেই ভাল মন্দ উভয়েরই প্রাধান্য জন্মিল। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক বল প্রকাশিত হইল। তখন হিন্দুজাতি অন্যান্য জাতির ন্যায় মানবজাতি-রূপে পরিদৃশ্যমান হইলেন। তখন তাঁহারা আর দেবজাতি রহিলেন না। ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য তখন তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইল না। মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবল ক্ষুধা তৃষ্ণা-সকল সন্তৃপ্তির জন্য ব্যাকুলিত হইল। হিন্দুজাতি তখন দেবত্ব হইতে মানবত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের রিপু ও ইচ্ছা সকল প্রবল হইল। কত দিন আর সে রিপু ও ইচ্ছা সকল দমিত থাকিবে? একটি সমগ্র জাতির সকল লোকে সেরূপ কঠিন দমনে থাকিবে কেন? যখন ভারতে হিন্দুজাতির এই ভাব, তখন তাঁহাদের শাস্ত্রও সেই ভাবে গঠিত হইতে লাগিল। তখন বিবাহও অষ্টবিধ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি বিবাহপ্রণালী প্রচলিত হইল। এই সমস্ত বিবাহ-প্রণালীতে কেবল পাশব ইচ্ছা প্রবল হইতে দেখা যায়। অর্থ ও কামনা অনেক বিবাহের উদ্দেশ্য হইল। পূর্ব্বকার ধর্ম্মভাব ক্রমে তিরোহিত হইল। যে স্বাভাবিক ও মূল কারণ বশতঃ বিবাহ-প্রথা হিন্দু ভিন্ন অপর সর্ব্ববিধ মানব-জাতি মধ্যে প্রচলিত, হিন্দুবিবাহও তখন সেই সমস্ত স্বাভাবিক ও মূল কারণের কার্য্যকারক হইল। সেই কাল হইতে

হিন্দুবিবাহও এক বিশেষ মানব জাতির একটি স্বাভাবিক অভাব পূরণের দ্বার স্বরূপ হইয়াছে মাত্র। আমরা মনুর সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বেও হিন্দুবিবাহের এই ভাব দেখিতে পাই। সেই কাল হইতে হিন্দুবিবাহের ভাব ও গতি এক রূপই রহিয়াছে। বরং বহুবিবাহ প্রণালীতে, হিন্দু বিবাহের তামসিক ভাব অধিকতর প্রবল মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে; এত দূর হইয়াছে যে, ইহা অনেক সভ্যজাতির বিবাহ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে।

এক্ষণে আমরা প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ গ্রহণ করিলাম। আমরা প্রথমাংশের সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেখিয়াছি, তাহা শাস্ত্রানুযায়ী দেশের আচার ব্যবহার দ্বারা স্থাপিত হইতে পারে না। প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশও তদ্রূপ দেখাইতে চাই। আমাদের যদি ঠিক স্মরণ থাকে, তাহা হইলে প্রবন্ধের শেষাংশের সার কথা গুলির মর্ম্ম এই রূপ :—

হিন্দুবিবাহে কন্যাদান ঘটি বাটি দানের ন্যায় হইয়া থাকে। দান একবার মাত্র শাস্ত্র সঙ্গত। দান কালে ঘটি বাটির মত কন্যা সামান্য সামগ্রী থাকে বটে, কিন্তু বৈবাহিক মন্ত্র বলে সেই কন্যা দেবত্ব পায়। এ দেশে ভার্য্যা দেবী রূপে পূজিত, ব্যবহৃত, এবং উপহৃত হয়েন। ইউরোপীয়েরা যে বলেন, প্রাচ্য দেশে নারীজাতির অবস্থা—দাসীর অবস্থা, পশুর অবস্থা, অথবা অতি হেয়, একথা ভ্রান্তিমূলক। ইউরোপের সাম্যবাদ-মূলক বিবাহপ্রণালী তামসিক ভাবে পরিপূর্ণ, সেই বিবাহপ্রণালী অপেক্ষা এতদ্দেশীয় বিবাহ প্রণালী অনেক শ্রেষ্ঠ। তজ্জন্য সাম্যবাদ এদেশে প্রচলিত হওয়া উচিত নহে। ইংরাজগণের বিবাহ প্রণালীতে একটী বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয়, সেজন্য তাহা অগ্রাহ্য এবং হিন্দু বিবাহ-প্রণালী শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয়। এই সার কথা গুলিতে চন্দ্রবাবু যে তাহার কতিপয় নিজ সিদ্ধান্ত দিয়াছেন, আমরা দেখাইতে চাই, সে সকলই অপসিদ্ধান্ত।

তিনি বলিয়াছেন যে, বৈবাহিক মন্ত্রের অলৌকিক বলে হিন্দুভার্য্যা দেবতাস্থানীয় হয়েন। একথা কি সত্য? বাস্তবিক কি আমাদের ধর্ম্মে ও আচার-ব্যবহারে হিন্দুভার্য্যা স্বামীর দেবতা-স্থানীয়? চন্দ্রবাবু এ কথার যাথার্থ্য স্থাপনার্থে একটী শাস্ত্রোক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা দেখাইতে পারি যে, যদি এ পক্ষ স্থাপনার্থ দুই চারিটী শ্লোক থাকে, তদ্বিপরীত পক্ষ সমর্থনার্থ বিশ পঞ্চাশটি শ্লোক আছে।

হিন্দুভার্য্যা স্বামীর দেবসম্মানযোগ্য, না হিন্দু স্বামী তাহার ভার্য্যার দেবস্থানীয়? হিন্দু স্বামী ভার্য্যার শুদ্ধ দেবস্থানীয় নহেন, দেবতা অপেক্ষাও অধিক। যেখানে দেবতা ও স্বামী বর্ত্তমান, সেখানে হিন্দু ভার্য্যার নিকট অগ্রে স্বামীর পূজা বিধেয়, তৎপরে দেবতার

পূজা। হিন্দুভার্য্যার যে ব্রত স্বামীর পাদপূজা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ব্রত। আমাদের দেশের আচার-পদ্ধতিতে বাস্তবিক কে কাহার দেবসম্মানভাজন হইয়াছেন? এই চলিত আচার পদ্ধতি যদি হিন্দু শাস্ত্র-সঙ্গত হয়, তবে হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি পরিষ্কার হইতে পারে? হিন্দু আচার পদ্ধতিতে ভার্য্যাকে কি বাস্তবিক তাঁহার স্বামীর সেবিকা ও দাসীরূপে পরিণত করে নাই? যে ভার্য্যা স্বামীর সব দাস্য কার্য্যে নিযুক্ত না হন, তিনি কি ভদ্র-সমাজে নিন্দনীয় হয়েন না? তাঁহাকে কি স্বামী যথোপযুক্ত শাসনবলে আপনার সেবা শুশ্রূষায় নিয়োজিত করাইতে পারেন না না করেন না? যে ভার্য্যা আপনি স্বামীর পদপূজা না করিবেন, স্বামী মনে করিলে, তাহাকে সেইরূপ করাইতে পারেন। আর স্বামী যে ভার্য্যাকে চিরকাল নিতান্ত অনুগত সেবিকা ও দাসীরূপে দেখিয়া আসিয়াছেন, সেই ভার্য্যাকে স্বামী কিরূপে দেবসম্মান দিতে পারেন? যে ভার্য্যা বাস্তবিকই দাসী ও পদলগ্ন সেবিকা, মন্ত্রবলে তাঁহাকে কিরূপে দেবস্থানীয় করিতে পারে আমরা বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রে আদেশ করিলে কি হইবে স্বামীর যে মন ভার্য্যাকে প্রতিদিন দাসীভাবে দেখিতেছে, সেই মন আদেশ ক্রমে সেই ভার্য্যাকে কি দেবতা জ্ঞান করিতে পারে? ইহা যদি সম্ভব হয়, তবে একদিন আদেশ ক্রমে গঙ্গার তরঙ্গকেও বিপরীত দিকে ফিরান সম্ভব হইতে পারে। লোকে গুণে এবং পদে অপরের সম্মান ভাজন হয়েন। ভার্য্যার গুণ সকল সেবিকার গুণ, ভার্য্যার পদ দাসীর পদ। তবে তিনি কিরূপে স্বামীর সম্মান আকর্ষণ করিতে পারেন? ভার্য্যা গুণবতী হইতে পারেন, কিন্তু স্বামী কেন সকল ধর্ম্মকে ভার্য্যার দেবগুণ বলিবেন? স্বামীর চক্ষে ভার্য্যার সেই সকল ধর্ম্মই দেব-গুণ, যে সমস্ত ধর্ম্ম পতিপ্রাণা সেবিকার উপযোগী। গুণবতী ভার্য্যার অর্থ সহিষ্ণু, সুশীলা, পতিপরায়ণা, সতী। পতিপরায়ণতাই ভার্য্যার প্রধান গুণ। আমরা যদি ভার্য্যাকে পূজা করি, তাঁহার পতিপরায়ণতার পূজা করি। পূজা বস্তুতঃ করি না, আদর করি মাত্র। পতিপরায়ণা ভার্য্যাকে গৃহলক্ষ্মী বলিয়া তাঁহার সমাদর বাড়াই, তাঁহার প্রশংসা করি, এইরূপ সাধুবাদ দিয়া তাঁহার আনুগত্যের পুরস্কার দিই। এইরূপ সাধুবাদ দিই কি জন্য? তাঁহার নিকট হইতে অধিক সেবা লইবার জন্য। এইরূপ প্রশংসার দিকে আমরা নারীজাতির মন আকৃষ্ট করি। বাহবা দিয়া তাহার নিকট হইতে সেবা লই। এই প্রকার যাহা যদি দেব-সম্মান হয় তবে অবশ্য বলিব, হিন্দু-ভার্য্যা দেবতাস্থানীয়। আপনার কাজ লইবার জন্য যদি দুই দশটা বাকা মিষ্ট কথা বলিয়া সন্তোষোৎপাদনের নাম দেব-সম্মান হয়, তবে অবশ্য বলিব, আমরা ভার্য্যাকে দেব-সম্মান করি। হিন্দু ভার্য্যা তাহার স্বামীর এই অর্থে দেবতাস্থানীয়। কিন্তু চন্দ্র বাবু শুদ্ধ এই স্থানে থামেন নাই। তিনি আরও বলেন, যিনি ভার্য্যাকে দেবতা জ্ঞান করেন, তিনি নিজে দেবতা। কারণ, যিনি সীতা গড়িয়াছিলেন তিনি বাল্মীকি। যিনি সীতাকে দেবোপম জ্ঞান করিতেন তিনি রামচন্দ্র। এক্ষণে দেখুন, সীতার কি গুণে তিনি দেবস্থানীয় হইয়াছিলেন? সীতার ধীরতা ও অমানুষী পতিপরায়ণতাই সীতাকে দেবতা করিয়াছিল। আমরাও

বলি, আমরা সীতার মত ভার্য্যা পাইলে তাঁহাকে বাল্মিকির ন্যায় সহস্র বার 'দেবী বাক্যে' সম্মান করি। আমরা সেরূপ ভার্য্যার সম্মান করিয়া নিজে দেবতা হইতে পারি; এবং ভার্য্যার অবর্ত্তমানে সোণার সীতার মত সোণার ভার্য্যা গড়িয়া রাখি। কিন্তু তলাইয়া দেখিতে গেলে, এ কথার অর্থ কি দাঁড়ায়? যখন আমরা এরূপ ভার্য্যার সম্মান করি, তখন আমরা সে ভার্য্যাকে সম্মান করিতেছি না, প্রকৃতঃ আমরা আপনারই সম্মান করিতেছি। আর স্বামী যদি পতিপরায়ণা ভার্য্যাকে সম্মান করিয়া দেবস্থানীয় হয়েন, তবে অবশ্য বলিব, ঘোর স্বার্থপরতা দেবগুণ। চন্দ্রনাথ বাবু স্বার্থপরতাকে দেবগুণ বলিতে কি প্রস্তুত আছেন?

নিজে মনুই কি নারীজাতিকে সম্মান-ভাজন জ্ঞান করেন? তিনি অনেক স্থলে নারীজাতির নিন্দা করিয়াছেন। একথা প্রতিপন্ন করিতে আমরা প্রস্তুত আছি।

ইউরোপীয়গণ, আমাদের শাস্ত্রের এক কোণে কি একটি আদেশ অথবা উক্তি আছে, তাহা দেখেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে নারীজাতির প্রকৃত অবস্থা দেখিয়াছেন, এবং লোকের মুখে সেই নারীজাতির বিবরণও শুনিয়াছেন। প্রকৃত ক্ষেত্রে নারীজাতির যে অবস্থা প্রতীত হইয়াছে, তাঁহারা তাহাদিগকে সেই রূপই বর্ণনা করিয়াছেন। এদেশে প্রকৃত ক্ষেত্রে নারীজাতির অবস্থা যে অত্যন্ত হেয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই স্বীকার করিবেন। আমরা কিছু এমত বলি না যে, ইউরোপে নারীজাতির অবস্থা দেবোপম। তবে সেখানে যে নারীজাতির অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহার আর সন্দেহ নাই। আর যদি ইউরোপীয়গণকে শাস্ত্রোক্তি দেখাইয়া তাহাদের কথা প্রতিপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলেও তাঁহাদের উক্তি অযথার্থ বলিয়া প্রতীত হইবে না। সে উক্তির প্রতিপোষক-বাক্য হিন্দুশাস্ত্রে প্রচুর প্রমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চন্দ্রবাবু সাম্যবাদের বিরোধী কেন, আমরা বুঝিতে পারি না। অথবা বোধ হয় তিনি শুদ্ধ নারীজাতির প্রতি সাম্যভাব প্রযুক্ত করিতে ইচ্ছুক নহেন। তিনি কি এদেশে পুরুষজাতির প্রতিও সাম্যবাদ নিষিদ্ধ জ্ঞান করেন? তিনি কি সাম্যবাদী হইয়া ইংরাজের সঙ্গে আমাদের স্বত্ব ও অধিকারের জন্য আন্তরিক ইচ্ছার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবেন না? তিনি প্রজার পক্ষ হইয়া জমিদারের সঙ্গে তাঁহার স্বত্ব ও অধিকারের জন্য বিরোধ উপস্থিত করিবেন না? তিনি কি পুরুষজাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক স্বত্বের জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন না? বোধ হয়, হইবেন। তবে তিনি স্ত্রীজাতির সম্বন্ধে সাম্যবাদী নহেন কেন? বোধ হয়, তাহার কোন গূঢ় অর্থ আছে। স্ত্রীজাতি-সম্বন্ধে সাম্যবাদী হইতে গেলে, পুরুষজাতিরই ক্ষতি। যে স্থলে আপনার ক্ষতি, বহুকালের সাধের প্রভুত্বের ক্ষতি, আপনার সেবা শুশ্রূষার ক্ষতি, সে স্থলে সাম্যবাদী হওয়া লাভ কি? যদি এই স্বার্থপরতার জন্য সাম্যবাদ পরিত্যাজ্য হয়, তবে চন্দ্রবাবুর সেই কথা খুলিয়া বলা উচিত ছিল। তাহা হইলে আমরা তাঁহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিতাম।

আমাদের হিন্দু ভার্য্যা যেরূপ দেবতা, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। সেই দেবতার পরিতোষার্থ আমরা তাহাকে সকল দ্রব্যই উপহার দিই।

আমরা যেমন গৃহে পশু পক্ষী পুষিলে, কতক মায়া বশতঃ কতক ভালবাসা বশতঃ কতক নিজ ইচ্ছা পরিতোষার্থ সেই পোষা পশু ও পাখীর রক্ষার্থ এবং শোভনার্থ নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও অলঙ্কার দিই, আমরা আমাদের ভার্য্যাকেও তাহাই দিয়া থাকি। বরং তদপেক্ষা আরও অধিক দিই। এত অধিক দিবার কারণও আছে। যেহেতু, ভার্য্যাকে বহুমূল্য দ্রব্য দেওয়াতেই আপনারই মান বৃদ্ধি হয়; এবং তাহাকে বহুমূল্য দ্রব্য দেওয়াও যাহা, আপনার সিন্দুকে সেই সকল দ্রব্য তুলিয়া রাখাও তাহা। তবে এই সকল দানে যে স্নেহ মমতা আছে, তাহা আমরা জানি। আমরা ভার্য্যাকে সকলই দিই বটে, এবং কিছুই অদেয় বিবেচনা করি না বটে, কিন্তু কতক্ষণ? যতক্ষণ ভার্য্যা আমাদের অনুগত সেবাদাসী। আমরা এরূপ ভার্য্যার যাহা পাওনা গণ্ডা তাহা দিই, কিন্তু তদতিরিক্ত কিছুই দিই না। নারীজাতির যে সকল প্রকৃত অধিকার ও স্বত্ব তাহা দিই না, মানবজাতির যাহা ন্যায্য অধিকার, তাহাতে নারীজাতিকে বঞ্চিত রাখিয়াছি। সাম্যবাদ ইহা চায় না। সাম্যবাদ বলে, ও কি মন মন ভুলাইবার জন্য তুমি নারীজাতিকে কতকগুলি বৃথা চাকচিক্য দ্রব্য দিতেছ? উহা ত নারীজাতির প্রকৃত অভাব নহে? নারীজাতির যাহা প্রকৃত অভাব, যাহা মানবপ্রকৃতির অভাব, যাহা মানবপ্রকৃতির ক্ষুধা ও তৃষ্ণা, সেই সমস্ত স্বাভাবিক ক্ষুধা তৃষ্ণা কি তুমি নিবারণ করিতেছ? তুমি সকলই দেও বটে, কিন্তু নারীর যাহা প্রকৃত অভাব, তাহা দেও না। নারীজাতির সকল স্বত্ব ও অধিকার দেও না। তাঁহাদের জ্ঞান-ক্ষুধা সম্যক নিবারণ কর না। তাঁহাদের স্বাধীনতার প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর না। তাঁহারা যে সকল তৃষ্ণায় অন্তরে অন্তরে কাতর, সে সকল তৃষ্ণায় জল দান কর না। তাঁহারা যে সকল জ্বালায় দিবা-নিশি ক্রন্দন করেন, সে সকল জ্বালায় শান্তিবারি দেও না। যে সকল অধিকারের অভাবে, তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে সে সকল অধিকার দেও না। তাঁহারা যে সকল দুঃখ সন্তাপ স্বজাতির মধ্যে পরস্পরে গোপনে গোপনে জ্ঞাপন করেন, সে সকল দুঃখ সন্তাপ তোমার হয় তো কখন শ্রবণ-গোচরও হয় না; যদি হয়, তাহাতে তোমার হৃদয় ভিজে না। তাঁহাদের দুঃখ-কাহিনী তাঁহারা পরস্পর বলিয়া হৃদয় সন্তাপ দূর করেন। সাম্যবাদ এই দুঃখে শান্তি-বারি প্রদান করিতে উদ্যত।

আমরা ভার্য্যাকে শুষ্ক মুখে দেবতা বলিলে কি হইবে? তিনি কি বাস্তবিক দেবতা? শুষ্ক দেবতা বলিয়া তাঁহাকে কল্পনা করিলে কি হইবে, তিনি কি কল্পনার অনুমত সামগ্রী? যিনি বাস্তবিক যাহা নহেন তাঁহাকে সে কল্পনায় ভূষিত করা মিথ্যাদৃষ্টি মাত্র। কিন্তু যাহা কাল্পনিক তাহাও একদা সুসিদ্ধ হইতে পারে। এখন যাহা মিথ্যা দৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও সত্য হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রের দেবীকে বাস্তবিক দেবো-চিত করা যাইতে পারে। যে দেবী হিন্দু শাস্ত্রে কল্পনা করিবে মাত্র, সেই দেবী সাম্যবাদ গড়িতে পারিবে। হিন্দু শাস্ত্রের দেবী কেবল হিন্দু স্বামীর নিকট দেবী, সাম্যবাদীর দেবী সমগ্র জগতের আরাধ্যা।

পতিপরায়ণতা গুণে হিন্দুভার্য্যা দেবী পদে অভিষিক্ত হন, কিন্তু মানব প্রকৃতির সমস্ত দেবভাবে সম্পন্ন ও অভিব্যক্ত হইয়া সাম্যবাদের নারী প্রকৃত দেবস্থান

অধিকার করিবেন। সাম্যবাদ নারীকে তাহার স্বাভাবিক অবস্থা দিয়া, তাহার সকল অধিকার ও স্বত্ব দিয়া, তাহাকে সুশিক্ষিতা করিয়া তাহার প্রকৃতির সকল গুণের বিস্ফুরণ ও সম্যক্ বিকাশ করিতে চায়। সাম্যবাদ বলে, স্বাধীন ক্ষেত্র ও সুশিক্ষা নহিলে মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রীড়া ও সম্প্রসারণ হয় না। মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক ক্রীড়া ও সম্প্রসারণ না হইলে সেই প্রকৃতির দেবভাব স্ফুটিত হয় না। নারীজাতীয় মানব-প্রকৃতি মধ্যে যে দেবভাব আছে, সাম্যবাদ সেই দেবভাবের আবির্ভাব করাইয়া মানবকে দেব পদে উন্নোলিত করিতে চাহে। এই সাম্যবাদের ধ্বনি ইউরোপেও আজিও সম্যক্ প্রবল হয় নাই। সেই জন্য ইউরোপেও আজিও নারীজাতির অবস্থা অনেক পরিমাণে হীন রহিয়াছে। ইউরোপে সাম্যবাদের ধ্বনি সবে মাত্র প্রবল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সাম্যবাদ ইউরোপে এক্ষণে ঘোর সামাজিক আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছে। শুদ্ধ নারীজাতির নহে, পুরুষ জাতির পক্ষ হইয়াও সাম্যবাদ ঘোর গণ্ডগোল উপস্থিত করিয়াছে। জানি না এ তরঙ্গ কোথায় গিয়া থামিবে। অথবা এ তরঙ্গ কখন থামিতে পারে কি না, তাহাই সন্দেহ। পুরুষ পক্ষ হইয়া সাম্যবাদ যে সামাজিক আন্দোলন উত্থাপিত করিয়াছে, চন্দ্রবাবুর বোধ হয় তৎপক্ষে সহানুভূতি থাকিতে পারে। তবে যে স্ত্রীজাতি পক্ষে সাম্যবাদ প্রয়োগে তিনি কেন বিদ্বেষী হইবেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত পক্ষে নারীজাতিকে দেবতাস্থানীয় করিতে চান, তবে তিনি সাম্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করুন। অসাম্যবাদে নারীজাতি কে কিরূপে দেবতা হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

যিনি বাস্তবিক যাহা, সাম্যবাদ তাঁহাকে সেই রূপই জ্ঞান করিতে পারে; তদ্ভিন্ন অন্যরূপ জ্ঞান করা সাম্যবাদের কার্য্য নহে। যাহা যে রূপ, তাহাকে বিসদৃশ করা সাম্যবাদ নহে। মানবকে সাম্যবাদ মানবরূপ দেখিতে চাহে। মানব যেরূপ দেবতা হয়, সাম্যবাদ মানবকে সেইরূপ দেবতা করিতে চাহে। মানব-সমাজের যে সকল আচার ব্যবহার, তাহা মানব প্রকৃতিরই অনুরূপ হইবে। সে আচার ব্যবহার যদি মানব প্রকৃতির অনুসারী না হয়, তবে তাহা তিষ্ঠিবে না। যাহা দেবাচার ও দেব ব্যবহার, তাহা মানব-প্রকৃতির যোগ্য হইতে হইলে, তাহাতে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক ভাব প্রবিষ্ট করা চাই। দেবাচার মানব-সমাজে প্রবর্ত্ত করিলে, ক্রমে আচার মধ্যে ক্রম মানুষীভাব প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে। মানুষীভাব সম্পন্ন না হইলে মানব-সমাজে কিছুই চলে না। হিন্দু বিবাহে কেমন মানুষীভাব ক্রমশঃ প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। মানব-সমাজের অন্যান্য ভাগে বিবাহ-প্রথা যে রূপ স্বাভাবিক ভাবে প্রচলিত আছে, হিন্দু বিবাহও যে ক্রমশঃ সেই আকারে পরিণত হইয়াছে তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যদি ইহার ধর্ম্ম-উদ্দেশ্য কখন ছিল, সেই ধর্ম্ম উদ্দেশ্য বিরহিত হইয়া, ইহা ক্রমে হিন্দু সমাজে কেমন মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি সমুদায়ের অনুযায়ী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। এই রূপ ঘটিবেই ঘটিবে। কারণ, যাহা সমুদায় মানব-প্রকৃতিতে খাটে না তাহা মানবজাতি গ্রহণ করে না; যদি গ্রহণ করে, তাহাকে সমগ্র প্রকৃতি

অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। হিন্দু-বিবাহ প্রণালীকেও হিন্দুজাতি সেইরূপ গড়িয়া লইয়াছে। হিন্দু বিবাহ যদি কখন শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবে স্থাপিত হইয়া থাকে, সেই বিবাহে ক্রমশঃ প্রকৃতির তামসিক ভাব সকলও প্রবেশ করিয়াছে। এখন বিবাহে শুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাব নাই, উহাতে তামসিক ভাবও মিশ্রিত হইয়াছে। চন্দ্র নাথ বাবু যদি একথা বলেন যে, সেই বিবাহ নীতি যে রূপই হউক না কেন, তাহার উদ্দেশ্য ধর্ম্ম রাখা উচিত। রাখুন, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? সে উদ্দেশ্য কোথায় গিয়া দাঁড়ায়? সে উদ্দেশ্য কোথায় যে তিরোহিত হয় হিন্দুসমাজ তাহা দেখাইয়াছে। পরীক্ষায় যে ফল লাভ হইয়াছে, সেই ফলই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহার উপর আর বাক্যব্যয় চলে না।

চন্দ্র বাবু বলেন, দান একবার বই দুই বার শাস্ত্রসম্মত নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের শাস্ত্র সকল রকমই আছে। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ কেমন সুপ্রচলিত ছিল, তাহা বিদ্যাসাগর মহাশয় দেখাইয়াছেন। কোন কোন বিধবা-বিবাহে কি দ্বিতীয়বার দান গ্রহণ হয় নাই? যদি হইয়া থাকে তবে কি তাহা শাস্ত্র সঙ্গত হয় নাই? দুই বার দান নিষিদ্ধ বলিয়া যদি চন্দ্র বাবু বলেন, বিধবা-বিবাহও রহিত থাকা উচিত; তাহা পুনর্জ্জীবিত করা উচিত নহে, তবে তিনি তাহা কোন্ যুক্তি অনুসারে বলিবেন, বলুন।

চন্দ্র বাবু বলিয়াছেন, ইংরাজি বিবাহ প্রণালীর দ্বিবিধ দোষ আছে। কিন্তু তাহার দোষ আছে বলিয়া যে আমাদের বিবাহ-প্রণালী নির্দোষ, পবিত্র ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহপ্রণালী হইবে, একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। যদি এই যুক্তি স্থির হয়, তবে আবার এই যুক্তি অনুসারেই ইংরাজী বিবাহপ্রণালী নির্দোষ, পবিত্র, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবাহপ্রণালী হইয়া পড়ে। কারণ, আমরা যদি দেখাইতে পারি যে, আমাদের বিবাহপ্রণালীতে বহুবিধ দোষ আছে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে ইংরাজী প্রণালী ভাল। কিন্তু সার কথা এই, মানবের কোন ব্যবস্থাই দোষ শূন্য নহে; অথবা সকল উত্তম সামগ্রীরই অপব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু অপব্যবহার হইতে পারে, অথবা হয় বলিয়া যে সেই সামগ্রী উত্তম নহে একথা বলা যুক্তি বিরুদ্ধ। তবে যদি দোষ বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে যাহার অধিক দোষ, তাহাই পরিত্যাজ্য, যাহার অল্প দোষ তাহাই গ্রহণীয়। এখন দেখিতে হইবে, হিন্দু প্রণালীর দোষ অধিক, কি ইংরাজী প্রণালীর দোষ অধিক? যদি এরূপ বিচার করিয়া একের শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইত, তাহা হইলে চন্দ্রবাবুর কথা তত যুক্তিবিরুদ্ধ হইত না। কিন্তু তিনি যে যুক্তিপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে যেন শুদ্ধ ইংরাজী প্রণালীর ছিদ্র অন্বেষণ করাই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়। তাহাই যদি হয়, তবে আমরা বলিব, মহাত্মন, অগ্রে আপনার ছিদ্র দেখুন, পরে অন্যের ছিদ্র দেখিতে যাইবেন। পরের দোষ দেখাইয়া আপনার গৌরব-বৃদ্ধি হয় না। আপনাকে নির্দোষী ও পবিত্র করিতে পারিলেই আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়।

শ্রী শ—

বঙ্গবামার সামাজিক অবস্থা।

ইংরাজ, ফরাসী ও আমেরিকাবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব দেশীয়া মহিলাবৃন্দকে পুরুষজাতির সহিত সমান স্বাধীনতা ও সমান অধিকার দিবার নিমিত্ত বিশিষ্টরূপ চেষ্টা ও আন্দোলন করিতেছেন; এবং আমাদের দেশেরও কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, নারীগণ চিরদিন পুরুষের অধীনে থাকিবে কেন? পুরুষেরা যাহা করে, সে সমস্ত কার্য্য স্ত্রীলোকেরা করিতে পারিবে না কেন? কেন মনুষ্যজাতির অর্দ্ধভাগ অপরার্দ্ধভাগের তাঁবেদারী করিবে? ইহার উত্তরে আমরা বলি যে, যে কারণে স্ত্রীজাতিকে পুরুষের অধীন হইতে হইয়াছে, সেই কারণেই তাহাদিগকে চিরদিন পুরুষের অধীনে থাকিতে হইবে। পুরুষের আকৃতি-প্রকৃতি স্ত্রীজাতির আকৃতি-প্রকৃতি হইতে অনেক অংশে বিভিন্ন এবং এই বিভিন্নতাই স্ত্রীপুরুষের সামাজিক অবস্থার তারতম্যের কারণ। পুরুষের বল স্ত্রীলোকের যদি থাকিত, পুরুষের সাহস ও দৃঢ়তা স্ত্রীলোকের যদি থাকিত, তাহা হইলে আদৌ স্ত্রীলোক পুরুষের অধীনতা স্বীকার করিত না। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ সর্ব্বত্রই প্রবল এবং দুর্ব্বল সহজেই বলবানের অধীন হইয়া পড়ে। এই হেতু লতা পাদপাশ্রয় গ্রহণ করে, এই জন্যই স্ত্রীলোক পুরুষের অধীন হইয়াছে। এবং এই জন্যই "সমাজচিন্তা"-প্রণেতা পূর্ণচন্দ্র বাবু পৃথিবীর ইতিবৃত্ত দেখিয়াছেন "পুরুষজাতি আবহমান কাল প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছে এবং নারীজাতি চিরকাল পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে।" এ নির্ভর ভাব নরনারী উভয়েরই মঙ্গলকর, সমাজের মঙ্গলকর এবং মঙ্গলময় ঈশ্বরের অভিপ্রেত। মিলের তর্কে, রমাবাইয়ের বাগ্মিতায় এবং এনিবেসান্টের কোলাহলে স্ত্রীজাতির এ পরাধীনতা কখনই ঘুচিবে না। প্রাকৃতিক নিয়ম কাহার সাধ্য অতিক্রম করে? রমণীগণ পুরুষাবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রা হইলে, পদে পদে তাহাদের বিপদ ঘটিবে। পাদপ হইতে লতা বিচ্যুত হইলে, তাহার কি আর সে শোভা থাকে, না সে জীবিতভাব থাকে? জীবিকার্জ্জন জন্য পুরুষের সহিত সমান খাটিতে হইলে, সমান কষ্ট স্বীকার করিতে হইলে, অল্পবলা কোমলা কামিনী কত দিন জীবিত থাকিবে? উদরান্নের জন্য প্রবল পুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে, নিশ্চয়ই নারীগণ খাইতে পাইবে না। বালক দুর্ব্বল, এই নিমিত্ত পিতামাতার অধীনে থাকা তাহার কর্ত্তব্য; পিতার কর্ত্তৃত্বে অবজ্ঞা করিলে, পিতার অবাধ্য হইলে পদে পদে

তাহার বিপদ। সেইরূপ স্বামীর প্রভুত্ব অবজ্ঞা করিলে, স্বামীর অবাধ্য হইলে অবলা নারীর পদে পদে বিপদ। যেমন হৃদয়হীন কর্ত্তব্যবিহীন পিতা মাতা আছে, সেইরূপ পিশাচোপম পাষণ্ড ভর্ত্তাও আছে, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু কোন কোন পিতা নিষ্ঠুর হয় বলিয়া কে বলিবে, বালকগণের পিতা মাতার অধীনে থাকা কর্ত্তব্য নহে? সেইরূপ কোন কোন স্বামী নিষ্ঠুর হয় বলিয়া, কোন্ বিবেচক লোক বলিবে যে স্বামীর উপর নির্ভর করিয়া থাকা বামাগণের কর্ত্তব্য নহে। স্নেহ যে অধীনতার বন্ধন-রজ্জু সে অধীনতাও কি পরাধীনতা? কেহ কেহ বলেন, বাঙ্গালী স্ত্রীকে ভালবাসে না, বাঙ্গালী স্ত্রীকে দাসীর ন্যায় জ্ঞান করে। আমরা বলি, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা; বাঙ্গালীর ন্যায় স্ত্রীপুত্রগত-প্রাণ আর কোন্ জাতি আছে? বাঙ্গালী স্ত্রীপুত্রের মায়ায় এতই আবদ্ধ যে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এক দিনের তরে স্থানান্তরে থাকিতে হইলে, তাঁহার দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। বাঙ্গালী শতসহস্র কষ্ট সহ্য করিতে পারে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা তাহার অসহ্য। এমন কোমলহৃদয় যে বাঙ্গালী—এমন স্নেহপূর্ণ যাহার প্রকৃতি, সেও কি কখন আপনার দেহার্দ্ধভাগ প্রাণের পত্নীকে দাসীর ন্যায় জ্ঞান করিতে পারে? স্ত্রী আমাদের ভাত রাঁধিয়া দেয়, পান সাজাইয়া দেয়, শয্যা প্রস্তুত করিয়া দেয়, আমাদের সন্তানগণকে লালনপালন করে বলিয়া স্ত্রী কি আমাদের দাসী হইল? স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের কার্য্য করে বলিয়া স্ত্রীলোক কি পুরুষের দাসী হইল? গৃহকার্য্য করা স্ত্রীলোকের যদি দাস্যবৃত্তি হয়, তাহা হইলে পুরুষের অবস্থা তাহাদের অপেক্ষা শতগুণ হীনতর বলিতে হইবে। স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রভু—ভর্ত্তা; কিন্তু সেই ভর্ত্তার উপর তাঁহার আবার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে। স্ত্রী যাহা হুকুম করিবে, পুরুষকে তৎক্ষণাৎ তাহা তামিল করিতে হইবে। নতুবা সংসার অচল, গৃহ অন্ধকার হইয়া উঠিবে। চাউল আনিয়া দাও খাইতে পাইবে, টাকা আনিয়া দাও সংসার চলিবে, অলঙ্কার না দাও শয়নাগার আগ্নেয় গিরি হইয়া দাঁড়াইবে। শুদ্ধ সহধর্ম্মিণীর গোলামী নয়—একমুটা খাইবার জন্য পুরুষকে সহস্র লোকের গোলামী করিতে হয়, সহস্র সহস্র বিঘ্নবিপত্তি অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র লাথি ঝাটা খাইয়া বর্ষার জলে, শীতের হিমে, গ্রীষ্মের রৌদ্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, তবে তিনি ঘরে আসিয়া রাঁধা ভাত ও সাজান পান পান; তাহাও আবার কোন দিন পান, কোন দিন নাও পান। পাওয়া না পাওয়া গৃহিণীর মেজাজের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। অতএব গৃহকার্য্য করা গৃহ-লক্ষ্মীদিগের দাস্যবৃত্তি নহে। সুসভ্যদেশেও গৃহকার্য্য নারীকে

দাস্যবৃত্তি বলে না। জার্ম্মণি দেশে যে রমণী রন্ধন করিতে এবং মিষ্টান্ন ও আচার প্রস্তুত করিতে না জানে, তাহার ভারি নিন্দা হয়। কোন কোন সময়ে এরূপ রমণীর বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠে।

দেখা গেল স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা একান্ত অস্বাভাবিক ও অনিষ্টকর। অনিষ্টকর বলিয়াই পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন "নস্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। অনিষ্টকর বলিয়াই মনু বিধান করিয়াছেন—

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ,
পাণিগ্রাহস্য যৌবনে।
পুত্রাণাং ভর্ত্তরি প্রেতে,
ন ভজেৎ স্ত্রী স্বতন্ত্রতাং॥"

স্ত্রীলোকদিগের যখন স্বাতন্ত্র্য নাই, স্ত্রীগণ যখন সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের উপর নির্ভর করে, তখন তাহাদের সুখসচ্ছন্দের প্রতি বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা পুরুষদিগের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। মনুও এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে সে সকল বচন এ স্থলে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তিনি বামাবৃন্দকে সর্ব্বদা সম্মান করিতে, সন্তুষ্ট রাখিতে ও সময়ে সময়ে পূজা করিতে বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, যে বংশে স্ত্রীগণ রোদন করে, সে বংশ উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। এ সকল শাস্ত্রোপদেশ সত্ত্বেও আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের দেশের অসংখ্য মহিলাগণ কতকগুলি দুষ্ট দেশাচার নিবন্ধন চির দুঃখে জীবনাতিপাত করিতেছেন, এই সকল দেশাচার সংশোধন করিয়া অবলাবৃন্দের দুঃখ মোচন করাই অবলাবন্ধুদিগের কর্ত্তব্য। নতুবা তাঁহাদিগকে ঘোমটা খুলাইয়া, পথ হাঁটাইয়া লইয়া বেড়াইলে এবং শ্বশুর, ভাসুর ও অপরিচিত ব্যক্তিদিগের সহিত একত্র বসাইয়া পানাহার করাইলে, তাঁহাদের কি সুখোন্নতি হইবে। সদ্বংশীয়া বঙ্গাঙ্গনারা এ প্রকার কার্য্যে ঘৃণা ও লজ্জা বোধ করেন। বস্তুতঃ স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণ কদাচ কল্যাণকর নহে। এই জন্য সকল সভ্যসমাজ হইতে উক্ত প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। স্ত্রীপুরুষ-সংমিশ্রণে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে সুফল ফলে নাই, যে পরিমাণে সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেই পরিমাণে অনিষ্ট উৎপাদিত হইয়াছে। সভ্যতম জার্ম্মণি প্রদেশে "বিবাহ বা খ্রীষ্টোৎসব ব্যতীত অন্য সময়ে স্ত্রী-পুরুষ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সকল উৎসবকালে ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলারা একত্র মিশ্রিত হন বটে, কিন্তু সেও বিশেষ সংযমের সহিত। পুরুষেরা এক দিকে বসিয়া কথোপকথন করেন এবং স্ত্রীলোকেরা দল বাঁধিয়া অন্য দিকে পরস্পর আলাপ করেন।" যে প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে, সে প্রথা পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য। বামাবৃন্দের প্রকৃত সুখোন্নতির

নিমিত্ত কি চেষ্টা করা হইয়াছে? স্ত্রী-শিক্ষার জন্য কি বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইয়াছে? স্ত্রীশিক্ষার ভার মিশনরীদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে কেন? স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ সাধারণে প্রচলিত না হইলে এবং বহু প্রমাদ-জনক বাল্যবিবাহ প্রথা উঠিয়া না গেলে, বামাবৃন্দের সুখোন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীশিক্ষা।

আমরা বাঙ্গালী, হিন্দুর চূড়ামণি, হিন্দুয়ানী আমরা যেমন বজায় রাখিয়াছি, এমন আর কোন জাতিই পারে নাই। আমরা শাস্ত্রানুসারে নাই, শাস্ত্রানুসারে খাই, শাস্ত্রানুসারে বস্ত্র পরি, শাস্ত্রানুসারে শয়ন করি। দেহত্যাগও আমাদের শাস্ত্রানুসারে করিতে হয়। শাস্ত্রে মুখাগ্নির ব্যবস্থা আছে বলিয়া প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময়ী জননী এবং প্রণয়িনী পত্নীর মুখে আমরা স্বহস্তে নুড়া জ্বালিয়া দিই, সংক্ষেপতঃ পদে পদে আমরা শাস্ত্রানুসারে চলি। কিন্তু "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ" শাস্ত্রের এ অনুজ্ঞাটি আমরা অগ্রাহ্য করিয়াছি কেন? কেন আমাদের কন্যাদিগকে বিদ্যাদানে পরাঙ্মুখ রহিয়াছি? যাঁহারা কালিদাসী কাব্যের অনাদর করিয়া জটিল নৈষধকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন; যাঁহারা কেবল মুগ্ধবোধ পাঠে মুগ্ধ হইয়া সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, যাঁহারা পাণিনির নাম কখনও শুনেন নাই এবং ব্রাহ্মণ হইয়া বেদ কখনও পড়েন নাই, যাঁহারা মনু, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্যের মত অগ্রাহ্য করিয়া স্মার্ত্তবাগীশের পূজা করিয়াছেন এবং যাঁহারা গঙ্গাযাত্রা অন্তর্জলি ও বিধবা নিপীড়নের অতীব বর্ব্বর ব্যবস্থাবলি প্রস্থাপিত করিয়াছেন, সেই কুশাগ্রীয়মতি মহামহোপাধ্যায় চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক মহোদয়গণ যখন আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের বিধাতা পুরুষ তখন আর বলিয়া দিতে হইবে কেন, যে কেন আমাদের শাস্ত্রের সদুপদেশ গুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং কেন আমরা আমাদের দুহিতাদিগকে বিদ্যাদানে পরাঙ্মুখ রহিয়াছি? বাচস্পতি মহাশয় বলিয়াছেন, কন্যাবিদ্যাবতী হইলে বিধবা হয়; অতএব কন্যাকে লেখা পড়া শিখাইতে আর কাহার সাহস হইবে?

স্ত্রীশিক্ষার অভাবে বঙ্গীয় সমাজ যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদের দরিদ্রতা, দুর্ব্বলতা, ভীরুতা ও নীচাশয়তা অনেক পরিমাণে আমাদের বামাবৃন্দের বিদ্যাবিহীনতা ও অজ্ঞানতার ফল। পূর্ব্বকালে কামিনীগণ নানা শাস্ত্র ও নানা কলা শিক্ষা করিতেন। গার্গী প্রভৃতি যশস্বিনী যোষাগণ বেদ বেদান্তেরও পারদর্শিনী ছিলেন —পূর্ব্বকালে ভারতের অবস্থাও ভাল ছিল। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়,

এক্ষণকার রমণীগণ ইতর পশুর সমান হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য মাত্রেরই যাহা জানা কর্ত্তব্য এবং যে সকল বিষয় স্ত্রীজাতির অবশ্য-জ্ঞাতব্য, সে সমস্ত বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা না দেওয়া যে কতদূর অন্যায় কার্য্য হইতেছে, তাহা বলা যায় না। ললনাগণ দুরূহ শাস্ত্র সকল ও উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানাদি শিক্ষা করেন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—উপায়, অবসর ও অভিলাষ থাকিলে, কেন তাঁহারা জ্ঞানবৃদ্ধি ও উপাধিলাভ করিবার জন্য যত্ন না করিবেন। কিন্তু সাধারণতঃ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার নিমিত্ত যে সকল বিষয় পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয় এবং ধাত্রীশিক্ষা, সূচীকার্য্য, পাকপ্রকরণ ও কিয়ৎ পরিমাণে উদ্ভিদ্বিদ্যায় তাঁহাদিগকে শিক্ষা দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই সকল বিষয় জানা থাকিলে, তাঁহারা সাংসারিক ব্যাপার সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের অবস্থারও বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধিত হইবে, অঙ্গনাগণ কলাবতী হইলে, বঙ্গে স্বর্গসুখ অনুভূত হইবে।

বিধবা-বিবাহ।

পঞ্চবিংশতি বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইল, পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বীজ বপন করিয়াছেন,আজিও কি তাহা অঙ্কুরিত হইল না? এই পঞ্চবিংশতি বৎসরেও যদ্যপি বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না হইল, তবে আর কবে হইবে? পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা প্রাচীন ও বিধবা-বিবাহের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা ত বহুকাল পরলোক গত হইয়াছেন। তখন যাঁহারা যুবা ও বিধবা-বিবাহের সাপক্ষ ছিলেন, তাঁহারা ত এক্ষণে প্রবীণ ও স্ব স্ব পরিবারের কর্ত্তা হইয়াছেন। তবে এখনও বিধবাবিবাহ চলিতেছে না কেন? এখনও যদি তাহা না চলিল, তবে আর কবে চলিবে?

কাগজে, নাটকে, পুস্তকে দেখিতে পাই বাঙ্গালী বড় স্বাধীনতা-প্রিয় হইয়াছে। বাঙ্গালীর ধর্ম্মনৈতিক সাহস খুব বাড়িয়াছে, কিন্তু কার্য্যে তাহার কি প্রমাণ পাইতেছি? আমরা যদি কদর্য্য দেশাচারের অধীনতা হইতে মুক্ত হইতে না পারিলাম, তবে আমাদের স্বাধীনতা-প্রিয়তার ফল কি? দুঃখিনী বিধবাদিগের বিবাহ না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য—ইহা জানিয়াও যদি সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলাম, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, আমাদের ধর্ম্মনৈতিক সাহস প্রবর্দ্ধিত হইয়াছে? তুমি বুড়াবয়সে তৃতীয় বার বিবাহ করিয়া ভার্য্যাকে নানালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রাজরাণী সাজাইয়া রাখিয়াছ; কিন্তু তোমার যুবতী বিধবা ভগ্নী দিবানিশি দীন বেশে দাস্যবৃত্তিতে নিযুক্ত রহিয়াছে, ইহাতে কি তোমার একটু লজ্জাবোধ হয় না? একটু

ঘৃণা হয় না? একটু ধর্ম্মভয় হয় না? এক বার চাহিয়া দেখ—তাহার কি দশা করিয়া রাখিয়াছ।

"মলিন বসনখানি অঙ্গে আচ্ছাদন,
"আহা দেখ অঙ্গে নাই অঙ্গের ভূষণ!
"রমণীর চিরসাধ চিকুর বন্ধন,
"আহা মরি সে সাধেও বিধিবিড়ম্বন।"

একাদশীর দিন তোমার বালিকা বিধবা কন্যা—পিপাসায় ছাতি ফাটিয়া গেলেও একটু জল খাইতে পায় না, তুমি কেমন করিয়া অন্নজল গ্রহণ কর? কেমন করিয়া লুচি পুরী ভক্ষণ কর? তখন তোমার হৃদয় কি ভরিয়া উঠে না তখন সেই বিবিধ উপকরণ তোমার কি কণ্ঠাবরোধ করে না?

বাঙ্গালি, তুমি না বড় হিন্দুয়ানীর গুমর কর? তুমি না সর্ব্বদা শাস্ত্রানুসারে চল? তুমি না বল যে, যে বাটীতে ভ্রূণ-হত্যা হয়, সে বাটী অপবিত্র হইয়া যায়? কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশ যে ঐ মহাপাতকে প্লাবিত হইয়া গেল—সমস্ত বঙ্গদেশ যে পতিত, অপবিত্র, কলঙ্কিত হইল—তাহার কি প্রতিকার করিতেছ? তোমাদের শাস্ত্রে না আছে যে, যে সংসারে রমণীগণ সর্ব্বদা রোদন করে, দেবতারা সে সংসারের প্রতি বিমুখ হন? কিন্তু তোমাদের প্রতি পরিবারে, প্রতি সংসারে বিষাদ-প্রতিমা, পতিপুত্রহীনা যোষাগণ যে নিরন্তর রোদন করিতেছে, তাহার কি উপায় করিতেছ? বঙ্গবিধবা জীবন্মৃতা, তাহার দুঃখের শেষ নাই, সুখের লেশমাত্র নাই, দুঃখ জানায় এমন লোকও তাহার কেহ নাই; আপনার জনক জননী যে হতভাগিনীর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিল না, সে আর কাহার কাছে কাঁদিবে? কাহার কাছে মনের দুঃখ জানাইবে?

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, রাজা বিধান করিয়াছেন, বিধবা-বিবাহের সন্ততি ? ক বিভবের উত্তরাধিকারী হইবে; এ অধিকাংশ লোকেই বুঝিতে পারিয়াছে, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা কর্ত্তব্য; তবে বিধবা-বিবাহ চলিতেছে না কেন? আমরা ভীরু, আমরা স্বার্থপর, আমরা নিতান্ত নীচাশয়, নির্ব্বীর্য্য ও কার্য্যাক্ষমতাহীন, তাই বিধবা-বিবাহ চলিতেছে না। আমাদের জাতীয় ঐক্য থাকিলে আমরা স্বদেশ ও স্বজাতির তরে স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ করিতে পারিলে, আজিও কি বঙ্গে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত থাকে? আমরা বিধবা-বিবাহের কর্ত্তব্যতা বুঝিয়াও নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি, কেবল সমাজচ্যুত হইবার ভয়ে। যে সমাজে অবলাঘাতক রাক্ষস দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছে—যে সমাজে বর্ব্বরাচার দেশাচার-রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যে সমাজে রমণীগণ নিরন্তর রোদন করিতেছে এবং যে সমাজে স্ত্রীহত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি মহাপাতকের ইয়ত্তা নাই, ভাবিয়া দেখ—সে সমাজ কি ভয়ঙ্কর! সে বিষময় সমাজ পরিত্যাগ করিতে আবার ভয় কি? বাঙ্গালার তিন

কোটি লোকের মধ্যে তিন হাজার লোকেও কি এই অবশ্যকর্ত্তব্য সাধনে বদ্ধ-পরিকর হইতে পারে না? এক বার যদি আমরা অন্ততঃ তিন হাজার ব্রাহ্মণ কায়স্থ দলবদ্ধ হইতে পারি, তাহা হইলে আর কাহার সাধ্য, আমাদের জাতিচ্যুত করিতে পারে? কাহার সাধ্য—আমাদের পুত্রকন্যার বিবাহে প্রতিবন্ধকতা করে? কাহার সাধ্য আর বিধবা-বিবাহ নিবারণ করিয়া রাখে? "আমাদিগের যদি এক্ষণে কোন বীরত্বের আবশ্যক হয়, তাহা সামাজিক অধীনতার বল অতিক্রম করিয়া উন্নতির দিকে উঠিতে পারার বীরত্ব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে, এক দিন আমরা পুরুষ নামের উপযুক্ত হইব। এই বীরত্বে মাতিতে পারিলে, আমরা সর্ব্ববিধ যুদ্ধে ক্রমশঃ সমর্থ হইব। যে শত্রু অতি গোপনীয়ভাবে, অদৃষ্টরূপে আমাদিগের সমূহ অনিষ্ট করিতেছে, আমরা যদি তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইতে না পারিলাম, তবে আর কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব?" বঙ্গীয় যুবকগণ, তোমরা যদি পুরুষ-নামে অভিহিত হইতে চাও, যদি তোমাদের ধর্ম্ম-নৈতিক সাহস ও কার্য্য-ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে, তবে কাহারও কথা শুনিও না, সমাজের ভ্রূকুটি দেখিয়া ভয় পাইও না, অগ্রসর হও, আর কাল বিলম্ব করিও না—বঙ্গের নিপীড়িতা বিধবাদিগকে রক্ষা কর—দেশাচারের কঠিন শাসন হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। বিধবার শাপে ভারতের অধঃপতন হইল, বিধবার উষ্ণ নিঃশ্বাসে ভারত ভস্মীভূত হইল, বিধবার নয়নজলে ভারত ডুবিয়া গেল!!

বাল্যবিবাহ।

পূর্ব্বকালে পিতামাতা যে, পুত্রের বিবাহ দিতেন অথবা পুত্রের নিমিত্ত ভার্য্যা নির্ব্বাচন করিতেন এরূপ প্রমাণ আমরা কুত্রাপি প্রাপ্ত হইতেছি না। স্মৃতিশাস্ত্রেও এরূপ কোন বিধান দেখিতেছি না। কাব্য ও পুরাণে বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। কন্যার বিবাহে পিতা কোন কোন স্থলে হস্তক্ষেপ করিতেন বটে, কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া বিশিষ্টরূপে পাত্রের গুণাদি পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে হইত। মনু বলিয়াছেন বরং মরণকাল পর্য্যন্ত কন্যাকে গৃহে অদত্তা রাখিবে, তথাপি গুণহীনপাত্রে প্রদান করিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—যুবা বুদ্ধিমান্ শিষ্ট-প্রকৃতি ও বেদাদি শাস্ত্র-বেত্তা বরে কন্যা সম্প্রদান করিবে, কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না। অনেক স্থলে কন্যাগণ স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিধানে স্বয়ং বিবাহ করিতেন। যেখানে স্বয়ম্বর ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিধান রহিয়াছে, সেখানে বালিকাবিবাহের অবশ্য কর্ত্তব্যতা কেমন করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে? রঘুনন্দন ঘোর ভ্রমে পতিত হইয়া বাল্য-বিবাহ প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পুরাণে, তন্ত্রে, কাব্যে কুত্রাপি বালিকা বিবাহের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হইতেছি না। কোন কোন শাস্ত্রে ঐরূপ বিধি আছে সত্য, কিন্তু বোধ হয়, সে আইন রঘুনন্দনের "উদ্বাহতত্ত্ব" প্রচারের পূর্ব্বে কখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তাহা যদি হইত, কোথাও না কোথাও তাহার প্রমাণও আমরা পাইতাম। মহাভারতে লিখিত আছে, ত্রিংশদ্বর্ষ-বয়স্ক ব্যক্তি ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে—

"অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।
নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্॥"

অর্থাৎ, যে পতিমর্য্যাদা জানে না, যে পতিসেবার উপযুক্ত হয় নাই এবং যে ধর্ম্ম শাসন বুঝে না, পিতা, এমন বালিকা কন্যার বিবাহ কদাচ দিবেন না।

হিন্দুশাস্ত্র রত্নাকর বিশেষ; যাহা খুঁজ, তাহাই পাওয়া যায়। ইহা হইতে সকল প্রকার মতের প্রতিপোষক ভুরি ভুরি বচন উদ্ধার করা যাইতে পারে। এই জন্যই লোকে বলে নানা মুনির নানা মত। এক্ষণে কেবল শাস্ত্রীয় মত লইয়া বৃথা বাদানুবাদ করিলে কোনই ফল দর্শিবে না। প্রচলিত রীতি নীতি দেখ, তাহার দোষ-গুণ বিচার কর, যদি কোন দেশাচার দুষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহার সংস্কার ও সংশোধনে একেবারে বদ্ধ-পরিকর হও।

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য নকর্ত্তব্যো বিনির্ণয়।
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানি প্রজায়তে।"

বাল্য-বিবাহ যে বহু দুঃখের আকর তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। অতএব কন্যাকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে পিতা যাজ্ঞবল্ক্যের বচনানুসারে জামাতা নির্ব্বাচন করিবেন এবং সেই জামাতা ও কন্যা যদি উভয়ে উভয়ের মনোনীত হয়, তবেই তিনি কন্যা পাত্রস্থ করিবেন। এরূপ হইলে দাম্পত্য সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং অনেক পরিমাণে বামাবৃন্দের অবস্থার উন্নতি সাধিত হইবে। আমাদের দেশে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত থাকাতে এবং পাত্রের পণ কন্যাকর্ত্তার অবস্থার একান্ত অতিরিক্ত হইয়া পড়াতে অতি অল্প লোকই মনোমত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিতেছেন। অধিকাংশ কন্যা মূর্খ, দুশ্চরিত্র বৃদ্ধ, রুগ্ন বা সপত্নীক পাত্রে অন্যায় রূপে প্রদত্তা হইতেছে। এ প্রকার পাত্রে প্রদত্তা হইলে কন্যার আর কি সুখের আশা থাকে? এপ্রকার পাত্রে কন্যা দান করা, জানিয়া শুনিয়া হাত পা বাঁধিয়া কন্যাকে জলে ফেলিয়া দেওয়া, কন্যার যাবজ্জীবনের সুখ হরণ করা যে মহাপাপ তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না।

আমাদের শাস্ত্রে যে স্ত্রী-শিক্ষার বিধান আছে, সে স্ত্রীশিক্ষা পূর্ব্বকালে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, সেই স্ত্রীশিক্ষার

স্থার বাল্যবিবাহ-রীতি বদ্ধ করিয়া দিয়াছে। যে কাল হইতে বঙ্গে বাল্য বিবাহের রীতি সুপ্রচলিত হইয়াছে, বোধ হয়, সেই কাল হইতে কন্যার শিক্ষাকাল অল্প হওয়াতে, এবং তাহার বিবাহ দিবার কর্ত্তব্যতার আশু উপস্থিত হওয়াতে ভর্ত্তৃগণকে কাজেই কন্যার শিক্ষাকার্য্য অবহেলা করিয়া তাহার বিবাহ-দায়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। শ্বশুরালয়ে কন্যাকে সংসারকার্য্যে এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া থাকিতে হয়। সেখানে স্বামীর সহিত তাহার সর্ব্বক্ষণ আলাপ ও মিলন ঘটিয়া উঠেনা। সুতরাং বাল্যবিবাহের সহিত কন্যার মূর্খতা আসিয়া পড়িয়াছে। শিক্ষা কার্য্যের অবসর বিরহে সে কার্য্য রহিত হইয়া গিয়াছে। অতএব বাল্য-বিবাহের উচ্ছেদের উপর স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি নির্ভর করিতেছে।

যে ত্রিবিধ দেশাচারে আমাদের স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করিয়াছে, তাহা আমরা প্রদর্শন করিলাম। স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে হইলে, ঐ ত্রিবিধ দেশাচার রহিত করা আবশ্যক। যাঁহারা স্বদেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধনে ব্রতী, যাঁহারা আত্মোন্নতির জন্য ব্যস্ত, তাঁহারা আগে স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, অগ্রে আপন আপন গৃহ সংস্কারে প্রবৃত্ত হউন। আপন গৃহে অগ্রে অবলা নারীর ক্রন্দন নিবারণ করুন। যে গৃহে এবং যে দেশে নারীজাতি অনবরত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছে, সে গৃহের এবং সে দেশের মঙ্গল কোথায়? যে গৃহধাম সকল সুখের আলয়, সেই গৃহধামে অগ্রে শান্তি-স্থাপন না করিলে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সুখী হইবার চেষ্টা করা দুরাশামাত্র।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

আয়ুর্ব্বেদ ও বঙ্গদেশীয় বৈদ্য।

অতি প্রাচীনকালে মনুষ্যাদি জীবগণের জীবনরক্ষার ও স্বাস্থ্যরূপ অমূল্য রত্নলাভের অদ্বিতীয় উপায়-স্বরূপ আয়ুর্ব্বেদনামে যে শাস্ত্র প্রচারিত ছিল, কাল-চক্রের পরিবর্ত্তনে তাহার অবনতি হইয়া আসাতে ভারতবর্ষের,—বিশেষতঃ আমাদিগের বঙ্গপ্রদেশের যে শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা

* ভবানীপুরে "অম্বষ্ঠ-সম্মিলনী সভা" স্থাপিত হইয়াছে। সেই সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসাদ দত্ত কবিভূষণ, গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরত্ন, গৌরীনাথ সেন কবিরঞ্জন প্রভৃতি অল্পমাত্র সভ্য ব্যতীত অন্যান্য তাবৎ বৈদ্য সভ্যের মত যে, বৈদ্যেরাই আয়ুর্ব্বেদ শিখিবার অধিকারী। অন্য কোন বর্ণ নহে। সেই মতের ভ্রান্তি-প্রদর্শনার্থে এই প্রস্তাব লিখিত হইয়াছে। সং।

অনুধ্যান করিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অশ্রুপাত হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত এই শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল, আজি কালি অনেকে তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কারণ, রোগের স্বরূপনির্ণয় হইলেই, তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই চেষ্টা যথোপযুক্ত হইলেই, সুফল লাভ হয়, ইহা জগতের একটী নিয়ম।

এতদ্দেশে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র ও তদনুযায়ী চিকিৎসার অবনতি হইয়াছে কেন, তদ্বিষয়ে বহুতর কারণ আছে। তন্মধ্যে একটী অতি প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করাই আজিকার এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। (১)

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে প্রচলিত "ভৈষজ্যরত্নাবলী" নামক অপেক্ষাকৃত একটী আধুনিক সংগ্রহ-গ্রন্থে লিখিত আছে যে—

"অন্যজাতিকৃতঃ পাকো
হ্যস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্
বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ॥
মোহাৎ দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ
পাচিতে খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তীভবেৎ শূদ্রো
জাতিহীনো ভবেৎদ্বিজঃ॥"

ভৈষজ্যরত্নাবলী, ৪ পৃঃ।

বৈদ্য জাতি ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও জাতি কোনও ঔষধের পাক (প্রস্তুত করা,) করিলে, সেই ঔষধ সর্ব্বজাতির অস্পৃশ্য হইবে। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ যেন ঔষধ প্রস্তুত করিবার বিষয়ে বৈদ্যকেই নিযুক্ত করেন।

যদি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি-মধ্যে কোনও ব্যক্তি ঔষধ পাক করেন, ও সেই ঔষধ অন্যকে খাইতে দেন, তবে দ্বিজাতি ব্যক্তি, (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য) জাতিহীন হইবেন এবং শূদ্র হইলে, সে ব্যক্তি

---

(১) গত অগ্রহায়ণমাসের আর্য্যদর্শনে "আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ" নামক প্রস্তাবে লেখক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহার সকল কথার সহিত আমাদিগের ঐক্য না হউক, কিন্তু তিনি সংস্কৃত ভাষার পতন, বৈদেশিক রাজশাসন, আয়ুর্ব্বেদের সংক্ষেপসাধনকে যে আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক। আমাদিগের এই মাত্র বক্তব্য যেন বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গভাষাতে আয়ুর্ব্বেদের অনুবাদই উন্নতির কারণ বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং তজ্জন্য আমরা অনুবাদকদিগকে ধন্যবাদ দিতে ও সামান্য ত্রুটিতে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু একেবারে অনুবাদ কার্য্যে অনভিজ্ঞতা বা অমনোযোগ অবশ্যই দূষণীয়। আর অনুবাদের জঘন্যতা বা অনিষ্টকারিতা-সম্বন্ধে উদাহরণ দিতে হইলে, তাঁহার প্রস্তাবিত "রোগবিনিশ্চয়গ্রন্থের অনুবাদ" গণ্য না হইয়া "চক্রদত্তসংগ্রহ" ও "রসেন্দ্রসারসংগ্রহের" অনুবাদই গণ্য হওয়া উচিত।

প্রায়শ্চিত্ত করিবার যোগ্য পাতকী হইবেন।

এস্থলে, বৈদ্যগণ ব্রাহ্মণাদি চারিটী মূল জাতি ব্যতিরিক্ত অপর জাতীয় ব্যক্তি বুঝাইতেছে। সুতরাং বৈদ্য শব্দে—অগত্যা বৈদ্যপর্য্যায়ক অম্বষ্ঠ নামকজাতি বিশেষকেই বুঝাইবে (২)।

উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিধি অবলম্বন করিয়া বঙ্গদেশীয় অনেক বৈদ্য একেবারে স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন যে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাব্যবসায়ে কেবল বৈদ্য অর্থাৎ অম্বষ্ঠ জাতিরই অধিকার; অন্য কোনও জাতির অধিকার নাই। এবিষয়ে তাঁহারা আরও দুই একটী বচন আবৃত্তি করেন। যথা—

"ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলো জলমাবিশেৎ।"

অর্থ।—ব্রাহ্মণকে চিকিৎসা কার্য্য করিতে দেখিলেও, পাতক হয়। সেই পাতকের খণ্ডনার্থ যে বস্ত্র পরিধান করিয়া তাদৃশ ব্রাহ্মণ দেখা হইয়াছে, সেই বস্ত্র সহ স্নান করিবে।

এইরূপ সিদ্ধান্ত ও সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া বঙ্গদেশের অনেক বৈদ্য (৩) ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি অন্যজাতীয় ব্যক্তিকে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের পাঠনা ও তদনুযায়ী ব্যবসায় শিক্ষা করাইতে নিতান্ত অসম্মত হয়েন; এমন কি, অন্যজাতীয় ব্যক্তিকে এই কার্য্য করিতে দেখিলে, বিশেষ বিদ্বেষ প্রকাশ করেন। আবার কোনও কোনও অনুদার অন্তঃকরণে এই সংস্কার এমন কুটিলবেশ ধারণ করিয়াছে, যেন তাঁহারা আপন জাতীয় ও আত্মীয় ব্যক্তিকে আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকাদির শিক্ষা দিবার সময়ে অন্যজাতীয় ব্যক্তিগণ যাহাতে কোনরূপেই এতাদৃশ বিষয় জানিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সতর্কতা শিক্ষা দেন।

অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বিবেচনা করেন যে, যে আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়ের উপর পৃথিবীস্থ অসংখ্য ব্যক্তির জীবন ধারণ নির্ভর করিতেছে,—তাহা যদি পৃথিবীর সম্বন্ধে এক বর্গহস্ত পরিমিত স্থানের তুল্য বঙ্গপ্রদেশের একটী নির্দ্দিষ্ট জাতীয় কয়েক জন ব্যক্তির প্রতি তাঁহারা নির্ব্বোধই হউন আর বুদ্ধিমান্ই হউন, নির্ভর করে, তবে হয় শাস্ত্রের এতাদৃশ ব্যবস্থা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অথবা বঙ্গদেশীয় অধিকাংশ বৈদ্যের এতদ্বিষয়ক অন্যান্য শাস্ত্রে জ্ঞান নিতান্ত অল্প ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া বোধ করেন এবং আপনারা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সর্ব্বজাতীয় ব্যক্তিকে অসঙ্কোচে আয়ুর্ব্বেদীয় শাস্ত্রের উপদেশ ও ব্যবসায় শিক্ষা দিয়া থাকেন।

(২) "অম্বষ্ঠঃ * * বৈদ্যঃ" অমরকোষ।

(৩) আমরা বঙ্গদেশীয় বৈদ্যমাত্রকে এইরূপ সংস্কারাপন্ন বলিতেছি না। কোন কোনও বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় ব্যক্তি এই সংস্কারের বশবর্ত্তী নহেন বরং ইহার বৈপরীত্যে তাঁহারা এতাদৃশ সিদ্ধান্তকে অপসিদ্ধান্ত

অথবা একাদৃশ বিধানের বচন কোনও স্বার্থপর ও অসুদারচেতাঃ ব্যক্তি রচনা করিয়া আয়ুর্ব্বেদীয় পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত করিয়া থাকিবে। আমাদিগের বিবেচনায় বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদিগের এই সংস্কার ও আচরণ কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আয়ুর্ব্বেদের অবনতির অতি প্রধান কারণ বলিয়া স্থির হইতেছে।

এই বিষয় লইয়া সম্প্রতি তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। এই নিমিত্ত আমরা আয়ুর্ব্বেদীয় মূল সংহিতা গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ের যে সকল ইতিহাস, বিধি, নিষেধ ও শিষ্টাচারের প্রমাণ পাইয়াছি এবং তাহা হইতে যেরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়, তাহা অদ্য পাঠকবর্গের গোচর করিব।

১।—অথ খলু ভগবন্তমমরবরং * * আশ্রমস্থং কাশিরাজং দিবোদাসং ধন্বন্তরিম ঔপধেনব-বৈতরণৌরভ্র পৌষ্কলাবত-করবীর্য্য-গোপুর-রক্ষিত-সুশ্রুতপ্রভৃতয় উচুঃ। ভগবন! * * * (বয়ম্) আয়ুর্ব্বেদং শ্রোতুমিচ্ছামঃ, * * * তদ্ ভগবন্তুপপন্নাঃ স্ম শিষ্যত্বেনেতি। * * (৪)

(সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান, ১ অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে, ভগবান্ ধন্বন্তরির নিকট ঔপধেনব, বৈতরণ ঔরভ্র, পৌষ্কলাবত, করবীর্য্য, গোপুর, রক্ষিত, সুশ্রুত, নিমি (বৈদেহ), কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব নামে দ্বাদশ জন শিষ্য (৫) আয়ুর্ব্বেদ ঘটিত জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করিয়া তাঁহার ছাত্র হয়েন।

নারায়ণাবতার ভগবান্ ধন্বন্তরি প্রথমতঃ কাশীর রাজা থাকিয়া, পরে বানপ্রস্থাশ্রমে রাজর্ষি হয়েন। সুতরাং তিনি ক্ষত্রিয় জাতিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্যের মধ্যে সুশ্রুত নামক ঋষি, ক্ষত্রিয়জাতীয় রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র, ইহাও নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—

"বিশ্বামিত্রসুতঃ শ্রীমান্ সুশ্রুতঃ পরিপৃচ্ছতি।" সুশ্রুত, উত্তরতন্ত্র, ৬৬ অধ্যায়।

অর্থ—বিশ্বামিত্রের পুত্র শ্রীমান্ সুশ্রুত, (আপনার গুরু ধন্বন্তরিকে) জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

চরক সংহিতার সূত্রস্থানের (৬) প্রথমঅধ্যায়ে উল্লিখিত আছে যে,—

(৪) মূল সংস্কৃত পুস্তকে প্রস্তাবিত বিষয়ের অতিরিক্ত যে সকল বিশেষণ আছে, এস্থলে অপ্রয়োজনীয় বোধে তাহা ত্যাগ করা হইল। এইরূপ অন্যত্রও হইল।

(৫) টীকাকার ডল্লনাচার্য্য কহেন যে,—"গোপুর রক্ষিত" এক জনেরই নাম। আর প্রভৃতি শব্দে ভোজ প্রভৃতি কতকগুলিকে বুঝায়। (তাহা হইলে শিষ্যসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইল না)। তিনি কহেন যে, অপর মতে গোপুর ও রক্ষিত, দুই জনের নাম এবং প্রভৃতি শব্দে নিমি, কাঙ্কায়ন, গার্গ্য ও গালব এই চারি জন। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা ১২ জন। আমরা দ্বিতীয় ব্যাখ্যা অবলম্বন করিলাম।

(৬) বিস্তৃতি ভয়ে আমরা এই স্থানের মূল সংস্কৃত লিখিলাম না।

"পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে রোগ প্রাদুর্ভাব হইলে, মনুষ্যদিগের দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া একদা,—হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বে অঙ্গিরা, জামদগ্নি, বশিষ্ঠ, ভৃগু, নারদ, অগস্ত্য আত্রেয়, প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমবেত হইয়া রোগ নাশের উপায় চিন্তা করেন, পরে স্বর্গলোকে ইন্দ্রের নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থ ভরদ্বাজ ঋষিকে প্রেরণ করা হয়। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া ঋষিগণের নিকট ব্যক্ত করেন। অনন্তর অত্রিমুনির পুত্র পুনর্ব্বসু নামক মুনি অগ্নিবেশ, ভেল,জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষার পাণিনামক ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করান। পরে তাঁহারাও পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা গ্রন্থ প্রস্তুত করেন ও আপন আপন ছাত্রদিগকে অধ্যয়ন করান। যথা।—

"অগ্নিবেশশ্চ ভেলশ্চ জতুকর্ণঃ পরাশরঃ।
হারীতঃ ক্ষারপাণিশ্চ জগৃহুস্তন্মুনের্ব্বচঃ॥
*   •   *   •
ততো ভেলাদয়শ্চক্রুঃ স্বং স্বং তন্ত্রং * *।

চরক, সূত্রস্থান, ১অ,

উল্লিখিত প্রামাণিক ইতিহাস দ্বারা স্থির হইতেছে যে, পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি "দ্বিজাতিগণই" আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রচার, গ্রন্থ প্রণয়ন, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিয়াছেন।

২।—"ব্রাহ্মণস্ত্রয়াণাং বর্ণানামুপনয়নং কর্ত্তুমর্হতি। রাজন্যো দ্বয়স্য, বৈশ্যো বৈশ্যস্যৈবেতি।"

"শূদ্রমপি কুলগুণসম্পন্নং মন্ত্রবর্জ্জমনুপনীতমধ্যাপয়েদিত্যেকে।"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২অ।

অর্থ—ব্রাহ্মণজাতি, ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির আয়ুর্ব্বেদ ঘটিত উপনয়ন করিবেন। (৭) ক্ষত্রিয়জাতি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের; বৈশ্যজাতি, কেবল বৈশ্যের উপনয়ন করিবেন। কোনও মতে শূদ্রজাতিও বিশেষ গুণবান্ হইলে, তাহার উপনয়ন না করিয়া তাহাকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিবেন।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমং
ভিষক্ শিষ্যম্ উপনয়েৎ। * *"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ২ অ।

আয়ুর্ব্বেদ অধ্যাপনার নিমিত্ত ভিষক্ অর্থাৎ চিকিৎসক, (এস্থলে ব্রাহ্মণ) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির কোনও জাতীয় ব্যক্তিকে ছাত্র গ্রহণ করিবেন। (৮)

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপক ও ছাত্র, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণই হইবেন,

(৭) যেমন অন্যান্য বেদ পাঠের পর অথর্ব্ববেদ পাঠের সময় পুনরায় উপনয়ন করিতে হয়, সেইরূপ যে গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ পাঠ হইবে, তাঁহার নিকট পুনরায় উপনয়নের বিধান আছে।

(৮) কুলগুণসম্পন্ন শূদ্রকেও গ্রহণ করা পূর্ব্ব বিধান দ্বারা ব্যবস্থিত হইয়াছে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে ইহা স্পষ্টাক্ষরে বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

৩।—যুক্তি দ্বারা বিবেচনা করিলে প্রতিপন্ন হয় যে, আয়ুর্ব্বেদ সদৃশ সূক্ষ্ম তত্ত্বময় শাস্ত্রে দ্বিজাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতির অধিকারই মুখ্য কল্প, তদনন্তর যথাক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈদ্য ও বৈশ্য এবং শূদ্র জাতির অধিকার গৌণ কল্প। যথা,—

আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত আছে যে,—

"সূক্ষ্মা হি দ্রব্য-রস-গুণ-বীর্য্য-বিপাক-দোষ-ধাতু-মলাশয়-মর্ম্ম-শিরা-স্নায়ু সন্ধ্যস্থি-গর্ভসম্ভবদ্রব্যসমূহবিভাগাঃ তথা প্রণষ্ট-শল্যোদ্ধরণব্রণবিনিশ্চয়-ভগ্নবিকল্পাঃ সাধ্যা-যাপ্য-প্রত্যাখ্যেয়তা চ বিকারাণাম্, এবমাদযশ্চান্যে বিশেষাঃ।

সহস্রশো যে বিচিন্ত্যমানা বিমল-বিপুলবুদ্ধেরপি বুদ্ধিমাকুলীকুর্য্যুঃ কিং পুনরল্পবুদ্ধেঃ।"

[সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ৪ অ।

অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদীয় তত্ত্ব সকল অতি সূক্ষ্ম। যথা,—প্রত্যেক ভেষজ দ্রব্য বিষয়ে ক্ষিতি, জল প্রভৃতি মূল দ্রব্য; অম্ল, মধুরাদি রস; শীতত্য, উষ্ণত্যাদি গুণ; উষ্ণাদি বীর্য্য জাঠরাগ্নি দ্বারা পরিপাকের পর রসপরিবর্ত্তনরূপ বিপাক; বাত, পিত্তাদি দোষ; রস, রক্তাদি ধাতু; শরীরমধ্যে বাতপিত্তাদির আশয়; মর্ম্মস্থান (যে স্থানে অস্ত্র আঘাতাদি দ্বারা অধিক পীড়া বা মৃত্যু হয়); শিরা, স্নায়ু, অস্থি, সন্তানোৎপাদক পদার্থ সকল, ও প্রণষ্ট শল্যের উদ্ধার, ব্রণরোগের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ, অস্থি প্রভৃতি ভগ্ন হইলে, তাহার প্রকারভেদ-নির্ণয়, রোগ সকলের সাধ্যতা, যাপ্যতা, প্রত্যাখ্যেয়তা প্রভৃতি বহুতর ব্যাপার বিমল ও বিপুলবুদ্ধি ব্যক্তি সহস্র বার চিন্তা করিলেও তাঁহার বুদ্ধি আকুল হইয়া যায়; অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির ত কথাই নাই।

এ দিকে ব্রাহ্মণাদি জাতির বিষয়ে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে যে—

"চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥"

ভগবদ্গীতা উপনিষৎ।

"তত্র সত্ত্বগুণপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি। সত্ত্বমিশ্রিতরজোগুণপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি। রজোমিশ্রিততমোগুণ-প্রধানাঃ বৈশ্যাঃ তেষাং বাণিজ্যরূপাণি কর্ম্মাণি। তমোগুণপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ তেষাং ত্রিবর্ণশুশ্রূষারূপাণি কর্ম্মাণি।

শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা।

"ব্রাহ্মণাদ্ বৈশ্যকন্যায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

পুরাণ।

অর্থ—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিতেছেন) আমি, সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি গুণভেদে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান করিয়াছি। আমিই (প্রকৃতি সহযোগে) সেই বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টির কর্ত্তা, আবার আমি (প্রকৃতিরহিত অবস্থায়) তাহার কর্ত্তা নহি।

উক্ত চারি জাতির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ; সম, দম (৯) প্রভৃতি কার্য্য তাঁহার অনুষ্ঠেয়। অধিক-রজোগুণ ও অল্পসত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তি ক্ষত্রিয়; শূরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক যুদ্ধাদি কার্য্য তাহার অনুষ্ঠেয়। অধিক তমঃ ও অল্প রজো গুণযুক্ত ব্যক্তি বৈশ্য; বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য তাহার অনুষ্ঠেয়। তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তি শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি তিন জাতির সুশ্রূষা তাহার অনুষ্ঠেয়।

ব্রাহ্মণ জাতি হইতে বৈশ্যকন্যাতে অম্বষ্ঠ নামক জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং শাস্ত্রের মীমাংসানুসারে (১০) অম্বষ্ঠজাতি—মাতৃজাতি বৈশ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং পিতৃজাতি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং অন্যান্য কারণে সমস্থানীয় ক্ষত্রিয় জাতি অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইতেছে।

যেরূপ শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশ দর্শিত হইল, তদনুসারে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণজাতি সত্ত্বগুণ-প্রধান। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তির নির্ম্মলতা ও নিশ্চলতা সম্ভাবিত নহে। এ দিকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যেরূপ সূক্ষ্মতত্ত্বময়, তাহাতে তাদৃশ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মবোধ এবং তদনুযায়ী চিকিৎসাব্যবসায় সত্ত্বগুণ প্রধান ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের আয়ত্ত হওয়া কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব শাস্ত্রমূলক যুক্তি অনুসারে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রের অধ্যয়নাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণজাতির অধিকার মুখ্য কল্প; আর যথাক্রমে অন্যান্য জাতির অধিকার গৌণকল্প হইতেছে।

৪।—"ত্বক্ পর্য্যন্তস্য দেহস্য যোঽয়
　　মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ বর্ণ্যতে ঽঙ্গেষু
　　কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং হর্ত্রা শল্যস্য
　　বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্ দ্রষ্টব্যোঽঙ্গ-
　　বিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতোহি যদ্দৃষ্টং শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ
　　যদ্ভবেৎ
সমাসতস্তদুভয়ং ভূয়োজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥
তস্মাৎ সমস্তগাত্রম্ অবিষোপহতম্
* পুরুষম্ * * আপগায়াং কোথয়েৎ।
* * উদ্ধৃত্য ততো দেহং * অবঘর্ষয়ন্
ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ বিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েৎ
　　চক্ষুষা।"

[সুশ্রুত, শারীরস্থান, ৫ অ।

অর্থ—শরীরের বাহিরের ত্বক্ হইতে অভ্যন্তরের যে সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বর্ণিত হইল, শল্যতন্ত্রে সম্যক্ জ্ঞান না হইলে, তাহা ভালরূপে বুঝিবার

(৯) ঈশ্বরবিষয়ক শাস্ত্র শ্রবণাদি ভিন্ন অন্য কার্য্য হইতে বাহ্য ইন্দ্রিয় সকলকে নিবৃত্ত করার নাম "শম"; আর অন্তরিন্দ্রিয়কে নিবৃত্ত করার নাম "দম"।

(১০) মনুসংহিতা প্রভৃতিতে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত আছে।

উপায় নাই। অতএব যে ব্যক্তি শরীরস্থ (সূক্ষ্ম) শল্য উদ্ধার করিতে বাসনা করেন, (অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদীয় শল্যতন্ত্রশাস্ত্র ভাল রূপে জানিতে চাহেন) তিনি মৃতদেহ বিচ্ছেদ করিয়া সূক্ষ্ম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি দেখিবেন। শাস্ত্রপাঠ দ্বারা উপদেশ লাভ এবং প্রত্যক্ষ দর্শন এই উভয় একত্র হইলে, পূর্ণ জ্ঞান উৎপাদন করে।

অতএব যে ব্যক্তি বিষভক্ষণাদি ব্যতিরেকে মরিয়াছে, এবং শস্ত্রাদি দ্বারা যাহার কোনও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নষ্ট হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তির মৃত দেহকে প্রথমতঃ নদীতে ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে উদ্ধার পূর্ব্বক, শাস্ত্রে যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছে, তদনুযায়ী বাহ্য ও অভ্যন্তর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি স্বচক্ষে দেখিবে।

উল্লিখিত প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি অর্থাৎ দ্বিজাতি-পদ-বাচ্য ছাত্রগণ যে, কেবল আয়ুর্ব্বেদের পবিত্র অংশগুলির অধ্যয়ন অধ্যাপনা করিবেন,'এরূপ নহে, তাঁহারা স্বয়ং শববিচ্ছেদাদি করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে পারদর্শিতাও লাভ করিবেন। এরূপ ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

পঞ্চম। "ইদং (শল্যতন্ত্রম্) শাশ্বতং পুণ্যং স্বর্গ্যং যশস্যম্, আয়ুষ্যম্ বৃত্তিকরঞ্চেতি।"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান, ১ অ,

অর্থ—এই শল্য বিদ্যা শাশ্বত অর্থাৎ অবিনাশী, পুণ্যজনক, স্বর্গসাধক, যশস্কর, আয়ুষ্কর ও বৃত্তিকর অর্থাৎ ইহাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

"কুলীনং ধার্ম্মিকং স্নিগ্ধং সুভৃতং সততোত্থিতং।

* * *

মহানসে প্রযুঞ্জীত বৈদ্যং তদ্বিদা পূজিতম্॥"

সুশ্রুত, কল্পস্থান, ১ অ,

"কুলমত্র আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়ি কুলম্, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয় বৈশ্য ভেদেন ত্রিবিধম্। কুলগুণসম্পন্ন শূদ্রেণ সহ চতুর্ব্বিধমিত্যন্যে"

ডল্বনাচার্য্য কৃত টীকা।

অর্থ—রাজার কর্ত্তব্য যে, তিনি (আহারদ্রব্যের বিষাক্ততাদি পরীক্ষার নিমিত্ত) পাকশালাতে, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিদ্বান্, আয়ুর্ব্বেদাধ্যায়িকুলে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদিকুলে) উৎপন্ন, ধার্ম্মিক, শান্ত-মূর্ত্তি, উত্তমরূপে প্রতিপালিত, এবং সতর্কতাপন্ন বৈদ্যকে নিযুক্ত করিবেন।

"স চাধ্যেতব্যো ব্রাহ্মণরাজন্যবৈশ্যৈঃ। তত্র অনুগ্রহার্থং প্রাণিনাং ব্রাহ্মণৈঃ আরক্ষার্থং রাজন্যৈঃ। বৃত্ত্যর্থং বৈশ্যৈঃ। সামান্যতো বা ধর্ম্মার্থকামপরিগ্রহার্থং সর্ব্বৈঃ।"

চরক, সূত্রস্থান, ৩০ অ,

অর্থ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতি আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতির অধ্যয়ন, প্রাণিদিগের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত, ক্ষত্রিয় জাতির অধ্যয়ন, অন্যকে (শস্ত্রাঘাতাদি

জনিত পীড়া হইতে) রক্ষা করিবার নিমিত্ত; বৈশ্যজাতির অধ্যয়ন—ব্যবসায়ের নিমিত্ত। অথবা সামান্যতঃ সকল জাতির অধ্যয়ন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রতিগ্রহের প্রাপ্তির নিমিত্ত।

শেষোক্ত বিধানের তাৎপর্য্য এই যে,—

ব্রাহ্মণজাতি সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ (ধনোপার্জ্জন) ও কাম (অভিলষিত দ্রব্যাদি) প্রাপ্তি সাধনার্থ আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়াদি করিবেন; কিন্তু ধর্ম্মার্থ প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিবার বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ক্ষত্রিয়-জাতি সাধারণতঃ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের নিমিত্ত, কিন্তু বিশেষরূপে প্রাণীদিগের জীবন-রক্ষার নিমিত্ত; বৈশ্যজাতি সাধারণতঃ ধর্ম্মাদি জন্য বিশেষরূপ বৃত্তির জীবিকা নিমিত্ত আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসয়াদি করিবেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জগৎ-কৌশল।

কার্য্য-কারণ অনুমান হইতে ঈশ্বরানুমান সিদ্ধ করা আস্তিকদিগের সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। উদয়নেরও ইহা প্রথম যুক্তি। এ যুক্তি কিরূপ দুর্ব্বল এবং কার্য্যকারণ হইতে ঈশ্বর-অনুমান সিদ্ধ হয় কি না, তাহা আমরা প্রদর্শন করিয়াছি। আস্তিকদিগের অন্যান্য যত প্রকার যুক্তি আছে, সে সমুদায়ই এই কার্য্যকারণ-যুক্তির উপর স্থাপিত। সুতরাং এই কার্য্যকারণ-যুক্তি যখন খণ্ডিত হইতেছে, তখন অপরাপর যুক্তির দাঁড়াইবার স্থল নাই। কার্য্যকারণের পর আস্তিকদিগের দ্বিতীয় প্রধান যুক্তি এবং ঈশ্বরাস্তিত্বের প্রমাণ—জগতের কৌশল। সে যুক্তি এইরূপে বিন্যস্ত হইতে পারে:—

(১) জগতে, বিশেষতঃ জীবরাজ্যে, কৌশলের নিদর্শন সর্ব্বত্র বিদ্যমান।

(২) কৌশল জ্ঞানের পরিচায়ক।

(৩) অতএব এই জগৎ-কৌশলের কারণস্বরূপ একজন জ্ঞানী পুরুষ অবশ্য আছেন।

(৪) সেই পুরুষই ঈশ্বর।

ক। স্বীকার করা গেল, জগৎ-কৌশলের কারণস্বরূপ একজন জ্ঞানী পুরুষ বিদ্যমান আছেন। মানুষী কার্য্যের দৃষ্টান্তানুসারে কৌশল হইতে কৌশল-কারী একজন পুরুষেরই অনুমান হইতে পারে, কিন্তু সেই পুরুষ আদি কারণ কি না, সেই পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা ও ঈশ্বর কি না, সেই কৌশলজ্ঞ পুরুষ নিজে সৃষ্ট কি না, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে স্বতন্ত্র, কি তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহা আমাদের স্বীকার্য্য হইতে অনুমান করা যায় না। জগৎকৌশলের সৃষ্টিকারী পুরুষ যে শেষ পুরুষ, ঈশ্বর—

এ সিদ্ধান্ত কোন্ যুক্তি অনুসারে অনুমিত হয়? এ সিদ্ধান্ত করিতে গেলে অবশ্য আস্তিকদিগকে কার্য্যকারণ রূপ যুক্তিপথ অবলম্বন করিতে হইবে। সুতরাং জগৎ-কৌশলের যুক্তি হইতে একেবারেই ঈশ্বরানুমান সিদ্ধ হয় না।

খ। আবার দেখুন, কৌশলের যুক্তি সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য-কার্য্যের সাদৃশ্যাবলম্বনে গঠিত। আমরা কোন জ্ঞানবান্ পুরুষ দ্বারা ঘড়ী এবং বাড়ী তৈয়ারি হইতে দেখিয়াছি, এইজন্য অনুমান করি যে, সেই ঘড়ী ও বাড়ীতে যে কৌশলের পরিচয় আছে, সেই কৌশল মানবরূপ একজন জ্ঞানী পুরুষ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। এ যুক্তি-অনুসারে, কেবল কৌশলের জন্য জ্ঞান আবশ্যক, এই মাত্র প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু যাহাতে সেই কৌশলের পরিচয় আছে অথবা যিনি সেই কৌশলের জন্মদাতা, সেই দ্রব্যাদি এবং সেই পুরুষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, এই প্রশ্নের মীমাংসা কৌশল যুক্তি করিতে পারে না। ঘড়ী ও বাড়ীতে কৌশল আছে সত্য কিন্তু ঘড়ী ও বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে বিশেষ প্রকার কৌশলোপযোগী শক্তিবিশিষ্ট যে দ্রব্যাদির আবশ্যক হইয়াছে, সে দ্রব্যাদির সৃষ্টি ও বিদ্যমানতা এবং যে জ্ঞানবান মনুষ্য সেই কৌশলের জন্মদাতা, সেই মনুষ্যের সৃষ্টি এবং বিদ্যমানতা কৌশল ঘটিবার পূর্ব্বেই রহিয়াছে। সুতরাং কৌশলজ্ঞ জ্ঞানবান্ পুরুষের পূর্ব্বেই সেই কৌশল-বিন্যাসোপযোগী শক্তি-পুঞ্জের সৃষ্টি ও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হয়। যদি এ সমস্ত স্বীকার করিতে হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে কৌশল-যুক্তি দ্বারা সৃষ্টির মীমাংসা হয় না। বরং সে যুক্তি-অনুসারে কৌশল-কর্ত্তাকে সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে একজন স্বতন্ত্র পুরুষই বলিয়া মানিতে হয়। সৃষ্টির কারণ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে কার্য্য-কারণ যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়। সুতরাং কৌশলযুক্তি হইতে ঈশ্বররূপ আদিকারণ অনুমিত হইতে পারে না।—

গ। আস্তিকেরা আরও বলেন, কৌশল ঘটিবার পূর্ব্বে শক্তিপুঞ্জের বিদ্যমানতা হওয়া আবশ্যক বটে, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সেই শক্তিপুঞ্জকে কৌশলোপযোগী করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একথা বলাতে শক্তিপুঞ্জকে অথবা সমগ্র বলকে কৌশল বলা হইল। কারণ, যাহা কৌশলোপযোগী, তাহাও কৌশলেরই অংশ মাত্র। তাহা হইলে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শক্তি-পুঞ্জের সৃষ্টি হয় নাই, একেবারে কৌশলের সৃষ্টি হইয়াছে। আস্তিকেরা এইরূপ আপনাদের পক্ষসমর্থনার্থ সমুদায় শক্তিকে কৌশল জ্ঞান করিলেন। আমরা স্থলান্তরে দেখাইব, তাঁহারা বিপক্ষীয় অন্য একটী আপত্তিখণ্ডনার্থ আবার সমুদায় কৌশলকে শক্তি অথবা বলরূপে অনুমান করিতেছেন। যাহা

হউক, জগতের সমগ্র শক্তিপুঞ্জ যদি কৌশল বলিয়া ধর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র সৃষ্টিব্যাপারকে একটী বৃহৎ কৌশলময় কার্য্যস্বরূপ জ্ঞান করিতে হইল। সৃষ্টিব্যাপারকে কার্য্যস্বরূপ জ্ঞান করিলে, তাহা কার্য্য-কারণ-অনুমানের বিষয়ীভূত হইল। সুতরাং ঈশ্বরনির্ণয়ে কৌশলযুক্তিই শেষ যুক্তি নহে, সেই যুক্তি অবলম্বনে আমরা কার্য্য-কারণ-অনুমানে আসিয়া পড়ি। কিন্তু কার্য্য-কারণ-অনুমান কতদূর ও কিরূপ ঈশ্বনির্ণায়ক, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। এ জগৎকে কৌশলময় স্বীকার করিয়া লইলে, সেই কৌশলের হেতু জগৎ অতীত যে স্বতন্ত্র ঐশীশক্তি হইবে, এমত প্রমাণিত হয় না। যে যুক্তির অবলম্বন করিয়া জগৎ অতীত একটী স্বতন্ত্র কৌশলকর্ত্তার সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে মনুষ্য-কৌশলের দৃষ্টান্তের উপর স্থাপিত। মনুষ্যকার্য্য নির্ম্মাণকার্য্য, তাহা সৃষ্টিব্যাপার হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নির্ম্মাণকার্য্যে যে যুক্তি খাটিবে, তাহা সৃষ্টি-ব্যাপারে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে সেই দুই কার্য্যের সাদৃশ্য প্রমাণ করা চাই। সৃষ্টিব্যাপারের সহিত যখন নির্ম্মাণকার্য্যের সাদৃশ্য নাই, তখন নির্ম্মাণ-কার্য্যসম্বন্ধে যে যুক্তি খাটে, সৃষ্টিব্যাপার সম্বন্ধে সে যুক্তি খাটিতে পারে না।

ঙ। জগৎ কেবল ঘটনাময়। বিজ্ঞান এই ঘটনার ত্রিবিধ কারণ নির্ণয় করিয়াছে;—নৈমিত্তিক কারণ, ভৌতিক কারণ এবং ক্রিয়াবান্ কারণ। একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করুন। আগুনে কাঠ দিলে পুড়িয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এস্থলে নৈমিত্তিক কারণ, কাষ্ঠনিক্ষেপকারী মনুষ্য, নি[illegible], এবং অগ্নি। ভৌতিক (physical) কারণ—ভূবায়ুস্থ অম্লজান [illegible] এবং অঙ্গার [illegible] সহিত [illegible] রাসায়নিক [illegible] এবং সেই [illegible] বাষ্পের আকার ধারণ করা প্রভৃতি। এ[illegible] কি প্রকারে এই দহন [illegible] ঘটে, তাহাই [illegible] দেখিতে পাই। কিন্তু কেন সেরূপ ঘটিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারি না। অঙ্গার যে অম্লজানের সহিত কেন মিশ্রিত হয়, তাহা দ্বারা কেন যে তাহাদিগের রাসায়নিক মিশ্রণ সংঘটিত হয়, এ সমস্ত বিষয় বিজ্ঞান কিছু নির্ণয় করিতে পারে না। কাঠ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, কিন্তু কেন দগ্ধ হইতেছে, তাহা মনুষ্যজ্ঞানাতীত। যে কারণটি মনুষ্যজ্ঞানের অগোচর, তাহাই প্রকৃত ক্রিয়াবান্ কারণ (efficient cause)। তদ্রূপ, জীবরাজ্যেও আমরা দেখিতে পাই, পুং-শুক্র এবং স্ত্রী-শুক্র মিশ্রিত হইয়া জীবনধাতু উৎপন্ন হয় এবং সেই জীবনধাতু ক্রমশঃ একটী জীবাকারে পরিণত হয়। জীবনধাতু যে কেন জীবরূপে পরিণত হয়, এবং

পুং শুক্র ও স্ত্রী-শুক্র মিশিয়া কেন যে জীবনধাতু উৎপন্ন হয়, বিজ্ঞান এ সমস্ত প্রশ্নের রহস্যভেদে অসমর্থ। জীবনধাতুতে এমত একটী ক্রিয়াবান কারণ আছে, এমত জননশক্তি আছে, যে জন্য তাহা জীবরূপে পরিণত হয়। এই ক্রিয়াবান কারণ মনুষ্যজ্ঞানের অগোচর। এই ক্রিয়াবান কারণ যখন মনুষ্যের জ্ঞানগোচর নহে, তখন আমরা বলিতে পারি না যে, ইহা কৌশলেরও কারণ নহে।

উদয়ন এই স্থলে একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি বলেন, জড় প্রকৃতিতে জ্ঞানশক্তির পরিচয় নাই, কৌশল জ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং প্রকৃতি কৌশলের কারণ নহে। জড়প্রকৃতিতে জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি নাই, উদয়নের একথা আমরা স্বীকার করি না। আমরা যদি ক্রিয়াবান কারণ কি তাহা সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে বলিতে পারিতাম, জগতে যে কৌশল ও জ্ঞানের পরিচয় আছে, তাহা প্রাকৃতিক শক্তির পরিণাম নহে। প্রকৃতিতে যখন কৌশলের পরিচয় আছে, এবং যখন প্রকৃতিনিহিত ক্রিয়াবান কারণ মনুষ্যজ্ঞানের অগোচর, তখন অবশ্য বলিতে হইবে যে, এই ক্রিয়াবান কারণ যদ্রূপ অন্যান্য শক্তির পরিচায়ক তদ্রূপ জ্ঞানেরও পরিচায়ক। যেহেতু সেই জ্ঞান প্রকৃতি মাত্রেই বিদ্যমান। অতএব কৌশল-যুক্তি-অবলম্বনে জগৎ-অতীত একজন স্বতন্ত্র কৌশলী পুরুষের বিদ্যমানতা সপ্রমাণ হয় না। জগৎ কৌশল ও জ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তির পরিণাম নহে, একথা সপ্রমাণ করিতে না পারিলে জগৎ-অতীত জ্ঞানবান পুরুষের সত্তা প্রমাণিত হয় না। কিন্তু যখন প্রাকৃতিক শক্তিবিষয়ে মনুষ্য সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তখন সে কথা সপ্রমাণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সে কথা সপ্রমাণ না হইলে আমরা তদতীত হইয়া যাইতে পারি না।

চ। আমরা যাহাকে কৌশল বলি, কোন জ্ঞানবান পুরুষকে সেই কৌশল উৎপাদন করিতে হইলে, তাঁহাকে একটী নির্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রণালী উদ্ভাবন করিতে চিন্তাপ্রক্রিয়ার প্রয়োজন। কারণ, কোন্ কোন্ উপাদানসামগ্রী লইতে হইবে, এবং কি প্রকার প্রণালীতে সেই সমস্ত উপাদানপদার্থকে বিন্যস্ত করিলে কৌশল উৎপাদিত হইতে পারে, তাহা চিন্তার বিষয়। আস্তিকেরা যাঁহাকে ঈশ্বর পুরুষ বলেন, তিনি কি মনুষ্যের ন্যায় চিন্তা ও বিবিধ শক্তি যোজনা করিয়া জগৎ-কৌশল উৎপাদন করিয়াছেন? তাহা যদি করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, তাঁহার জ্ঞান পরিমিত ও সীমাবদ্ধ। তাহা হইলে তিনি আর আস্তিকদিগের অনন্ত জ্ঞানবান ও সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর হইলেন না। তিনি মনুষ্যের ন্যায় এক জন

চিন্তাশীল পুরুষ মাত্র। হদ্দ বলিতে পার তিনি মনুষ্যাপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানবান্ পুরুষ।

এই সিদ্ধান্ত পরিহারার্থ আস্তিকেরা একটি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহাকে চিন্তা অথবা শক্তি যোজনা করিতে হয় নাই, তিনি ইচ্ছা করিলেন, আর জগৎ কোশলময় হইয়া সৃষ্ট হইল। এস্থলে ইচ্ছা শব্দের অর্থ বুঝা যায় না। ইচ্ছা মনুষ্যে সম্ভব, ঈশ্বরে সম্ভব কি প্রকারে বুঝা যায় না। যাহা হউক, ইচ্ছা শব্দ ছাড়িয়া দিলে বলিতে হইবে যে এই যুক্তি দ্বারা আস্তিকেরা কেবল এক ভূমি হইতে অন্য ভূমিতে নড়িয়া বসিয়াছেন মাত্র। যে বিশ্বরচনা পূর্ব্বে তাঁহারা জ্ঞানের কার্য্য বলিতেছিলেন, এই যুক্তি-অনুসারে তাহাকে ফিরাইয়া শক্তি অথবা বলের কার্য্য বলিলেন। তাহা হইলে সিদ্ধান্ত হইল শক্তি অথবা বল চিন্তা না করিয়াও কৌশল উৎপাদন করিয়াছে সুতরাং এই জগৎ-কোশল বল হইতেই সাক্ষাৎভাবে সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং সমগ্র কৌশল বলমাত্র, এইরূপ কল্পনা করা হইল। বল হইতে যদি সাক্ষাৎ ভাবে কৌশলময় জগৎ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, তবে সেই শক্তি জগৎ-অতীত স্বতন্ত্র ঐশী সত্তা, না জগৎ-নিহিত প্রাকৃতিক শক্তি? এ প্রশ্নের উত্তর কৌশলযুক্তি দিতে সমর্থ নহে। ইহার উত্তর খুঁজিতে গেলে কার্য্য-কারণ যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

যে প্রকৃতি-নিহিত আদ্য শক্তি জগৎ রূপ বৃহৎ ব্যাপারের মূল, যাহা হইতে সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, যাহা সমস্ত কার্য্যের মধ্যে মূল কারণ রূপে বর্ত্তমান, এবং যাহা সমুদায় পরিবর্ত্তশীল দৃশ্যের একমাত্র নিত্য পদার্থ, সেই শক্তিকে উদয়ন জড়ময় জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে জ্ঞানের কার্য্য অসম্ভব বলিয়া সিদ্ধান্ত করাতে প্রকৃতি-শক্তিকে সৃষ্টি শক্তি অনুমানে দোষারোপ করিয়া গিয়াছেন। আমরা উদয়নের এই বিপ্রতিপত্তি পূর্ব্বে খণ্ডন করিয়াছি। অপর কোন কোন আস্তিক আর একটী আপত্তি উত্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, যদি প্রকৃতিশক্তিই সৃষ্টিশক্তি হয়, তাহা হইলে পাকতঃ বলা হইল, জ্ঞানময় জগৎ একজন জ্ঞানময় পুরুষ ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে, এই রূপ সিদ্ধান্ত করা হইল; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য। কপিল এ আপত্তির উত্তর সংক্ষেপে দিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জ্ঞানের সৃষ্টিকর্ত্তা যে জ্ঞানবান পুরুষ হইবেন, এ সিদ্ধান্ত কোথা হইতে আইসে? তাঁহার কথার সারমর্ম্ম এইরূপ বুঝা যায়। আমরা সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইতে দেখি নাই যে বলিব, একজন জ্ঞানবান পুরুষ হইতে সকলি সৃষ্ট হইতেছে, বরং আমরা সৃষ্টিপর্য্যায়ে দেখিয়াছি, জড় জগতের পর প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। তাহা হইতে বরং এমত অনুমান করা যায় যে, জড় জগতের পরিণাম জ্ঞান-

জগৎ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু জ্ঞান হইতে যে জড় এবং তৎপরে জ্ঞানবান প্রাণীর উৎপত্তি হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত অনুমানমূলক নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পার যে, জড় জগৎ হইতে যে কিরূপে জ্ঞানময় প্রাণী-জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা যদি সৃষ্টিশক্তি বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে সে প্রণালীও বুঝিতে পারিতাম। এইটী বুঝিতে পারি না বলিয়া আস্তিকেরা মানুষী দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বলিলেন, যেমন মনুষ্য হইতে কৌশলময় কার্য্য উৎপন্ন হয়, তেমনি জ্ঞানময় এক জন পুরুষ হইতে এই কৌশলময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে তাঁহারা সৃষ্টিকে নির্ম্মাণ-কার্য্য হইতে ভিন্ন জ্ঞান করেন নাই। কিন্তু এই ভিন্নভাব উপর যে অনুমান স্থাপিত নহে, সে অনুমান সৃষ্টিকর্ত্তাবধারণে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

আস্তিকেরা আর একটি আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁহারা বলেন, প্রকৃতিশক্তি যদি সৃষ্টিশক্তি হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইল, প্রকৃতিশক্তি স্বয়ং-সম্ভূত। এবং প্রকৃতিশক্তি যদি কৌশল ও জ্ঞানোৎপাদিকা হয়, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, কৌশল ও জ্ঞানোৎপাদিকা সৃষ্টিশক্তি স্বয়ংসম্ভূত। তবে কি এজগৎ ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ং-সম্ভূত? কিছু কি স্বয়ং-সম্ভূত হইতে পারে? আস্তিকদিগের একথার উত্তরে বলিব, তাঁহারা নিজেই তো আদি পদার্থের স্বয়ং-সম্ভবশক্তি অনুমান করিয়াছেন। তাঁহারা জগৎকে স্বয়ংসম্ভূত অনুমান করিতে না পারিয়া তাহার উৎপত্তিকারণ ঈশ্বর ধরিলেন; কিন্তু ঈশ্বরকে তো স্বয়ংসম্ভূত বলিতে হইল। তবে জ্ঞান-অতীত হইয়া এক পদ অগ্রসর হওয়াতে আর কি লাভ হইল। যখন একজনকে স্বয়ংসম্ভূত বলিতেই হইবে, তখন আস্তিকদিগেরই মতানুসারে প্রকৃতিকেই কেন না স্বয়ংসম্ভূত বলিব? যদি আস্তিকদিগের কল্পনানুসারেই বলিতে হয় যে, এই জগৎ সম্ভূত হইয়াছে; যদি সৃষ্টি ও সম্ভূত হওয়া একই ভাব হয়, তবে যেখানে আমাদের জ্ঞান থামিয়াছে, সেই খানে থামিয়া কি এই প্রকৃতিকেই স্বয়ংসম্ভূত বলা যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে না? না হইলে তোমাকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া বলিতে হইবে, ঈশ্বর স্বয়ংসম্ভূত। সুতরাং তোমাকে একস্থানে কোন পদার্থ স্বয়ংসম্ভূত জ্ঞান করিয়া থামিতে হইবেই হইবে। অথবা আদি পদার্থ যে স্বয়ংসম্ভূত হইতে পারে, তাহা আস্তিকেরাই কল্পনা করিতেছেন। আস্তিকেরাই কল্পনা করিলেন, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবনীয়। সৎ ভিন্ন যে সৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, আস্তিকেরা তো একথা বলিতেছেন না। যদি অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, এবং যদি এই জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সৎ

হয়, তবে অবশ্য বলিব এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংসম্ভূত। আর যদি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অসৎ হয় এবং ঈশ্বরই একমাত্র সৎ হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, এই জগৎ সেই সতেরই বিবর্ত্ত মাত্র, সেই সৎ এই জগৎরূপে অবস্থান করিতেছেন, এবং যখন একমাত্র সৎই ঈশ্বর তখন অবশ্য বলিব, এই জগৎই ঈশ্বর। তাহা হইলে বলিতে হয় এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। কিন্তু এই মত, আস্তিকেদের অনুমোদিত নহে। তাহারা জগতকেও সৎ বলিতে চাহেন। যদি জগৎকে সৎ বলিতে হয়, তবে তাহাকে স্বয়ংসম্ভূত না বলা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। কৌশল-যুক্তি যে কতদূর কার্য্যকারণযুক্তির উপর স্থাপিত, এ প্রস্তাবে আমরা তাহাই প্রদর্শন করিয়াছি। কৌশল-যুক্তির অপরাপর অঙ্গ আমরা পরে বিচার করিব।

ব্যবহার-বিজ্ঞান।

হিন্দুজাতির রাজকীয় ব্যবস্থাশাস্ত্র কিরূপ, অনেকেই তাহা সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাত নহেন। কেবল দায়ভাগ-অংশই আদালত-গ্রাহ্য বলিয়া বিবিধ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে; তজ্জন্য সেই অংশই সাধারণের নিকট পরিচিত আছে; কিন্তু অন্যান্য অবয়বগুলি ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। আমাদের হিতকারী ঋষিদিগের চিরচিন্তনের ধন একবারে ডুবিয়া যাওয়া অল্প দুঃখের বিষয় নহে। আধুনিক পেনালকোড বিধি ও দেওয়ানী আদালত সংক্রান্ত রাশি রাশি বিধান একত্র করিয়া হিন্দুদিগের সামান্যতর একখানি ক্ষুদ্র ব্যবস্থা-পুস্তকের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, পূর্ব্বে হিন্দুরা সেই সামান্যকায় পুস্তকের সাহায্যে যে ফল লাভ করিত, এক্ষণকার রাশি রাশি পুস্তকের দ্বারা সে ফল উৎপন্ন হয় কি না সন্দেহ। আমাদের দেশের অবস্থা ও মানবপ্রকৃতি যেরূপ, আমাদের শাসনব্যবস্থাও সেইরূপ। আমাদের দেশীয় ব্যবস্থা সকল আমাদের অবস্থা ও প্রকৃতির অবিরোধী ছিল বলিয়াই অনুমিত হয়। ক্রমে এক একটী করিয়া ভিন্নদেশীয় শাসনপ্রণালী আমাদের উপর নিয়মিত হইতেছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ দুঃখের বীজ উৎপন্ন হইতেছে।* যাহা হউক, সে ভাবনায় কোন ফলোদয়

* "ব্যভিচারিণী স্ত্রীর স্বত্বাধিকার থাকিবে।" এই নূতন বিধির দ্বারা যে অনিষ্ট হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। "বেশ্যা হইলেও বিষয় পাইব, ভয় কি?" এইরূপে নির্ভয় হইয়া অনেক স্ত্রী পতিকুলের সর্ব্বনাশ করিয়া গৃহবহির্গতা হইতেছে।

নাই। এক্ষণে আমাদের ইহাই চিন্তা করা উচিত যে, কিসে আমাদের পুরাতন ব্যবস্থা-শাস্ত্রগুলি সমূলে উচ্ছিন্ন না হয় এবং কিসে সর্ব্বসাধারণে তাহা জানিতে পারে। আমাদের "এই ছিল" "এই ছিল"—ক্রমে যদি প্রত্যেক ব্যবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া জানা যায়—তাহা হইলে বর্ত্তমান ভোগের সহিত তুলনা করিয়া যেটী প্রধানহিতকর, সেটীর প্রচলন-বিষয়ে যত্ন জন্মিতে পারে। সকলের যত্ন হইলে, তখন তাহার সংশোধন হইলেও হইতে পারে। অতএব,যাহাতে আমাদের পুরাতন ব্যবস্থাটী লোকের মন হইতে একবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায় একমত হইয়া অগ্রে তাহাই করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

লোকতত্ত্বপরীক্ষক ঋষিরা বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রজাগণের মধ্যে যত প্রকার বিবাদ উত্থিত হয়, তত্তাবতের মূল অষ্টাদশবিধ। আঠারো প্রকারের অতীত বিবাদস্থান নাই। মহর্ষি মনু সেই অষ্টাদশ বিবাদ-স্থান গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন এবং তাহার প্রথমেই 'ঋণাদান' নামক বিবাদ স্থানটীর উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"তেষামাদ্যমৃণাদানং নিক্ষেপোঽ-
স্বামিবিক্রয়ঃ।
সম্ভূয়স্য সমুত্থানং দত্তস্যানপকর্ম্মচ॥
বেতনস্যৈব চাদানং সম্বিদশ্চ ব্যতিক্রমঃ।
ক্রয়বিক্রয়ানুশয়োবিবাদস্বামিপালয়োঃ॥
সীমাবিবাদধর্ম্মশ্চ পারুষ্যেদণ্ডবাচিকে।
স্তেয়ঞ্চসাহসঞ্চৈব স্ত্রীসংগ্রহণমেবচ॥
স্ত্রীপুংধর্ম্মো বিভাগশ্চ দ্যূতমাহ্বয়মেবচ।
পদান্যষ্টাদশৈতানি ব্যবহারস্থিতাবিহ॥"

১ম ঋণাদান, ২য় নিক্ষেপ, ৩য় অস্বামিক বিক্রয়, ৪র্থ সম্ভূয় সমুত্থান, ৫ম দত্ত দ্রব্যের অনপকরণ, ৬ষ্ঠ বেতনের অদান, ৭ম প্রতিজ্ঞা বা স্বীকারের ব্যতিক্রম করণ, ৮ম ক্রয়ঘটিত, ৯ম বিক্রয় ঘটিত, ১০ম স্বামিভৃত্যঘটিত বিরোধ, ১১শ সীমাঘটিত বিরোধ, ১২শ দণ্ড-পারুষ্য ও বাক্‌পারুষ্য, ১৩শ চৌর্য্য, ১৪শ সাহস, ১৫শ স্ত্রীসংগ্রহ, ১৬শ স্ত্রীপুরুষের ধর্ম্ম, ১৭শ ধনবিভাগ এবং অষ্টাদশ দ্যূত-ক্রীড়া ও আহ্বান। এই আঠার প্রকার বিবাদ স্থান; এবং ইহাই ব্যবহারশাস্ত্রের ভিত্তি স্বরূপ। আমাদের ইচ্ছা যে, আমরা যথাক্রমে এই অষ্টাদশ বিবাদস্থান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সহ বিবৃত করিব। উল্লিখিত শ্লোকের প্রথমেই ঋণাদানের উল্লেখ থাকায় আমরাও সর্ব্বাগ্রে ঋণাদান বিবাদের বিধান গুলি যথাযথরূপে বর্ণন করিব।

ঋণদান।

ঋণ ও তাহার আদান=ঋণাদান। ঋণ কি? কিরূপ ধন ঋণ হয়? কিরূপ ধন ঋণ বা হয় না? তাহার আদান অর্থাৎ গ্রহণই বা কিরূপ প্রণালীর? ইত্যাদি প্রশ্ন-পরিপূরণের নিমিত্ত অগ্রে "ঋণাদান' শব্দটীর ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ বজায় রাখিয়া একটী নির্দ্দোষ লক্ষণ

বলা আবশ্যক। তাহা নিম্নলিখিত আর্য বচনের দ্বারা উত্তমরূপে নির্ণীত হয়। যথা—

"ঋণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথা চ যৎ।
দানগ্রহণধর্ম্মাচ্চ ঋণাদানমিতি স্মৃতম্॥"

যাহা লইবার অভিসন্ধি রাখিয়া দেওয়া হয় এবং দিবার অভিসন্ধি পূর্ব্বক গৃহীত হয় সেস্থলে সেই বস্তু ঋণ নামে গণ্য। ব্যবহারে দান ও গ্রহণ এই উভয় ভাব আছে বলিয়া উক্ত ব্যবহারটী "ঋণাদান" নামে প্রথিত হইয়াছে। (ক, খকে একটী টাকা দিল কিন্তু তাহা তাহার লইবার অভিসন্ধি থাকিল। খও তাহা গ্রহণ করিল কিন্তু তাহা পুনর্ব্বার দিতে স্বীকৃত রহিল। এস্থলের সেই টাকাটী ঋণ হইল। এই ঋণ যে দেয় সে উত্তম; আর যে লয় সে অধম। এই নিমিত্ত ঋণদাতাকে উত্তমর্ণ আর ঋণগ্রহিতাকে অধমর্ণ বলিয়া থাকে।

ঋণ দুই প্রকার। কুসীদ আর নিষ্কল। যাহার সুদ চলে তাহার নাম কুসীদ; আর যাহার সুদ নাই, মাত্র প্রদত্ত ধনটী গৃহীত হয় তাহার নাম নিষ্কল। যথা—

"স্থানলাভনিমিত্তং যৎ দানগ্রহণমিষ্যতে।
তৎ কুসীদমিতি জ্ঞেয়ং তেন বৃত্তিঃ কুসীদিনাম্।"

স্থানং=অবস্থানং মূলধনস্য। তস্মিন সতি এব লাভঃ=বৃদ্ধিঃ। তন্নিমিত্তং=তদর্থম্ দানগ্রহণম্। ইমে কর্ম্মব্যুৎপন্নে। তেন, মূলাবস্থান এব ধনিকেন দত্তং অধমর্ণেন চ তল্লাভাপেক্ষয়া গৃহীতং ঋণং কুসীদমিত্যর্থঃ।' কলাশূন্যেত্তু গৌণ প্রয়োগঃ। গুণশ্চ অবশ্যাপাকরণীয়ত্বম্।

ধনী বা উত্তমর্ণ যে স্থলে "মূলধন যেমন তেমনি থাকিবে অথচ লাভ (বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত) দিতে হইবে" এই রূপ স্বীকার করাইয়া ধন দেয় এবং অধমর্ণ তাহা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া গ্রহণ করে, সেই স্থলের তাদৃশ ঋণকে কুসীদ বলিয়া জানিবে। এই কুসীদ ঋন প্রদান করিয়াই কুসীদব্যবসায়ীরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কু = কুৎসিত। সীদং অবসন্ন। তাহা দ্বারা চাণ্ডালাদি নিন্দিত ব্যক্তি ও দরিদ্র প্রভৃতি অবসন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে এ ধন গৃহীত হয় বলিয়া উক্ত ঋণের নাম "কুসীদ"। যে স্থলে কলা অর্থাৎ লাভের কথাবার্ত্তা নাই কেবল মাত্র মূলই থাকে সেস্থলে তাদৃশ ঋণ "নিষ্কল" নামে খ্যাত। যেহেতু ইহা অবশ্য দেয় সেই হেতু উহা ঋণ, কিন্তু বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রদত্ত ধন ঋণ নহে। বাণিজ্য ও কৌসীদ্য পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন। কেন না, বাণিজ্যের নিমিত্ত যাহা দেওয়া যায় তাহা বা তজ্জাতীয় বস্তু লইবার প্রতিজ্ঞায় দেওয়া হয় না, গৃহীতও হয় না। তদ্দ্বারা বস্তু ক্রীত হইয়া তদ্বিনিময়ে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহারই দান ও গ্রহণ অভিমত হইবে। সুতরাং বাণিজ্যার্থ দেয় ধন ঋণ বলিয়া গণ্য হইতে

পারে না। সুতরাং তজ্জন্য বিবাদ ও ঋণাদান বিধির বিষয় নহে। যথা—

"যস্যৈব দানং তস্যৈব তজ্জাতীয়স্য বা গ্রহণম্।

অতএব বাণিজ্যার্থপ্রযুক্তস্যাপি ধনস্য ন ঋণত্বম্॥"

বাণিজ্যপ্রযুক্ত ধন লইয়া যে বিবাদ উত্থিত হয়, তাহা সম্ভূয়-সমুত্থান বিধির বিষয় হইবে। এবং তাহা সেই স্থলেই প্রদর্শিত হইবে।

উক্ত দ্বিবিধ ঋণ অস্বতন্ত্রা স্ত্রী, নাবালক ও দাসকে দেওয়া বিধিবিরুদ্ধ। যথা—

"ন স্ত্রীভ্যোদাসবালেভ্যঃ প্রদদ্যাৎ কিঞ্চিদুদ্ধৃতম্।

দাতা ন লভতে তত্তু তেভ্যো যত্তু তদ্বসু॥"

বণিক, অস্বতন্ত্রা স্ত্রী, নাবালক ও দাসকে কোনও প্রকার উদ্ধার অর্থাৎ ঋণ প্রদান করিবেন না। যদি করেন, ত সেই প্রদত্ত অর্থ তিনি অভিযোগ করিয়া প্রাপ্ত হইবেন না।

"এতত্তু স্বাম্যনুমতিং বিনা।"

স্বামীর অনুমতির অভাব-স্থলেই এই নিষেধ। বিনা অনুমতিতে স্বাধীনভাবে ঋণ যাচ্ঞা করিলে, ধনী তাহাদিগকে ঋণ দিবেন না। যদি দেন, তবে তদীয় স্বামী, প্রভু ও পিতা কি তাঁহার সম্পত্তি তজ্জন্য দায়ী হইবেন না। (ক্রমশঃ)—

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

বর্ণভেদ।

মন্‌রো সাহেব যে বর্ণভেদ লইয়া এত আন্দোলন করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে যাহাদের মধ্যে বর্ণবৈষম্য আছে, তাহাদিগের জেতৃ-জাতির সহিত রাজনৈতিক সাম্য চাহিবার অধিকার নাই। ভারতীয় সেই বর্ণভেদের উৎপত্তি, পরিণতি, উপকারিতা, ও অপকারিতা সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ আমরা ইহার উৎপত্তিবিষয়ে আলোচনা করিব। এই বর্ণভেদের উৎপত্তিকাল নির্ণয় করা দুরূহ। যখন ভারতীয় আর্য্যেরা সারস্বত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ইউরোপ কি অবস্থায় ছিল, তাহার কোন প্রবাদ বা ইতিহাস নাই। সে খ্রীষ্টশকের প্রায় দুই তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। তখন সমস্ত পৃথিবী ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল। তাহার বহুকাল পরে গ্রীস ও রোমের অভ্যুদয় হয়। গ্রীস ও রোমের জ্ঞানালোক ক্রমে ক্রমে ইউরোপ হইতে অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত করে। আমরা যে সময়ের কথা আরম্ভ করিলাম, সে সময় আমাদের জেতা

ইংবাঙ্গ কাল কুক্ষিগত ছিলেন। তাহার বহুকাল পরে তাঁহাদিগের জাতীয় উৎপত্তি হয়।

সেই সুদূর অনৈতিহাসিক কালে আর্য্যেরা ভারতে আসিয়া দেশীয়গণ অপেক্ষা আপনাদিগের বর্ণগত উৎকর্ষ দেখিয়া সর্ব্বপ্রথমে 'শ্বেত কৃষ্ণ' দ্বারা শ্রেণীবিভাগ আরম্ভ করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যবর্ণ ও দেশীয়দিগকে অনার্য্যবর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ হইতে ক্রমে আর্য্য ও অনার্য্য শ্রেণী বিভাগ হয়। এইরূপে গাত্রবর্ণ ক্রমে জেতা ও জিত রূপ রাজনৈতিক শ্রেণীবিভাগে পরিণত হয়। বিজয়ী আর্য্যগণের মধ্যে তখন একমাত্র বর্ণ ছিল। সকল আর্য্যই সমান ছিলেন। এই সত্যযুগে আর্য্যেরা আপনাদিগের মধ্যে সাম্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। আর্য্য ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে ধনী, দীন, জ্ঞানী, অজ্ঞান, বীর ও অবীর সব সমান। সকলেই পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া মনে করিতেন। স্ত্রীজাতির প্রতি অবিশ্বাস ছিল না, অবরোধ ছিল না। স্ত্রী পুরুষ সকলেই স্বাধীন—অথচ সকলেই পরস্পরে মমতাপূর্ণ। উভয়ের প্রতি একই বিধি ব্যবস্থাপিত ছিল। মিথ্যা প্রবঞ্চনা কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা সরলতার ও সত্যপ্রিয়তার এক একটী জীবন্ত ছবি ছিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই পবিত্র হৃদয়াকাশে এক খানি কাল মেঘ উদিত হইয়া ছিল। সাম্যময় আর্য্য উপনিবেশে অনার্য্য সংস্রবে বৈষম্যের রেখা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। আদিম নিবাসিগণ নিরন্তর উৎপীড়ন করায় তাঁহাদিগের অন্তরে অনার্য্য বিদ্বেষ অতি গাঢ়তর ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঋক্‌বেদের সমস্ত স্তোত্র গুলিতেই এই ভাব দেদীপ্যমান। যখন তাঁহারা তামসী নিশির কোলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকিতেন, তখন অনার্য্যেরা আসিয়া তাঁহাদিগের অতি আদরের গোধন সকল লুটপাট করিয়া লইয়া যাইত—তাঁহাদিগের স্ত্রীপুত্রাদি কাড়িয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ করিত। এই জন্য তাঁহারা ঋক্‌বেদে অনার্য্যদিগকে দস্যু, নরভুক্, রাক্ষসাদি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই দস্যুগণের উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা রজনীতে গড়খাই করা শিবিরে সকলে একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা সংখ্যায় এত কম ছিলেন যে, দৈববল দ্বারা আত্মবল উপচিত করা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া যখন রজনীতে সকলে একত্র হইতেন, তখন দেবগণের স্তোত্র আরম্ভ করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া সমবেত স্ত্রীপুরুষমণ্ডলীর হৃদয় আকৃষ্ট করিতেন। এক এক জন আপন আপন হৃদয়ের ভাব

কবিতাকারে গাঁথিয়া তানলয়-যোগে গাইয়া সেই ক্ষুদ্র আর্য্যজগৎকে মাতাইতেন ; নির্ব্বাণোন্মুখ বীর্য্যবহ্নিতে প্রতিদিন ইন্ধন সংযোগ করিতেন। এই সকল স্তোত্রে আদি কবিগণের স্বভাবজ কবিত্ব, সরলতা, ও জীবন্ত ধর্ম্মবিশ্বাস পরিব্যক্ত। ইহাতে তাঁহারা দেবগণকে পরিচিত বন্ধুভাবে আহ্বান করিয়াছেন—তাঁহাদিগের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহাদিগের ভয়বিহ্বল হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতে আহ্বান করিয়াছেন,—এরূপ ভাবে আহ্বান করিয়াছেন যেন তাঁহারা সর্ব্বদা দেবগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতেন, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিপদে তাঁহারা আসিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কবিত্বপূর্ণ স্তোত্রনিচয় বহু কাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় অভিগীত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে বেদব্যাস সংহিতাকারে সে গুলি প্রকাশ করেন। ঋক্‌বেদ, বেদব্যাস-সংগৃহীত এই স্তোত্র-পরম্পরা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ঋক্‌বেদের কোন স্থানেই আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ নাই। সামবেদে এই ঋক্‌গুলি গীতাকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র ; সুতরাং তাহাতেও বর্ণবিভাগের উল্লেখ থাকিতে পারে না। যজুর্ব্বেদও ঋক্‌বেদের সার-সংগ্রহ মাত্র—অধিকন্তু তাহাতে কতকগুলি মন্ত্র সংযোজিত হইয়াছে মাত্র। ইহাতেও আধুনিক বর্ণ-বৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অথর্ব্ববেদ অনেক আধুনিক ; ইহা ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠ প্রণীত। ইহাতেও আধুনিক বর্ণবৈষম্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্ব্বর্ণের উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে কেবল 'ব্রাহ্মণে' দেখিতে পাওয়া যায়। এই ব্রাহ্মণগুলিতে পরিপুষ্ট সমাজের ছবি প্রতিফলিত। ইহা যে বৈদিক কালের অনেক পরে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ বেদে যাযাবর জাতির ছবি চিত্রিত। আর্য্যেরা তখন ভারতে নূতন আসিয়াছেন। সুতরাং বেদে গ্রাম নগরীর ছবি নাই। শিল্প বিজ্ঞানের কথা নাই, রাজপ্রাসাদ ও রাজপরিচ্ছদ দির উল্লেখ নাই। যাযাবর জাতির যাহা যাহা প্রয়োজন, কেবল সেই সকলের উল্লেখ আছে মাত্র। ক্রমে ক্রমে সমাজবন্ধন আরম্ভ হইল। আর্য্যেরা নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ক্রমে কষ্ট বোধ করিলেন। তাঁহাদের গোধনও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কারণ, গোমাংস এই সময়ে আর্য্যদিগের প্রধান খাদ্য ছিল। গোমেধ-যজ্ঞের এসময় বিশেষ আধিক্য ছিল। অতিথি আসিলেই তাহার জন্য একটী করিয়া গরু মারা হইত ; এই জন্য তাহাদিগকে 'গোঘ্ন' বলিত। 'গোঘ্ন' অর্থাৎ যাহার জন্য গোবধ হয়। ক্রমে আর্য্যগণের বংশ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আর গোমাংস ও গোদুগ্ধে কুলাইয়া উঠিল

না। সুতরাং কৃষির আবশ্যকতা হইয়া উঠিল। কৃষির আবশ্যকতা হওয়ায় তাঁহাদিগকে পল্লীবদ্ধ হইতে হইল। যাযাবর অবস্থায় তাঁহাদিগের সকলকেই প্রয়োজনানুসারে সকল কার্য্যই করিতে হইত। সুতরাং তখন কার্য্যভেদে বর্ণভেদের উৎপত্তি হয় নাই। এত দিনে কার্য্য-সৌকর্য্যার্থে তাঁহাদিগের শ্রমবিভাগ করা আবশ্যক বলিয়া বোধ হইল। তাঁহারা দেখিলেন, সকলেই যুদ্ধ করিতে গেলে সংসারধর্ম্ম চলে না—এবং সকলে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, আত্মরক্ষা হয় না। বিশেষতঃ সকলে সকল কাজে কিছু পটু হইতে পারে না। এই জন্য যে যে কার্য্যের উপযোগী, তাহারই উপর সেই কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। যাঁহারা কৃষিকার্য্যের উপযোগী, তাঁহাদিগের উপর কৃষি কার্য্যের ভার অর্পণ করা হইল। ইহাঁরা বৈশ্য বা বিশ নামে অভিহিত হইলেন। যাঁহারা যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ও শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারা রাজ্যরক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। ইহাঁরা বৈশ্যদিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতেন বলিয়া ইহাঁদিগকে 'বিশ-পতি' বলিত। ইহাঁদিগের অপর নাম ক্ষত্রিয়। আর্য্যদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস অতিশয় প্রবল ছিল—ইহা জীবন্ত ও জলন্ত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে, প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলেই দেবতারা আসিয়া তাঁহাদিগের সমস্ত অভাব মোচন করিবেন। তাঁহাদিগকে সমস্ত বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবেন। যখন তাঁহারা শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেন, তখন উচ্চৈস্বরে এই রূপে ডাকিতেন:—

'ইন্দ্র ও সোম! আমাদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট কর, তাহাদিগকে নরকে নিক্ষিপ্ত কর! ঐ উন্মত্তদিগকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর! শ্বাসরোধ করিয়া তাহাদিগকে মারিয়া ফেল! ঐ নরভুক্‌দিগকে কাটিয়া তাহাদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূরে নিক্ষিপ্ত কর'

'ইন্দ্র ও সোম! ঐ পিশাচদিগের বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ কর! অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন তাহা জ্বলিয়া উঠে, সেই রূপ উহাদিগের দেহে অগ্নি প্রজ্বালিত কর! ঐ আম-মাংস-ভুক্—ঐ ব্রাহ্মণ-দ্বেষীদিগকে চির দিন ঘৃণা করিও!'

'ইন্দ্র ও সোম! ঐ অনিষ্ট কারিগণকে নরকের গভীরতম অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত কর! দেখিও, যেন এক জনও সেই অন্ধকূপ হইতে উঠিতে না পারে!'

শত্রু-পরিবেষ্টিত আর্য্যের হৃদয় হইতে স্বতঃই এইরূপ প্রার্থনা বাহির হইত। যাঁহাদিগের হৃদয়ে এরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস—এরূপ জীবন্ত ধর্ম্মভাব, তাঁহাদিগের মধ্যে আধ্যাত্মিক-উৎকর্ষ-সম্পন্ন ব্যক্তির আদর যে অধিক হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং যাঁহাদিগের অধিকতর ধর্ম্মভাব ও উন্নতর কবিত্বশক্তি ছিল, তাঁহাদিগের প্রতি অধিকাংশেরই মন ভক্তিভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। আর্য্য-সাধারণ তাঁহাদিগকে অন্য কার্য্য হইতে

নিবৃত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত করিলেন। ইঁহারাই ব্রাহ্মণ (ব্রহ্মোপাসক) নামে অভিহিত হইলেন। সে সময় বৈশ্যেরা কৃষক ও সৈনিকের কার্য্য করিতেন। ক্ষত্রিয়েরা সেনাপতি ও রাজার কার্য্য করিতেন। এবং ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মযাজক বা আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। আর্য্যসেনা যখন শত্রুসেনার বিরুদ্ধে অভিযানোদ্যত হইত, তখন আচার্য্যগণ বিদারিয়া দেবতাদিগকে ডাকিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। আচার্য্য দেবতাগণকে আহ্বান করিয়াছেন, সুতরাং অবশ্য তাঁহারা সমরে তাহাদিগের সাহায্য করিবেন—এই বিশ্বাসে আর্য্যসেনা বিশ্বস্ত হৃদয়ে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। সে বিশ্বাস-প্রদীপ্ত হৃদয়ের গতিরোধ করা কাহার সাধ্য? অনার্য্যজাতি এই প্রচণ্ড আর্য্য-স্রোতস্বিনীর সহিত অবিরত সংঘর্ষে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ক্রমে ইহাতে বিলীন হইয়া গেল। যাহারা মিশিল না—তাহারা পর্ব্বতের অধিত্যকা প্রদেশে গিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করিল। সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি—সেই অদমিত ও অনমনীয় অনার্য্য জাতি। তাহারা সমস্ত ছাড়িল, তথাপি স্বাধীনতা বিক্রয় করিল না। এই পার্ব্বত্যজাতিসকলের অভ্যন্তরে আজও সেই দুর্দ্দমনীয় স্বাধীনতা-স্পৃহা বর্ত্তমান। আজও তাহারা সুযোগ পাইলেই স্বাধীনতা-পতাকা উড্ডীন করিয়া থাকে। সাঁওতাল বিদ্রোহ ও রম্পাবিদ্রোহ প্রভৃতি তাহার প্রমাণ। যে সকল অনার্য্য যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, আর্য্যেরা তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন ও চতুর্থ বর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন। বলা বাহুল্য যে, এই চতুর্থ বর্ণের নাম শূদ্রবর্ণ। এইরূপে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হইল। এত দিনে ভারতে শান্তি বিরাজিত হইল। আর্য্য অনার্য্যে যে নিরন্তর সংঘর্ষ চলিতেছিল, তাহা মিটিয়া গিয়া আভ্যন্তরীণ উন্নতির সূত্রপাত হইল। আবার নূতন করিয়া কার্য্য বিভাগ হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কার্য্য পূর্ব্বের ন্যায়ই রহিল। কিন্তু বৈশ্য ও শূদ্রের কার্য্যের পরিবর্ত্তন হইল। এত দিন বৈশ্যগণকে যুদ্ধের সময় সৈন্যের কার্য্য ও কমিসেরিয়টের কার্য্য, এবং শান্তির সময় কৃষিকার্য্য করিতে হইত। কিন্তু এক্ষণে তাঁহাদিগের স্কন্ধে সে ভার রাখার আর আবশ্যকতা রহিল না। অসংখ্য শূদ্র হিন্দুসমাজভুক্ত হওয়ায়, তাহাদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত করিয়া বৈশ্যেরা এক্ষণে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। আর্য্য-অনার্য্য-মিলনের পূর্ব্বে কমিসেরিয়েট বিভাগও বৈশ্য-গণের হস্তে ছিল। সেই সময় হইতেই তাঁহারা ক্রয়-বিক্রয়ে পারদর্শী হইয়াছিলেন। কমিসেরিয়েট ও সৈনিক বিভাগ হাতে থাকিলে লোকে যেরূপ সহজে ধনশালী হয়, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। বৈশ্যেরা

এক্ষণে সেই সঞ্চিত ধন বাণিজ্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ক্রমে তাঁহারা বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যে অসাধারণ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। এক দিন এমন গিয়াছে যে বৈশ্যগণের বহির্বাণিজ্যপোত—রোম, ভিনিশ, মিসর, সিংহল, জাবা, চীন ও জাপান প্রভৃতির বন্দরে গমনাগমন করিত। এ দিকে শূদ্র জাতি কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও পরিপুষ্টিতে রত রহিলেন। এই শান্তির সময়েই ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগের অধিকার সমস্ত অনাক্রান্ত রাখিবার জন্য বেদের শাখা প্রশাখা করিতে লাগিলেন। বিবাদ মিটিয়া গেলে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বতঃই কমিয়া আসিল। যখন সকলেই প্রাণভয়ে আকুলিত ছিলেন, যখন সৈন্যগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ঋষিবৃন্দের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবগণ রণস্থলে তাহাদিগের শরীরে আবির্ভূত হইতেন, এবং সেই বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা রণে অজেয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জীবন-মৃত্যু-সংশয়কালে ঋক-প্রণেতা ব্রহ্মর্ষিগণের বড় আদর ছিল। শুদ্ধ সৈন্য-গণের কেন, আর্য্যজাতি সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে দেবতারা সহায় না হইলে, যুদ্ধে জয় লাভ হয় না। এবং ব্রহ্মর্ষিগণের স্তোত্র ভিন্ন আর কিছুতেই দেবগণ সন্তুষ্ট হন না. সুতরাং যত দিন যুদ্ধ ছিল, তত দিন ব্রাহ্মণের আদরের আর সীমা ছিল না। এ বিশ্বাস ব্রাহ্মণেরা আপনারাও করিতেন। ব্রাহ্মণেরাও যে বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহাদিগের আরাধনায় দেবতারা তুষ্ট হইয়া অভিষ্ট সিদ্ধি করেন, তাহা তাঁহাদিগের স্তোত্রের একাগ্রতা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হয়। এই একাগ্রতা ঋক-বেদের অনেক স্তোত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটীর ছবি আমরা দিতেছি :—

‘হে বরুণ! তোমার সাহায্য বিনা আমি নয়নের পল্লব ফেলিতেও অক্ষম। আমি যদিও প্রতিদিন তোমার আদেশের বিপরীতাচরণ করিতেছি, তথাপি দেখিও যেন আমায় মৃত্যুর হস্তে সমর্পণ করিও না। দেব! মৎপ্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ কর। আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। এস একবার দেখা দাও, এস আবার অনেক দিনের বন্ধুর ন্যায় পরস্পর কথাবার্ত্তা কহি।’

আর এক জন কবি স্তব করিলেন—

‘হে বরুণ! আমার স্তব শ্রবণ কর, আমি তোমার সাহায্যভিখারী হইয়া ডাকিতেছি, আমায় সাহায্য দেও; আমায় আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমি সুখী হই।’

‘হে বরুণ! হে রাজরাজেশ্বর! হে স্বর্গমর্ত্তের অধীশ্বর! দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর।’—ঋক্‌বেদ ১। ২৫।১৯।

একাগ্রতা ও দৃঢ় বিশ্বাসের ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি দিব? কিন্তু ব্রাহ্মণগণের এ আধিপত্য চিরদিন

অক্ষুণ্ণ রহিল না। যখন শত্রু দমিত হওয়ায় আর্য্যাবর্ত্তে শান্তি বিরাজিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণের আধিপত্য ক্ষত্রিয়গণের অসহ্য হইয়া উঠিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরা ও অভ্যস্ত আদরে বঞ্চিত হইয়া ক্রোধানলে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের এই সময়কার স্তোত্র রাগদ্বেষাদিতে পরিপূর্ণ। দুই একটী স্তোত্রের ছবি দেখিলেই তাহা প্রতীত হইবে:—

'হে মরুদ্গণ! যাহারা আমাদিগকে উপহাস করে, যাহারা ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে—তাহাদিগকে পুড়াইয়া মার।'

'হে সোমদেব! ব্রাহ্মণেরা এত দিন তোমাকে কি তাহাদিগের রক্ষক বলিয়া স্বীকার করে নাই? তাহারা কি বলে নাই যে, তুমি তাহাদিগকে শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ? তবে ব্রাহ্মণেরা যখন উপহসিত হইতেছে, তখন কেমন করিয়া তুমি উদাসীন রহিয়াছ? তোমার জ্বলন্ত বর্শা ব্রাহ্মণদ্বেষ্টার প্রতি নিক্ষেপ কর।'

'আগামিনী উষা আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক! সুদৃঢ় পর্ব্বত সকল আমাদিগকে রক্ষা করুক ইত্যাদি। ঋক্‌বেদ ৬।৫২।

এই ব্রহ্মদ্বিট্ যে ক্ষত্রিয়—তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ, এই সময় বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছেন। তিনি ঘোরতর তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ও তদ্বংশীয়গণের অনেকগুলি স্তোত্র ঋক্‌বেদ সংহিতায় সংগৃহীত হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে পরাস্ত হইয়া অগত্যা তাঁহাকে স্বদলভুক্ত করিয়া লইলেন। স্বদলে লইলেন বটে, কিন্তু পূরা লইলেন না। তাঁহাকে মহর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। স্পষ্ট ব্রাহ্মণ বলিলেন না। ব্রাহ্মণেরা আর এক জন ক্ষত্রিয়ের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ভীত হইয়া তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি দিয়া ভুলাইলেন। এরূপ কথিত আছে যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও বিদেহরাজ সুপ্রসিদ্ধ জনকের নিকট শাস্ত্রজ্ঞানে পরাস্ত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণেরা জনকের নিকট পরাস্ত হইয়াও তাঁহাকে রাজর্ষিমাত্র উপাধি দিয়াছিলেন। আধ্যাত্মিক উন্নতিতে ক্ষত্রিয়েরা যে ব্রাহ্মণগণের সমকক্ষতা লাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা তাহার বাধা সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।

যাহাতে ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তির ভাব প্রবল হয়, যাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ-পূজাকে দেবাদিষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণেরা ঋক্‌বেদের স্তোত্রের মধ্যেও সেরূপ নীতি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। বেদ আর্য্য জাতির সকলেই অপৌরুষের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, "সুতরাং বেদের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিলে নরকে

যাইতে হইবে," এই ভয়ে ক্ষত্রিয়েরা ইহার বিরুদ্ধাচরণ হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন—এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয়, এরূপ স্তোত্রগুলি রচিত হয়। ঋক্‌বেদের ৭।৫০।৮ স্তোত্র পাঠ করিলেই আমাদের কথা বুঝিতে পারিবেন। তাহার মর্ম্ম এই:—

'যে রাজা পুরোহিতকে পুরোবর্ত্তী করিয়া চলেন, তিনিই স্বরাজ্যে ও স্বগৃহে সুপ্রতিষ্ঠাপিত থাকেন, তাঁহার রাজ্যে মেদিনী শস্যশালিনী হন, তাঁহার প্রজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে। যে রাজা শরণাগত ব্রাহ্মণকে ধন সম্পত্তি দিয়া রক্ষা করেন, তিনি অবাধে শত্রুমিত্রের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিতে পারেন,, ঈশ্বর তাঁহাকে সকল বিপৎ হইতে রক্ষা করেন'।

ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়গণকে এইরূপে শুদ্ধ ভুলাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন এরূপ নহে, তাঁহাদিগের উন্নতি-পথে অনেকগুলি কণ্টক রোপণ করিয়া রাখিলেন। বেদের স্তোত্রগুলির উচ্চারণের নিয়ম এরূপ সূক্ষ্ম করিলেন যে যাঁহারা আশৈশব তাহার উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ সহজে উচ্চারণ করিয়া উঠিতে পারে না। এদিকে তাঁহারা লোকের মনে এরূপ সংস্কার জন্মাইয়া দিতে লাগিলেন যে, বেদের শব্দের বা বর্ণের উচ্চারণের ঈষৎ তারতম্য হইলেও দেবতারা রুষ্ট হন। সুতরাং কার্য্যতঃ আশৈশব বেদগায়ী ব্রাহ্মণ ব্যতীত বেদের উচ্চারণে আর কাহারও অধিকার থাকিল না। সুতরাং অগত্যা জনসাধারণের দেবতুষ্টি-বিধানের নিমিত্ত ব্রাহ্মণবর্গের শরণাপন্ন হইতে হইত। এইরূপে লোকশিক্ষায়, যাজনকার্য্যে ও রাজোপদেশে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য রহিয়া গেল। যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ স্তব না করিলে, ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন হন না; ইন্দ্রাদি দেবতা প্রসন্ন না হইলেও সৈন্যের মনে বিজয়াশা জন্মে না, সৈন্য আশা-প্রদীপ্ত না হইলেও বিজয়লক্ষ্মী রাজার অঙ্ক-শায়িনী হন না—সুতরাং, রাজাকে ব্রাহ্মণচরণে লুণ্ঠিত শির হইতেই হইত। রাজাকে ব্রাহ্মণচরণে লুণ্ঠিত-শির ও ব্রাহ্মণের অনুগ্রহপ্রার্থী দেখিয়া প্রজারাও রাজগুরু ব্রাহ্মণের শরণাপন্ন হইত। রাজা প্রজা সকলেই ব্রহ্মশাপের ভয়ে অস্থির। ব্রাহ্মণকে যে কোন প্রকারে প্রসন্ন করিতে পারিলেই দেবতারা প্রসন্ন হইবেন—সকলেরই এই বিশ্বাস।

এদিকে ব্রাহ্মণেরাও এই বিশ্বজনীন বিশ্বাসের সুবিধা লইতেও ত্রুটি করেন নাই। তিনি আপনাকে দেবোপাসক হইতে ক্রমে উচ্চতর পদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে তিনি আপনাকে 'মনুষ্য-দেব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিলেন। বৈদিক যুগে শ্রাদ্ধ তত দূর গড়ায় নাই। 'ব্রাহ্মণ'-যুগেই দেবপূজক ব্রাহ্মণ স্বয়ং দেবমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। শতপথব্রাহ্মণে

(২য় অ।২।৩) লিখিত আছে যে, দুই শ্রেণীর দেবতা আছেন। প্রথমতঃ স্বর্গীয় দেবগণ, দ্বিতীয়তঃ মনুষ্য দেবগণ। যাঁহারা সমগ্র বেদ পাঠ করিয়াছেন ও বেদের প্রকৃত উচ্চারণে সমর্থ, তাঁহারাই মনুষ্যরূপী দেবতা। এই দুই দেবতারই পূজা ব্যতীত মানবের মুক্তি নাই। ও দিকে ব্রাহ্মণেরা প্রথমে যে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ, ও জলন্ত বিশ্বাসে আর সকলকে মুগ্ধ করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ক্রমশঃ সে মাহাত্ম্য, নৈতিক উৎকর্ষ ও জলন্ত বিশ্বাসের অভাব ঘটিতে লাগিল। সুতরাং আপনাদিগের আধিপত্য রক্ষার জন্য ব্রাহ্মণগণকে আধিদৈবিক উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল।

তাঁহাদিগের প্রাথমিক স্তোত্র-পরম্পরায় স্বার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয় নাই। তখন তাঁহারা একমাত্র বর্ণ বই আর কিছু জানিতেন না। তখন নিঃস্বার্থ স্বজাতিপ্রেম তাঁহাদিগের কার্য্যের একমাত্র নিয়ামক ছিল। সে সত্যযুগের কথা এখন ব্রাহ্মণ ভুলিয়া গিয়াছেন। ভাগবত পুরাণে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে 'সত্যযুগে একমাত্র বেদ, একমাত্র দেবতা, একমাত্র অগ্নি ও একমাত্র বর্ণ ছিল। ত্রেতাযুগে পুরোরবার সময়েই তিন বেদ ও তিন বর্ণ হয়।' বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই বর্ণগত ভেদের উৎপত্তির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ লিখিত আছে যে, "সর্ব্বপ্রথমে একমাত্র 'ব্রহ্ম' ছিলেন। তাঁহা হইতেই দেবমানবের সৃষ্টি হইয়াছে। মানবসৃষ্টির প্রথম সৃষ্টি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় সৃষ্টি ক্ষত্রিয়, তৃতীয় সৃষ্টি বৈশ্য, চতুর্থ সৃষ্টি শূদ্র। (শূদ্রকে পৃথিবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অর্থাৎ ধরিত্রী যেমন সর্ব্বভূতের ভর্ত্রী, সেইরূপ শূদ্রজাতি সকল বর্ণেরই আহারদাত্রী)। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। যে পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ঘৃণা করিবে, তাহাকে গুরুবধের পাতকী হইতে হইবে।'—এই সকল উক্তি দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে ব্রাহ্মণেরা এই কালে শাস্ত্রের ভয় প্রদর্শন দ্বারা ভক্তি চিরস্থায়িনী করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। যদি গুণ থাকে ত ভক্তি আপনিই আসিবে—এ বিশ্বাসের উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়া থাকিতে সাহস করেন নাই। ইংরাজেরা এখন ভুল করিতেছেন—বেয়নেটের ভয় দেখাইয়া ভক্তি আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—তাঁহারাও সেই ভুল করিয়াছিলেন। প্রভেদ এই যে, ইংরাজেরা বেয়নেটের ভয় দেখাইতেছেন, ব্রাহ্মণেরা পরলোকের ভয় দেখাইয়াছিলেন। যখন পরলোকের ভয় দেখাইয়াও কুলাইল না, তখন চাপের ও শাপের ভয় দেখাইতেও পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। 'শাপেন চাপেন বা' শাপে হয় ভাল, নতুবা শত্রু দমনের জন্য তাঁহারা চাপ গ্রহণ করিতেও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন।

এই স্বধর্ম্মচ্যুতিরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাঁহারা হাতে হাতে পাইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ-গণের এই একাধিপত্য-প্রিয়তার জন্য ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহাদিগের ঘোরতর শত্রুতা বাধিয়া উঠিল। ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের এরূপ একাধিপত্য অস্বীকার করিলেন। অনেক রক্তারক্তির কথা ব্রাহ্মণ ও পুরাণাদিতে লিখিত আছে। আমরা এখানে দুই একটী মাত্রের উল্লেখ করিব।

ক্ষত্রিয়েরাই প্রথমে এই সংঘর্ষ উপস্থাপিত করেন। ভৃগু-বংশীয়েরা কার্ত্তবীর্য্যের পুরোহিত ছিলেন।* কার্ত্তবীর্য্য তাঁহাদিগকে অনেক অর্থ দিয়া যান। তাঁহাদিগের অধিকাংশই দানাদি দ্বারা সেই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন—কেহ কেহ তাহা বিল-মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ দুঃস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জানিতেন যে ভৃগুবংশীয়গণের নিকট কার্ত্তবীর্য্য-প্রদত্ত ধন আজও মজুত আছে। তাঁহারা ভৃগুবংশীয়গণের নিকট এই ধন চাহিলেন। না পাইয়া শেষে তাঁহাদিগের বাটীর মাটী খুঁড়িতে লাগিলেন। খুঁড়িতে খুঁড়িতে সেই গুপ্ত ধন বাহির হইয়া পড়িল। তখন তাঁহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভৃগুবংশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—অধিক কি গর্ব্ভস্থ শিশুসন্তান পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল দৈববলে দুই একটী রক্ষা পাইয়াছিল। পরশুরাম তাহার অন্যতর। পরশুরাম ভৃগুকুল-তিলক যমদগ্নির পুত্র। সেই বীরের হৃদয়ে আশৈশব দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসাবৃত্তি উদ্দীপিত ছিল। যথাকালে তিনি পিতৃকুলের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার ন্যায় বীর তৎকালে জন্মে নাই। তাঁহার প্রচণ্ড কুঠারের আঘাতে ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইতে লাগিল। শুনিলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায় যে, তিনি একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া সামন্ত পঞ্চকে পাঁচটী রৌধির হ্রদ প্রস্তুত করিয়া, সেই শত্রু-শোণিতে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন*। পরশুরাম নিজে পরম যোগী ছিলেন। এ নরহত্যায়—এ স্বজাতিধ্বংসে—তাঁহার প্রতিহিংসা সাধন ভিন্ন অন্য কোন স্বার্থসাধনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি এইরূপে ভারত-ভূমিকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া, ও তাহাতে ব্রাহ্মণের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করিয়া কাশ্যপ মুনির হস্তে সমস্ত ভারতের সাম্রাজ্য অর্পণ পূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমিতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

যমদগ্নির মাতা সত্যবতী কান্যকুব্জাধিরাজ কুশিকবংশোদ্ভব গাধির কন্যা। এই গাধির পুত্রেরই নাম প্রখ্যাতকীর্ত্তি

* মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৬—১১৭ অধ্যায়, মহাবীরচরিত ও রঘুবংশ প্রভৃতি দেখ।

বিশ্বামিত্র। সুতরাং পরশুরাম বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়-পুত্র। পরস্পর এত নিকটসম্বন্ধী হইয়াও দুই জন দুই প্রতিকূল দিকে ধাবিত হইয়াছিলেন। পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের ধ্বংসে কৃতসঙ্কল্প বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণের একাধিপত্য-নাশে গৃহীতব্রত। ইক্ষাকুবংশীয় রাজা সুদেশের পৌরহিত্য লইয়া বশিষ্ঠের সঙ্গে বিশ্বামিত্রের যে ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহার অনেক কিংবদন্তী পুরাণাদিতে ব্যক্ত আছে। এখানে তাহার সবিস্তর বর্ণন অনাবশ্যক। এই সংঘর্ষের ফলে বিশ্বামিত্র মহর্ষি হইয়া ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিত্ব বা রাজ পৌরহিত্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। সেইরূপ এই সংঘর্ষকালে কাশীশ্বর অজাতশত্রু—যাঁহাকে কৌশীতকী ব্রাহ্মণ মহর্ষি গার্গ্য অপেক্ষায়ও অধিকতর বেদজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে,—এবং বিদেহরাজ জনক—যাঁহাকে যাজ্ঞবল্ক্য শতপথ ব্রাহ্মণে আপনা অপেক্ষা অধিকতর পণ্ডিত বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—রাজর্ষি উপাধিমাত্র পাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষি উপাধি পাইলেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা এক প্রকার অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল। বরং এই বিজয়ে সেই প্রভুত্ব অধিকতর সুদৃঢ় হইল।

এই সংঘর্ষের পূর্ব্বে বর্ণসংমিশ্রণের প্রতিকূলে কোন কঠোর নিয়ম বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এখন হইতে ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধ স্বধর্ম্মাতিরেকের বিরুদ্ধে নিয়ম করিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না; চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের মধ্যে আদান ও অন্নগ্রহণাদি নিষিদ্ধ করিলেন, এবং কঠোর সামাজিক দণ্ড দ্বারা এই পার্থক্যভাব চিরস্থায়ী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয় সকল পরশুরামের কুঠারাঘাতে প্রায় নির্ম্মূল হইয়াছিল। সুতরাং ভারতের শক্তিসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের দুর্দ্দমনীয় প্রভুশক্তিকে সংযমিত করিতে ক্ষত্রিয়কুল সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ অবস্থা বহুকাল থাকিতে পারে না। ব্রাহ্মণের অত্যাচার যখন একান্ত দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিল, তখনই কপিলবাস্তু নগরের অধীশ্বর শুদ্ধোদনের পুত্র ক্ষত্রিয়কুলতিলক শাক্যসিংহ বর্ণত্রয়ের কষ্ট নিবারণার্থ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

ব্রাহ্মণগণের একাধিপত্যপ্রিয়তাই ভারতে শাক্যসিংহ-প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম্মের আশুকৃতকার্য্যতার প্রধান কারণ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ জ্ঞানী; অভেদ বুদ্ধির ভাব সর্ব্ব প্রথমে তাঁহার অন্তরে উদিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি আদি বুদ্ধ বলিয়া প্রথিত। তিনি প্রচার করিতে লাগিলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সব সমান। চতুর্ব্বর্ণের নিকট তিনি এই সাম্য গান গাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ দীন দুঃখী অবহেলিত

ও পদদলিত শূদ্রজাতির নিকটই তিনি এই নব ধর্ম্মের সবিশেষ প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই গানের এমনই মোহিনী শক্তি যে, এ গান যখন যে দেশে যিনিই গাইয়াছেন, তিনিই জগৎকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছেন। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, গুরুগোবিন্দ, শাক্যসিংহ, মহম্মদ, শঙ্কর ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই এই সাম্যধর্ম্মের প্রচারক। প্রত্যেকেই এই নূতন গানে জগৎকে মাতাইয়া গিয়াছেন। প্রত্যেকেরই ছবি আজও জগতের কোন কোন স্থানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বৈষম্য-দগ্ধ জগতের আজও তাহা একমাত্র আশাস্থল।

ব্রাহ্মণ ও বেদের বিরুদ্ধেই শাক্যসিংহের অভ্যুত্থান। বৈষম্যের আকর ব্রাহ্মণজাতি, এবং বেদ তাঁহাদিগের আধিপত্য সংরক্ষণের প্রধান দুর্গস্বরূপ, সুতরাং এ দুইই উড়াইয়া দিতে তিনি কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি এই সুমহৎ ব্রত উদ্যাপনার জন্য রাজসিংহাসন, প্রাণময়ী ভার্য্যা, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহময় জনক জননী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অতি কঠোর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। নিজে আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া তিনি জগৎকে আত্মত্যাগ শিখাইলেন। বৈষম্যপূর্ণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রত্যেককে যে কঠোর সামাজিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এই নব ধর্ম্ম তাহা খুলিয়া দিল। নবীন উৎসাহে ভারত মাতিয়া উঠিল। সম্রাট হইতে কুটীরী পর্য্যন্ত সকলেই এই নব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। বুদ্ধ শুদ্ধ পুরুষ জাতির পায়ের বন্ধন খুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। তিনি স্ত্রীজাতিকেও সকল বিষয়ে পুরুষের সমান অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া বৌদ্ধ-প্রচারক ও বৌদ্ধ-প্রচারিকাগণ ভারত আলোড়িত করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারকার্য্য ভারতের সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ রহিল না। দেশ দেশান্তরে ও দ্বীপ দ্বীপান্তরে তাহা প্রসৃত হইয়া পড়িতে লাগিল। আজ দুই একটী মুক্তিফৌজ দেখিয়া ভারতবাসী অবাক্ হইতেছে, কিন্তু বত বৌদ্ধ মুক্তিফৌজ যে জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়া বেড়াইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই মোহমন্ত্র আজও মানবজাতির তৃতীয়াংশকে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছে। আজও যেখানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রবল, সেই খানেই জাতীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বর্ত্তমান। চীন জাপান প্রভৃতি তাহার নিদর্শন। ভারতে যে ছয় সাত শত বৎসর এই ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, সেই ছয় সাত শত বৎসরই ভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম কাল। ভারতের বাণিজ্যপোত, ভারতের রণতরি, ভারতের মুক্তিফৌজ এই সময়ই জগৎ আলোড়িত করিয়া বেড়াইয়াছিল। এই সময়েই শিল্পের চরমা কাষ্ঠা হইয়াছিল। এই সময়েই বিদ্যার বিমলজ্যোতি সর্ব্ব-

শ্রেণীতে এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিতে সমভাবে বিকীরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রী শূদ্রজাতি হইতে উৎপন্ন। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রভাবে ভারতের এরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল যে, গ্রীক নরপতিগণ ভারতীয় নরপতিগণের নিকট সন্ধিপ্রার্থী হইয়াছিলেন। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব-কালেই ভারত সিংহল জয় করিয়াছিল, এবং অজেয় সেকন্দর সাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এই সৌভাগ্য ভারতের দুরদৃষ্টবশতঃ চিরস্থায়ী হইল না।

এই সাম্যতন্ত্ররূপ প্রকাণ্ড বিপ্লব ছয় সাত শত বৎসরমাত্র ভারতে রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণের বুদ্ধির নিকটই পরাজয় স্বীকার করিল। সকলেই বোধ হয় জানেন যে প্রসিদ্ধনামা শঙ্করাচার্য্যই অলৌকিক প্রতিভাবলে আর্য্য-সাম্য-বায়ব্যাস্ত্রে বৌদ্ধ সাম্য-বরুণাস্ত্র উড়াইয়া দিলেন। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' বিষ দ্বারায় বিষ নষ্ট করার ন্যায় এক প্রকার সাম্য প্রচার দ্বারা অন্য প্রকার সাম্য বিলুপ্ত করিলেন। বুদ্ধ গাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র সকলেই সমান। শঙ্করাচার্য্য গাইলেন—'ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্' এক ব্রহ্মই সত্তা; অপর সমস্তই সত্তাভাস, প্রকৃত সত্তা নহে; জড়, অজড় সমস্তই এক ব্রহ্মময়। এই যে প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ দেখিতেছ—এ সেই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নয়। প্রকৃতি ভ্রমমাত্র, পুরুষই একমাত্র সত্তা;—অর্থাৎ যাহাকে তোমরা প্রকৃতি বলিতেছ, তাহা প্রকৃতি নহে—পুরুষ বা ব্রহ্ম—প্রকৃতি পুরুষ ভেদজ্ঞান অজ্ঞানের কার্য্য। এই মহা অস্ত্রের নিকট বৌদ্ধ অস্ত্র পরাস্ত হইল। যখন সবই এক—যখন জড়, অজড় সবই ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে—তখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, সভ্য ও অসভ্যে, দীন ও দরিদ্রে স্ত্রী ও পুরুষে কেন ভেদ থাকিবে? হঠাৎ যেন ভারতের মোহ নিদ্রা ভগ্ন হইল! ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম যেন আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া চির-লালিত বৈষম্য ভুলিয়া গেল। এই অদ্বৈতবাদ গহ্বরে বৌদ্ধ সাম্যবাদ বিলীন হইয়া গেল। বৈষম্যজনিত বিবাদ যেন কোথায় চলিয়া গেল। শূদ্র, যবন, পার্ব্বত্য, বৌদ্ধ প্রভৃতি সমস্ত সাম্প্রদায়িক নদ নদী যেন এই প্রকাণ্ড অদ্বৈতবাদ মহাসাগরে আসিয়া মিশিয়া গেল। সবই এক—সুতরাং সবই সমান—এই মহামন্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র উদ্‌ঘোষিত হইতে লাগিল। যে ভারতভূমি এত দিন হিন্দু-বৌদ্ধ-সংঘর্ষে রুধির কর্দ্দমিত হইতেছিল, আজ তাহাতে যেন শান্তিবারি পতিত হইল!

ধন্য শঙ্করাচার্য্য! ধন্য তোমার বিশ্বপ্রেম! ধন্য তোমার বুদ্ধিবল! তুমি আশৈশব ভারতের মঙ্গল-কামনায় দীক্ষিত ছিলে বলিয়া এরূপ অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলে! তুমি চণ্ডালের মন্ত্রশিষ্য হইতে কুণ্ঠিত হও নাই

বলিয়াই তুমি ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল এক করিতে পারিয়াছিলে! ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম এরূপ মাহাত্ম্য আর কখন দেখাইতে পারে নাই। এ মাহাত্ম্যের এক কণামাত্র আজ ব্রাহ্মণগণে থাকিলে, ভারতের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইত। এই আত্মধ্বংসকারী আর্য্য ভূমিতে তোমার মত নেতার আবার প্রয়োজন। দেব! তুমি যে অসাধ্য-সাধন করিয়া গিয়াছিলে, তোমার মত লোক ভিন্ন সে অসাধ্য-সাধন আবার করে কে? দেব! আসিয়া দেখ যে, ভারতে তোমার কীর্ত্তি লুপ্তপ্রায়! আবার ভারতবক্ষ ধর্ম্ম-সাম্প্রদায়িকতায় ছিন্ন ভিন্ন। হিন্দু ধর্ম্ম আবার স্বদক্ষিত সেই বিশাল বৃত্ত হইতে সঙ্কুচিত হইয়া সঙ্কীর্ণতর বৃত্তাভ্যন্তরে আসিয়া পড়িয়াছে! তুমি এক দিন হিন্দু ধর্ম্মে যে ঔদার্য্য সংক্রামিত করিয়াছিলে, যে ঔদার্য্যগুণে এক দিন হিন্দুধর্ম্ম সমস্ত ভারতবাসীকে অন্তর্লীন করিয়া মানবমণ্ডলীকে কুক্ষি-গত করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল—আসিয়া দেখ দেব! সে হিন্দুধর্ম্ম এখন কি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে! কতিপয় সঙ্কীর্ণমনা ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অনৌদার্য্যে ইহা ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর সীমায় আবদ্ধ হইতেছে! তুমি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে যে পরিমাণে তুলিয়াছিলে, প্রতিক্রিয়ার বেগে ইহা সেই পরিমাণে নামিয়া পড়িয়াছে। সেই বর্ণভেদ, সেই জাতিভেদ, সেই স্ত্রী পুরুষ বৈষম্য আবার পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। যায়—সব যায়—সোণার ভারত অন্তর্বিচ্ছেদে ছার খার হয়! দেব! এক বার আবির্ভূত হইয়া এই বিষম বিপত্তিকালে তোমার হৃদয়ের ধন ভারতকে উদ্ধার কর! আবার নতজানু হইয়া চণ্ডালের নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর! আবার ভারতে বিশ্বব্যাপী সাম্যের—বিশ্বজনীন একত্বের—ভেরি বাজাও। খ্রীষ্টান্, মুসমান, বৌদ্ধ, জৈন, শীক, য়িহুদী, ব্রাহ্ম, পারসীক—ভারতীয় ধর্ম্ম সম্পদায়কে আবার বিশ্ব-প্রেম-বলে হিন্দুধর্ম্মের কুক্ষিগত কর! দেব! তাহা না হইলে—আবার বলি—সব রসাতলে যায়।

ব্রাহ্মণ! তুমিই ভারতকে অষ্ট পৃষ্ঠে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছিলে, তুমিই আবার শঙ্করাচার্য্য-রূপে সেই শৃঙ্খল খুলিয়া দিয়াছিলে; আবার শৃঙ্খল পরাইয়াছ,—আবার শঙ্কর-মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া সেই শৃঙ্খল খোল! তাহা হইলেই তোমার গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইবে! শঙ্করাচার্য্য অসংখ্য ভাঙ্গা দল জোড়া দিয়াছিলেন—ছিন্ন ভিন্ন বিশীর্ণ ভারতকে এক করিয়াছিলেন; সকলকে পায় ধরিয়া ডাকিয়া এক ধর্ম্ম-মন্দিরের ভিতরে আনিয়াছিলেন। সে সময় শঙ্করাচার্য্য ভারত-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত না হইলে, বোধ হয় এত দিন জগতে হিন্দুধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইত। সেই ধর্ম্মবীরের মাহাত্ম্যেই হিন্দুধর্ম্ম নবীন তেজে উঠিয়া কিছু কাল ভারতে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা বিলুপ্ত

করে, ভারতের স্তরে স্তরে আবার হিন্দুধর্ম্মের বীজ নিহিত হয়। কিছু কাল ধরিয়া হিন্দুধর্ম্ম শঙ্কর-মাহাত্ম্যে ভারতে অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী প্রভুতা ভোগ করিয়াছিল। অদ্বৈতবাদময় সাম্যের ভেরি বহু দিন ধরিয়া ভারতের পর্ব্বতে পর্ব্বতে, গুহায় গুহায়, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে, গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, উদ্ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু কি পাপে জানিনা—ইতিহাস আমাদিগকে সে বিষয়ে সহায়তা করে না—আবার বৈষম্যের ভাব সমস্ত ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে! ব্রাহ্মণ নিজের আধিপত্য রক্ষার জন্য আবার বর্ণ-বৈষম্য-রূপ লূতা-তন্তুজালে ভারতকে আচ্ছন্ন করিয়াছেন! কৌলীন্যরূপ উপসর্গ আসিয়া আবার বর্ণবৈষম্য রূপ রোগের সহিত যোগ দিয়াছে।

ব্রাহ্মণেতর বর্ণকে ও স্ত্রীজাতিকে জ্ঞান-ভাণ্ডারে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার ফল হিন্দুধর্ম্মে সাধারণের সহানুভূতি বিরহ। বলা বাহুল্য যে হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুরাজত্বে সাধারণের এই সহানুভূতি-বিরহই ভারতের জাতীয় পতনের মূল। পাণিপথ সমরক্ষেত্রে যে অগণিত হিন্দু-সেনা সমবেত হইয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি ও ব্রাহ্মণ্য রাজত্বের প্রতি তাহাদিগের অবিচলিত ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে সে অজেয় সেনাকে পরাস্ত করিতে কাহার সাধ্য হইত? জনসাধারণ যদি না জানিত যে 'রামে মারিলেও মারিবে, রাবণে মারিলেও মারিবে'—তাহা হইলে আজ বহু কোটী লোক মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধ-বীর্য্য সর্পের ন্যায় পড়িয়া থাকিত না। বহু কোটী হিন্দু থাকিতে ভারত কখন অনন্তকাল ঘুমাইয়া থাকিত না!

যতদিন না ভারত আবার এক-জাতীয় ধর্ম্মের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে, যতদিন না আবার ভারতে সাম্যভেরি বাজিতেছে, ততদিন ভারতে জাতীয় জীবনের আশা নাই। সে একীকরণ অদ্বৈতবাদে কি দ্বৈতবাদে, হিন্দুধর্ম্মে কি ব্রাহ্মধর্ম্মে হইবে জানি না। তবে বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় নেতার যে প্রয়োজন হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সেই বিশাল হৃদয়, সেই বিশ্বপ্রেম ব্যতীত যে ভারতের ধর্ম্মসমীকরণ অসাধ্য তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। অতিবিশাল ও গভীর বৌদ্ধধর্ম্মকেও যে উদার হিন্দুধর্ম্ম একদিন কুক্ষিগত করিতে পারিয়াছিল, সে উদার হিন্দুধর্ম্ম যে ভারতের বিবিধ ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে আবার অন্তর্লীন করিতে পারিবে না—কেমনে বলিব? উপকরণ সামগ্রী সমস্তই হিন্দুধর্ম্মের অভ্যন্তরে নিহিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে কালের উপযোগী দ্রব্য সকল বাছিয়া লইয়া একাগ্রচিত্তে শব-সাধনা করিলেই সাধক সিদ্ধি লাভ করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি খ্রীষ্টানধর্ম্মের দিকে বেশী না গড়াইত, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায় এই সাধনায় সিদ্ধ হইতেন। কিন্তু তাঁহারা এক্ষণে দিন

দিন হিন্দুজাতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছেন। এই জন্য হিন্দু-জাতির উপর আর কর্তৃত্ব করিতে পারিবেন কি না সন্দেহ-স্থলে দাঁড়াইয়াছে।

ব্রাহ্মণ! তুমি এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের উদার নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া আর্য্য নামের গৌরব পুনরুদ্ধার কর। বৈষম্যময় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতের যে অনিষ্ট করিয়াছ, আবার সাম্য-সুধাময় গান গাইয়া সেই গুরুতর পাপের গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত কর! আবার ভারতে নব জীবন সঞ্চারিত হউক!! মিলিত ভারত—ঘনীভূত ভারত—আবার জগতের আরাধ্য হউক!! কে বলিতে পারে, সে দিন আর আসিবে না?

স্বাস্থ্য।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

প্রসবের কাল নবম বা দশম মাস। আয়ুর্ব্বেদ বলেন—তৎপরে ও একাদশ বা দ্বাদশ মাসে প্রসব হওয়ায় স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটে (১)। নবম মাসে মধুর-ঔষধ-সিদ্ধ তৈল দ্বারা অনুবাসন করা আয়ুর্ব্বেদের অভিপ্রায়। সেই সময়ে কোষ্ঠাশয় স্নেহ-সিক্ত হইলে মল পরিষ্কার থাকিলে, বায়ুর অনুলোম হয় এবং প্রসবের কোন ব্যাঘাত জন্মে না (২)। ইংরাজিশাস্ত্রও এ বিষয়ে এক মত। ধাত্রীশিক্ষা-প্রণেতা বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় সুযোগ্য ডাক্তার মহোদয়ও উপদেশ দিয়াছেন, নবম মাসে গর্ভিণীর উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান নিতান্ত কর্ত্তব্য। সুখ-প্রসবের জন্য সুতরাং গর্ভিণী ও তাঁহার অভিভাবকগণের এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। গর্ভিণী অন্য কোন ঔষধ সেবন না করিয়া যদি নবম মাসে উষ্ণ দুগ্ধের সহিত এরণ্ড তৈল পান করে, তাহা হইলে বিশেষ উপকার হয়। গর্ভাশয়ের বায়ুর কোন বিকৃতি-ভাব না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। প্রসবকালীন সন্তানের বিকৃতি-ভাব হইয়া মূঢ় গর্ভরোগ জন্মিবার বায়ু-বিকৃতিই মুখ্য কারণ (৩)। সূতিমারুতের

(১) নবমে দশমে মাসি নারী গর্ভং প্রসূয়তে।
একাদশে দ্বাদশে বা ততোঽন্যত্র বিকারতঃ।
—ভাব প্রকাশ।

(২) নবমেতু খল্বেনাং মাসে মধুরৌষধ-সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ।
—চরক।

ততঃ পয়োমধুর-কষায়-সিদ্ধেন তৈলেনানুবাসয়েৎ, অনুলোমে হি বায়ৌ সুখং প্রসূয়তে, নিরুপদ্রবা চ ভবতি।
সুশ্রুত।

(৩) মূঢ়ঃ করোতি পবনঃ খলু মূঢ়গর্ভং।"
নিদান।

বিকৃতি হইলে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে প্রতিবন্ধক হয়। এরণ্ড তৈল বায়ু শান্তির অসাধারণ ঔষধ। এ ঔষধে বায়ু যেরূপ প্রকৃতিস্থ রাখে, সেইরূপ মলাশয় পরিষ্কার করে। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া এরণ্ড তৈল ব্যবহার করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, সহজেই সিদ্ধান্ত হইবে। সুশ্রুতাচার্য্য এরণ্ড তৈলের গুণবর্ণন-স্থলে বলিয়াছেন (৪) "এরণ্ড তৈল মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু ও পশ্চাৎ কষায়-রস বিশিষ্ট, সূক্ষ্ম, স্রোতোবিশোধন কারক, ত্বকের হিতকর, শুক্রবৃদ্ধিকারক, পাকে মধুর, ব্যবহারে শরীরের বলি-পলিতাদি সহজে জন্মে না, যোনি এবং শুক্রের শোধনকারক, আরোগ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি ও বলের উৎপাদক, বাতশ্লেষ্মা ও শরীরের অধোভাগের দোষ-নাশক।" এই সকল গুণ পর্য্যালোচনা করিলে, পূর্ণ গর্ভিণীর পক্ষে এরণ্ড তৈল যে সর্ব্বতোভাবে হিতকর, তদ্বিষয় নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হইবে।

সুশ্রুতাচার্য্য প্রসবের পূর্ব্বরূপ লক্ষণ-নির্দ্দেশ-স্থলে বলিয়াছেন—(৫) কুক্ষি-দেশ শিথিল, হৃদয়ের বন্ধন মুক্ত ও উরু-দ্বয় বেদনাবিশিষ্ট হইলে, প্রসবকাল উপস্থিত বলিয়া জানিবে। উপস্থিত প্রসবে কটি ও পৃষ্ঠদেশের চতুর্দ্দিকে বেদনা হয়, এবং নিরন্তর যোনি-মুখ হইতে শ্লেষ্মার নিঃসরণ ও নিরন্তর মলমূত্রের প্রবৃত্তি হয়। চরকাচার্য্য বলিলেন (৬) গাত্রের ক্লান্তি, মুখ ও চক্ষুর গ্লানি, কুক্ষির বন্ধন বিভিন্নতার ন্যায় বোধ, অবস্রংসন, অধোদেশের গুরুতা, বংক্ষণ, বস্তি, কটি, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠবেদনা, যোনি-স্রাব ও ভোজনে অনিচ্ছা হয়, তদনন্তর শ্লেষ্মা ও গর্ভোদকের প্রাদুর্ভাব হইলে রোগীকে ভূমিতে কোমল শয্যায় শয়ন করাইয়া চারি দিকে প্রসবকার্য্যে দক্ষ বুদ্ধিমতী স্ত্রীগণ সান্ত্বনাজনক বাক্যে আশ্বাস দিয়া তাহার মনের তুষ্টি সম্পাদন করিবে।

---

(৪) এরণ্ডতৈলং মধুরমুষ্ণং তীক্ষ্ণং দীপনং কটুকষায়ানুরসং সূক্ষ্মং স্রোতোবিশোধনং ত্বচ্যং বৃষ্যং মধুর-বিপাকং বয়ঃ-স্থাপনং যোনি-শুক্র-বিশোধনমারোগ্য-মেধাকান্তি-স্মৃতি-বলকরং বাতকফহরমধোভাগদোষহরঞ্চ।

সুশ্রুত।

(৫) জাতে হি শিথিলে কুক্ষৌ মুক্তে হৃদয়বন্ধনে, সশূলে জঘনে নারী জ্ঞেয়া সা তু প্রজায়িনী।

তত্রোপস্থিতপ্রসবায়াঃ কটিপৃষ্ঠং প্রতি সমন্তাদ্বেদনা ভবত্যভীক্ষ্ণং পুরীষ-প্রবৃত্তির্মূত্রং প্রসিচ্যতে যোনিমুখাৎ শ্লেষ্মা চ।

(৬) ক্রমো গাত্রাণাং গ্লানিরাননস্যাক্ষ্ণো-র্বিমুক্তবন্ধনত্বমিব কুক্ষেরবস্রংসনমধো-গুরুত্বং বংক্ষণ-বস্তি-কটি-পার্শ্বপৃষ্ঠ নিস্তোদো যোনেঃ প্রস্রবণমনন্নাভি-লাষশ্চেতি, ততোঽনন্তরমাবীনাং প্রাদুর্ভাবঃ প্রসেকশ্চ গর্ভোদকস্যাবী-প্রাদুর্ভাবে তু ভূমৌ শয়নং বিদধ্যাৎ, মৃদ্বাস্তরণোপপন্নং তদধ্যাসীত, সা তা-সমন্ততঃ পরিবার্য্য যথোক্তগুণা স্ত্রিয়ঃ।

সুশ্রুতাচার্য্য বলেন,—(৭) প্রসবের কালে মঙ্গলকার্য্য স্বস্তি-বাচন করিবে। গর্ভিণী পুন্নাম ফল হস্তে করিয়া থাকিবে; শিশুগণ তাহার চতুর্দ্দিকে রহিবে। গর্ভিণীকে তৈল মাখাইয়া উষ্ণোদকে পরিষেক করতঃ যথেষ্ট পরিমাণে যবের মণ্ড আকণ্ঠ পান করাইবে। তদনন্তর মৃদু কোমল বিস্তৃত শয্যায় উপাধানে শয়ন করাইয়া উরুদ্বয় কিঞ্চিৎ উন্নত করাইয়া রাখিবে, প্রসব-কার্য্যে কুশলা পরিণতবয়স্কা চারিটি স্ত্রীলোক নখ-চ্ছেদ পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে তাহার পরিচর্য্যা করিবে।

আমাদের দেশের অসুশিক্ষিতা ধাত্রীরা শীঘ্র প্রসব হইবার কারণ আসন্ন প্রসবা-দিগকে নানারূপ ব্যায়াম করাইয়া কষ্ট দেয়, আয়ুর্ব্বেদের এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ। চরকাচার্য্য বলেন,—প্রসবের লক্ষণ হইয়া প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে তাহাকে উদূখলে ধান্য পূর্ণ করিয়া তাহা কুটিতে দেওয়া, বারংবার পাদচারণ করান, কাহারও কাহারও মত; আত্রেয় মুনি তাহা নিষেধ করিয়াছেন। একেত গর্ভিণীর দারুণ-ব্যায়াম-বর্জ্জন বিশেষ নিষিদ্ধ। তাহাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভিণীর সকল ধাতু ও দোষ প্রচলিত হয়। সে সময়ে ব্যায়ামে বায়ু ক্ষুব্ধ হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। (৮)

প্রসবের পূর্ব্বভাব হইলে (৯) অনুলোম ভাবে তৈল মর্দ্দন করাইতে করাইতে একটি স্ত্রীলোক গর্ভিণীকে বলিবে, "হে সুভগে! যাহাতে কষ্ট না হয়, এরূপ প্রবাহন কর। পরে গর্ভনাড়ীর বন্ধন শিথিল হইলে, কটী, কুঁচকি, বস্তি ও শিরোদেশ শূল-বিশিষ্ট হইলে, ক্রমে ক্রমে কুন্থন করিবে। অনন্তর গর্ভ যোনিমুখে সমাগত হইলে অধিকতর প্রবাহন করিবে। অকালে প্রবাহন করিলে বধির, মূক, হনু-বিপর্য্যস্ত, মস্তকের অভিঘাত, কাশ, শ্বাস শোষ প্রভৃতি নানা পীড়াবিশিষ্ট অথবা কুব্জ, বিকটাকার সন্তান হয়। সন্তান বিপরীত ভাবে গর্ভমধ্যে থাকিলে তাহাকে সরল ভাবে আনিয়া প্রসব করাইবে।

শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার রায়।

(৭) "প্রজনয়িষ্যমাণাং কৃতমঙ্গলস্বস্তি-বাচনাং কুমারপরিবৃতাং পুন্নাম-ফল-হস্তাং স্বভ্যক্তামুষ্ণোদক-পরিষিক্তা-মথৈনাং সম্ভৃতাং যবাগূমাকণ্ঠাৎ পায়য়েত, ততঃ কৃতোপধানে মৃদুবিস্তীর্ণে শয়নে স্থিতা মাভুগ্নসক্থীমুত্তানামশঙ্ক নীয়াশ্চতস্রঃ স্ত্রিয়ঃ পরিণতবয়সঃ প্রজনন-কুশলাঃ কর্ত্তিতনখাঃ পরিচরেয়ুঃ।

(৮) চরক শারীর স্থান অষ্টম অধ্যায় দেখ।

(৯) অথাস্যা বিশিখান্তরমনুলোম-মনুসুখমভ্যজ্যাদ্রুয়াচ্চেনামেকা 'সুভগে! প্রবহস্বেতি ন চাপ্রাপ্তাবী প্রবহস্ব ততোবিমুক্তে গর্ভনাড়ীপ্রবন্ধে সশূলেষু শ্রোণিবংক্ষণবস্তিশিরঃসু প্রবহেথাঃ শনৈঃ শনৈঃ। ততো গর্ভনির্গমে প্রগাঢ়ং ততো গর্ভে যোনিমুখং প্রপন্নে গাঢ়তর-মাবিশল্যভাবাৎ, অকারণ প্রবাহণাদ্বধিরং মূক-ব্যস্তহনুং মূর্দ্ধাভিঘাতিনং কাশশ্বাস-শোষোপদ্রুতং কুব্জং বিকটং বা জনয়তি তত্র প্রতিলোমমনুলোময়েৎ। সুশ্রুত।

আমার জীবনের ইতিহাস।

অন্ধতমিস্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমি বলিয়াছি যে, মাতু যখন আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আমার হৃদয়াবেগ অনেকটা কমিয়া গিয়াছে, সুতরাং আমাদের মধ্যে কি কথা হইতেছিল, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। বস্তুতঃ তাহার মনে যে কোন সন্দেহ হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বোধ হইল না। সে ভুবনের সহিত হাসিতে লাগিল, কত কি গল্প ফাঁদিয়া বসিল, ও গ্রীবাভঙ্গী করিয়া কুটিল দৃষ্টিতে এক এক বার আমার দিকে চাহিয়া আমাকে সাক্ষী মানিতে লাগিল। আমি অবাক্ হইয়া বসিয়া রহিলাম। হতভাগ্য মূষিক যেমন মার্জ্জারের সম্মুখে প্রাণ হাতে করিয়া থাকে, আমি তদ্রূপ বসিয়া রহিলাম। ক্রমশঃ রাত্রি বাড়িতে লাগিল, ও সেই দুরন্ত শীতে সর্ব্ব শরীর শীতল হইয়া গেল। তখন মাতু ভুবনকে সম্বোধন করিয়া বলিল—'আর না ভাই, অনেক রাত্রি হইয়াছে। বেঁচে থাকি ত কাল দেখা হবে।' ভুবন কোন উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল।

মাতু বাহিরে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—'উহু, বড় শীত, বড় শীত, শীঘ্র চল।' এই বলিয়া সে আমার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল। সেখানে গত রাত্রির সেই ক্ষুদ্র প্রদীপটি সেই রূপ ক্ষীণালোকে জ্বলিতেছিল। মাতু তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল দান করিয়া আপনি শুইল, ও আমাকে শয়ন করিতে বলিল। দুই একটি কথা কহিতে কহিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, এবং অচিরে শান্তির কোমল করস্পর্শে তাহার চক্ষু দুটি নিমীলিত হইয়া গেল।

মাতু দেখিতে দেখিতে ঘুমাইয়া পড়িল —যেন তাহার হৃদয় সুনীল শারদ গগনের ন্যায় নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক; যেন কট মন্ত্রণার চিন্তাভারে তাহা কখনও প্রপীড়িত হয় নাই; যেন ঘোর দুরভিসন্ধি ধারণ করিয়া সে হৃদয় কস্মিন্ কালে কলুষিত হয় নাই। আর হতভাগিনী সেই ভয়ানক রাত্রি কেমন করিয়া কাটাইল, কেমন করিয়া সে যাতনা সহিয়াও বাঁচিয়া রহিল, তাহা কাহাকে বলিব— কেমন করিয়াই বা বলিয়া উঠিব! যে অসহায় হতভাগ্য জীব রোগের তীক্ষ্ণ কণ্টকময় শয্যাতে পড়িয়া হতাশ হৃদয়ে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিমীলিত নয়নে অনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিয়াছে, সেই তাহা বুঝিবে। সেই বুঝিবে, যে নিস্তব্ধ নিদ্রা-বিহ্বল

জগতের ভিতরে নিদ্রার জন্য লালায়িত হইয়াছে, এবং লালায়িত হইয়াও অদৃষ্ট-দোষে সে সুখাস্বাদানে হতাশ হইয়াছে, তাহার অবস্থা কি ভয়ানক।

আমরা যখন শুইতে আসিলাম, রাত্রি তখন নিতান্ত অল্প হয় নাই। কিন্তু তথাপি আমাদের সম্মুখ ও পার্শ্বস্থ ঘরগুলির মধ্যে মহা ধুমধাম ও গণ্ডগোল চলিতেছিল। তাহাদের মধ্যে কি ব্যাপার চলিতেছে, তাহা এক্ষণে অবশ্য বুঝিতে বাকি রহিল না। সেই চীৎকার, সেই বিকট হাস্য ও সঙ্গীতে আর সকল চিন্তা ও ভাবনা হৃদয় হইতে দূরীভূত হইয়া কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও ভীতির উদয় হইতে লাগিল। সেই ঘৃণা ও ভীতির সহিত জড়িত হইয়া অ র একটি কথা অনুক্ষণ হৃদয়কে ব্যথিত করিতে লাগিল—'হতভাগিনি! তুমিও ইহাদেরই এক জন! কি মহাপাতকে বিধাতা তোর অদৃষ্টে এই সর্ব্বনাশ লিখিয়াছেন। এ নরককুণ্ডে পড়িয়া তোর হৃদয়ের মধুরতা, হৃদয়ের কোমলতা, আর কত দিন থাকিবে!'

ক্রমশঃ সেই শীতকালের রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরকে অতিক্রম করিয়া তৃতীয় প্রহরে পদার্পণ করিল। ক্রমশঃ প্রদীপটির জীবন ফুরাইয়া আসিল, ও উহা হঠাৎ এক বার আলোকজাল বিস্তার করিয়া পরক্ষণেই গাঢ় অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। মাঝে মাঝে যে দুই এক খানি গাড়ির গুড়্ গুড়্ শব্দ শ্রুত হইতেছিল, ক্রমশঃ তাহা বন্ধ হইয়া আসিল, এবং সর্ব্বশেষে সেই নারকাবজনক পাপস্রোত শব্দ পর্য্যন্ত বিলীন হইয়া গেল। কি ভয়ানক নিস্তব্ধতা! প্রকৃতি যেন প্রাণশূন্য হইয়া অনন্তকালের জন্য শতপুরু অন্ধকারে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে—এমনি চারি দিক্ নীরব, স্পন্দহীন ও গাঢ়-তমসাচ্ছন্ন। সেই রাশীকৃত অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। আমার এক এক বার বোধ হইতে লাগিল, যেন আত্মা দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধতামিস্র-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সেই শূন্যময় তামিস্র-মধ্যে শব্দ নাই, সংজ্ঞা নাই, অন্য আত্মার প্রবেশাধিকার নাই। আমি একটু ঘুমাইবার জন্য এত চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পোড়া চক্ষুতে ঘুম আসিল না। চেতন হউক, অচেতন হউক, যদি কোন পদার্থের শব্দ শুনিয়া প্রাণ জুড়াইতে পারি, এই প্রত্যাশায় এত কাল পড়িয়া রহিলাম, কিন্তু কোন শব্দই শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল না। এক এক বার মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—আমি মরিয়াছি, না বাঁচিয়া রহিয়াছি?—কিন্তু তাহাও বুঝিতে পারিলাম না। যত সময় যাইতে লাগিল, ততই সেই ভীষণ নিস্তব্ধ ভাব বক্ষোপরি যেন পাষাণের মত চাপিয়া ধরিতেছে, বোধ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ এই অবস্থা এত অসহ্য হইয়া

উঠিল যে,—এক বার ভাবিলাম, দ্বার খুলিয়া একটু বাহিরে গিয়া বসি, কিন্তু সাহস করিয়া তাহা করিতে পারিলাম না। আবার ভাবিলাম, মাতু পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহাকেই ডাকি; কিন্তু সে সাহসও হইল না। নিদ্রিতা কালসর্পীকে কে জাগাইবে? এই রূপে সময় যাইতে লাগিল। কিন্তু সুখের জীবন যাহাদের, তাহাদের সময় যেরূপে যায়, সেরূপে নহে। এক বার নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিশ্বাস ফেলিতে যত টুকু সময় লাগে, অভাগিনীর পক্ষে তাহা যুগের সমান হইল--দুঃখের দিনের কি শেষ আছে! জগতে যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, সকলই তড়িল্লতার ন্যায় এক বার বিকাশিত হইয়া তখনই অদৃশ্য হইয়া যায়। নব প্রস্ফুটিত কুসুমের কান্তি, বসন্তের শোভা, বাল্যের সরলতা, যৌবনের সৌন্দর্য্য, দেখিতে দেখিতে সকল ফুরাইয়া যায়; কেবল দুঃখের দিন যায় না—যাইয়াও যাইতে চাহে না!

এই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে বোধ হয়, এক বার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ঠিক্ নিদ্রা নহে, নিদ্রারই উপক্রম মাত্র; কারণ, বোধ হইল, কে যেন আমার চক্ষুদ্বয় নিমীলিত না হইতে হইতেই অতিবেগে ঠেলিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, ও বুকের ভিতরে গুর্ গুর্ করিতে লাগিল। এই ক্ষণিক সংজ্ঞা-বিলোপকে যদি নিদ্রা বলা যায়, তাহা হইলে সে রাত্রিতে সেই প্রথম ও শেষ নিদ্রা। তখন রাত্রি কত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আমার বোধ হইল, কত কাল যেন সেই শূন্যময় অন্ধকারে কাটাইয়াছি, এবং আরও কত কাল কাটাইতে হইবে! আলোক কাহাকে বলে, এ জন্মে আর তাহা জানিব না। মনুষ্যের মুখ, মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি, স্থাবর জঙ্গম কোন পদার্থেরই আকৃতি, কি শব্দ,—এ জন্মে এ সকলের আর কিছুই দেখিব না, শুনিব না। যত কাল সংজ্ঞা থাকিবে, আশাশূন্য হইয়া, উদ্দেশ্যশূন্য হইয়া, সেই শূন্যময় অন্ধকারে দিন কাটিবে। সে অন্ধকারের আর অবসান হইবে না; প্রভাতের প্রফুল্ল মুখ খানি দেখিয়া আর হৃদয় জুড়াইব না।—এই সকল চিন্তা মস্তকের ভিতরে ঘুরিতে লাগিল, সর্ব্ব শরীর জ্বলিতে লাগিল—যেন জ্বলন্ত অঙ্গার শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি। কত ক্ষণ যে সে যাতনা সহিলাম, বলিতে পারি না। কারণ, সময়ের আমার কিছুমাত্র ঠিক ছিল না। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমার যেরূপ বোধ হইল, তাহাতে সে এক যুগ হইবে। এইরূপে অন্ধকারে ও নৈরাশ্যে যুগাবসান হইল, কিন্তু তথাপি হতভাগিনীর যাতনার অবসান হইল না। অবশেষে সেই অকথনীয় দৈহিক ও মানসিক যন্ত্রণায় শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, ও কেমন এক প্রকার ঈষৎ অচৈতন্যে যেন সংজ্ঞা বিলুপ্তপ্রায় হইল। এই অবস্থায় বহু

দূর হইতে আসিয়া কি একটি শব্দ আমার শ্রবণ-পথে প্রবেশ করিল। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে কোন শব্দ শুনিতে পায়, তদ্রূপ আমি সেই শব্দটি শ্রবণ করিলাম। সেরূপ মধুর ধ্বনি আমি আর কখনও শুনি নাই—আর শুনিব না। আহা শব্দটি কি স্থির, কি গম্ভীর, কি কোমল! আমার বোধ হইল, কে যেন তাহার সহিত অমৃত রস শ্রবণ-দ্বার দিয়া ঢালিয়া দিয়া জ্বলন্ত অগ্নি নিবাইয়া দিল। আমার দেহে পুনরায় যেন কথঞ্চিৎ প্রাণ সঞ্চার হইল। সেই শব্দটি শুনিতে শুনিতে আমি চক্ষু উন্মীলন করিলাম; কিন্তু তথাপি সেই অন্ধকার—যে দিকে চাহি, সেই দিকেই অন্ধকার! হঠাৎ শব্দটি থামিয়া গেল। আমি চমকিয়া উঠিয়া হস্ত প্রসারণ করিলাম—যেন তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব! যেন অতি কষ্টে কোন হৃদয়ের ধন পাইয়াছিলাম; তাহাকে ছাড়িয়া দিব না। হৃদয়ের ধন হৃদয়ে করিয়া রাখিব! কিন্তু তখনই সেইরূপ স্থির, গম্ভীর ও মধুর আর একটি শব্দ বাজিয়া উঠিল, এবং তাহার সহিত আর একটি যোগ দিল; এবং তাহারা না থামিতে থামিতে আর দুই একটি বাজিয়া উঠিল। প্রকৃতির সেই ভীষণ নিস্তব্ধ ভাব ভাঙ্গিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে কি অপূর্ব্ব শব্দ-লহরী বহিতে লাগিল। আমি অসাড় হইয়া সেই সঙ্গীত-সুধাপান করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ সে শব্দ গুলি একে একে থামিয়া গেল, ও তৎপরিবর্ত্তে আর দুই একটি শব্দ উঠিয়া স্পন্দহীন প্রাণশূন্য জগতে চৈতন্য সঞ্চার করিতে লাগিল। এই সময়ে হঠাৎ একটি নূতন শব্দ কর্ণগোচর হইল। সেই অন্ধকারের মধ্যে একটি কাক অকস্মাৎ এক বার ডাকিয়া উঠিল—এক বার ডাকিয়া তখনই নিরস্ত হইল। হায়! তাহারও দশা যেন আমারই মত! তাহারও হৃদয় যেন আলোকের জন্য ব্যাকুল হইয়াছে; একাকী অন্ধকারে অন্ধকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে। তাহার শব্দ শুনিলাম; কিন্তু সেই প্রিয় সুহৃদকে দেখিব কেমন করিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সেই শূন্যময় জগতে সে আর আমি,—তাহার মত সুহৃদ্ তবে কে? আবার সে ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু এবার উপর্য্যুপরি দুই তিন বার; এবং তাহার শব্দ শেষ না হইতে হইতে, একটী চিল অতীব করুণস্বরে একটিবার মাত্র চীৎকার করিয়া উঠিল। হায়! সময়-বিশেষে কাক চিলের শব্দও এত মধুর! এই-রূপে দুই একটি করিতে করিতে কিয়ৎ কালের মধ্যে বিহঙ্গম-কোলাহলে চারি-দিক পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্যবিধ দুই একটী শব্দও কর্ণ-গোচর হইতে লাগিল। আমার মৃত-দেহে পুনরায় জীবন সঞ্চার হইল, মৃতপ্রায় আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইল। আবার জীবলোকে প্রবিষ্ট হইলাম;

অচিরে আবার আলোক দেখিতে পাইব, এই আহ্লাদে হৃদয় নাচিতে লাগিল। স্পন্দহীন জড়পদার্থের ন্যায় আমি আর শয্যায় পড়িয়া থাকিতে পারিলাম না। পাছে মাতু জাগিয়া উঠে, এই ভয়ে অতি সাবধানে গিয়া দ্বারটি খুলিয়া অর্দ্ধেক ভিতরে অর্দ্ধেক বাহিরে এই ভাবে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। আহা! কি যে দেখিলাম, বলিতে পারি না। সেই অর্দ্ধালোক অর্দ্ধান্ধকারে উষা-সুন্দরীর অবগুণ্ঠিত মুখ খানি কি সুন্দর, কি স্নিগ্ধতর, মরি কি আশাজনক! সেই দুরন্ত শীত সত্বেও প্রভাত-সমীরণ স্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর জুড়াইয়া যাইতে লাগিল ও চক্ষুর জলের সহিত এই কথা গুলি মনে আসিল—দেব! হতভাগিনী দুহিতার অদৃষ্টে কি দুর্দ্দশা লিখিয়াছ! অবশেষে অঞ্চল দ্বারা চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে পুনরায় গিয়া শুইলাম। নিদ্রা আর আসিল না; কিন্তু তথাপি কি যে আরাম বোধ হইতে লাগিল, তাহা বলিয়া উঠিতে পারি না।

যাতনার উপর যাতনা।

সে অন্ধকার, সে নিস্তব্ধতা আর নাই। চারি দিকে কোলাহল উত্থিত হইয়াছে, পৃথিবী পুনরায় সজীব হইয়াছে, ও গৃহাভ্যন্তরে আলোক-রেখা প্রবেশ করিয়া অন্ধকারকে অপসারিত করিয়া দিতেছে। এই সময়ে মাতু জাগিল। তাহার নিদ্রা-ভঙ্গ হইয়াছে দেখিয়া, আমি আপাদ-মস্তক আবৃত করিয়া রহিলাম। সে শয্যা হইতে উঠিয়া আমাকে জগাইবার জন্য আস্তে আস্তে দুই এক বার ডাকিল, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আমি একাকিনী রহিলাম। গত রাত্রির অনিদ্রায় শরীর যে কি পর্য্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু বেলা হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আর ঘুমাইতে ইচ্ছা হইল না, অথচ শয্যা ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

এই অবস্থায় কিয়ৎ কাল অতিবাহিত হইল—কত ক্ষণ ঠিক বলিতে পারি না প্রভাতের সঞ্জীবনী-শক্তিতে শরীর ক্রমশঃ সুস্থ বোধ হইতে লাগিল—বসন্ত-সমাগমে যেন মৃতপ্রায় লতা পুনরায় সজীব হইয়া উঠিল। হায়! সে জানিত না যে, বসন্তের হাসি দেখিতে দেখিতে ফুরাইবে, নিদাঘের প্রখর রৌদ্রে সর্ব্ব শরীর শুকাইয়া যাইবে, যাতনা না যাইতে যাইতে আবার যাতনা আসিয়া দেখা দিবে! গত রাত্রি যে ভয়ানক অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহাতে মনে কোন চিন্তাই আসিবার উপায় ছিল না। কিন্তু এক্ষণে সে অবস্থার কিঞ্চিৎ উপশম হওয়ায় মন যেন আবার ভাবিবার অবকাশ পাইল। কোথায় আসিয়াছি, কাহাদের সহবাসে রহিয়াছি, ইত্যাদি চিন্তায় হৃদয় ক্রমশঃ অভিভূত হইতে লাগিল। কি করিব, কেমন করিয়া নিস্তার পাইব, কিছুই

বুঝিতে পারিলাম না। যে দিকে চাহি, সেই দিকেই মৃত্যু আসন্ন। আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে হতভাগিনীকে রক্ষা করিবে, এমন সুহৃদ্ কে আছে? তখন পূর্ব্বকথা সকল স্মরণ হইতে লাগিল। 'সেও যে ছিলাম ভাল। তবে কেন এমন কর্ম্ম করিলাম,—কি আশায় সে আশ্রয় ছাড়িয়া উন্মত্তের ন্যায় কূল-কিনারা-শূন্য সমুদ্রে আসিয়া ঝাঁপ দিলাম! ব্রহ্মাণ্ডদেব! চিরদুঃখিনীর দুঃখে এক বার তাহার অপরাধ ভুলিয়া যাও। দেব! এক বার এ কলঙ্কিত হৃদয়ে আসিয়া বলিয়া যাও, এখনও ভরসা আছে,—এখনও ভগ্নতরি কূলে গিয়া পৌঁছিবে!'

আমি আর রোদন সংবরণ করিতে পারিলাম না। চিরদিন কাঁদিবার জন্য,—অন্তর্জ্জ্বালায় চিরদিন জ্বলিয়া মরিবার জন্য, বিধাতা যাহাকে সৃজন করিয়াছেন, সে কাঁদিবে না ত কাঁদিবে কে? আমার বোধ হইতেছে যেন সেই প্রাতদৃশ্যটি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইতেছি; যেন আমার সম্মুখে ছোট একটী ঘর রহিয়াছে। সেই ক্ষুদ্র ঘরটির ভিতরে ক্ষুদ্র একটি শয্যায় কে একটি অসহায়া বালিকা (যেন আমি নহি, আর কেহ হইবে) শয়ন করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার চক্ষু দুটি হইতে বারি-ধারা বহিয়া শয্যা ভিজিয়া যাইতেছে। বালিকা মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা তাহার চক্ষুর জল মুছিতেছে, আর চক্ষু দুটি আবার তখনই জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তাহার দুঃখে দুঃখী হইবে, এমন কেহ নাই; দুইটা মিষ্ট কথা কহিয়া, দুইটা আশ্বাস বাক্য বলিয়া, তাহাকে বুঝাইবে, এমন লোক নাই। আহা এ তরুণ বয়সে তাহার এ দশা হইল কেন?—কুসুম না ফুটিতে ফুটিতে তাহাতে কীট আসিয়া প্রবেশ করিল কেন? বিধাতা হে, এ ভব-রঙ্গভূমে এ কি লীলা খেলিতেছ? দেব, এত কাল ভাবিয়া দেখিলাম, কিছুই বুঝিলাম না। যদি কুসুম-সুকুমার হৃদয়ে অগ্নি প্রবেশের পথ করিয়া দিলে, তবে সে অগ্নি নিবাইবার শক্তি তাহাতে দিলে না কেন, এ রহস্যের কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না।

কিঞ্চিৎ পরে মাতু আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—'ও কি? কাঁদিতেছ কেন?' আমি আরও কাঁদিতে লাগিলাম। মাতু আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল ও গায় হাত বুলাইতে বুলাইতে পুনরায় বলিল—'কেন কাঁদিতেছ বল না। ছি ছি অমন করিয়া কি কাঁদিতে হয়? লোকে বলিবে কি?' আমি তবু কাঁদিতে লাগিলাম। তখন মাতু যেন একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—'বলি, কাঁদিতেছ কেন—তার কি কোন উত্তর নাই? কি হয়েছে বল না।' আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলাম—'আমি বাড়ী যাইব।' মাতু এ বার হাসিয়া উঠিল—'ও হরি,

তাই এত কান্না!—বাড়ী যাবে তা কান্না কেন?' আমি পুনরায় বলিলাম—'আমি এখানে আর থাকিব না, আমি বাড়ী যাইব।'

'বাড়ী যাবে না ত কি এখানে থাক্‌তে এসেছ?'

'কবে লইয়া যাইবি?'

'যে দিন তুমি বলিবে?'

আমি তখন একটু সাহস পাইয়া বলিলাম—'আমি আজই যাইব।'

মাতু আবার হাসিয়া উঠিল।—"ছেলে মানুষ আর কাকে বলে? কি ভাগ্য যে দুপর রাত্রিতে জাগিয়া উঠিয়া বল নাই 'মাতু আমি বাড়ী যাইব; আমাকে বাড়ী লয়ে চল্।' আর পোড়ামুখী মাতু তখন কি করিত? সে তখনই কোমর বাঁধিত, লানটান হাতে করিত, করিয়া বলিত 'চল আমরা বাড়ী যাই'—ঠিক যেন দেশেতে রাত্রি-বেলায় এ বাড়ী থেকে ও বাড়িতে যেতে'ছি। ঠিক সেই রকম না?—উত্তর দাও না কেন?"

আমি একটু হাসিয়া ফেলিলাম। মুখে হাসি, চক্ষুতে জল। মাতু তখন বলিল—'চল দেখি বাহিরে গিয়া একটু বসিবে দাঁড়াইবে? এ রকম করিয়া ঘরের ভিতরে একলাটী থাকিলে মন কেমন করিবে না ত কি? চল, বাহিরে চল।' কিন্তু আমি কিছুতেই রাজি হইলাম না দেখিয়া সে উঠিল। আমি দৃঢ় মুষ্টিতে তাহার অঞ্চল ধরিয়া রহিলাম। মাতু বলিল—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি এখনই আবার আসিব।' এই বলিয়া সে আমার হাত ছাড়াইয়া ঘরের বাহির হইল। আমি আবার কাঁদিতে লাগিলাম।

ক্ষণকাল পরেই মাতু ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এবারে সে একা না আসিয়া বিনোদকে সঙ্গে করিয়া আনিল। আমি তাহাকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইলাম। তাহারও মনে কি এরূপ কোন ভাবের উদয় হইয়াছিল?—বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তখনই তাহা তাহার হৃদয়ের উচ্চতর প্রবৃত্তির কাছে পরাভূত হইল। পরদুঃখকাতরা হতভাগিনী বিনোদিনীর হৃদয় পরের দুঃখে কখনও চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিত না। অশ্রুজল দেখিলে কে যেন তাহার মর্ম্মস্থানে আঘাত করিত। এক বার হাসিতে হাসিতে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'দিদি কাঁদ্‌তে দেখলে চখে কান্না আসে, কেন বল দেখি?' সে সময়ে নিস্তার সেখানে উপস্থিত ছিল। সে উত্তর করিল—'যাদের চোক্ পান্‌সে তারাই বল্‌তে পারে।'—নিস্তার তোরও চক্ষু এরূপ পানিসা হইল না কেন!

বিনোদ ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল যে আমি কাঁদিতেছি। তাহার হৃদয় অমনি উছলিয়া উঠিল। সে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া ছুটিয়া আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, ও অতি ব্যাকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—'দিদি, দিদি, কাঁদি-

তেছ কেন দিদি?—মাসী, দিদি কাঁদিতেছে কেন?' মাতু আস্তে আস্তে বলিল—'তাই ত তো ক ' এলেম; জিজ্ঞাসা কর না।' এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। আমি বিছানার ভিতরে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম। বিনোদ আমার কাছে বসিয়া রহিল, ও আমাকে কথা কহাইবার জন্য বিস্তর টানাটানি করিতে লাগিল। 'দিদি কথা কৈবে না—কৈবে না? তবে আমি যাই—বল যাই?' আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম। একটু পরে সে আবার আমাকে ঠেলিতে লাগিল—'আমি যেন কিছু টের্ পাচ্ছিনে? বিছানার ভিতরে মুখ লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি হচ্ছে। আমি কিছু টের্ পাচ্ছিনে—না?' এই বলিয়া সে আমাকে তুলিবার জন্য হাসিতে হাসিতে আমার মস্তক ধরিয়া টানিতে লাগিল। কিন্তু আমি তথাপি কথা কহিলাম না দেখিয়া বিনোদের মনে একটু অভিমান হইল।—'এত করিয়া সাধিতেছি, যদি কথা না কও, তবে মিছা বসিয়া কি করিব।' এই বলিয়া সে উঠিবার উপক্রম করিল। তখন আমি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দুঃখের দুঃখী যে (সে যেই হউক না কেন) তাহার মত জগতে আপনার কে? তোমার চক্ষুজল দেখিয়া যাহার চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রুপাত হইতেছে;—তোমার দুঃখ দেখিয়া যাহার বক্ষঃস্থলকে স্ফীত করিয়া একটী (অধিক নহে,—একটি) দীর্ঘ নিশ্বাস বহিয়াছে; বল দেখি, তাহার মত তোমার সুহৃদ্ কে আছে? দুঃখের গাঢ়তমসাচ্ছন্ন নিশিতে সে তোমার নয়নের জ্যোতিঃস্বরূপ। হইতে পারে সে জ্যোতিঃ অতি ক্ষীণ। কিন্তু ক্ষীণ হইলেও এরূপ দুই একটী জ্যোতিঃ যদি মানুষের না থাকিত, তাহা হইলে এ শোক-তাপান্ধকারময় জগতে মানুষ কয় দিন বাঁচিতে পারিত?

বিনোদ উঠিতেছে দেখিয়া আমি আর চুপ্ করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কথঞ্চিৎ রোদন সংবরণ করিয়া স্খলিত স্বরে তাহাকে বলিলাম—বিনোদ, বিনোদ, তুমি যেও না। আর একটু আমার কাছে বসো।' আমাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাহারও চক্ষু দুটি জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—'দিদি কেন তুমি কাঁদিতেছ বল। মা কি মাসী থাকিতে তোমার কিসের কষ্ট? তোমাকে কাঁদিতে দেখিলে—সত্য বলিতেছি—আমার বড়ই কষ্ট হয়। আমার মাতা খাও বল, কি হয়েছে।' আমি একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলাম—'বিনোদ আমার বড় মন কেমন করিতেছে। আমার এখানে আর একটুও থাকিতে ইচ্ছা হতেছে না। বাড়ীর জন্য মন বড় ব্যস্ত হতেছে।' বিনোদের মুখখানি একটু ম্লান হইল—নিষ্কলঙ্ক শারদ শশী যেন হঠাৎ সূক্ষ্ম মেঘাবরণে আবৃত হইল। 'দিদি আমাদের এত শীঘ্র যদি ফেলিয়া যাইবে

তবে এলে কেন ?' এ কথায় কি উত্তর দিব স্থির করিতে না পারিয়া আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম। বিনোদ একটু দুঃখিত হইয়া আবার বলিল—

'দিদি কোন উত্তর দিলে না যে ?'

'তোমাকে না দেখিয়া, বিনোদ, আমি কখনই অধিক দিন থাকিতে পারিব না।' 'তা হলে আর এত শীঘ্র ফেলে যেতে চাইতে না। এ পৃথিবীতে কারুকে ভাল বাস্‌তে নেই। ভালবাসায় দুঃখ বৈ সুখ পাওয়া যায় না।' বিনোদের কথার শেষ-ভাগটিতে পোড়া প্রাণের ভিতরে যেন হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল। চকিতের মধ্যে মাতা মুণ্ড কত কি মনে আসিল, সে কথায় আর কায নাই! হায় ভালবাসা! এ জগতে তুমি কি সমগ্রী, কিছুই বলিতে পারি না! রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর—যেখানেই যাও, সর্ব্বত্রই লোকে তোমার জন্য লালায়িত। তোমাকে না পাইলে কি প্রাণপাখী একাকী পিঞ্জরে থাকিতে পারে না ?

বিনোদ আবার বলিল—'এত শীঘ্র দিদি, তুমি চলিয়া যাবে, যদি আগে জান্‌তেম, তা হ'লে কখনই তোমার সঙ্গে ভাব কর্‌তেম না—সত্যি বল্‌ছি।'

বিনোদের চক্ষুদুটি জলে ছল্ ছল্ করিতে লাগিল; কিন্তু সে ভাব সে গোপন করিবার জন্য তাহার গোলাপের মত সেই অধরোষ্ঠে একটু মৃদু হাস্য-স্রোত প্রবাহিত করিয়া দিল। তাহার মনে এমনি আশঙ্কা হইল, যেন আমি যাইবার জন্য আয়োজন করিয়া বসিয়া রহিয়াছি; যেন সেই তাহার সহিত শেষ দেখা; তখনই (হয়ত চিরদিনের জন্য) তাহার সহিত বিচ্ছেদ ঘটিবে! হায় বিনোদ তোমার সে আশঙ্কা বিধাতা পূর্ণ করিলেন না কেন! তাহা হইলে হয়ত এ জীবন আশাশূন্য মরুভূমি না হইয়া অদ্য অন্য রূপ ধারণ করিত।—হরি হরি, অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডন করিবে!

বিনোদের আশঙ্কায় আমার মনে যেন একটু আশার সঞ্চার হইতে লাগিল—যেন সত্যই অচিরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া সেই ভয়ানক বিপদের হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারিব। এইরূপে দুর্ব্বল হৃদয়ে পুনরায় কিঞ্চিৎ বল সঞ্চার হইল, মেঘান্ধকারময় নৈশ গগনে পুনরায় যেন শুক-তারা দেখা দিল; এবং ভবিষ্যতে এ হতভাগ্য জীবনের দুঃখের একশেষ করিবার জন্য অদৃষ্ট পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিল।

শ্যাম।

আত্মবোধ যোগ।

জীবাত্মাকে না জানিতে পারিলে পরমাত্মাকে জানা যায় না; এ জন্য 'অহং-তত্ত্ব' নির্ণয় করা আবশ্যক। যে যোগী অহংতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, সেই যোগীই যোগী। অন্যথা অহঙ্কারী ভোগী। এ বিষয়ে পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমান্ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত যাহা ব্রহ্মণামাবলি-স্তোত্রে প্রকাশ আছে, এখানে লেখা গেল। যথা—

নিত্যোহহং নিরবদ্যোহহং নিরাকারোহ-
মচ্যুতঃ।
পরমানন্দরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥ ১॥

অস্মদপদ-বাচ্য নিত্যবস্তু জীবাত্মা অবধ্য অর্থাৎ তাঁহাকে কেহই বধ করিতে পারে না; আর তিনি নিরাকার অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার জ্ঞান হয় না। যাহার ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই, যিনি পরমানন্দরূপ, আর যাঁহার কোন কালে ধ্বংস নাই, তিনিই আমি। ১।

শাশ্বতানন্দরূপোহং শান্তোহহং প্রকৃতেঃ
পরঃ।
প্রত্যক্ চৈতন্যরূপোহহমহমেব হ-
মব্যয়ঃ। ২॥

যাঁহাকে আমি বলি, সে বস্তুই নিত্যানন্দ, শান্ত এবং মায়ার সাক্ষাৎজ্ঞানরূপ; তাঁহাকে মায়া-প্রভাবে আমি বলা যায়।

স্বয়ংপ্রকাশরূপোহং চিন্ময়োহহং পরস্যাহং।
অদ্বৈতানন্দরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥৩

যিনি আপনা আপনি প্রকাশ পাইতেছেন অর্থাৎ যাঁহাকে অন্য কোন পদার্থ প্রকাশ করিতে পারে না, এমন পদার্থ স্বপ্রকাশ রূপ বলা যায়। এতাদৃশ রূপ আমি; আর জ্ঞানময়, পরমাত্মা, এবং অদ্বৈতানন্দরূপ ও অব্যয় যিনি, তিনিই আমি ॥৩।

তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মহং অধ্যাতীতঃ পরঃ
শিবঃ।
মায়াতীতং পরং জ্যোতিরহমেবাহ-
মব্যয়ঃ॥৪।

আমি তত্ত্বাতীত পরমাত্মা, অধ্যাতীত শিব, মায়াতীত পরমজ্যোতিঃ অব্যয় পুরুষ।

নামরূপব্যতীতোহহং চিদাকারোহমচ্যুতঃ
সুখরূপস্বরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ॥৫।

নাম এবং আকৃতি-রহিত অক্ষয় জ্ঞানরূপ সুখস্বরূপ অব্যয়াত্মা আমি।

মায়াতৎকার্য্যদেহাদি মম নাস্ত্যেব
সর্ব্বদা।
স্বপ্রকাশৈকরূপোহং অহমেবাহমব্যয়ঃ॥৬।

দেহীর দেহ কেবল মাত্র মায়ার কার্য্য; আমার অর্থাৎ পরমাত্মার সর্ব্বদাই সেই দেহ নাই। সেই পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পান বলিয়া স্বপ্রকাশৈকরূপ। সেই স্বপ্রকাশৈক রূপ অব্যয় আমি। ৬।

অন্তর্যামিস্বরূপোহং কূটস্থঃ সর্ব্ব-
গোস্ম্যহং।
পরমাত্ম-স্বরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ।৭

আমি অন্তর্যামিস্বরূপ কূটস্থ সর্ব্বত্রগামী। পরমাত্মা স্বরূপ অব্যয় পুরুষ।৭।

শুদ্ধচৈতন্যরূপোহং আত্মারামোহমেবচ।
অখণ্ডানন্দরূপোহমহমেবাহ-
মব্যয়ঃ ॥৮।

নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ আমার আত্মা এবং আত্মারাম অখণ্ড আনন্দরূপ অব্যয় ॥ ৮।

নিষ্কামোহং নিষ্ক্রিয়োহং সর্ব্বাত্মা চ সনা-
তনঃ।
অপরোক্ষস্বরূপোহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৯।

আমি নিষ্কাম, নিষ্ক্রিয়, সর্ব্বাত্মা, সনাতন, অপরোক্ষস্বরূপ ও অব্যয়।

প্রজ্ঞান-মন এবাহং বিজ্ঞান-মন এব চ।
অকর্ত্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥১০।

প্রজ্ঞান মন আমি এবং বিজ্ঞান-মনও আমি। অকর্ত্তা অভোক্তা অব্যয় পরমাত্মা আমি।

নিরাধারস্বরূপোহং সর্ব্বাধারোহমেব চ।
আপ্তকামস্বরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥১১।

আমি আশ্রয়শূন্য অথচ সকলের আধার; আপ্তকাম স্বরূপ অব্যয় আমি ॥১১।

তাপত্রয়বিনির্ম্মুক্তো দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহমেবাহ-
মব্যয়ঃ ।১২।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক নামে যে দুঃখ আছে সেই দুঃখ হইতে বিমুক্ত আর স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এই শরীরত্রয়বিশিষ্ট আর বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য এই অবস্থা-ত্রয়ের সাক্ষী অব্যয় পরমাত্মা আমি।

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তোহং নিরাকারোহমব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩।

আমি নিত্য, শুদ্ধ বিমুক্ত আর নিরাকার অব্যয়। এবং ভূমানন্দস্বরূপ অক্ষয়। ১৩ ॥

অতঃপর আত্মষটক্ হইতে সংগৃহীত আত্মবোধ বলিতেছি।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং
নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ।
দারাপত্যক্ষেত্রবিত্তাদি দূরে
সাক্ষী নিত্যপ্রত্যগাত্মা শিবোহং ॥ ১ ॥

আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয়সমূহ নহি, অহঙ্কার-বৃত্তিও নহি; প্রাণবর্গ ও বুদ্ধিও নহি। স্ত্রী, পুত্র, ক্ষেত্র ও বিত্তাদির সাক্ষী নিত্য প্রত্যগাত্মা শিব আমি।

নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো
দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্ত্তৃত্বাদিচিন্ময়স্যাস্তি নাহং
কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোহং ॥ ২ ॥

আমি জন্মাই না, বাড়ি না, নষ্টও হই না; তবে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম অনুসারে দেহ জন্মে, বাড়ে ও নষ্ট হয়। আর কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি যে জ্ঞান, তাহা চিন্ময় পরমাত্মার নহে; সে কেবল অহঙ্কারের ধর্ম্ম। আমি সেই চিন্ময় পরমাত্মা শিব।

নাহং দেহো জন্মমৃত্যুঃ কুতো মে
নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে।

নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে
নাহঙ্কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥ ৩ ॥

আমি দেহ নহি অর্থাৎ দেহধর্ম্মাবলম্বী নহি; আমার জন্ম মৃত্যু কি নিমিত্ত হইবে? আমি প্রাণ নহি অর্থাৎ প্রাণধর্ম্মাবলম্বী নহি, তবে কি জন্য ক্ষুধাতৃষ্ণা হইবে? আমি চিত্ত নহি, কি জন্য শোক মোহ প্রাপ্ত হইব? আমি কর্ত্তা নহি, সুতরাং কি হেতু আমার সংসার-বন্ধন ও মোচন হইবে? আমি সেই পরমাত্মা শিব। আপন আত্মাকে যে যোগী ইত্যাদি প্রকার বিচার করিয়া চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে বিলয় করিতে পারেন, তিনিই শিব, তিনিই নারায়ণ,তিনিই পরমহংস,তিনিই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী। তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ কুবের, হুতাশনাদি দেবতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রতাপে সূর্য্যদেব ও যম ভীত হন। আদিতে সৃষ্ট শনক সনাতনাদি কুমারগণ, কপিল ও দত্তাত্রেয়ী আর মরীচি আদি সপ্তঋষিমণ্ডল এই শ্রেণীর যোগী। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি অনেক আছেন, তাঁহারা সিদ্ধ যোগী।

পুরাণ, মহাপুরাণ ও বেদতন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সকল সিদ্ধ যোগী ও মহাসিদ্ধ যোগী মুনি ঋষি দেবতা ও রাজাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা এক্ষণে কাল-গতিকে আর পৃথিবীর অবস্থানুসারে শরীর পরিবর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছেন। শাক্যসিংহ, শঙ্করাচার্য্য, পূর্ণানন্দ, জ্ঞানানন্দ, শ্যামানন্দ প্রভৃতি হিন্দুজাতীয়গণ,যিশুখৃষ্ট ও পেগম্বর আদি কয়েক জন ইহাঁরা সকলেই সিদ্ধযোগী। পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়া কেহ কেহ হিন্দু; কেহ কেহ ইহুদি, কেহ কেহ মুসলমান কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া নারায়ণ সাধনার্থ নানাপ্রকার পথ প্রচার করিয়া সে সকল দেহও পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন কায় গ্রহণ করিয়া কখন মহাপ্রভু, কখন গুরুনানক, কখন কবীরদাস কখন বা তুলসীদাস হইয়া হরিনাম বিতরণ করিয়াছেন। এখনও নানা বিগ্রহ পরিগ্রহ পূর্ব্বক ভগবানের উপাসনা করিতেছেন ও লোকনিস্তারার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া হরিনাম প্রচার করিতেছেন।

পূর্ব্বে জীবাত্মা আর পরমাত্মার বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রসঙ্গাধীন আর তিন প্রকার আত্মার বিষয় যথাশাস্ত্র লেখা যাইতেছে—

ভূতাত্মা চেন্দ্রিয়াত্মা চ প্রধানাত্মা তথৈব চ।
আত্মা চ পরমাত্মা চ ত্বমেকঃ পঞ্চধা স্থিতঃ॥

এক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চাত্মায় ব্যবস্থিত। যথা, ভূতাত্মা শব্দে ক্ষিত্যাদিপঞ্চমহাভূত অর্থাৎ পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ। এই পঞ্চ পদার্থ আর ইন্দ্রিয়াত্মা-শব্দে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, হস্ত, পাদ, পায়ু, লিঙ্গ, বাক্য। প্রধানাত্মা অর্থে মহত্তত্ত্ব আত্মা পদে জীবাত্মা, আর

পরমাত্মা। জীবদেহ এই পঞ্চাত্মা-ঘটিত। ইহাদিগের কার্য্য পৃথক পৃথক বলিয়া পৃথক্ সংজ্ঞা হইয়াছে। কিন্তু উহারা তাবৎ এক পরমাত্মা; কার্য্য কেবল ভিন্ন ভিন্ন। যেমন এক বায়ু শরীরস্থ হইলে, কার্য্য ভেদে প্রাণ, অপান, সমান ব্যান ও উদানাদি নানা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীকালীকমল সার্ব্বভৌম

চন্দ্রমা সঙ্গীত।

স্বর্গীয় কুসুম!
সুকুমার প্রিয় ফুল কাল তরু শিরে;
কল্পনা—নন্দনবন, মন্দার-কুসুমগণ,
চিরস্থায়ী—মধুমাস নন্দন-কাননে;
নন্দন-কুসুমই তুমি, উজলি গগনভূমি
আছ শশি কুসুমিত চারু উপবনে;
তুমি মৃণালিনী ভাস জ্যোৎস্নার নীরে।
উজ্জ্বল চন্দ্রমা!
প্রিয় সুকুমার জ্যোতি! কাহার উপরি
চেয়ে আছ, স্থির রাখি খুলিয়ে কোমল
আঁখি।
শান্ত সুমধুর জ্যোতি! শান্ত নীলিমার;
সুকুমার শিশুপ্রায় বসুমতী নিদ্রা যায়
স্ফীত সঙ্কুচিত বক্ষ জলধি যাহার;
বিধির আদেশে তুমি ধরার প্রহরী?
দূর আকাশের—
তুমি কি প্রসন্নকান্তি নিঃস্পৃহ সন্ন্যাসী
নিশীথের নিরজনে, প্রচার মানবগণে
নবধর্ম্ম, মাধুরীই মূল মন্ত্র যার;
ঢাল সুপ্ত নবপ্রাণে দীপ্ত দিবা অবসানে
নিশীথে, স্বর্গীয় বেদ; ভাসাতে সংসার
সৌন্দর্য্য নির্ঝর হতে আন শোভারাশি
হে যোগী! নীরবে
কি ভাব পুষ্পিত রম্য কানন-ভিতর;
আকাশের সন্নিধানে শুনিছ কি
একপ্রাণে
সৃজনের কুসুমিত সেই ইতিহাস;
নীরবে,তোমার তরে সে অমর বেদ ঝরে
সৃজন-সঙ্গীত গায় অনন্ত আকাশ;
হৃদয়ে হৃদয়ে গান সঙ্গীত সুন্দর!
আকাশের কবি!
বিকীর্ণ কবিত্ব প্রতি জ্যোৎস্নার লহরে
আঁকিতে মাধুর্য্য ছবি যে পারে
সেই ত কবি।
সৌন্দর্য্যে বাসিতে ভাল শিখায় মানবে
কোন্ কবি তব সম আঁকে ছবি উচ্চতম
এমন সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ কে করায় ভবে
যে শোভা বিকীর,বিধু, জগত ভিতরে।
স্বর্গীয় গায়ক!
ও উচ্চ সঙ্গীত তব এ বিশ্ব ভিতরে
কে বুঝিবে? মূর্খ নর এবে ক্লান্তকলেবর
ঘুমাইছে; কে শুনিবে কে বুঝিবে তবে;
বুঝিবে না? ঢাল শশি জ্যোৎস্না সঙ্গীত-
রাশি
স্পন্দহীন তরুলতা মুগ্ধ হয়ে রবে,
আমিও, শশাঙ্ক, বসি আছি এ প্রান্তরে।
উচ্চ প্রেমিবর!
কাহার সৌন্দর্য্যমুগ্ধ প্রেমে মুগ্ধ কার,

মধুর মধুর হাসি কারে এত ভালবাসি
কারে সদা আলিঙ্গিতে চায় তব প্রাণ,
না সুধাংশু ! এক জনে নহে প্রেম,
তারাগণে
ব্যাপ্ত তাহা সমভাবে কর প্রেমদান,
কোটী-তারা প্রেমমুগ্ধ হৃদয় তোমার।
মধুর সুন্দর,
জানি আমি নর নারী প্রেম পরস্পরে
সে প্রেম পঙ্কিল নয়, স্বর্গীয় নির্ম্মল,
মাধুরীময়
তাহাও বিরল প্রেমি ! জগত ভিতর,
কিন্তু পারাবার সম বিস্তৃত গভীরতম
সে প্রেম নহে কি পূর্ণ স্বর্গীয়, সুন্দর ?
আছে কি চন্দ্রমা তাহা অবনীভিতরে ?
হায় তারানাথ।
কে তোমার উচ্চ প্রেম বুঝিবে ধরায়,
সঙ্কীর্ণ প্রণয় গানে নহে শুধু নরপ্রাণ
সে বেণু ঝঙ্কারে আজ মুগ্ধ এ ভুবন,
দেশের জাতির তরে সে স্বর্গীয়প্রেমময়ে
প্রকৃতি, ঈশ্বর প্রেম বুঝে কয় জন ?
সে স্বর্গীয় প্রেম বিধু ! শিখাও আমায়।
বড় ভাল বাস।
বড় ভালবাসি চন্দ্র ! ও শান্ত জ্যোৎস্নায়
নিস্তব্ধ নিশীথে আসি হেরিলে ও
শোভারাশি
মত্ত হয় প্রাণ, শান্ত এ দূর বিরলে
আমি বসি শূন্য প্রাণে, তুমি চন্দ্র ওইখানে
উপরে অনন্তসিন্ধু পৃথ্বী পদতলে
বড় ভালবাসি, ভাল বাস কি আমায় ?
কত দিন শশি !
তবে সে কি সুখমৃত্যু, নিস্তব্ধ নিশায়
যেমতি নিস্তব্ধ বায় সঙ্গীত মিশায়ে যায়
যেমতি নিশায় তারা প্রভাত গগনে,
তব করে করি স্নান পবিত্র হইয়ে প্রাণ
চলে যাবে সেই ধাম পুণ্য নিকেতনে
হে চন্দ্র ! জীবন্ত শোভা ! নিশি ও জ্যোৎস্নায়

শ্রীদ্বিঃ—

সমালোচনা।

জীবন, আত্মা ও মনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান। ময়মনসিংহ ভারত মিহির যন্ত্রালয়। ১৮৮১।

এক্ষণে ইউরোপীয় বিজ্ঞানালোচনায় নিত্য নিত্য যে সকল নূতন মত আবিষ্কৃত হইয়াছে, গ্রন্থকার বহু যত্নে সে সকল মতামত বিশেষ রূপে অধ্যয়ন করিয়া তাহার প্রস্তাবিত বিষয় সম্বন্ধে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এ গ্রন্থে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ইউরোপীয় দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক মতামত যাঁহারা একাধারে জানিতে ইচ্ছা করেন তাহারা একবার এই গ্রন্থ খানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করুন। পুস্তক খানি গ্রন্থকারের বিস্তারিত অধ্যয়নের পরিচয় দিতেছে। তাহার সিদ্ধান্ত গুলি সকলের অভিমত না হইতে পারে, কিন্তু পাঠকগণ তাহার

বিস্তারিত জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন।

গ্রন্থ-রচনাও অতি পরিপাটী। বিষয় সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হইয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত সকল পর পর বিবেচিত এবং অনুমিত হওয়াতে গৃহীত বিষয় অত্যন্ত বিশদ হইয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, গ্রন্থখানি এত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় যে ইহার স্থান প্রস্তুত হইয়াছে এমত বোধ হয় না। যে ভূমির উপর ইহা দাঁড়াইবে, বোধ হয়, বাঙ্গালা সাহিত্যে সে ভূমি আজিও প্রস্তুত হয় নাই। যাঁহারা ইংরাজীতে পণ্ডিত নহেন, তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠে যে ইহার রসগ্রাহী হইবেন, এমত অনুমান হয় না। যাঁহারা শুদ্ধ বাঙ্গালা জানেন, অথবা, ইংরাজী বিজ্ঞান ও সাহিত্যে বিশেষ অধিকারী নহেন, তাহারা যে অন্ধকারময় ভূমির উপর দাঁড়াইয়া আছেন, তাহাদিগের নিকট এ গ্রন্থের আলোক প্রতিভাত হওয়া সহজ নহে। এ গ্রন্থ পড়িবার জন্য পূর্ব্বে যে সকল গ্রন্থের জ্ঞানলাভ আবশ্যক, বাঙ্গালা সাহিত্যে কি সে সকল গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়?

গ্রন্থকারের সকল সিদ্ধান্ত এবং যুক্তি আমাদের নিকট তত বিশুদ্ধ বোধ হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমারা দুইটী নির্দ্দেশ করিতেছি।

গ্রন্থকার প্রদর্শন করিয়াছেন, এ জগতের স্রষ্টাকে প্রকৃতি-অতীত এক অভৌতিক ঐশী শক্তি মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, ক্রিয়াবান কারণ (Efficient cause) বিজ্ঞান রাজ্যের অতীত, সুতরাং মানব জ্ঞানাধীন নহে। তাহার পর তিনি গ্রন্থের এক স্থলে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ঈশ্বরকে নির্জ্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা না বলিলেও সজীব বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইবে। কেন না, নির্জ্জীব বস্তু হইতে সজীব বস্তূৎপত্তির সন্তোষকর ব্যাখ্যান বিজ্ঞান শাস্ত্র দিতে পারে না।

বিজ্ঞান শাস্ত্র দিতে পারে না বলিয়াই যে সজীব পদার্থ কোন অভৌতিক ঐশীশক্তি হইতে সমুৎপন্ন একথা কিরূপে প্রতিপাদিত হয়? বিশেষতঃ যখন আমরা ভৌতিক কার্য্য সকলের ক্রিয়াবান কারণের কিছুই অবগত নহি, তখন আমরা কিরূপে অনুমান করিতে পারি যে, সেই ক্রিয়াবান কারণশক্তিতে সজীব পদার্থোৎপত্তির কারণ নিহিত নাই? এই পৃথ্বীর যে অবস্থায় নির্জ্জীব পদার্থ হইতে প্রথমে সজীব পদার্থ সমুদ্ভূত হইয়াছিল, সে অবস্থায় সমুদায় বিষয় বিজ্ঞানের আয়ত্তে আইসে নাই এবং আসিতে পারে কি না, সন্দেহ। তখন আমরা হদ্দ এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, নির্জ্জীব পদার্থ হইতে কিরূপে সজীব পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে অথবা হইতে পারে, কি না, তাহা আমি

পর্য্যন্ত মনুষ্যের জ্ঞান গোচর হয় নাই। ঐশী শক্তিদ্বারা আমাদের এই অজ্ঞতা নিরসন করিতে গেলে কি বাস্তবিক আমাদের অজ্ঞতা নিরাকৃত হইল? না সেই অজ্ঞতা যেখানকার সেই খানেই রহিল? এই জড় জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা যদি ঐশীশক্তি না হয়, তবে তিনি সজীব জগতের স্রষ্টা কিরূপে হইতে পারেন, আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অভৌতিক শক্তিদ্বারা ভৌতিক কার্য্যের ব্যাখ্যান কিরূপ যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। প্রথমতঃ অভৌতিক শক্তিই কি, তাহা আমরা জানি না। দ্বিতীয়তঃ সেই অভৌতিক শক্তি যে আবার ভৌতিক পদার্থের কিরূপে সৃষ্টি-কারণ হইতে পারে, তাহাও মানুষের জ্ঞানগোচর নহে। যদি কেহ এমত কথা বলেন যে, যদি অভৌতিক শক্তিদ্বারা ভৌতিক পদার্থ উৎপন্ন না হইয়া থাকে, তবে কি পদার্থ সকল স্বয়ং উৎপন্ন হইল? আমরা বলিব কোন পদার্থ যে স্বয়ংসম্ভূত হইতে পারে, তাহা ঈশ্বরবাদীরাই বলিতেছেন; তাহা আমরা বলি নাই; যে হেতু, ঈশ্বরবাদীরা ঈশ্বর পদার্থকে স্বয়ংসম্ভূত বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন। আমরা বলি, কিরূপে পদার্থোৎপত্তি হইয়াছে সে রহস্য মানব-জ্ঞানাতীত। তবে ঈশ্বরবাদীরাই বলিতেছেন, পদার্থ স্বয়ং সম্ভূত হইতে পারে। যদি শরীরের স্বয়ংসম্ভূতশক্তি সম্ভাবিত হয়, তবে জড়জগতের ভৌতিক শক্তি সকল সেই রূপ না হয় কেন? বিশেষতঃ যখন আমরা সেই শক্তির আদি কোথায় তাহা জানি না। আর যদি সেই শক্তি অনাদি হয় এবং মনুষ্যের জ্ঞানের বিষয় না হয়, তবে সেই শক্তি যেমন নির্জীব জগতের মূল, সেই রূপ সজীব জগতের মূল না হয় কেন? গ্রন্থকার এই সমস্ত বিচার না করিয়াই একবারে একটি মত ধরিয়া লইয়াছেন। অথচ যে বিষয়ের ব্যাখ্যান খুঁজিতেছিলেন, সে বিষয় কিছুই ব্যাখ্যাত হয় নাই।

আর একটি বিষয়। আত্মা ও মন সম্বন্ধে জগতে দ্বিবিধ মত প্রচলিত দেখা যায়। প্রাচীন চার্ব্বাকেরা বলিয়াছিলেন আত্মা ও মন হয় শরীরেরই শক্তি, না হয় শরীর হইতে উৎপন্ন পদার্থ এবং শরীরের সহিত তাহাদের অস্তিত্ব থাকে। আর একটি মত এই, আত্মা ও মন শরীর অতীত এক প্রকার স্বতন্ত্র পদার্থ, যাহা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং শরীরবিচ্ছেদেও থাকিবে। বিজ্ঞান এই দ্বিবিধ মতের কোন মতই স্থাপন অথবা খণ্ডন করিতে পারে না। যখন শারীর জীব মনুষ্য কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইতে পারেনা, তখন ঐ দুই মতের সম্যক্ পরীক্ষা হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, আত্মা শারীর শক্তি নহে, তাঁহারা বলেন, অদ্যাপি শারীর বিদ্যা দ্বারা যতদূর শারীরিক প্রক্রিয়া জানা গিয়াছে তাহাতে শরীরের সহিত আত্মার

সম্বন্ধ মাত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেয়; কিন্তু শরীরই যে আত্মা এমত প্রতিপাদন করে না। গ্রন্থকার যাহা দেখাইয়াছেন, তদ্দ্বারাও এই সম্বন্ধের নির্দ্দেশ করে মাত্র। তিনিও কোন মত স্থাপন অথবা খণ্ডন করিতে পারেন নাই।—কিন্তু তিনি যদি বলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য তাহা ছিল না, মানব চেতনার শারীরিক প্রক্রিয়া বুঝানই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য; আমরা তৎপক্ষে বলিব যে, সে উদ্দেশ্য ভালরূপে সিদ্ধ হয় নাই। যেহেতু গ্রন্থের এই অংশ তত পরিষ্কার নহে।

যাহা হউক, আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব যে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রস্তাবিত বিষয়ে এ প্রকার গ্রন্থ এক্ষণে আর দ্বিতীয় নাই।

দুর্য্যোধনের মৃত্যু।*

কবিবর ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্ত বিরচিত।

"দেখ, দেব, দেখ চেয়ে," কাতরে কহিলা
কুরুরাজ কৃপাচার্য্যে,—"আসি'ছেন ধীরে
নিশীথিনী; নাহি তারা কবরী-বন্ধনে,—
না শোভে ললাটদেশে চারু শিশামণি!
শিবির বাহিরে মোর লহ কৃপা করি, গু
মহারথ। রথ লয়ে যথায় ঝরিবে
এ ভূনত-শিরে এবে শিশিরের ধারা,
ঝরে যথা শিশুশিরে অবিরল বহি

* অনেকেই অবগত আছেন, কবিকেশরী মাইকেল মধুসূদন দত্তজার সহিত আমার কি সম্বন্ধ ছিল। বৈষয়িক জীবনে তাঁহার সহিত আমার প্রভু ভৃত্য-রূপ সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু, তিনি আমাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিতেন এবং পার্থিব জীবনের একজন সহায় বলিয়া জানিতেন। জীবিতাবস্থায় তিনি আমার উপর যে অসীম স্নেহ ও অপার অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তদীয় জীবনাখ্যান সমাজে প্রচার করিয়া সেই দুষ্পরিশোধ্য ঋণের কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিবার বলবতী ইচ্ছা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক আছে। কিন্তু, নানাবিধ প্রতিকূল ঘটনার অনিবার্য্য শাসনে অদ্যাপি সে ইচ্ছা সফলা হয় নাই, আর সত্বর যে ফলবতী হইবে, এমত সম্ভাবনাও নাই।

ঐ মহাকবির বিরচিত বহুসংখ্যক অসম্পূর্ণ কবিতা আমার হস্তগত হইয়াছিল। অভিলাষ ছিল, তাঁহার জীবন-চরিতের সহিত ঐ সমস্ত কবিতা মুদ্রিত করিয়া সমাজে প্রচারিত করিব। যখন সে অভিলাষ সুসিদ্ধ হইবার বাধা হইতেছে, তখন ঐ সকল কবিতা প্রচার না করিয়া আর ফেলিয়া রাখিলে কাব্যপ্রিয় সামাজিকগণের নিকট আরও অপরাধী হইতে হয়। বস্তুতঃ এই সুদীর্ঘকাল উক্ত কবিতাকদম্ব প্রচার না করায় আমি অপরাধগ্রস্ত হইয়াছি। সহৃদয় সামাজিকেরা আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। অতঃপর আর্য্যদর্শন পত্রিকায় ঐ কবিতাগুলি ক্রমশঃ প্রচারিত হইবে। এবারে "দুর্য্যোধনের মৃত্যু" নামক অসম্পূর্ণ কবিতাটী প্রকাশিত হইল।

খুলনা নৈহাটী। শ্রীকৈলাসচন্দ্র বসু।

জননীর অশ্রুজল, কালগ্রাসে যবে
সে শিশু।" লইলা সবে ধরাধরি করি
শিবির-বাহিরে দূরে —ভগ্নউরু রথে!
মহাযত্নে কৃপাচার্য্য পাতিল ভূতলে
উত্তরী। বিষাদে হাসি কহিলা নৃমণি;—
"কার হেতু এ সুশয্যা, কৃপাচার্য্য রথি?
পড়িনু ভূতলে, প্রভু মাতৃগর্ভ ত্যজি;—
সেই বাল্যাসন ভিন্ন কি আসন সাজে
অন্তিমে? উঠাও বস্ত্র, বসিব ভূতলে।
কি শয্যায় সুপ্ত আজি কুরুবীর্য্য রূপী
গাঙ্গেয়? কোথায় গুরু দ্রোণাচার্য্য রথী
কোথা অঙ্গপতি কর্ণ? আর রাজা যত
ক্ষত্র-ক্ষেত্র পুষ্প দেব। কি সাধে বসিবে
এ হেন শয্যায় হেথা দুর্য্যোধন আজি?
কি কাষ আমার আর বৃথা সুখ ভোগে?
নির্ব্বাণ পাবক আমি, তেজ শূন্য বহ্নি।
ভস্মমাত্র। এযতন বৃথা কেন তব।"
সবায়ে উত্তরী দূরে বসিলা ভূতলে।
নিকটে বসিলা কৃপ কৃতবর্ম্মা রথী
বিষাদে নীরব দোঁহে;—আসি নিশীথিনী,
মেঘরূপ ঘোমটায় বদন আবরি,
উচ্চ বায়ু-রূপ শ্বাসে সঘনে নিশ্বাসি;—
বৃষ্টি-ছলে অশ্রুবারি ফেলিলা ভূতলে।
কাতরে কহিলা চাহি কৃতবর্ম্মাপানে
রাজেন্দ্র; "এ হেন ক্ষেত্রে, ক্ষত্র চূড়ামণি,
ক্ষত্র-কুলোদ্ভব, কহ, কে আছে ভারতে,
যে না ইচ্ছে মারিবারে? যেখানে, যেকালে
আক্রমেন যমরাজ; মর্ম্মপীড়া-দায়ী
দণ্ড তাঁর, — রাজপুরে, কি ক্ষুদ্র কুটীরে,
মম ভয়ঙ্কর প্রভু, সে ভীম মূরতি!
কিন্তু হেন স্থলে তাঁরে আতঙ্ক না করি
আমি। — এই সাধ ছিল চিরকাল মনে।
যে স্তম্ভ স্তব্ধ বলে, শির উঠায় আকাশে
উচ্চ রাজ-অট্টালিকা, সে স্তম্ভস্বরূপে
ক্ষত্রকুল-অট্টালিকা ধরিনু স্ববলে
ভুজবলে। ভূপতিত এবে কালে আমি;
দেখ চেয়ে চারিদিকে ভগ্ন শতভাগে
সে সুঅট্টালিকা চূর্ণ এ মোর পতনে!
গড়ায় এক্ষেত্রে পড় শৃঙ্গ চূড়া কত।
আর যত অলঙ্কার—কার সাধ্য গণে?
কিন্তু চেয়ে দেখ সবে, কি আশ্চর্য্য! দেখ—
রক্ত বরণে দেখ, সহসা আকাশে
উদিছেন এ পৌরব বংশ-আদি যিনি,
নিশানাথ। দুর্য্যোধনে ভূশয্যায় হেরি
কুবরণ হইলা কি শোকে সুধানিধি?"
পাণ্ডব-শিবির পানে ক্ষণেক নিরখি
উত্তরিলা কৃপাচার্য্য;—"হে কৌরবপতি,
নহে চন্দ্র যাহা, রাজা, দেখিছ আকাশে,
কিন্তু বৈজয়ন্তী তব সর্ব্বভুক্‌রূপে!
রিপুকুল চিতা, দেব, জ্বলিয়া উঠিল।
কি বিষাদ আর তবে? মরিছে শিবিরে
অগ্নি-তাপে ছট ফটি ভীম দুষ্টমতি;
পুড়িছে অর্জ্জুন, রায়, তার শরানলে,
পুড়িল যেমতি হেতা সৈন্য দল তব!
অন্তিমে পিতায় স্মরে যুধিষ্ঠির এবে;
নকুল ব্যাকুলচিত সহদেব সহ!
আর আর বীর যত একাল সমরে
পাইয়াছে রক্ষা যারা, দাবদগ্ধবনে
আশে পাশে তরু যথা!—দেখ মহামতি!

বাগ্মী ও সংবাদপত্র*।

মহাশয়, এখন একদল লোক হইয়াছেন, যাঁহারা দেশীয় বক্তা ও লেখকদিগের প্রতি গালিবর্ষণ ব্যবসা করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের এ প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে দমনীয়। আমাদের আধুনিক সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" এ প্রকৃতির পরিপোষক। কিছু দিন গত হইল বঙ্গবাসীতে "কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম। আরও কয়েক বার ঐরূপ অর্থশূন্য প্রবন্ধ বঙ্গবাসীকে কলঙ্কিত করিয়াছিল। উহাদের মতে সুরেন্দ্র ও কেশব, "আর্য্যগাথা" ও "ভারত সঙ্গীত" ভারতের ভাবী মঙ্গলের বাধা। যেন বর্ক ও ডিমস্থিনিস্ মহাপাতকী, মুর ও ভল্টেয়ার নরকেরও অযোগ্য পাপী। এই সকল কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধ যদি বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিবার জন্য সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বলি যে, এরূপ শিক্ষা বঙ্গ হইতে শতযোজন দূরে পলায়ন করুক, অজ্ঞানের গাঢ়তম অন্ধকারকে সাদরে আলিঙ্গন করুক।

দেশে কতকগুলি লোক আছেন, যাঁহারা স্বদেশের কোন প্রকার হিতকর কার্য্য করিতেছেন। এই অপরাধে বঙ্গবাসী ও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি তাঁহাদিগের বিরোধী। এই অপরাধে তিনি তাঁহাদিগের উপর, বোধ হয়, উচ্চ নিঃস্বার্থ ক্রোধে বা গরীয়সী দেশহিতৈষিতায় চালিত হইয়া, জ্বলিত হৃদয়ে তীব্র গালিবর্ষণ করিয়াছেন। বঙ্গবাসী বাঙ্গালীকে সাবধান করিয়া দিতেছেন যে, এই সম্প্রদায়ের লোক অতি ভয়ানক, দেশের কণ্টক, শান্তির হন্তারক। তিনি আজ নূতন শিক্ষা দিতেছেন যে, শুদ্ধ বক্তৃতায় কার্য্য হইবে না, বাকেী কার্য্য হইবে না। তবে বোধ হয়, সংবাদ পত্রে অর্থশূন্য কুযুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলে হইবে। কারণ, ইহা ব্যতীত আমরা বঙ্গবাসীর অন্য কোন স্বদেশহিতৈষিতার নিদর্শন পাই নাই।

বঙ্গবাসীর সম্প্রদায়ের লোকেরা বক্তৃতার উপর বড় বিতৃষ্ণ। যেন বক্তৃতা শুদ্ধ অনাবশ্যক নহে, নিতান্ত অনর্থকারী, কেবল অনুর্ব্বরা ভূমি নহে, উহা কণ্টকময় অরণ্য। ইঁহারা কি জ্ঞাত নহেন যে, বক্তৃতায় জগতে কত মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে? বক্তৃতায় ও লেখায় ইটালী জাগিয়াছিল; বক্তৃতায় উইলবার্ফোর্স্ (Wilberforce) দাসজাতির উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন: বক্তৃতায় মিরাবো (Mirabeau) উন্মত্ত ফ্রান্সকে দমিয়া রাখিয়াছিলেন ও বাঁচিলে হয়ত ফ্রান্সের সে প্রজ্বলিত

* আমরা এই পত্র খানির উদ্দেশ্য ভাল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিলাম, কিন্তু লেখকের মতামত ও শ্লেষোক্তির জন্য আমরা দায়ী নহি। স।

সময় মাবালনরূপ ললাটলিপি খণ্ডন করিতে পারিতেন; বক্তৃতায় ঈশা ঈশ্বরের ধর্ম্ম জগতে প্রচার করিয়াছেন। অবশ্য, বক্তৃতা অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলদায়ী। যথার্থই দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত একটী জীবন শত বক্তৃতা অপেক্ষা ফলপ্রদ। অবশ্য, নিজে উপদেশ দিয়া নিজে পালন না করিলে উপদেশ অধিক ফলদায়ী হয় না। অবশ্য, শুদ্ধ বক্তৃতায় সন্তুষ্ট নহি, কার্য্য চাই। কিন্তু সর্ব্বদেশে সর্ব্বসময়ে অগ্রে বাক্য, পরে কার্য্য হইয়া আসিয়াছে। আরবীয় মহম্মদ একবারেই জগতের বিরুদ্ধে, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে একা তরবারি ধরেন নাই। ফ্রান্স বিনা বক্তৃতায় ও লেখায় জাগে নাই। অগ্রে হৃদয়োন্মাদী বাক্য, পরে জীবন্ত বিশ্বাস, পরে জ্বলন্ত অনুরাগ, পরিশেষে বিশ্ব-বিপ্লবী কার্য্য; ইহাই জগতের চিরন্তন নিয়ম, ইহাই মনুষ্য জীবনের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খল। কার্য্যের সময় আসিয়াছে কি না ঘটনা বিচার করিবে। ভারতে কি বক্তৃতার আবশ্যকতা নাই? যে সকল উন্নত-ভাবে পূর্ণ হইয়া ইউরোপ এত শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে, আমাদের দেশে কি সে সকল মহৎভাব জনসাধারণ বুঝিয়াছে? বোধ হয়, কিছুই বুঝে নাই। যে সকল অনুষ্ঠানে সমগ্র জাতির চেষ্টা ও যত্ন আবশ্যক, সে সকল অনুষ্ঠান একাকী হইতে পারে না বলিয়া, তাহা অবলম্বিত হইতেছে না। দেখুন না কেন, আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "বিধবা বিবাহ" বিষয়ক সদনুষ্ঠান কেন বিফল হইল? সমাজ-সংস্কার কি স্বদেশের অপরাপর হিতানুষ্ঠানে জাতীয় অনুরাগ ও প্রযত্নের আবশ্যক। জাতীয় অনুরাগ উদ্দীপিত হইবার পূর্ব্বে জাতীয় সংস্কার ও বিশ্বাস উৎপাদনের প্রয়োজন। মন ফিরিলে, হৃদয় ফিরিবে, হৃদয় ফিরিলে হস্ত কার্য্য করিতে উদ্যত হইবে। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের জাতি সাধারণের কি মন ফিরিয়াছে? জিজ্ঞাসা করি, এই জাতি সাধারণের মন ফিরাইবার জন্য কি অগ্রে বক্তৃতা, শিক্ষা এবং উপদেশের প্রয়োজন নাই? অনেক বাক্যব্যয় না করিলে কি সহজে শিক্ষা লাভ হয়?

যাহাইউক কার্য্য না পারিলেও যাহারা শুদ্ধ বক্তৃতা করে, দেশকে শিক্ষা দেয়, তাহাদিগের গ্লানি গাইব; স্বয়ং অসমর্থ বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিব, ঈশ্বর তাহা হইতে আমাদিগকে শত হস্ত দূরে রাখুন!

বাগ্মী বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন বলিয়া স্পষ্টতঃ বঙ্গবাসীর লেখকের দারুণ আক্রোশ। অবশ্য সাধারণের শিক্ষা আবশ্যক, দেশীয় ভাষায় বক্তৃতাও প্রয়োজনীয়। আমরা ভরসা করি যে দেশীয় ভাষায় বক্তাও আছেন, যাঁহারা সাধারণকে শিক্ষা দেন। কিন্তু ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা তিন কারণে আবশ্যকীয়। প্রথমতঃ নিশ্চয়ই বঙ্গের ভাবী আশা

অনেক পরিমাণে বঙ্গীয় শিক্ষিত যুবকদিগের উপর নির্ভর করিতেছে; কারণ তাঁহারাই অশিক্ষিত সম্প্রদায়কে ক্রমে শিক্ষিত করিবে। প্রথমে তাঁহাদিগের শিক্ষা বস্তুতঃ সাধারণের শিক্ষা। তাঁহারা ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতায় অধিক আকৃষ্ট হন। বৃটনের পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলে এ বিষয়ে ভাব-প্রিয়তা স্বভাবিক বলিয়াই বোধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইংরাজী ব্যতীত কোন ভাষা সমগ্র ভারতে প্রচলিত নহে। সমগ্র ভারতকে কোন কথা বুঝাইবার একমাত্র সহজ উপায় ইংরাজিভাষা। তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক বক্তৃতা ইংরাজের বিশেষ পাঠ্য। কারণ তাঁহাদিগের হইতে অনেক উপকারের প্রত্যাশা। আজ বাঙ্গালী বা ভারতবাসী যে বলপূর্ব্বক স্বত্ব ইংরাজদিগের হস্ত হইতে লইবে, সে দিন আসে নাই। সে দিন আসে নাই যে, ভারতবাসী আইরিশদিগের ন্যায় সদর্পে বলিবে "ইংরাজগণ! তোমরা জেতা, আমরা বিজিত সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া স্বত্ব চ্যুত করিও না; আমাদের স্বত্ব আছে, তোমাদের বাধ্যতা আছে। অন্যায় করিলে ফলভোগ করিবে।" বাঙ্গালী যাহা চায়, ইংরাজদিগের হৃদয় নিহিত মহৎ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করিয়া লইতে হইবে। তাহার জন্যই ইংরাজী বক্তৃতার আবশ্যকতা। লেখক যখন লিখিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় দেশহিতৈষিতা-প্রবর্ত্তনায় এত উত্তেজিত হইয়াছিলেন, ভাবের স্রোত এতই লেখনী হইতে বহিয়াছিল যে, এ সকল ভাবিবার সময় পান নাই। অথবা ভাবিয়াছিলেন ভাষার অপূর্ব্ব ছটায় ভাবের বিচিত্র মধুরিমায় নূতন প্রবর্ত্তিত নীতির নবীনতার ও উজ্জ্বলতায় পাঠক এ সকল ভুলিয়া যাইবে।

লেখক বলিতে চান যে, বাগ্মীদিগের স্বার্থত্যাগ নাই, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পারি, লেখকের নিজের কোন স্বার্থত্যাগ আছে কিনা? ভাই, আগে আপনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তৎপরে অপরের আলস্য জন্য গালি দিতে অধিকারী হইতে পারিবে। বামকর-ন্যস্ত মস্তকে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা লেখনী চালন ব্যতীত তিনি নিজে কোন ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কি? দুগ্ধফেনধবল নবনীতকোমল শয্যায় শুইয়া চিন্তা ভিন্ন নিজে স্বার্থত্যাগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন কি না?

"Let us be serious should such
trials come,
Are they themselves prepared
for martyrdom."

বাগ্মীর নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দেশের শিক্ষার নিমিত্ত স্থান হইতে স্থানান্তর গমনে শীতরাত্রের হিমভোগে ও জাগরণে ও অনাহারে, গ্রীষ্মের তাপে ও ধূলার ভ্রমণে কি তিনি কিছুই প্রশংসনীয় দেখিতে পান না? অবশ্য, ম্যাটসিনির স্বার্থত্যাগের সহিত তুলনায় ইহা বলিবার উপযুক্ত নহে। কিন্তু ভারত কি

ইটালী? মনুষ্য সময়ের অধীন,—বাহ্য ঘটনাবলীর অধীন। ম্যাট্সিনির সময়ে ইটালীর ও আধুনিক ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কি সমান? বিনা মহৎ উদ্দেশ্যে অনাহারে ও শীত-জর্জ্জরিত দেহে মরিলেই কি স্বার্থত্যাগী হওয়া যায়? আরও জগতে কয় জন ম্যাটসিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে? উঁহারা মানব জীবনের আদর্শ—দূরোচ্চস্থাপিত বাত্যা-অক্ষুব্ধ স্থির দীপালোক—যে যতদূর নিকটে যাইতে পারে, সেই তদ্দূর মহৎ—ততদূর উদ্দেশ্যে পূর্ণমনোরথ। ঠিক ম্যাট্সিনির ন্যায় অত দূর স্বার্থত্যাগ নাই বলিয়া লোক নিন্দা, হেয়, গালিবর্ষণের যোগ্য পাত্র? সময় আসিলে ভারতেও আবার ম্যাট্সিনি জন্মিবে। সময় আসিলে অতুলনীয় স্বার্থত্যাগী এই দেশেই জন্মগ্রহণ করিবে। আজ এক জন বক্তা ভ্রম পতিত হইয়াও দেশের জন্য, ধর্ম্মের জন্য—মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কারাগারকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছেন। কাল এক জন আবার দেশের জন্য, জাতির জন্য, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবেন। বঙ্গবাসী! ক্ষুব্ধ হইও না, নিন্দা করিও না, সে দিন আসিবে, আসিবে। তুমি নিশ্চল থাক। প্রকৃতি—জাতীয় জীবন—নিশ্চল থাকিবে না, উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে।

লেখক বলিতে পারেন যে, বাগ্মী হইতে দেশের কি কার্য্য সাধিত হইতেছে? কিন্তু দেশ পরাজিত,, কালচক্রে ঘূর্ণমান ভারতের দগ্ধ ভাগ্য আজ পরের হস্তে। ইহাতে কি অধিক আশা করা যাইতে পারে? সেই বুদ্ধিমান্ রাজনীতিজ্ঞ, যে কেবল কি বক্তনীয় বিবেচনা করে না, কিন্তু কি আশনীয়, তাহাও দেখে*। বিদেশীয়গণ রাজশাসনে পিতৃতুল্য হইলেও, তাঁহারা বিজাতীয়। এ রাজ্য রামরাজ্য হইলেও ইহা পরের হস্তে। যেখানে তাহাদের স্বার্থের সহিত আমাদের স্বার্থের সংঘাত হইবে, সেখানে কি আমাদের স্বার্থ বিচূর্ণ হইবার কথা নহে? তথাপি বক্তৃতায় অনেক কার্য্য হয়। নূতন অত্যাচারী বিধি বিলুপ্ত না হউক, কতক পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবার আশা আছে। বর্ক (Burke) অতি অল্প সময় উদ্দেশ্যে পূর্ণ-মনোরথ হইতেন। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার বক্তৃতার কিছু ফল দর্শে নাই? যখন বস্ওয়েল (Boswell) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার প্রস্তাবিত বিষয় নিষ্ফল হইবে জানিয়াও তিনি বক্তৃতায় এত পরিশ্রম স্বীকার করেন, ইহা লোকে আশ্চর্য্য বিবেচনা করে। তিনি উত্তর করিলেন যে, "যদি কোন পাণ্ডুলিপি বাধা সত্ত্বেও বিধিতে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই বাধানিবন্ধন বিধি কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমরা জয়লাভ না করি, তর্কে পরাস্ত করিব।" বর্ক হেষ্টিংসের বিচারে আপাততঃ অপূর্ণ-

* See Burke on American taxation.

মনোরথ হইলেও তাহার ফল কি পরে দৃষ্ট হয় নাই†? তাই বলি বক্তৃতায় অপাততঃ ফল না দেখিতে পাইলেও, ফল পরে লক্ষিত হইবে। সত্য, আশা বিফল হইলে ক্ষোভ হয়; তাহার জন্য দোষী কি বক্তাগণ? হতভাগ্য আসামীর, বিচারে হারিলে, উকীলকে গালি দেওয়া যেরূপ অসঙ্গত, বক্তাগণকে গালি দেওয়া কি তদ্রূপ নহে? বঙ্গবাসী! দোষী বক্তাগণ নহে, দোষী আমাদিগের অভিশপ্ত দগ্ধ ললাটলিপি।

লেখক বলিবেন, বাগ্মীরা অনেক সময় অপব্যয় করেন। কিন্তু যাঁহারা সুখে আহার করিয়া নিদ্রা যান, আপন গৌরবে নিজগৃহে বসিয়া নিজগৌরব ধ্যান করেন, যাঁহারা মদ্যপানে ও পাপাচারে জীবনের অধিক সময় যাপন করেন, যাঁহারা নিজ আবাসস্থল অশ্লীল আলাপনে ও কুৎসাচর্চ্চায় বারবিলাসিনী-গৃহবৎ ঘৃণিত করিয়া তুলেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বাগ্মিগণ সময় অধিক অপব্যয় করেন? যাঁহারা অর্থের লোভে সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে অর্থহীন, গ্লানিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন, তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাদিগের উদ্দেশ্য মহৎ নহে? আর যাঁহারা বিবাহরহস্য, গহনারহস্য ও মেম সাহেব লিখিয়া, সংবাদপত্রকে কলঙ্কিত করেন, অন্ততঃ তাঁহাদিগের অপেক্ষা কি বক্তাগণ প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিযুক্ত নহেন? "লোকরঞ্জন মহাব্রত, এই রঘুকুলগুরু-প্রদিষ্ট মহাবাক্য বুঝি আজ সার্থক হইল। রাম লোকরঞ্জনার্থে নিজের প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে যখন বনবাস দিয়াছিলেন, বঙ্গবাসী যদি সেই লোকরঞ্জনার্থে সত্য, ন্যায় ও ভদ্রতাকে বিসর্জ্জন করিতে না পারিলেন তাহা হইলে আর মহত্ত্ব কি?

ইঁহারা বলেন যে বক্তাগণ সাধারণের অর্থ লইয়া অপব্যয় করেন, ইহা অসহনীয়। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র মহোদয়েরা বেশ্যানৃত্যগানে ও অন্যান্য সহস্র নীচামোদে যে ব্যয় করেন, তাহা অপেক্ষা কি এই ব্যয় দূষণীয়? বিড়াল কুকুরের বিবাহার্থ অকাতরে রাশীকৃত অর্থব্যয় অপেক্ষাও কি ইহা অপব্যয়? চাঁদা আদায় করিয়া লোকে যে বারয়ারিতে যাত্রা অভিনয় প্রদর্শন করে, তাহা হইতেও কি ইহা নিন্দনীয়? আর বক্তাদিগের কর্ত্তৃক ব্যয় এত অসহনীয়? হা ঈশ্বর!. সেই উদ্দেশ্যে যে এত অল্প মুদ্রা সংগৃহীত হয়, ইহা কি অল্প ক্ষোভের বিষয়?

ইঁহারা বলেন যে যশোলিপ্সায় বক্তাগণ এই আন্দোলন করেন। আচ্ছা স্বীকার করিলাম; কিন্তু যশোলালসা কি এতই হেয়—অর্থলোভ হইতেও ঘৃণ্য? অবশ্য, যাঁহারা যশের নিমিত্ত উৎসুক নহেন, দেশের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়া যাইব, ইহাই যাঁহাদিগের বাসনা, তাঁহারা মহৎ, প্রকৃত দেশানুরাগী; তাঁহারা দেবোপম। অন্তরে

† Life of Burke by Morley.

তাঁহাদিগকে পূজা করি। কিন্তু যাঁহারা যশোলালসাতেও দেশকে উন্নত করিতে যত্ন করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিদ্রিত, নির্জ্জীব, জড়পদার্থ দেশবাসী হইতে সমধিক প্রশংসনীয়। যশ প্রায় মনুষ্যমাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কয় জন সে যশোলাভে যত্নবান বা সমর্থ? যশ সুলভ নহে; প্রতি পণ্যবীথিকায়ই ইহা প্রাপ্য নহে।

যশোলালসা এক মহতী বিশ্বব্যাপিনী শক্তি। ইহা যেখানেই যায়, সেই স্থানেই অনিষ্ট উৎপাদন করে না। ইহা মনুষ্যকে যেমন নিকৃষ্টতম পশু করে, তেমন ইহা মনুষ্যকে পূজ্য দেবতা করে; যেমন মনুষ্যকে দেশের অনিষ্টপ্রয়াসী দুঃখদ কুচক্রী করে; সেইরূপ ইহা মনুষ্যকে দেশের নিমিত্ত প্রাণোৎসর্গী হিতৈষী করে;* ইহা দেশকে কণ্টকময় অরণ্য করে বটে, কখন আবার দেশকে সুবাসস্ফুটিত কুসুমালঙ্কৃত সুন্দর উদ্যানেও পরিণত করে। তবে উন্মত্ত মানব যশমাত্রকেই নিন্দা করিও না "Chatter not, sublime reader, common places of scoundrel moralists against ambition. In some cases ambition is a hopeful virtue; in others ambition was the virtue by which any others could flourish"†। যখন দেশ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, নিদ্রা ও অলসতা বিশ্বব্যাপী ধূমে সমাচ্ছন্ন, তখন কখন কখন যশোলিপ্সাই দেশহিতৈষী নাবিকের অটল, স্থির ধ্রুব-নক্ষত্র; ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই নাবিক তরণী চালাইয়া যায়। তবে যশোলিপ্সা মাত্রই দূষণীয় নহে। যে যশোলিপ্সায় স্বদেশকে জগতের অলঙ্কার করিতে প্রয়াসী হয়, প্রতি সহৃদয় দেশবাসীই তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, সন্দেহ নাই।

মহাশয়! এই কুৎসা-প্রিয় লোকদিগের এরূপ আচরণের কারণ কি এই নহে যে, তাহারা নিজে অকর্ম্মণ্য, নির্জ্জীব ও যশোলাভে অসমর্থ। অপরে পরিশ্রম করিয়া যশোলাভ করিবে, ইহাও তাহাদিগের অসহনীয়। এই পরশ্রীকাতরতাই তাহাদিগকে দগ্ধ করিতেছে। তাহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য পরের অবনয়ন। ঘৃণিত কীটসমূহ যেমন গলিত শব আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, এই সমস্ত লোক পরনিন্দা আহার করিয়া পরিপুষ্ট হয়।

বাগ্মীর বহিশ্চরিত্রে দোষারোপ করিয়া ইহারা ক্ষান্ত হইতে পারে নাই। অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া অন্তর্ব্বাটীর পবিত্র যবনিকা উদ্ঘাটন করিতে লজ্জা বোধ করে না। জুনিয়সের ঈর্ষ্যাহলাহল আছে, সামর্থ্য নাই; উইলকক্সের কু-

* The same ambition can destroy
or save
It makes a martyr as it makes
a knave.
Pope, Essay on Man.

† The Caesars by De. Quincy.

প্রবৃত্তি আছে, তাহার প্রকাশ-ক্ষমতা নাই। শ্লেষে সত্যের আভাসও চাই। ইহাদিগের ক্ষিপ্ত কল্পনা নিতান্ত অস্বাভাবিক বিষয় চিত্রিত করিতে অভিলাষী। ইহাদিগের ব্যাধিজর্জরিত মস্তিষ্ক প্রসূত সৃষ্টি যথার্থ জীবনের সহিত মিলে কি না চিন্তা করে না। পরিবারের অভ্যন্তরে বাগ্মী বিধবা মাতার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন, শয়ন-মন্দিরে পত্নীর সহিত কিরূপ আলাপ করিলেন ইহাই ইহারা কলুষিত কল্পনায় রচনা করিবে ও লজ্জাহীন লেখনীতে প্রকাশ করিবে। এ দৃশ্য সত্য হইলেও অন্তর্ব্বাটীতে আমার আচরণ সাধারণের বিবেচ্য ও আলোচ্য নহে।

মহাশয়! এ প্রকার লোকের প্রতি কাহারও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। যাহারা অন্তর্ব্বাটীর দ্বার উদ্ঘাটন করিতে সাহসী ও তাহা অপরঞ্জিত করিতে কাতর নহে; যাহারা নিজের স্বার্থের নিমিত্ত পরের প্রিয়তম স্বার্থ বিনাশ করিতে,শুভ্র যশ কলঙ্কিত করিতে উদ্যত, তাহাদিগকে অন্য সকলেই অতি হেয় ও ঘৃণ্য মনে করেন।

মহাশয়! ভাবি নাই, কোন বঙ্গীয় লেখক অন্তঃপুরের পবিত্র আবরণ উন্মোচনে সাহসী হইবে। ভাবি নাই, যখন বঙ্গবাসী প্রকাশিত হইয়াছিল, এ প্রকার কুরুচি প্রবন্ধ সকল বঙ্গবাসীতে স্থান পাইবে। ভাবি নাই চৌর্য্যভাবে অন্তঃপুরপ্রবেশ ও এই পরশ্রীকাতর মস্তিষ্কজাত কাল্পনিক দৃশ্য বঙ্গবাসীর স্তম্ভকে কলঙ্কিত করিবে। কিন্তু দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

বঙ্গবাসীর অবতার আজ নূতন ধর্ম্ম শিখাইতে আসিয়াছেন, যে—"দেশহিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই, হৃদয়ের শোণিত চাই, দেশহিতৈষিতা বড় শক্ত কথা।" বোধ হয় তিনি একথা না বলিলে আমাদের উপায় ছিল না। হা সুরেন্দ্র! মিছাই তুমি ম্যাটসিনির স্বার্থত্যাগের বিষয় বক্তৃতা করিয়া মরিয়াছ। দেশহিতৈষিতায় স্বার্থত্যাগ চাই, একথাও শিখাইতে পার নাই? নূতন অবতার আসিয়া সে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। মিছাই তুমি পরিশ্রম করিলে। ভাবিয়াছিলে যে, তোমার নাম স্মরণীয় হইবে। কিন্তু এবার বুঝি তোমার নাম লোপ হয়। আর তুমি বক্তৃতা করিলেও, ত হৃদয়ের শোণিত দিতে পার নাই। বঙ্গবাসীর অবতার আজ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন, হৃদয়ের শোণিত দিয়া ফেলিয়াছেন। বঙ্গবাসী! যখন লিখিয়াছিলে, তখন "আমি নিজে কি" ইহা ভাবিতে কি বদন আরক্ত হয় নাই? মস্তক অবনত হয় নাই? অহো বিড়ম্বনা!

ইহা নিতান্তই সত্য যে, প্রকৃত দেশানুরাগ জগতে অতি বিরল। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে অধিক লোক স্বার্থচিন্তায় নিমগ্ন। ইহা নিতান্ত সত্য যে, জগতে ম্যাটসিনি অতি অল্পই জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছে। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে নিজের প্রিয় পরিবারের সুখ বিসর্জ্জন চাই। জানি, প্রকৃত দেশানুরাগে স্বার্থত্যাগ চাই, প্রাণোৎসর্গ চাই। কিন্তু হা জগৎ। তোমাতে ইহা বিরল না হইলে, কি তুমি স্বর্গ হইতে না?

প্লেটো তাঁহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিগণকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। আজ নূতন প্লেটো কল্পিত রাজ্য হইতে বক্তাগণকে দূর করিতে চান। হা কেশব! হা সুরেন্দ্র! হা কালীচরণ! তোমাদের দশা কি হইবে? আজ বঙ্গবাসী পোপের ক্ষমতা হস্তে লইয়া তোমাদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিতে চান। তোমরা নীরবে রোদন কর।

বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে বাঙ্গালীর—ভারতবাসীর একতা কখন হইল না। আমরা একা বঙ্গবাসীর বিরোধী নহি। শুদ্ধ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই ইহা লিখিত হইল না। এই সম্প্রদায়ের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। কেহ কার্য্য করিলে অন্যে কেন সহিতে অক্ষম? গৃহবিচ্ছেদে ভারতের পরাধীনতা ঘটাইয়াছে। গৃহবিচ্ছেদে ভারত পরাধীন আছে ও থাকিবে। কিন্তু গৃহবিচ্ছেদে কেন উন্নতির পথ রোধ করি?

সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ ও লেখকগণ! তোমাদিগের ত বক্তাগণ নিন্দাবাদ করেন না। তোমরা বক্তাদিগের সহকারী, তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, উৎসাহ দিবে—না, তাহাদিগের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা নিক্ষেপ করিতেছ!! সম্পাদকগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য মহৎ; তোমরা দেশের পরিচালক। কেন না, সংবাদপত্র দেশের জীবন্ত ক্ষমতা। নেপোলিয়ন্ তিন খানি সংবাদপত্রকে যত ভয় করিতেন, সমস্ত শত্রুকে তত ভয় করিতেন না। আমরা দীনহীন মূর্খ পরাধীন বাঙ্গালী। কত দিন গৃহবিবাদে এ দুরবস্থায় রহিয়াছি, আর কত দিন থাকিব?

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

নেপোলিয়ন্ বোনাপার্টি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ইয়ুরোপের মানচিত্র প্রসারণ করিলে ভারতবাসিগণের আপন দেশের সহিত একতা নিবন্ধন ইটালীদেশের প্রতিই অগ্রে লক্ষ্য হয়। ইটালীর প্রাকৃতিক অবস্থানের সহিত ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান প্রায় সমান; এবং উভয়দেশীয় প্রাচীন শাস্ত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেও ততোধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত করিয়া আহ্লাদিত হই। যৎকালে প্রাচীন পৃথ্বী সর্ব্বত্র অন্ধতামসে সমাচ্ছন্ন,

যখন জ্ঞানের বিমল জ্যোতি অপর কোন দেশের লোককেই বিভাসিত করে নাই, যখন সকলেই বৃক্ষের কোটরে অবস্থান, বৃক্ষের বল্কল পরিধান ও স্বচ্ছন্দচর বন্য-জন্তু ভক্ষণ করিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করিত, সেই প্রাথমিক সময়েও ইটালী ও ভারত সমান প্রভায় প্রভান্বিত। রোম ঐহিক সুখেচ্ছায় ইতস্ততঃ প্রধাবিত; ভারত পারত্রিক মঙ্গল কামনায় এক স্থানে অবস্থিত; রোমের বিজয়-পতাকা তদানীন্তন পরিজ্ঞাত সমুদায় জগতে উড্ডীয়মান, ভারতের জ্ঞানালোচনা, যোগসাধনা সকলেরই হৃদয়-কন্দরে দেদীপ্যমান। প্রাকৃতিক শোভায় ইটালী ভারতবর্ষ হইতে ন্যূন নহে; ভারতের উত্তরে দুর্ভেদ্য গগনস্পর্শী হিমাদ্রিশিখর সকলকে ত্রস্ত করিতেছে; আল্পস্ শ্রেণী ইটালীর উত্তরে দণ্ডায়মান হইয়া শত্রুর দিকে অঙ্গুলি প্রক্ষেপে সকলকে উপেক্ষা করিতেছে; ভারতের তিন দিকে রত্নাকর আপনার লহরীলীলা দেখাইতেছে, সমুদ্র তিন দিকে ইটালীর পাদদেশ বিধৌত করিয়া আহ্লাদে গদগদ হইতেছে; চরণাঙ্গুরীয়ক লঙ্কা ভারতের চরণ হইতে স্খলিত হইয়াই যেন তাহার দিকে মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। অন্য দিকে ইটালী যেন সিসিলীকে চরণ হইতে বিচ্যুত করিয়া আপনার ভার কতকটা হ্রাস করিয়াছে; গঙ্গা এবং পো পরস্পর উভয়েই মুক্তার মোহন মালা স্বরূপ উভয়েরই বিমল বক্ষঃস্থলে দ্বিগুণতর শোভায় শোভান্বিত হইতেছে; এইরূপ প্রাকৃতিক শোভায় ইটালী ভারতবর্ষ হইতে কিছুতেই ন্যূন নহে। ভারতবর্ষীয়গণের ন্যায় ইটালীয়গণও অত্যন্ত সঙ্গীতপ্রিয়, এবং অধুনা উভয় জাতিই অলস; কিন্তু অলস ইটালী অনেক দিনের পরে সুষুপ্তাবস্থা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন; ভারতের সে সুখের দিন কি কখন সমুপস্থিত হইবে—জগৎবাসী কি আর ভারতের সেই সুখের দিন ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন?

এক্ষণে এই ভারত সদৃশ মহাক্ষেত্রে নেপোলিয়নের সৈন্যগণ পরিগণিত; তাঁহার অদৃষ্টলক্ষ্মী এই মহাদেশে ঘূর্ণায়মান; নেপোলিয়নের যাহা চির-আকাঙ্ক্ষিত, এক্ষণে তাহা তাঁহার হস্তগত। তিনি এক্ষণে প্রধান সেনাপতি হইয়াছেন—ইটালীর সমরক্ষেত্রেই তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষিত হইবে; সুতরাং হর্ষ ও বিষাদে তাঁহার ললাটদেশ কুঞ্চিত—তাঁহার সুপ্রশস্ত চিত্ত দোলায়িত। অন্য কোন দেশে তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষিত হইলে তাঁহার বিষাদের কোন কারণই ঘটিত না; কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্গে পরিবেষ্টিত ইটালীই তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষার স্থল। উত্তরে আল্পস মালা সদর্পে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার উপরে জলন্ত অক্ষরে "উচ্চাভিলাষ এই স্থানে প্রশমিত হউক" এই কথাগুলি যেন আলিখিত রহিয়াছে।

এই পর্ব্বতের উপর দিয়াই তাঁহার ইটালী প্রবেশের পথ। যদি প্রবেশে কৃতকার্য্য হন, তাহা হইলে ইটালী অক্লেশেই হস্তগত হইবে—এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় কখন গর্ব্বে বিস্ফারিত, কখন বা প্রবেশ লাভ অসম্ভব বিবেচনায় তাহা নৈরাশ্য-পঙ্কে নিমজ্জিত হইতেছে।

কিন্তু এই দুর্লক্ষ্য পর্ব্বতমালা ঐরূপ ভাবে উন্নত থাকিলেও যৎকালে প্রাচীন রোমকগণ তাহার উপর দিয়া বহির্গত হইয়া সমুদায় দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল—যখন ঐ আল্পস শ্রেণীই কার্থেজীয় বীর হানিবালের পরাক্রম সহ্য করিতে পারে নাই, তবে তাহা বীর নেপোলিয়নের কেন অগম্য হইবে? এই সকল পূর্ব্বঘটনা তাঁহর স্মৃতিপটে সমুদিত হইলে, তাঁহার উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে অধিকতর উর্দ্ধে তুলিল।

আল্পস মালার পর-পার্শ্বেই ফরাসিগণের রাজ্য; যখন ফ্রান্সে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, তখন ইটালীয়গণ পর্ব্বতের নিম্ন প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া বসেন। সার্ডিনিয়ার রাজা এই অবসরে অনেক গুলি গিরিব্রজ হস্তগত করিয়াছিলেন; কিন্তু গতযুদ্ধে তিনি সাভয় ও নাইস হারাইয়াছেন; এক্ষণেও তাঁহার অধীনে অনেক সৈন্য ও কতকগুলি গিরিসঙ্কট ছিল। সে গুলি হস্তগত করিতে না পারিলে ফরাসী সৈন্যদলের ইটালী প্রবেশের সুবিধা নাই। কেন না সেই গুলিই ইটালী দেশের কুঞ্চিকা-স্বরূপ। কিন্তু সার্ডিনিয়ার রাজা একে অনেক সৈন্যের অধিনায়ক, তাহাতে আবার অষ্ট্রিয়ার রাজা কর্ত্তৃক বিশেষরূপে সাহায্যপ্রাপ্ত, সুতরাং তিনি সৈন্যবলে অত্যন্ত বলীয়ান্। পো নদীর অববাহিকায় অষ্ট্রিয়া রাজ্যের একটি উর্ব্বর প্রদেশ ছিল। সেটি রক্ষা করা তাঁহার অতীব প্রয়োজনীয়, এই জন্যই তাঁহার সৈন্যদল সার্ডিনিয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া নেপোলিয়নের আগমন প্রতিহত করিবার জন্য উদ্যত; ইটালীর সীমান্ত প্রদেশ পিডমণ্ট নামক স্থানে অষ্ট্র-সার্ডিনিয় সৈন্যদল যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইলেও নিয়াপলিটনে সৈন্যগণ ইহার পর তাহাদের সহিত যোগ দিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা এই মিলিত সৈন্যসংখ্যার সহিত তুলনায় নিতান্ত সামান্য; কিন্তু কোন দৈব দুর্ব্বিপাকে বিপক্ষীয় অধিকাংশ সৈন্য একটি গিরিদুর্গে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, তথা হইতে বহির্গত হইবার শীঘ্র কোন বিশেষ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল না।

এইরূপ অবস্থায় যুবক সেনাপতি রণ-সাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন; তাঁহার বয়স তখন ষড়বিংশতি বৎসর মাত্র; যে স্থানে এক বার তিনি অন্য সেনাপতির অধীনে থাকিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে এই বার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য দণ্ডায়মান।

গত যুদ্ধে তাঁহারই পরাক্রম ও বুদ্ধি-কৌশলে কলডিটেণ্ডি (Cal de Tende), সারজিয়ো এবং আল্‌পসের দুই একটি গিরিসঙ্কট অধিকৃত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেনাপতি ডুমরবিয়নই তাহার মান্য প্রাপ্ত হন। টুলোর যুদ্ধ তাঁহা কর্ত্তৃক লব্ধ হইলেও সেনাপতি ডুগোমিয়ার তাহার মান্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সে দিন পারিসবাসিগণের সহিত যুদ্ধের মান্য সেনাপতি বারাস পাইয়াছিলেন; সুতরাং এতাবৎ কাল মধ্যে তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে অনেক যুদ্ধ লব্ধ হইলেও তিনি বিশেষরূপ সম্মানিত হন নাই। অদ্য তিনি স্বাধীনভাবে বিরাজমান,—এই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে, তাঁহার মান্য প্রাপ্তির আর কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, সুতরাং গর্ব্বিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ-লালসা দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত হইল। পূর্ব্বযুদ্ধে তিনি আল্পস্ পর্ব্বতের পথ ঘাট সকল এক প্রকার দেখিয়া লইয়া ছিলেন, তাহা এক্ষণে তাঁহার সুবিধারই কারণ হইয়া পড়িল। এক্ষণে তিনি যুদ্ধলাভের উপায়-চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন।

নেপোলিয়ন্ যুদ্ধের একটি নূতন নিয়ম আবিষ্কার করেন; সেই জন্যই তিনি প্রতি যুদ্ধেই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। সমাজের অবস্থাভেদে যুদ্ধের নিয়মসকলও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে; অসভ্যাবস্থায় লোকে নানাবিধ যুদ্ধ স্ত্রে সজ্জিত থাকে। যষ্টি বা বর্শাই তখন যুদ্ধোপকরণের সর্ব্বস্ব। আদিম আমেরিকগণ স্প্যানিয়ার্ডগণের সহিত যুদ্ধে যষ্টি, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রই ব্যবহার করিয়াছিল; তাহাদের অপর কোন অস্ত্রই ছিল না; অসভ্যাবস্থায় লোকে বর্শা ক্ষেপণ, যষ্টি সঞ্চালন, শরাসনে জ্যারোপণ প্রভৃতি কার্য্যে বিলক্ষণ পটুতা প্রকাশ করিয়া থাকে। আরবীয়গণ মরু প্রদেশে বাস করে; কোথাও যাইতে হইলে প্রায় তাহাদিগকে মরুস্থল ভেদ করিয়াই যাইতে হয়; সুতরাং তাহাদের দ্রুতগমন প্রয়োজনীয়; এই জন্যই আরবীয় অধিকাংশ সৈন্যই অশ্বারোহী। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া একেবারে কোন নগরের উপর পতিত হয় এবং মুহূর্ত্ত-মধ্যে তাহা বিনষ্ট করিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করে; ইহাদের অস্ত্র শস্ত্রও তদনুযায়ী। অসভ্যাবস্থায় সমাজস্থ প্রায় সকলেই সৈনিক; কিন্তু সভ্যতার প্রথম স্ফুরণে যুদ্ধের অবস্থা অন্যবিধ। দেশ সভ্যতার দিকে যতই অগ্রসর হইতে থাকে, নাগরিক সম্প্রদায়ের সহিত সৈনিক সম্প্রদায়ের ঘনিষ্টতা ততই সামান্য হইতে থাকে। এই অবস্থায় যুদ্ধের প্রণালীও অন্যরূপ; সকলে মিলিয়া সাধারণ শত্রু নিপাতের জন্য তত দূর চেষ্টিত হয় না; কেবল স্ব স্ব প্রধান হইয়া সকলেই শত্রু-সংহারের চেষ্টা করিয়া থাকে; কেহ কোথা একটী শত্রু দেখিলে সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিহত করিবার জন্য উদ্যত হইল, সে আর কাহাকেও

আহ্বান করিবে না; অন্য কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবে না; দলবদ্ধ হইয়া এক-যোগে যুদ্ধ করা তখন এক প্রকার অনভ্যস্ত হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের গৃহ যুদ্ধ (Civil War) ইহার দৃষ্টান্ত। যুদ্ধ-বিদ্যা যে শিক্ষয়িতব্য বিষয়, তাহা পূর্ব্বকালে সকলের ধারণা ছিল না। ক্রমে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় যুদ্ধবিদ্যাও যে শিক্ষণীয়, তাহা বুঝিতে পারে এবং যুদ্ধের নিয়ম সকল যে গণিতশাস্ত্রের উপর নির্ভর করে, তাহাও পরিজ্ঞাত হইতে থাকে। যে সেনাপতি একই সময়ের মধ্যে এক স্থানে আবশ্যক মত সেনা সমাবেশ করিতে পারেন, জয়শ্রী প্রায় তাঁহারই অনুবর্ত্তিনী হইয়া থাকে। বিপক্ষপক্ষীয় অনেক সৈন্য যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান থাকিলেও এরূপ সেনাপতি তাহাদের উপর ক্ষণপ্রভার ন্যায় ঝলসিতে থাকে ও মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের নয়ন ধাঁধাইয়া দেয়, নেপোলিয়ন এইরূপ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার সময়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, সকল দেশেই প্রায় পূর্ব্বতন নিয়মানুসারেই যুদ্ধকার্য্য পরিচালিত হইত; ইনি অনুমানে এই নূতন প্রথার আবিষ্কার করেন; তিনি যুদ্ধের অবস্থা অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেন—আপন সৈন্য ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত থাকিলেও কার্য্যক্রমে, যাহাতে, তাহারা সকল দিক হইতেই এক স্থানে এক সময়ের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং কোন্ সৈন্য কিরূপ অস্ত্রধাবণের উপযুক্ত, তাহা সৈন্য দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারিতেন, এই জন্যই জয়লক্ষ্মী সততই তাঁহার উপর প্রসন্ন থাকিত। কার্য্যকালে নেপোলিয়নের ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইত; তিনি কখন কোথা কি কার্য্য করিতেছেন, তাহা কেহই জানিতে পারিত না—কেবল মধ্যে মধ্যে বিজলি ছটায় তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া যাইত। তিনি যে সময়ে কোন একটি কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক জ্ঞান করিতেন, তাহার পল মাত্র সময়ও ব্যতিক্রম হইবার যো ছিল না। সময়ে সময়ে কোথাও শিবির-সন্নিবেশের আবশ্যকই হইত না এবং শিবির-সমাবেশ ব্যতীত যুদ্ধ তিনিই প্রথম জগৎকে দেখাইয়া চমৎকৃত করেন। নেপোলিয়ন যুদ্ধে যাইতেছেন, সঙ্গে শিবির নাই—আহারীয় নাই—আহত সৈন্যের শুশ্রূষার জন্য আশ্রম নাই, সৈন্যগণ যে সে স্থানে খাইতেছে—যে সে স্থানে ঘুমাইতেছে—যে সে স্থানে মরিতেছে,—তথাপি অগ্রসর—তথাপি যুদ্ধ এবং তথাপি জয়। নেপোলিয়নকে সময়ে সময়ে হয়ত অধিক দূরতর স্থানে যাইতে হইয়াছে,—তিনি অতি দ্রুত-গতিতে যাইতেছেন—সঙ্গে শিবিরাদি কিছুই নাই—সৈন্যগণ পথপর্য্যটনে অতিশয় ক্লান্ত; সেই ক্লান্ত অবস্থাতেই যুদ্ধারম্ভ হইল—নেপোলিয়ন তথাপি

জয়ী; ইহাতেই তাঁহার সৈন্যগণের পথশ্রম প্রভৃতি ক্লেশরাশি মনে আসিত না; সৈন্যগণের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই সকল দেশে যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে, তাহা নেপোলিয়ন্ বিলক্ষণ অবগত আছেন এবং তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সৈন্য যেরূপেই পরিচালিত হউক না তাঁহার অধীনে থাকিয়া তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিলে জয়লাভের আর কোন সন্দেহই নাই; এই দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই সৈন্যগণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়াও নেপোলিয়নের প্রতি অনুরক্ত—তিনি যাহা বলেন, তাহাই তাহাদের শিরোধার্য্য।

পার্ব্বত্য প্রদেশে যুদ্ধ করা সকলেই অসুবিধাজনক বিবেচনা করিলেও নেপোলিয়ন তাহা বিশেষ সুবিধার কারণ বলিয়াই জ্ঞান করিলেন; এবং কিরূপে তথায় যুদ্ধ করিতে হইবে, তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত রহিলেন। সেই সকল গিরিপথের অভ্যন্তরে অষ্ট্রীয় সৈন্য দলবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং তাহাদের সংখ্যাও বিস্তর; নেপোলিয়নের অধীনে পঞ্চাশৎ বা ষষ্টি সহস্র সৈন্য আছে মাত্র; তাহারাও আবার রীতিমত বেতন, আহারীয় বা পোষাক পায় নাই। সেই নীহার-মণ্ডিত পার্ব্বতীয় প্রদেশে সৈন্যগণের বস্ত্র নাই—পোষাক নাই—জুতা নাই—প্রচুর আহারীয় নাই, কিন্তু তত্রাপি সকলেই তাঁহার প্রতি আসক্ত। ইটালীর এই সমরক্ষেত্রে অনেক গণনীয় সেনাপতি নেপোলিয়নের অধীনে কার্য্য করিয়াছিলেন, অগিরু, মাসেনা, সিরুরিয়ার, জুবার্ট, লান্নেস্ এবং মুরাট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সেনানায়কগণ এই ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন।

এই সময়ে নেপোলিয়নের সৈন্যগণের অবস্থান এই প্রকার ছিল; কল ডি আর্জেনটাইনে (Col di Argentine) এক দল; কল ডি টেণ্ডি ও বারটাণ্ড পর্ব্বতের নিকটে মধ্যদল এবং তৃতীয় দল সেণ্ট বারটাণ্ড ও সেণ্ট জাকিসের নিকটে ছিল। অষ্ট্রীয়ান সৈন্য এই তৃতীয় দল আক্রমণ করিয়া সেণ্ট জাকিস অধিকার করিয়া বসিল; কিলার ম্যান এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন; তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রধান দলে প্রবেশ করিলে সেনাপতি 'সেরার' তৎপদে নিয়োজিত হন; এবং ইনি মাসেনা ও অগিরুর সহায়তায় জাকিস ও কিনেল পুনরধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে ডাইরেক্টর সভা ইটালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন; যাহাতে অষ্ট্রীয়ান সৈন্য ইটালী হইতে দূরীভূত হইয়া যায়, তাহাই সভার ইচ্ছা, এবং পোপকে পদচ্যুত করাই তাঁহাদের প্রধান অভিপ্রায়। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ ডাইরেক্টর সভা পোপের প্রতি অতিমাত্র বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্যই সভা সমধিক চেষ্টিত।

রোমে কিরূপে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারা যায়, এক্ষণে সভায় তাহারই আন্দোলন চলিতে লাগিল, সভা এ বিষয়ে বোনাপার্টির মত জিজ্ঞাসু হইলেন; বোনাপার্টির তদুত্তরে লিখিলেন "অগ্রে ইটালীর উত্তর প্রদেশ সকল অধিকার করা আবশ্যক; তাহা হইলে রোম অক্লেশেই সভার হস্তগত হইবে" সভা এই কথার গুরুত্ব বুঝিয়া ইহাতেই অধিকতর আস্থাবান হইলেন। এবং এই প্রস্তাবের উদ্ভাবনকর্তার উপরেই ইহার সম্পূর্ণ ভার প্রদান করিলেন। এক্ষণে নেপোলিয়ন আপনার ইচ্ছানুসারেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। যদিও তাঁহার কার্য্য পরিদর্শনার্থ সালিসেটি সভা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন, তত্রাপি বোনাপার্টির যুদ্ধ কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। বিশেষতঃ তিনি বোনাপার্টির বিশেষ সুবিধারই কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়েই নেপোলিয়ন এরূপ ভাবে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, হয় তাহাতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইতে হইবে, না হয় তিনি সম্পূর্ণরূপে বিজয় লাভ করিবেন; এই কথা তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকেও বলিয়াছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন "আজি হইতে তিন মাসের মধ্যে হয় আমি মিলানে প্রতিষ্ঠিত হইব, না হয় পারিসে প্রত্যাগমন করিব।" তিনি এক্ষণে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত; সৈন্যগণকেও তদনুরূপ উৎসাহান্বিত করিবার জন্য তিনি তাহাদিগের নিকটে এই মর্ম্মে একটি বক্তৃতা করেন,—"সৈন্যগণ, তোমরা ক্ষুধার্ত্ত ও শীতার্ত্ত হইয়াছ; রীতিমত আহারীয় ও পরিধেয় পাইতেছ না; সাধারণতন্ত্র তোমাদের নিকটে অনেক বিষয়ে ঋণী; কিন্তু এক্ষণে সভার সেই অপরিশোধনীয় ঋণ পরিশোধ করিবার সামর্থ্য নাই। এই সকল অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য প্রদেশে তোমরা যে সকল অসহনীয় কষ্ট অক্লেশে সহ্য করিয়াছ—তাহা অতীব প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে গৌরবের কোন কথাই নাই; আমি তোমাদিগকে জগতীতলস্থ সর্ব্বপ্রধান উর্ব্বরক্ষেত্র দেখাইতে আসিয়াছি—তোমাদের সম্মুখে ঐশ্বর্য্যশালী জনপদ—ধনধান্যসমন্বিত প্রদেশ সমুদায়ই রহিয়াছে। মনে করিলে ঐ সমুদায় স্থানই তোমাদের হয়। বৎসগণ। তোমাদের পুরোভাগে এতাদৃশ লোভনীয় পদার্থ থাকিতেও কি তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিবে? সাহসই সকল সুখের মূল।" তাঁহার এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সৈনিকগণের রক্তমাংসে প্রবিষ্ট হইল—তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিল এবং যুদ্ধের নিমিত্ত সকলেই উন্মত্ত হইল।

এই সময় বিউলিউ অষ্ট্রিয়ার সেনানায়ক ছিলেন; ইনি এক জন প্রসিদ্ধ সেনাপতি কিন্তু এক্ষণে ইহাঁর বয়স ৭৫ বৎসরেরও অধিক; সুতরাং এক্ষণে তাঁহার আর যুবজনসুলভ ক্ষিপ্রকারিতা

ছিল না, বিশেষতঃ তিনি প্রচলিত প্রাচীন প্রণালীর যুদ্ধকার্য্যেই অভ্যস্ত, নেপোলিয়নের নূতন প্রণালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহা ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা তাঁহার কিছুমাত্র ছিল না।

নেপোলিয়ন এক্ষণে কোন পথ দিয়া ইটালী প্রবেশ করিলে বিশেষ সুবিধা হইতে পারে, তাহারই অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এক্ষণে তাহা স্থিরীকৃত হইল। তিনি ভাবিলেন, পূর্ব্বে যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, সে স্থান দিয়া প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষতঃ তথায় যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও কোন বিশেষ ফললাভের সম্ভাবনা নাই, এই জন্য তিনি ভূমধ্যস্থ সাগরের উপকূলবর্ত্তী জেনোয়ার মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, এই স্থানে বাচেট (Bochetta) নামক গিরিসঙ্কট দিয়া প্রবেশ করিতে পারিলে বিশেষ ফল লাভের সম্ভাবনা। এই স্থানটী উত্তর দেশ দিয়া ইটালী প্রবেশ করিবার সর্ব্ব দক্ষিণ সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী সমতল এবং এই স্থানেই আল্পস-মালা আপিনাইন পর্ব্বতের সহিত সংযুক্ত হইয়া একটি সঙ্কট উৎপন্ন করিয়াছে; তাহার নাম সেণ্ট জাকিস। এই স্থল হইতেই আল্পস পর্ব্বত উত্তরাভিমুখে ক্রমশঃ উচ্চতর হইয়া তাহার সর্ব্বোচ্চ শিখর মণ্টব্লাঙ্ককে মস্তকে ধারণ করিয়াছে এবং আপিনাইন দক্ষিণাভিমুখে ক্রমোচ্চ হইয়া গিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শৃঙ্গ ভেলি-নোকে উর্দ্ধে ধরিয়াছে; সুতরাং নেপোলিয়ন অতি সুন্দর স্থানই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এই স্থলে তিনি বৃহত্তী অষ্ট্র-সার্ডিনিয় সেনা ভেদ করিবার নিমিত্ত আপন সামান্য সৈন্যদলকে নূতনরূপ শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন।

নেপোলিয়নের এইরূপ স্থান পরিবর্ত্তন শুনিবামাত্র অষ্ট্রিয় সেনাপতি বিউলিউ একেবারে জেনোয়া রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। কেন না তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলে জেনোয়া প্রদেশ ভিন্ন ইটালী প্রবেশের অপর কোন পথ নাই, তিনি সত্বরই জেনোয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আপন সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিলেন, সেনাপতি কলির অধীনে সিভ নামক স্থানে সার্ডিনিয় সৈন্যগণ সংস্থিত হইল, মধ্যস্থলে সেনাপতি ডি আরজেনটিউ মণ্টিনটি যাত্রা করিতে ও তথায় মণ্টেলিজিনার নিকট অবস্থান করিতে আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন এবং সেনাপতি বিউলিউ স্বয়ং ভল্টি নগরের নিকট অবস্থিতি করিলেন। এইরূপে নেপোলিয়ন যে পথ দিয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহারই নিকট সমুদায় অষ্ট্র সার্ডিনিয় সৈন্য একত্রিত হইলেও বিউলিউয়ের সৈন্য-সমাবেশে একটি মহাভ্রম থাকিয়া গেল; যে তিনটী সৈন্যদল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সংস্থিত হইল, কার্য্যকালে আবশ্যক হইলে কেহ কাহারও সহানুভূতি

করিতে সমর্থ হইবে না; ঐ তিনটি দলই সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। উহাদের সহসা একস্থানে একত্রীকরণ অসম্ভব। কিন্তু ফরাসী সৈন্যদল পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিলেও কার্য্যকালে প্রয়োজন হইলে সকলেই একযোগে কার্য্য করিতে সমর্থ; এবং পরস্পর সকলেরই কথোপকথন চলে।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ১০ ই এপ্রেল অষ্ট্রিয় সেনাপতি ডিঃ আরগেনটাউ মণ্ট-নটীতে অবতীর্ণ হইলেন, এই নগর ফরাসিগণেরই অধিকৃত ছিল এবং সেনাপতি বিউলিউ ভল্টির নিকট যে সকল ফরাসী সৈন্য ছিল, তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন; এই স্থানে সাবভনি ফরাসী সৈন্যের অধিনায়কতা করিতেছিলেন, তিনি বিউলিউয়ের প্রতাপ ক্ষণমাত্র সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং দ্রুতপদে প্রধান দলে আসিয়া মিলিত হইলেন; যদি সেই দিন অষ্ট্রিয় সেনাপতি ডিঃ আরগেনটিউ বিউলিউয়ের ন্যায় যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তাহা হইলে নেপোলিয়নের নবোদিত যশোরশ্মি সেই মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যাইত; কিন্তু তাহা হইল না। ফরাসী কর্ম্মচারী কর্ণেল রাম্পন অতি তেজের সহিত ডিঃ আরগেনটিউয়ের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলেন; তাঁহার অধীনে তখন পঞ্চদশ শত মাত্র সৈন্য ছিল; রাম্পন ইহাদিগকে এরূপে উৎসাহিত করিয়াছিলেন যে, সৈন্যগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অগ্রসর হইল, ১১ ই তারিখ পর্য্যন্ত তিনি ফরাসী অধিকৃত স্থান অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ঐ দিন সন্ধ্যার সময় ডি আরগেনটিউ যুদ্ধ স্থগিত রাখিলেন। তাঁহার ইচ্ছা তৎপর দিন পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হইবে। কিন্তু তৎপরদিন যুদ্ধ করিবেন কি, সেনাপতি দেখিলেন তিনি চারি দিকে বিপক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছেন। সাবভেনি অষ্ট্রিয়া। সেনাপতি বিউলিউয়ের সমক্ষে তিষ্ঠিতে না পারিয়া তথা হইতে আসিয়া লা হার্পের সহিত মিলিত হন এবং এই উভয়েই ১১ ই রাত্রিকালে রাম্পনের রক্ষিত মণ্টিনটীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেবল ইহাই নহে। অগিরু এবং মাসার সৈন্যব্যূহ বিভিন্ন পথ ধরিয়া ডিঃ আরগেনটিউয়ের সেনানিবাসের অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই আসিয়া উপস্থিত হন, সুতরাং পর দিন প্রাতঃকালে অষ্ট্রিয় সেনাপতি যুদ্ধ আরম্ভ করা দূরে থাকুক, পলায়ন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় যুদ্ধারম্ভ হইল; ডি আরগেনটিউ পলায়ন করিলেন কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার সহস্র সৈন্য হত, দুই সহস্র বন্দী, এবং অনেক কামান ও পতাকা ফরাসী সৈন্যের হস্তগত হইল। এইটিই ইটালী ক্ষেত্রে নেপোলিয়নের সর্ব্ব প্রথম যুদ্ধ—ইহার নাম মণ্টিনটীর যুদ্ধ; এই যুদ্ধে নেপোলিয়নের বিশেষ রণ-চাতুরী প্রকাশ পায়, মণ্টিনটীর যুদ্ধ এতাদৃশ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সম্পন্ন

হয় যে, অষ্ট্রিয় সেনাপতি বিউলিউ বা কলি যুদ্ধের সংবাদ পাইবার অগ্রেই উহা লব্ধ হয়। এই সেনাপতিদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে উপস্থিত থাকিলেও যুদ্ধের বিশেষ কোন সমাচার পান নাই। যুদ্ধ লাভ করিলে কাইরো ফরাসিগণের অধিকৃত হইল; সুতরাং লম্বার্ডী হস্তগত করিবার বিশেষ সুযোগ ঘটিল। যে সময় ফরাসিগণ ডি আরগেনটিউয়ের সৈন্যদল আক্রমণ করেন অষ্ট্রিয়ান সেনাপতি বিউলিউ তখন ভল্টি নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ পাইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে সার্ডিনিয় সৈন্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া বরমিডা নদীর উপত্যকাস্থিত ডিগো নগরে উপনীত হইলেন। এই স্থানে সেনাপতি কলি মিলেসিমো নগর পুনরধিকার করিয়া লইয়া ছিলেন। সেনাপতি বিউলিউ ইহার নিকটে থাকিয়া মন্টিনটী যুদ্ধের প্রতিশোধ লইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু ফরাসিগণ তাঁহাকে সে সুবিধা প্রদান করিল না। ফরাসী সেনাপতি অষ্ট্রিয়গণকে একবারে আক্রমণ করিতে মনঃস্থ করিলেন, এবং আপনার সৈন্যদলকে পুনরায় তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক দল সেনাপতি অগিরুর অধীনে মিলেসিমো নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন,—দ্বিতীয় দলকে মেসিনার অধীনে বরমিডা নদীর উপত্যকায় ডিগো নগর আক্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন এবং তৃতীয় দল সেনাপতি লা হার্পের অধীনে বিউলিউয়ের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিতে অনুমত হইল। সেনাপতি অগিরুর অধীনস্থ সৈন্যগণ মন্টিনটীর যুদ্ধে স্থির ছিল; সুতরাং তিনি অগ্রেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন; তাঁহার সৈন্যগণ মন্টিনটীর যুদ্ধে পরিলিপ্ত ছিল না, সুতরাং সে ক্ষেত্রে লাভের কোন মানাই তাহারা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য তাহারা এই যুদ্ধে অতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়াছিল এবং যাহাতে তাহারাই একটী যুদ্ধলাভ করিতে পারে, এইজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিল, সুতরাং অগিরুর সৈন্যদল অপর সৈন্যের আগমন অপেক্ষা না করিয়াই ১৩ই এপ্রেল সেনাপতি কলিকে আক্রমণ করিল। প্রথমেই সৈন্যগণ এত তেজে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিল যে প্রধান দল হইতে, প্রভেরার অধীনে দুই সহস্র সৈন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; কিন্তু ইহারা এতাদৃশ নির্ভীকতার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল যে, ফরাসী সৈন্য ইহাদের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। ইহারা নির্ব্বিঘ্নে কসেরিয়ার ভগ্ন দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং অতি দক্ষতার সহিত দুর্গরক্ষা করিতে লাগিল।

নেপোলিয়ন এই সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া দুর্গটি জয় করিবার আবশ্যকতা বুঝিলেন; এবং আপন সৈন্যদলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া সেনাপতি জুবার্টের অধীনে প্রথম দল ন্যস্ত করিলেন।

সেনাপতি বানাল ও কুইনিন অপর দুই দলের নেতা হইলেন। জুবার্ট প্রথমেই দুর্গ-প্রাকারে সমুপস্থিত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন, কিন্তু মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে পশ্চাদগমন করিতে হইল; অন্য দুই দলও সে রাত্রে কিছুই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না, সুতরাং সে রাত্রে সেনাপতি প্রভের সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। পর দিন সূর্য্যোদয়ের সহিত নূতন ঘটনা আরম্ভ হইল। বোনাপার্টি কসিরিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া থাকিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অষ্ট্রিয় সেনাপতি কলিকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কলি বোনাপার্টির আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অনেক আয়াস ও যত্ন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তিনি সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত হইলেন এবং প্রধান সেনাপতি বিউলিউ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নেপোলিয়নের সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া সেভি নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; এ দিকে প্রভেরা সেইরূপ অবস্থাতেই পড়িয়া রহিলেন। যে দিনে নেপোলিয়ন কলির সহিত যুদ্ধে পরিলিপ্ত ছিলেন, সেই দিনই সেনাপতি মাসিনা বিউলিউ ও কলির সৈন্যদলের মধ্য ভাগ এবং লা কার্প বর্মিডা নদী অতিক্রম করিয়া অষ্ট্রিয় সেনাপতির প্রধান আড্ডা ডিগো নগর আক্রমণ করেন; এই স্থলে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল, বিউলিউ আপনার স্থান রক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল, তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন ও তাঁহাকে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে হইল। এই রূপে ইটালী রক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেনাপতিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরিয়া পলায়ন করিলেন; সেনাপতি কলি সিভাভিমুখে ও বিউলিউ ডি, অকির দিকে প্রস্থান করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে একটি নূতন ঘটনা ফরাসীগণকে ব্যতিব্যস্ত করিল; যে সকল অষ্ট্রিয়ান সৈন্য ভল্‌ট্রিতে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা প্রধান সেনাপতির সহিত মিলিত হইবার জন্য ডিগো পারে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বিউলিউ সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন ও তাহা ফরাসীগণের হস্তগত হইয়াছে; ইহা দৃষ্টে তাহারা অতিমাত্র চমকিত হইল, কিন্তু হতাশ্বাস না হইয়া ভীমদর্পে ডিগো নগর পুনরধিকার করিয়া বসিল। ফরাসী সৈন্য সে দিক হইতে আক্রমণের কোন আশঙ্কাই করে নাই; সুতরাং হঠাৎ আক্রমণে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল ও পরাজিত হইল। নেপোলিয়ন তখন এই স্থানে উপস্থিত ছিলেন না, তিনি এতচ্ছ্রবণে দ্রুত পদে নগর সন্নিধানে উপনীত হইলেন, এবং অষ্ট্রিয় সৈন্য আক্রমণ করিতে অনুমতি দিলেন। ফরাসী-সৈন্য অগ্রসর হইল,

কিন্তু উপর্য্যুপরি দুই বার প্রতিহত হইয়া গেল; তৃতীয় বারে সেনাপতি নাম্বুর্সি—ইনি পরে মিসরের যুদ্ধে নিহত হন—ডিগো নগরে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন; নগর অধিকৃত হইল। এই যুদ্ধে সেনাপতি লানেসও প্রভূত ক্ষমতা প্রদর্শন করেন; ইনি পরে ডিউক অব মন্টিবেলো নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ডিগোর যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ানগণ ছয় সহস্র সৈন্য, ত্রিশটি কামান, ও নানাবিধ যুদ্ধোপকরণ হারাইয়াছিল। এই যুদ্ধের পরই অষ্ট্রিয় ও সার্ডিনিয় সৈন্যগণ সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল এবং উভয় দলই পৃথক রূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষায় যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। সার্ডিনিয় সৈন্য টুরিন নগর রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিল—অন্যদিকে যাহাতে ফরাসীগণ মিলান প্রদেশে প্রবেশ করিতে না পারে তাহাই বিউলিউয়ের চেষ্টা হইল।

বিউলিউকে দমনে রাখিবার মত সৈন্য রাখিয়া নেপোলিয়ন কলির দিকে অগ্রসর হইলেন; কলি তৎপূর্ব্বেই সিভানগর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন সুতরাং এক্ষণে তাহা নেপোলিয়নের হস্তগত হইল। এবং তথায় মণ্টিজেমটো নামক শিখরের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নেপোলিয়ন ইটালীর শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইলেন। সম্মুখে পিডমণ্ট দেশের অববাহিক ক্ষেত্র; তথায় পো, টানারো প্রভৃতি স্রোতস্বতীনিচয় অদ্রিমালা হইতে বিনির্গত হইয়া তাহাকে ধনধান্যে সুশোভিত করিতেছে; তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে নিবিড় অরণ্য শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করিবার জন্য অকৃত্রিম দুর্গসদৃশ শোভা পাইতেছে; এই দুর্গম অরণ্যানী ভেদ করিয়া তিনি উর্ব্বরক্ষেত্রে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সম্মুখে সুন্দর লোভনীয় পদার্থ; তিনি তাহা অক্লেশেই হস্তগত করিতে পারেন, সুতরাং তাঁহার উচ্চাভিলাষ অতি উর্দ্ধে উত্থিত হইল। তাঁহার সৈনিকবৃন্দ ঔৎসুক্যের সহিত এই লোভনীয় বস্তু সতৃষ্ণ নয়নে দর্শন করিতে লাগিল। নেপোলিয়ন গর্ব্বের সহিত সৈন্যগণকে বলিলেন, হানিবল হঠাৎ আক্রমণে আল্পস অধিকার করিয়াছিলেন; আমরা রীতিমত যুদ্ধে তাহা হস্তগত করিয়াছি।

সেনাপতি মাসেনা ও সেরুরিয়ার বিভিন্ন দিক হইতে কলিকে আক্রমণ করিলেন, পিডমণ্টীয় সৈন্য ইঁহার সহিত যোগ প্রদান করিয়াছিল; সুতরাং অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ফরাসীগণ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। ফরাসী সেনানায়ক ষ্টেঙ্গল সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে যাইয়া নিহত হন; কিন্তু সেনাপতি মুরাট যুদ্ধের গতি ফিরাইলেন, তিনি কলিকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিলেন; এবং কলি তথায় অনেক সৈন্য, কামান ও যুদ্ধোপকরণ ফেলিয়া তথা হইতে প্রস্থান

করিলেন; নেপোলিয়ন এই অবসরে পিডমণ্ট প্রদেশের রাজধানীর সন্নিকটস্থ চেরাস্কো নগর অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপ এক মাসের মধ্যেই ইটালীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার ঈপ্সিত পথ বোনাপার্টির হস্তে ন্যস্ত হইল। এই সকল যুদ্ধে তাঁহাকে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা শতগুণ অধিক সৈন্যের সহিত তিন বার যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু এই সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মী তাঁহারই অঙ্কবর্দ্ধিনী হন। এই সকল যুদ্ধে শত্রুপক্ষীয়ের পঞ্চবিংশতি সহস্র সৈন্য হত, আহত ও বন্দী হইয়াছিল ও অশীতি পতাকা নেপোলিয়নের হস্তগত হয়, ইহাতে অষ্ট্রিয় সৈন্য কার্য্যক্ষম ও সার্ডিনিয় সৈন্য একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়। ফ্রান্স হইতে পিডমণ্ট পর্য্যন্ত তাঁহার গতিরোধ করিবার নিমিত্ত আর কেহই অবশিষ্ট রহিল না।

সার্ডিনিয় সৈনিকবৃন্দ আপনাদের রাজধানীর অভিমুখে প্রস্থান করিল, এবং ইহাও যে শীঘ্র শত্রুর হস্তগত হইবে, সর্ব্বত্র তাহাই ঘোষণা করিয়া দিল। সার্ডিনিয়ার রাজা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ইয়ুরোপে বিলক্ষণ মান্য পাইয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে তাঁহার সমুদায় মান্য স্খলিত হইল; যাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রতাপে এক সময়ে সমুদায় ইয়ুরোপ ভূমি কম্পিত হইয়াছিল, এক্ষণে তিনি সপ্তবিংশতি বৎসরবয়স্ক একটি অপরিচিত যুবার প্রসাদ পাইবার জন্য বিব্রত হইলেন;—যিনি কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ফরাসী সৈন্যদলে কাণা পার্শ্ব হইবার জন্য লালায়িত ছিলেন। এক্ষণে তিনিই তাহার শরণ্য—তাঁহার প্রসাদ-কণালাভ ভিন্ন তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। সার্ডিনিয়ার অধিপতি নেপোলিয়নের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, নেপোলিয়ান কনি এবং টর্টোনা নামক দুইটি প্রধান দুর্গ চাহিলেন; এই দুর্গ দুইটি বহুপূর্ব্বকাল হইতে রাজার অধিকারে ছিল। ইহারা তাঁহার রাজ্যের কুঞ্চিকাস্বরূপ; এক্ষণে তাহাই অগত্যা ছাড়িয়া দিতে হইল। চিরাস্কো নগরে ইহা স্থিরীকৃত হইলে তাহা স্বাক্ষরের জন্য পারিস নগরীতে পাঠান হইবে। তথায় এই মর্ম্মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; ১ম।—নেপোলিয়ন যে দুইটি দুর্গ প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর পাঁচটি প্রথম শ্রেণীর দুর্গ ফরাসীগণকে দিতে হইবে; ২। ফ্রান্স হইতে ইটালী যাইবার পথ ফরাসী সৈন্যের জন্য সতত উন্মুক্ত থাকিবে; ৩য়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব রাজার সহিত কোন সংস্রবই তিনি রাখিবেন না; ৪র্থ। ফরাসী দেশীয় কোন রাজপক্ষীয় লোক তাঁহার সভায় স্থান পাইবে না।

এই নিয়মে সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সার্ডিনিয়াধিপতি এই রূপ হীন মর্ম্মে সন্ধি করিয়া মনোদুঃখে আর অধিক দিন জীবিত রহিলেন না; তাঁহার পর তৎপুত্র রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন; ইহাঁর সময়ে টুরিন ব্যতীত সমুদায় প্রধান দুর্গই ফরাসীগণের হস্তগত হইল।

সার্ডিনিয়াধিপতির সহিত সন্ধিসূত্রে টর্টোনার গিরিদুর্গ ফরাসীগণের হস্তগত হইয়াছিল; এক্ষণে বোনাপার্ট সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং সেনাপতি মাসেনা আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন; এই স্থান অষ্ট্রিয়াধিকৃত মিলান নগরের অতি সন্নিকট, সুতরাং পো নদী অতিক্রম করিয়া মিলান নগর অধিকার করিবার তাঁহার সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। অষ্ট্রিয় সেনাপতি বিউলিউ এতদ্দৃষ্টে শঙ্কিত হইয়া মিলান রক্ষার্থে বদ্ধ-পরিকর হইলেন; এবং ফরাসী সৈন্য যাহাতে পো নদী পার হইতে না পারে, তাহারই চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

নেপোলিয়ন ভালেঞ্জা নগরসমীপে পো অতিক্রম করিবেন, আকারে এইরূপ দেখাইতে লাগিলেন; মাসেনা স্বদলে ঐ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অষ্ট্রিয় সেনাপতিও বাধা দিবার নিমিত্ত সেই স্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং তিনি ভালেঞ্জা নগর হইতে ৯ ক্রোশ দূরে ভালেটমিয়ো নগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার সমুদায় সৈন্য এই নগরাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভালেঞ্জা নগরে পো অতিক্রম করা নেপোলিয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে; তিনি এই জন্য প্লাসেঞ্জা নামক একটি স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন; সুতরাং অতি ক্ষিপ্রকারিতার সহিত ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন; সেখানে ফরাসী সৈন্য-দলকে বাধা দিবার জন্য কোন সৈন্যই সমাবেশিত ছিল না; কেবল দুই তিন দল অষ্ট্রিয় সৈন্য অতর্কিত ভাবে অবস্থান করিতেছিল। সেনাপতি আড্রেওসি এই স্থল হইতেই নবোদিত নক্ষত্রের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ প্রভা বিস্তীর্ণ করিতে লাগিলেন; ইহার অধীনে তখন পঞ্চ শত মাত্র সৈন্য ছিল; তাঁহাকেই প্রথমে পো পার হইতে হইবে; তিনি অৰ্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে স্বদলে পর-পারে উত্তীর্ণ হইলেন। এই স্থানে অষ্ট্রিয় সৈন্য উপস্থিত থাকিলে ইহাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিত, বলা যায় না; কর্ণেল লানেস্ তৎপরে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই দুই তিনটী সামান্য অষ্ট্রিয় সৈন্যদলকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। এইরূপে মিলান রাজ্যে প্রবেশ করিবার পথ ফরাসীগণের সুগম হইয়া উঠিল; এবং দুই দিনের মধ্যেই সমুদায় সৈন্য মিলান প্রদেশে উপনীত হইল। এইরূপে যে স্থানে সহস্র সহস্র সৈন্য বলিদান দিয়াও উপস্থিত হওয়া যাইত না, নেপোলিয়নের বুদ্ধিকৌশলে তাহা বিন্দুমাত্র রক্তপাত ব্যতীত বিনা ক্লেশেই সংসাধিত হইল। অষ্ট্রিয় সেনাপতি এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র দ্রুতপদে প্লাসেঞ্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু নেপোলিয়ন তথায় যুদ্ধের বিশেষ অসুবিধা বুঝিলেন; কেন না যদি তিনি কোন গতিকে সে দিন যুদ্ধে পরাজিত হন তাহা হইলে তাঁহাকে আর নদী পার হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে না। ক্রমশঃ

শ্রীকৈলাসচন্দ্র ঘোষ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

এই ৮ম খণ্ড আর্য্যদর্শনের ২য় সংখ্যায় শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রলাল দাসের প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ইংরাজী রাজস্থানের সমালোচনে 'অদ্য পর্য্যন্ত রাজস্থানের ৪টী সংস্করণ হইল,'—বলিয়া তৎপরে "১ম ভারতীয় সংস্করণ, ২য় ইংলণ্ডীয় সংস্করণ, ৩য় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণ, ৪র্থ সমালোচ্য গ্রন্থ (ব্রজেন্দ্রলাল দাসের সংস্করণ)"—এইরূপ মুদ্রিত হওয়ায় কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইয়াছে। আমাদের কাপিতে, ১ ভারতীয় সংস্করণ, ২ ইংলণ্ডীয় সংস্করণ, ৩ হরি মোহন বাবুর ও ৪ ব্রজেন্দ্রলালের সংস্করণ লেখা ছিল। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ এই রূপ পূরণবাচক না লিখিয়া ১, ২, ৩, ৪—এই রূপ সংখ্যাবাচক শব্দ মুদ্রিত হইলে, ভুল হইত না। ইংরাজী রাজস্থানের মোটে কয়টী প্রচারণ হইয়াছে, তাহা নির্দ্দেশ করাই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। কালক্রমানুসারে কোন সংস্করণের পর কোন্ সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, বলিবার অভিপ্রায় থাকিলে এইরূপ বলা যাইত;—লণ্ডন নগরে ১ম সংস্করণ হয়। তাহার কিছু কালপরে শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের সংস্করণের প্রচারারম্ভ হয়। ঠিক এই সময়ে কি ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরেই হউক, (কারণ তারিখ আমাদের ঠিক্ মনে হইতেছে না) মান্দ্রাজ হইতে একটী সংস্করণ বাহির হইতে থাকে। সর্ব্বশেষে ব্রজেন্দ্রলালের প্রচারণ আরব্ধ হইয়াছে। কেহ কেহ জিজ্ঞাসিয়াছেন, 'ভারতীয় সংস্করণ' বলার তাৎপর্য্য কি ছিল? আমরা মান্দ্রাজের সংস্করণকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ লিখিয়াছিলাম।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ২য় ভাগ; শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, মূল্য ৩৷৷০ টাকা।

অক্ষয় বাবুর বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ধন 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের' ১ম ভাগ ১২৭৭ সালে প্রচারিত হয়। তখন আর্য্যদর্শন প্রভৃতির জন্ম হয় নাই; সুতরাং সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানির পরিচয় আর্য্যদর্শনে দিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সে যাহা হউক, উপাসক সম্প্রদায় পুস্তক ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বঙ্গীয়গণের চিন্তার গতি ফিরাইয়া দিয়াছে—কিরূপ প্রণালীতে অধ্যয়ন করিতে হয়, কি উপায়ে প্রকৃত সত্য উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়, উক্ত গ্রন্থ তাহা শিক্ষা দেয়।

এ স্থলে নির্জ্জীব, জড়, উৎসাহবিহীন বাঙ্গালির মনোযোগ আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার বিষয় সংক্ষেপে বলা আবশ্যক। প্রায় ২৭।২৮ বৎসর গত হইল, ইনি উৎকট শিরঃপীড়ায় এক প্রকার জীবন্মৃত হইয়াও, এমন পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়াছেন, ও করিতেছেন,

এবং ভবিষ্যতেও করিবেন (গ্রন্থ মধ্যে তাহা জানা গেল) যাহাতে মস্তিষ্ক চালনা না হইলে কোন ক্রমেই চলে না। ইয়ুরোপীয় বা আমেরিক কোনও পণ্ডিত মস্তিষ্করোগ-প্রপীড়িত হইয়া মস্তিষ্কেরই চালনা করিয়া কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এমন কথা আমরা কোন স্থানে পাঠ করি নাই এবং কাহারও নিকটে শুনি নাই। ইতিহাসবেত্তা, অন্ধ প্রেস্‌কট্ 'স্পেন দেশীয় রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইজাবেলার ইতিহাস' 'মেক্সিকো-বিজয়ের ইতিবৃত্ত' 'পেরুবিজয়ের ইতিহাস' এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর আকারের 'দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বের পুরাবৃত্ত' এই ৪ খানি পুস্তক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ মিল্টন্ অন্ধ হইয়া 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড (Paradise Regained) কাব্য প্রণয়ন করেন। বধির ও খঞ্জ ব্যক্তিদের সুশিক্ষাপ্রাপ্তির বিষয়ও শুনা গিয়া থাকে। এ গুলি আমরা জানি। কিন্তু পতিত বঙ্গের পক্ষে অক্ষয় বাবুর দৃষ্টান্ত অল্প গৌরবের কথা নহে। এই আদর্শ বঙ্গবাসী ভ্রাতৃগণের জীবনের পরিচালক ও একমাত্র মূল জপমন্ত্র হওয়া উচিত।

সম্প্রতি সমালোচ্য গ্রন্থ বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক।

(ক) এই গ্রন্থে ২৮২ পৃষ্ঠা পরিমিত উপক্রমণিকা আছে। সাংখ্য প্রস্তাবে সাংখ্য পণ্ডিতগণের 'নির্গুণ ঈশ্বর হইতে কি রূপে সগুণ সংসারের উৎপত্তি হয়?' এই জিজ্ঞাসার উত্তরে গ্রন্থকর্ত্তা বলেন, "কিন্তু ঘটিকা যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, গ্রন্থকারের গ্রন্থ ইত্যাদি বস্তুতে যেরূপ বুদ্ধি-কৌশল বিদ্যমান আছে, যাঁহারা এই বিশ্বযন্ত্রে তদপেক্ষা শত সহস্র গুণ কৌশলরাশি দর্শন করিয়া প্রজ্ঞাবান্ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করেন, এবং সেই সমস্ত অদ্ভুত কৌশল অনির্ব্বচনীয়-কৌশল-সম্পন্ন নৈসর্গিক আদি নিয়মের কার্য্য জানিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অচিন্ত্য মহিমায় অতিমাত্র আধিক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সাংখ্য পণ্ডিতদিগের উল্লিখিত আপত্তি তাঁহাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলিতে পারেন, ঐ আপত্তি ঈশ্বরের স্বরূপ-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে এক দিন উত্থাপিত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব-নিরূপণ-বিষয়ে কোন রূপেই নিয়োজিত হইতে পারে না।" ঐ বাক্যে স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় অর্থাৎ ঈশ্বর সগুণ কি নির্গুণ জানা যাইতে পারে, কিন্তু ঐ আপত্তি অস্তিত্ব নিরূপণে নিয়োজিত হইতে পারে না—এই অংশ টুকু চিন্তার ফল এবং সাংখ্যাচার্য্যগণের এক আপত্তির খণ্ডন করিতেছে।

(খ) মীমাংসাদর্শনে শব্দ নিত্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শব্দ নিত্য কেন? না—শব্দ নষ্ট হয় বটে, তাহার অর্থ তো নষ্ট হয় না।—এই উপলক্ষে রাজা রাম মোহন রায়ের মত উদ্ধৃত হওয়াতে গ্রন্থের সেই অংশ, কোথায় উদ্দীপনা ও উত্তেজনা,

কোথায় বা উদ্বোধন ও উপদেশ এবং কোন স্থানে বা যথার্থ প্রকৃত কবিত্ব ও বাগ্মিত্ব আর অধিকাংশ স্থানে ঐ মত খণ্ডন করিয়া মীমাংসা প্রকাশ করিতেছে।

(গ) সবল ও স্বাধীন ভাবে আলোচনা করিয়া বেদান্ত প্রান্ত হইতে অক্ষয় বাবু আমাদিগকে দুইটী অত্যুন্নত উদার মত এই দেখাইয়াছেন যে, (১) "হিন্দুধর্ম্মোচিত আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া না চলিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞানসাধনে সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

(২)" যে স্থানে ও যে সময়ে মন স্থির হয়, সেই স্থানে ও সেই সময়েই উপাসনা করা বিধেয়।" অক্ষয় বাবু বেদান্তসূত্র দ্বারাই উহা প্রমাণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের এই দ্বিতীয় ভাগ ইঁহার প্রণীত প্রথম ভাগ অপেক্ষা দ্বিগুণ বৃহত্তর আকারের হইবে। এই বহু বিস্তৃত গ্রন্থ কোথা হইতে সংগৃহীত হইল ? এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন "এই ভাগের (দ্বিতীয় ভাগের) অন্তর্গত শৈবাদি সম্প্রদায় বিবরণের বহুতর অংশ নূতন সংগৃহীত। + + + বাঙ্গলা দেশের অধিক লোকই শাক্ত। এখানে তন্ত্রশাস্ত্রেরও অপ্রতুল নাই। অতএব শাক্ত ধর্ম্মের বিবরণ সংগ্রহ অপেক্ষাকৃত সহজ। শৈবসম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত-সংগ্রহ-উদ্দেশে ন্যূন সংখ্যা ১৪০০ চৌদ্দ শত শৈব উদাসীনের ব্যবহার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বহুশতের সহিত একত্র সহবাস করিয়া তাহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান-সংক্রান্ত নানা বিষয় কথোপকথন করিয়াছি এবং সজ্জন সরলস্বভাব উদাসীন পাইলে নিজ গৃহে আনয়ন পূর্ব্বক তদীয় মতামত শিক্ষা ও ক্রিয়ানুষ্ঠান দর্শন করিয়াছি। ঐ উদ্দেশে তাদৃশ সংখ্যক (১৪০০) বৈষ্ণব উদাসীনেরও আচার ব্যবহার অবলোকন ও তাহাদের সহিত সংসর্গ ও সদালাপ করিতেও ত্রুটি করি নাই। সন্ন্যাসী, সৎনামী, বীজমার্গী, পল্টুদাসী, আপাপন্থী প্রভৃতির গূঢ় মন্ত্র ও গুহ্য ব্যাপার যেরূপে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কি বলিব? আমাকে এই জীবন্মৃত শরীরের স্বাস্থ্যক্ষয় স্বীকার করিয়া আত্মসন্নিধানে অপরাধী হইতে হইয়াছে।"

ইহাতে ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা ব্যতীত তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সকলের অর্থ, যোগী, পরমহংস, ষটচক্র, 'কুম্ভক' যোগ দ্বারা একটি যষ্টির উপরি উপবিষ্ট মান্দ্রাজস্থিত যোগী, পুরাণপুরি নামক ঊর্দ্ধবাহু, নানা প্রকার তিলক এবং জগন্নাথ, ৪ প্রকার স্তূপ ৪টী, সজ্ব যন্ত্র, বুদ্ধযন্ত্র ইত্যাদির চিত্র আছে। মুসলমানেরা সংস্কৃত আদর করা দূরে থাকুক, ঘৃণা করিত, অনেকের মুখেই এই মত শুনা যায়। কিন্তু বোগদাদে, আরবে, দারাসাঁকোর সভায় সংস্কৃত চিকিৎসা, গণিত, উপন্যাস, জ্যোতিষ, উপনিষৎ, সঙ্গীতাদির কত সম্মান ও চর্চ্চা ছিল এবং তদনুসারে কত গ্রন্থ আরবি ভাষায়

ভাষান্তরিত হয়, এই গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে আছে—আর, গ্রীসদেশীয় হিপক্রেটিস্ পর্য্যন্ত চরক সুশ্রুত প্রভৃতি হিন্দুচিকিৎসকদিগের নিকটে কত ঋণী, তাহাও এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানিলে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইতে হয়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, ইহাতে অনুষ্ঠানের কোনই ত্রুটি নাই। ইহা বঙ্গের রত্ন-বিশেষ।

সমালোচক কাব্য, প্রথম খণ্ড, মূল্য /০ আনা। ভারতী, এডুকেশন গেজেট, বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন প্রভৃতিকে প্রধানতঃ লক্ষ্য করিয়া এই ব্যঙ্গকাব্য খানি বিরচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুস্তিকার কোন কোন স্থল আমাদের অভিমত অনুযায়ী হয় নাই।

সাধারণীসম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের ভারতী যে ভ্রম প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে সমালোচক কাব্যে অক্ষয় বাবুর মত-সমর্থক কথা আমাদের ভাল লাগে নাই। ভারতীর ঐ সমালোচনা যথাসময়ে পাঠ করিয়াছিলাম; তাহাতে ভারতী যথার্থ কথা বলিয়াছিলেন। "ভারতী স্বাধীন ভাবে তাঁহার মত প্রচারের অধিকারী; আর ভারতী বা যে কোন সাময়িক-পত্র-সম্বন্ধে জনসাধারণের যাহা বক্তব্য আছে, তাহাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারেন। কিন্তু বলিবার প্রণালী সুরুচি-সঙ্গত হওয়া চাই। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিষয়সংক্রান্ত অনেক কথাও আছে তৎসমস্তই অতি যথার্থ কথা এবং প্রকৃত কবিত্বপূর্ণ। লেখক আর্য্যদর্শনকেও ইঙ্গিতে দুই একটা কথা বলিয়াছেন। ব্যঙ্গভাবে কাব্যরচনে এই লেখকের বেশ ক্ষমতা আছে।

সুরভি (সাপ্তাহিক পত্র) বসুপ্রেসে মুদ্রিত। বিগত আশ্বিন মাস হইতে শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্বাবধানে ইহা প্রকাশিত হইতেছে। সুরভির মুখ্য উদ্দেশ্য—"সাধারণ বঙ্গবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিস্তার করা।" এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ইংরাজী গ্রন্থ হইতে বিস্তর বিষয় গৃহীত হইতেছে। সাময়িক পত্রের মধ্যে আর্য্যদর্শন যে ভার অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন; সংবাদ পত্রের মধ্যে সুরভি সেই ভার লইয়াছেন দেখিয়া হৃষ্ট হইলাম। বঙ্গদর্শন ভিন্ন অন্য কেহই আর্য্যদর্শনের উদ্দেশ্য ও কার্য্য তৎকালে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। অন্যান্য পত্রিকা সকল বরং বঙ্গদর্শনের মর্ম্ম রূপান্তরিত করিয়াছিলেন। অনুবাদে ভাষা শীঘ্র পুষ্ট ও পূর্ণাবয়ব হয়। আরবী ভাষা তাহার সাক্ষী। সংস্কৃত ভাব আরবীতে অনেক প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইয়ুরোপীয় ভাষার আভাস বঙ্গে যত প্রবিষ্ট হইবে, ততই মঙ্গল। সুরভির লেখা ধীর অথচ বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন। বঙ্গবাসীর ন্যায় অপরিণত দাম্ভিক মত অতি অল্পই ইহাতে স্থান পায়।

কোন কোন স্থানের ভাষায় ব্যাকরণ ভুল আছে। ১৭ সংখ্যায় দৈনিক সংবাদপত্রের নামোল্লেখ কালে সমাচার

চন্দ্রিকা ও সংবাদ প্রভাকরের নাম উল্লেখ করেন নাই। আর সুরভির লিখিত কয়েকটী প্রস্তাবের মর্ম্ম আমাদের পক্ষে পুরাতন। ইউজিন্ এরাম নভেলটী অনুবাদিত হওয়াতে, এক নূতন দৃষ্টান্ত বঙ্গীয় পাঠকের সমক্ষে ধৃত হইল। বাঙ্গালায় অনুকরণ করিয়া যে সকল জঘন্য নভেল বাহির হয়, ইহা তাহাপেক্ষা অনেক ভাল হইতেছে। বিজ্ঞান, [illegible] কি গল্প, পদার্থশাস্ত্র, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় উৎকৃষ্ট হইয়াছে। মাইকেলের পরে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উপকার হইতে পারিবে। ইহাতে দুই একটী প্রসিদ্ধ বাঙ্গালির জীবনচরিত প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

হৃদয়-প্রতিধ্বনি, শ্রীপুলিনবিহারী দত্ত-বিরচিত; মূল্য ৷৷০ আনা। কোন কোন পদ্যে ইংরাজী, সংস্কৃত ভাবের ছায়া থাকিলেও সাধারণতঃ কবিতাগুলি ভাল। বর্ণাশুদ্ধি দুই চারি স্থলে অতি অসঙ্গত হইয়াছে; অপ্রচলিত এমন এক একটী শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে যে, তাহার অর্থগ্রহ করিতে চিন্তা করিতে হয়—'সজ্য'ধনু অর্থাৎ জ্যা (ছিলা) সহিত ধনু। অনেক পদ্যে প্রণেতার হৃদয়বত্তার আভাস পাওয়া যায়। কবিতাগুলিতে কষ্ট-কল্পনা প্রায় নাই। অনুকরণের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া নিজ চেষ্টায় ভাব সংগ্রহ করিয়া উত্তরকালে কাব্য রচনা করিলে, পুলিন বাবু ভবিষ্য কালে খ্যাতি লাভ করিতে পারিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি একেবারে অকৃতকার্য্য নাই। লেখায় মাধুর্য্য আছে

রাজস্থান, ১ম খণ্ড, ১—৩ সংখ্যা। শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত। শ্রীঅঘোরনাথ বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।

রাজস্থানের বঙ্গানুবাদ [illegible] আর বাঙ্গালির স্ব[illegible] অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের এতদ্দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা। রাজস্থানে ভারতের ইতিহাস-সংক্রান্ত বিস্তর কথা আছে। সঙ্কলয়িতা দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশের যে বংশতালিকা দিয়াছেন, তাহা কতকটা পরিশ্রমের ফল। টডের প্রদত্ত তালিকা অপেক্ষা ইহা উৎকৃষ্টতর ও বিশুদ্ধতর। বাল্মিকী রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত, মৎস্য ও কল্কিপুরাণ প্রভৃতিতে সূর্য্যবংশাদির বংশপরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে। সার উইলিয়ম জোন্স এসিয়াটিক রিসর্চ্চে এ বিষয়ের সামঞ্জস্যের চেষ্টা করিয়াছেন। টড্ মহোদয়ও যথাসাধ্য যত্ন করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশের পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষায় মন দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সঙ্কলয়িতা টডের প্রদর্শিত পদবী অনুসরণ করিয়া যাহাতে ইতিহাস বজায় হয়, তাহার জন্য মনোযোগ দিয়াছেন, দেখা গেল। কিন্তু তিনি অসাবধানতা বশতঃ বোধ হয়, তালিকায় বিকুক্ষিকে ইক্ষাকুর পৌত্র লিখিয়া অনরণ্যের পুত্র বলিয়াছেন।

লেখকের সহিত পুরাণকে আমাদের ইতিহাস বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। পুস্তক-
দ্য টীকা দেওয়াতে মূল গ্রন্থ
না ইহার গুরুত্ব বাড়িয়াছে।
ক্ষ। বর্ত্তমান পুস্তক টডের
ভাবও কিছু কিছু নিরাকৃত
হার অশুদ্ধি সংশোধিত হই-
য়াছে, সুতরাং সম্পূর্ণ হইলে, ইহা উত্তম হইবে। মুদ্রণ ও কাগজ উৎকৃষ্ট; মূল্য সুলভ। এতৎ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আরো আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গ্রন্থাবলী (গদ্য ও পদ্য) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। মেডিকল লাইব্রেরির অধিকারী শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ বাবুর সমগ্র গ্রন্থ সুলভ মূল্যে প্রকাশিত করিতেছেন। ১৪ টাকা মূল্যের ২৩ খানি গ্রন্থ ডাকমাসুল সমেত ৪।। টাকায় প্রদত্ত হইবে। সুলভ মূল্য বলিয়া ছাপা বা কাগজ নিকৃষ্ট হইতেছে না। বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দ এই অবসর ত্যাগ করিলে, বাঙ্গালি জাতির অনস্তিত্বের জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইব। গ্রন্থাবলীর ৪ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে, কবিতাগুলি ভাল।

শিক্ষা, শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার-প্রণীত, সহর সেরপুর চারুযন্ত্র; মূল্য ৫০ আনা।

শিক্ষা-সম্বন্ধে সাধারণ প্রস্তাব, ছাত্রাবস্থা (Student Life) ব্যায়াম, স্ত্রীশিক্ষাদি শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয়গুলি এই পুস্তকে আলোচনার জন্য গৃহীত হইয়াছে। ভারতে পূর্ব্বকালে শিক্ষাসম্বন্ধে কত উচ্চ নীতি প্রচলিত ছিল, এই গ্রন্থে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই কার্য্যে তর্কালঙ্কার মহাশয় বিশেষ গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন। এ স্থলে আমরা "শিক্ষা"-প্রণেতার পরিচয় দিব। তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটীর' দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত গ্রন্থের মুদ্রণকালে সংশোধন, পারিপাট্য বা সংস্কার কার্য্যের উন্নতির জন্য নিযুক্ত আছেন, এবং সম্প্রতি ইনি কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কালেজের এক জন উৎকৃষ্ট অধ্যাপক। "শিক্ষার" প্রথম অংশে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বহুল প্রমাণ গৃহীত হইয়াছে। তদ্ভিন্ন যত্ন-সংগৃহীত অন্যান্য অনেক ঘটনারও ইহাতে সন্নিবেশন দেখিতেছি। ইংরাজী ও পারসীতে অনভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তত্তৎ ভাষার গ্রন্থের বিস্তর ভাব, ঘটনা ও উপদেশেরও ইহাতে সমাবেশ আছে। এবং এরূপ করায় গ্রন্থের গৌরব দাঁড়াইয়াছে। টোলের এক জন অধ্যাপকের এইরূপ চেষ্টা দেখিলে আমাদের কত যে আহ্লাদ হয়, তাহা আর কাহাকে জানাইব? তাঁহার ভাবাও অনুব্যবসায়ী ভট্টাচার্য্যের ন্যায় নহে; প্রত্যুত তাহা উত্তমরূপ তেজস্বিনী। ইহাঁর সহিত সাধারণতঃ আমাদের বড় মতভেদ নাই; তবে ২।১টী বৈলক্ষণ্য আছে। যথা—

(১) ১৫ পৃষ্ঠ—"অধিকাংশ মুসলমান রাজগণ হিন্দুদিগকে ভয়ানক দ্বেষ করিতেন"

(২) ৩১ পৃষ্ঠ—"কপিলের নিরীশ্বরবাদ প্রাচীন; তাহা সমাজের অনিষ্টকারী হয় নাই, কিন্তু মিলের নিরীশ্বরবাদ সমাজে কি ভয়ানক আন্দোলনই তুলিয়াছে * * *"

অধিকাংশ মুসলমান রাজগণের বরং হিন্দুদিগের প্রতি মমতার কথাই প্রতিপন্ন হয়। ইতিহাস আলোচনা দ্বারা উহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। আকবর, জাহাঙ্গীর, সাজিহান, দারা সাঁবো প্রভৃতি কখনই অত্যাচার করেন নাই। ইতিহাসের আলোকে এক্ষণে নূতন সত্য প্রকাশিত হইতেছে।

কপিলের নিরীশ্বরবাদে নাস্তিকতা শিখায় না কে বলিল? কপিল সূত্রের উপর ভাষ্যস্বরূপ হইয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এবং সেই বৌদ্ধ ধর্ম্মে হিন্দুসমাজ কত বিপর্য্যস্ত হয়, সকলেরই জানা আছে।

আর কপিলের পরে বোঢ়ু, আসুরি, পঞ্চশিখ, বিজ্ঞানভিক্ষু, যতি, ভোজরাজ, বিজ্ঞানেশ্বর, ঈশ্বরকৃষ্ণ, গৌড়পাদ, নারায়ণতীর্থ ও বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সাংখ্যশাস্ত্রের অনুশীলনকারিগণের চেষ্টায় কপিলের মত কি অল্প শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছিল? সে বিষয় ভাবিয়া দেখিলে মন যে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

বৌদ্ধধর্ম্মের মূল মন্ত্র কোম্তের হিতবাদে পাওয়া যায়। মিলের মত কোম্তেরই ছায়া মাত্র; সুতরাং ধরিতে গেলে, কপিল ঐ সকলের মূল। বৃহস্পতি আবার কপিলেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। আর—

(ক) তদ্বৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ। শ্রুতি।

(খ) যোহবমন্যেত তে মূলে হেতুশাস্ত্রাশ্রয়াৎ দ্বিজঃ।

স সাধুভির্বহিষ্কার্য্যো নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ॥

মনু, ২।১১শ্লোক।

(গ) নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া— ইত্যাদি নাস্তিকতার প্রমাণ সাংখ্যপ্রণেতার কত পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল! সুতরাং কপিলের অনীশ্বর বাদে ক্ষতি হয় নাই কিরূপে বলিব? তবে এখনকার মত তখনকার কোন বিষয়ের যথার্থ তথ্য ও ঘটনার বৃত্তান্ত এবং তালিকা পাওয়া যায় নাই—তাই ঐরূপ কথা শুনা যায়।

স্ত্রীশিক্ষাপ্রকরণে তর্কালঙ্কার মহাশয় অতি উদার মত পোষণ করেন। তাঁহার পুস্তকের এই অংশ হয়ত গোঁড়ামিপূর্ণ হইবে, পাঠের পূর্ব্বে আমাদের এই আশঙ্কা ছিল। স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে পুরাতন কাহিনী বলা হয় নাই—ইহা আরো আনন্দের কথা। তাঁহার এই প্রকরণে অনেক নূতন কথা আছে। চেষ্টা করিলে আরো কিছু নূতন অংশ যোগ দেওয়া যাইতে পারিত। এই ভাগে বিস্তর প্রমাণ প্রয়োগ উদ্ধৃত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন ছাত্রজীবনে যে পাণ্ডিত্য ও মীমাংসা প্রকাশিত আছে, তাহা প্রত্যেকেরই অনুমোদনীয়।

"শিক্ষার্থী" ন্যায় গ্রন্থ বাঙ্গালা [illegible] অতুল্য, সুতরাং নব্য বাঙ্গালি গ্রন্থকারের তাহা আদর্শ। এ প্রণালীতে লিখিত পুস্তক বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় না—এই মহৎ দুঃখ। নব্যগণ [illegible] দ্বিতীয় বা তৃতীয় বর্ষে ইহা অধীত হইবার কোন বাধা নাই।

SPEECHES AND MINUTES of the Hon'ble Kristo Dass Pal Rai Bahadur. C. I. E. Edited by Ram Chundra Palit.

কৃষ্ণদাস [illegible] ১৮৬৩ হইতে ১৮৮১ সাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় (Bengal Legislative Council) যে সকল বক্তৃতা করেন, বাবু রামচন্দ্র পালিত [illegible] এই পুস্তকে [illegible] করিয়াছেন। এবং দুর্ভিক্ষ, ইনকমট্যাক্স ও যুবরাজের ভারতাগমন, [illegible] খরচ পত্র, ট্রেড্স এসোসিয়েশনে বক্তৃতাগুলিও ইহাতে মুদ্রিত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস বাবু রাজনীতিজ্ঞ এক জন [illegible] ব্যক্তি। বক্তৃতাগুলিও উচ্চ [illegible]। পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস বাবুর অভিপ্রায়ও এই গ্রন্থমধ্যে আছে।

তাঁহার এই পুস্তক পাঠ করিলে চৌদ্দ বৎসরের ভারতের প্রধান প্রধান ঘটনা শিক্ষা করা যায়। কৃষ্ণদাস বাবু হিন্দু পেট্রিয়টে তাঁহার এই বক্তৃতাগুলির [illegible] পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। তাঁ[illegible] বহু যত্ন ও বহু পরিশ্রমের [illegible] [illegible] [illegible] হন, এই উদ্দেশে রামচন্দ্র বাবু প্রবন্ধ-নর্ত্তকে এই গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন।

এ স্থলে প্রকাশক ও সম্পাদক বাবু রামচন্দ্র পালিতের কথা কিছু বলা উচিত। তিনি ইতিপূর্ব্বে বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা মুদ্রিত করিয়াছিলেন। কিছু দিন হইল, তিনি গবর্ণর জেনেরেলের [illegible] সময় হইতে যত বক্তৃতাদি হইয়া গিয়াছে, তাহা মুদ্রিত করিয়াছেন। [illegible] ও ভারতরাজনীতিজ্ঞ [illegible] [illegible] সেই গ্রন্থে আছে। গবর্ণর জেনেরলের সম্মতিতে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। আমরা শুনিয়াছি, [illegible] তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেকের লোকে রামচন্দ্র বাবুকে [illegible] সাহায্য করেন, এই আমাদের [illegible] [illegible] আবেদন। [illegible] রামচন্দ্র বাবুকে আমরা তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] থাকিতে [illegible]। [illegible] তিনি সুরেন্দ্র বাবুর আদালত অবমাননার পুস্তক (The Great Contempt Case) মুদ্রিত করিয়া সাধারণের [illegible] হইয়াছেন।

সঙ্গীত সংগ্রহ ([illegible]) ১ম খণ্ড। মূল্য ।৵০ [illegible] মাত্র। [illegible] [illegible] [illegible] জীবনী সহিত তাঁহার [illegible] গীতাবলী [illegible] সংগ্রহ করেন, তিনিই বাবু [illegible]

বসু মহাশয়ের উত্তেজনা ও প্রবর্ত্তনায় এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবু প্রসাদ-প্রসঙ্গের অভিমতি-প্রকাশক পত্রে সংগ্রহকর্ত্তাকে লেখেন "প্রসাদ প্রসঙ্গ রত্নভাণ্ডার; কিন্তু আর একটী রত্ন-ভাণ্ডার অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহা বাউলের গীত"। রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আমরাও 'প্রসাদ প্রসঙ্গের' সংগ্রহকারকে এক জন উপযুক্ত সংগ্রহকার মনে করি। [পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রসাদ-প্রসঙ্গের আর্য্যদর্শনে অতি বিস্তৃত সমালোচনা হইয়াছিল]। বর্ত্তমান সংগ্রহ গ্রন্থে অনেক মহামূল্য রত্ন গীতচ্ছলে দৃষ্ট হইল। এই সংগ্রহেও সংগ্রাহককে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেননা, বাউল-সম্প্রদায়ীরা অন্যকে সংগীত দিতে ইচ্ছুক নহে—পুস্তকের অবতরণিকামধ্যে লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহে যত্নের ত্রুটি করা হয় নাই। দুর্ব্বোধ স্থানের টীকা করিয়া দেওয়ায় বুঝিবার সুবিধা হইয়াছে। ১৫৮টী সংগীত এই প্রথম খণ্ডে নিবেশিত আছে। আশা করি, বঙ্গদেশের লোক ইহার এক এক খণ্ড ক্রয় করিয়া উদ্যোগকর্ত্তাকে উৎসাহিত করিবেন। বিদেশের মুখাপেক্ষী না হইয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করিলে, ভারতের শুভ আশা নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিবে। এই স্বাধীন উদ্যমের প্রতি এদেশীয়গণের শ্রদ্ধা জন্মান, এক্ষণে একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম ভাগ—শ্রীরাজনারায়ণ বসু বিরচিত। মূল্য ১৲ টাকা। স্বদেশীয় ভাষানুশীলন, মাইকেলের "মেঘনাদবধ"-কাব্যের সমালোচন, বাল্মীকির অক্ষয় কীর্ত্তি, চিকিৎসা, জেঠামো, আশ্চর্য্য স্বপ্ন, শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের জাতীয়-গৌরবেচ্ছা-সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব ও মিসর দেশ-প্রস্তাব গুলি উত্তম হইয়াছে। তবে ইহার মধ্যে কোন কোন প্রস্তাবে রাজনারায়ণ বাবুর পুরাতন লেখাও দেখা গেল। সে গুলির ভাষা অনেক স্থলেই অননুমোদনীয়। দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যথা—"বিটন সাহেব, যিনি বেথুন সাহেবের পর শিক্ষাসমাজের সভাপতি ছিলেন, তিনি * * যে বক্তৃতা করেন ইত্যাদি।" "করেন" এই ক্রিয়াপদের কর্ত্তা 'বিটন সাহেব' ও 'তিনি'। ইংরাজীতেও এরূপ ভ্রম অসহনীয়। সমাজ সংস্কার প্রস্তাবেরও সকল মতে সায় দিতে পারি না। "স্ত্রীলোকের সতীত্বরক্ষার জন্য অন্তঃপুর আবশ্যক," বৈদিক কালের যমী, রোমশা, বিশ্ববারা, আত্রেয়ী, গার্গীর দৃষ্টান্ত চক্ষুর অগ্রে থাকিতেও কি প্রকারে বিশ্বাস করিতে পারা যায়? যাহা হউক, এই সকল ও অন্য প্রকার আপত্তি থাকিলেও, বলিতে হইবে—রাজনারায়ণ বাবু বাঙ্গালি জাতি ও বাঙ্গালা ভাষার এক জন অকপট উপাসক।

সিংহ, বানর্জি এবং ফ্রেণ্ড কোম্পানির ওরিয়েণ্টাল পবলিশিং ফারম হইতে বিবিধ প্রবন্ধের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হই-

তাহা যে সে লোকের কার্য্য নহে। নিকান অভ্যস্ত উপন্যাস-লেখকেরই সে বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভের সম্ভাবনা। দামোদর বাবু যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহার দায়িত্ব ও গুরুত্ব তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। স্বাধীন গদ্য ব উপন্যাস লেখার চেষ্টায় সে ক্লেশ নাই। দামোদর বাবু, উভয় বঙ্কিম এবং কালীপ্রসন্ন বাবুর মতের কতকটা [মা]ঝামাঝি গিয়াছেন। যাহা হউক, তিনি প্রসকল অনুবাদ না করিয়া অনেকটা স্বাধীন ভাবে চলিতেছেন। অনুবাদ ভাল হইতেছে।

৪। শরৎ ী Lamb's Tale হইতে অনুবাদিত। ল্যাম্ব সাহেবের এ অংশ সেক্ষপীয়রের Mid Summer Night's Dream হইতে গৃহীত। স্বকপোল-কল্পিত নাটক লিখিতে গিয়া বিফল-চেষ্ট হওয়া অপেক্ষা এরূপ উদ্যম মন্দ নহে। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া আমাদিগকে বিরক্ত হইতে হয় নাই। ভাষা প্রীতি-জনক বটে।

৫। নীলিমার ভাষা দেখিলে মনে হয়, লেখকের এইটী প্রথম প্রয়াস নহে। মধ্যে মধ্যে কর্কশ প্রয়োগ থাকিলেও, পাঠকালে, তত অপ্রীতিকর হয় না।

THE 2ND ANNUAL REPORT OF THE BROUGHTON INSTITUTION.

রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রিটের বিখ্যাত স্থাপকারী বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হইয়াছে, আমরা জানি। চিৎপুর ওয়েসলিয়ান মিশন স্কুলের ভূতপূর্ব্ব হেড্ মাষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় স্থাপনাবধি অঘোর বাবুর উপদেশ ও উদ্যোগে ইহার উন্নতির জন্য বিস্তর পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন—রিপোর্ট পাঠে অবগত হইলাম। হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রতিনিধি জজ ও ইদানীন্তন এড্মিনিষ্ট্রেটর জেনারল ব্রাউটন্ সাহেব মহোদয়ের নামে এই বিদ্যালয়ের নামকরণ হইয়াছে। স্কুলের খরচের জন্য টাকা অনাটন হইলে, অঘোর বাবু প্রায়ই নিজের টাকা হইতে বিদ্যালয়ের সাহায্য করিয়া থাকেন। যেরূপ ব্যবস্থার কথা শুনা যাইতেছে,তাহাতে বোধ হয়,শিক্ষা-কমিটীর (Education-Committe) রিপোর্ট বাহির হইলেই গবর্ণমেন্ট হইতে উচ্চশিক্ষা রহিত হইয়া যাইবে। সুতরাং ব্রাউটন ইনষ্টিটিউশনের দৃষ্টান্তে আরো বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া চাই। আশা করি, অতি ত্বরায় এই বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হইবে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ সি, আই, ই প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা ইহার উপকার করিতেছেন। অন্যান্য ধনী মহোদয়েরা ইহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নিজ নিজ ধনের সদ্ব্যয় করিয়া দেশের মঙ্গল করিতে থাকেন,এই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

১। আর্য্যগাথা, শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃক বিরচিত ; মূল্য ।০ আনা।

২। শ্মশান ও জীবন; শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত, মূল্য ⁄০ আনা।

৩। সিন্ধুদূত, শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ; মূল্য ।০ আনা।

৪। সখে! তা' কি ভোলা যায়? গ্রেট ইডেন যন্ত্র ; মূল্য ⁄০ আনা।

১। আর্য্যগাথার গীতিকাগুলি সদ্ভাব ও সদুদ্দেশ্যপূর্ণ। বঙ্গ দেশকে অকপট ভাবে দ্বিজেন্দ্র বাবু ভালবাসেন, পুস্তক পড়িলে তাহা প্রতীতি হইতে থাকে। ইহা আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

২। শ্মশানের ন্যায় গম্ভীর বিষয় পদ্যময় রচনায় প্রকাশের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সাধু। আমরা প্রণয়, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি সচরাচর প্রচারিত চুটকি কবিতা অপেক্ষা শ্মশান ও জীবনের প্রশংসা করিতে প্রস্তুত আছি।

৩। এক্ষণকার অধিকাংশ কবিতাপুস্তক দেখিলে কাব্যবিভাগে অরাজকতা পড়িয়াছে, বোধ হয়। কিন্তু সিন্ধুদূতসম্বন্ধে তাহা বলিতে পারি না।

ইহার পদবিন্যাসে যতটা নৈপুণ্য দেখা গেল—কবিত্বাংশে তদপেক্ষা অনেক কম নৈপুণ্য। প্রথম স্তবক ছন্দাংশে কতকটা ভাল লাগে। প্রত্যেকের দীর্ঘ-ছন্দ-বিষয়ক মন্তব্য সত্ত্বেও বলি, বৃত্তি রাখিতে বড় কষ্ট হয়।

৪। পদ্যগুলিতে বেশ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক স্থলে যথার্থ হৃদয় ভাব পরিস্ফুট ও সুব্যক্ত। দুঃখের বিষয়, নিতান্ত নির্লজ্জ ভাব অধিকাংশ স্থলে বিরাজ করিতেছে।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত সি, এস,—প্রণীত। ২য় সংস্করণ, মূল্য ৷৷০ আনা।

রমেশ বাবু, ইয়ুরোপ-অবস্থান-কালে তাঁহার কোন আত্মীয়কে ইংরাজীতে যে সকল পত্র লেখেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই পুস্তক তাহারই বঙ্গানুবাদ। পুস্তক-মধ্যে সিংহল, ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, ওয়েলস, স্কটলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজলণ্ড ও ইটালি প্রভৃতি স্থানের নাতিদীর্ঘ সুন্দর সুন্দর বর্ণনা আছে। পড়িবার সময়ে মনোমধ্যে দেশভ্রমণের বলবতী বাসনা জন্মে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে উহার উপকারিতার গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। বাঙ্গালা ভাষায় ভ্রমণবিষয়ক পুস্তক প্রায়ই দেখা যায় না। এ শ্রেণীর গ্রন্থের যতই প্রচার হইবে, ততই মঙ্গল। ইহার ভাষা বেশ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় ইহার প্রকাশক ও উপস্বত্ব (Copy-right) অধিকারী হইয়াছেন। ভরসা করি, বঙ্গীয় পাঠক তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

বিচিত্র পৌষ পার্ব্বণ (রস-কাব্য)।

শ্রীনেহালচাঁদ প্রণীত। আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের কুচরিত্রাংশকে বিদ্রূপ করা কাব্যের উদ্দেশ্য। তদ্ব্যতীত সুখে, আমাদের গ্রন্থকারের এবং রজন-

...লায়ও যে সকল দোষ আছে, তাহাও নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার দেখাইয়া-...ন। গ্রন্থের স্থানে স্থানে রচনা সুন্দর ...য়াছে। এক স্থানের রচনা উদ্ধৃত ...রিয়া দিলাম।—

...াটি গৃহ,'পাতি পিঁড়া বিছায়ে আসন—
...তি পাঁতি; রাখি গ্লাসে—বারিপূর্ণ,তায়
কোণে কোণে, এক টেরে রাখিলা
[প্রদীপ,—
...র্তিত হে গাবতেলে,—জলে মিটি মিটি;
...জের অস্তিত্ব যেন দেখাতে জগতে!
হে বিদেশি, এও এক চির-কুলপ্রথা
...ঙ্গের। অথবা, বাঙ্গালীর জাতিগত
...তজ, বল,শৌর্য্য, বীর্য্য, বীরত্ব, দর্পের—
...জ্জ্বল নমুনা ওটা!—অহো কি আক্ষেপ!"

...ভাবপ্রকাশ।* চরক, সুশ্রুতের ...র যত গ্রন্থ হইয়াছিল, ভাবমিশ্রের ভাবপ্রকাশ তন্মধ্যে এক খানি অত্যুত্তম পুস্তক। ভাবমিশ্র ভারতবর্ষের পশ্চিমা-ঞ্চলের লোক। ইহাতে শারীরতত্ত্ব, রোগের লক্ষণ, দ্রব্যগুণ, নাড়ীজ্ঞান,পথ্য-নির্ণয়, পীড়ার নিদান,সাধারণ চিকিৎসা, ...ত, তৈল, ঔষধ প্রস্তুতীকরণ এবং মুষ্টিযোগ প্রভৃতি আছে। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার শ্রীবৃদ্ধি হইতে সূত্রপাত হইয়াছে—আরও হওয়া আবশ্যক। এই পুস্তকে মূল সংস্কৃত ও তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হওয়াতে, সাধারণের সুবিধা হই-য়াছে। ভাষান্তরটী সাধারণের বিনা আয়াসে বোধগম্য হইবে।

সাহস (সাপ্তাহিক সংবাদপত্র)* সহরে এইরূপ পত্রিকা হইলে, সকলে অগ্রাহ্য করিত। কিন্তু, মফঃস্বলে যে যে স্থানে একেবারেই সমাচার পত্রিকা নাই, তথায় অন্ততঃ এরূপ পত্রি-কার প্রচারারম্ভ হইলে, স্থানীয় লোকের যথেষ্ট ইষ্ট সংসাধিত হয়। আমাদের দুর্গতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছে বলিয়া, মফঃস্বলের পত্রগুলির এইরূপ কদর্য্য মুদ্রাঙ্কন ও কদর্য্য কাগজ চক্ষে দেখিতে হয়। যেরূপ যোগ্যতা থাকিলে, পত্রিকা-সম্পাদক হওয়া যায়, বঙ্গীয়-সম্পাদক-গণের মধ্যে কত লোকের তত দূর শক্তি আছে, বলা বড় সুকঠিন। সম্পাদকের পদে বড় গুরুতর দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব যিনি স্মরণ করিয়া না চলেন, তাঁহার পতন অনিবার্য্য। কিছু দিন হইল, ইহা অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষা লিখিত হইতেছে।

গুপ্তপ্রেস্ পঞ্জিকা, ১২৯০ সাল। গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পঞ্জিকাতে অনেক পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। এবং গণনা বিশুদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট আয়াস করা হইয়াছে। এবারে ভট্টপল্লী-নিবাসী খ্যাতনামা পণ্ডিত-চতুষ্টয় এক-

* শ্রীরসিকলাল সেনগুপ্ত কবিরাজ কর্ত্তৃক অনুবাদিত। ১ম খণ্ড; ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট, সোমপ্রকাশ ডিপজিটরিতে প্রাপ্তব্য।

* এলাহাবাদে প্রকাশিত।

...স্থিত হইয়া গণনা করিয়া দিয়াছেন এবং জয়পুরনিবাসী প্রায় সমস্ত পণ্ডিতগণ, শ্রীযুক্ত [illegible] বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত জীবানন্দ জ্যোতিঃশেখর ও [illegible] প্রভৃতি অনেক [illegible] ইঁহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন। [illegible] বার বেলা ও কাল রাত্রি দণ্ড পলে লিখিত থাকে। [illegible] ইহাদের প্রায় বার বেলা, কাল রাত্রি কোন্ কোন্ বারে কি কি রূপ হয়, তাহা কণ্ঠস্থ থাকে; সুতরাং তাহা বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাদিগের প্রায় পঞ্জিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় না; কিন্তু যাঁহাদের তাহা কণ্ঠস্থ নাই তাঁহারা দণ্ড পল ও ঠিক বুঝেন না, [illegible] করিয়া না লইলে [illegible] পারেন না, সুতরাং তাঁহাদের সুবিধার্থ তাহা ইংরাজী ঘণ্টা মিনিটে করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত প্রাত্যহিক স্ফুট গণনা [illegible] নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এবারে দুই খানি ছবি নূতন দেওয়া হইয়াছে। এক খানি জৈনদিগের [illegible], অপরখানি [illegible]। দুই এক খানি পুরাতন ছবিও বাতিল করিয়া নূতন ধরণে দেওয়া হইয়াছে। সর্ব্বসমেত এবারের পঞ্জিকাতে ৩২ খানি ছবি আছে।

[illegible] সংযোগও অনেক পরিবর্ত্তন আছে। এই সমস্ত ইহার গুণ।

দোষের মধ্যে ইহাতে উক্তরূপ গণনা সত্ত্বেও ভ্রম, অসাবধানতা, ত্রুটি, অসম্পূর্ণতাদি রহিয়া গিয়াছে। আর বাঙ্গালার মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কথা থাকাও একটী দোষ। যেমন, ৪ দণ্ড বার বেলা [illegible] ইত্যাদি। আমাদের অনুরোধ—এটী শোধিত হয়।

আধ্যাত্ম রামায়ণ, ১—৩ খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী কর্তৃক ভাষান্তরিত। শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসাদ চন্দ্র কোম্পানি দ্বারা প্রকাশিত। বাল্মীকি রামায়ণে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, অধ্যাত্ম-রামায়ণে বেদব্যাস সে প্রণালী অবলম্বন করেন নাই। [illegible] রূপে বর্ণনা করা ব্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য। এতদ্ভিন্ন ঘটনাসম্বন্ধেও ইহাতে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, বলাইবাবু রামদেবের আধ্যাত্মরামায়ণ-অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়ায়, বঙ্গসাহিত্যে একটী নূতন জিনিসের সমাবেশ হইল। মধ্যে মধ্যে অনুবাদক যে সকল টীকা দিতেছেন, তৎ সমস্ত অতীব মহামূল্য। অনুবাদের ভাষাও উত্তম। আরব্ধ গ্রন্থ শীঘ্র উপসাপিত হইলেই, সুখের বিষয় হয়।